প্রবন্ধ সমগ্র ১

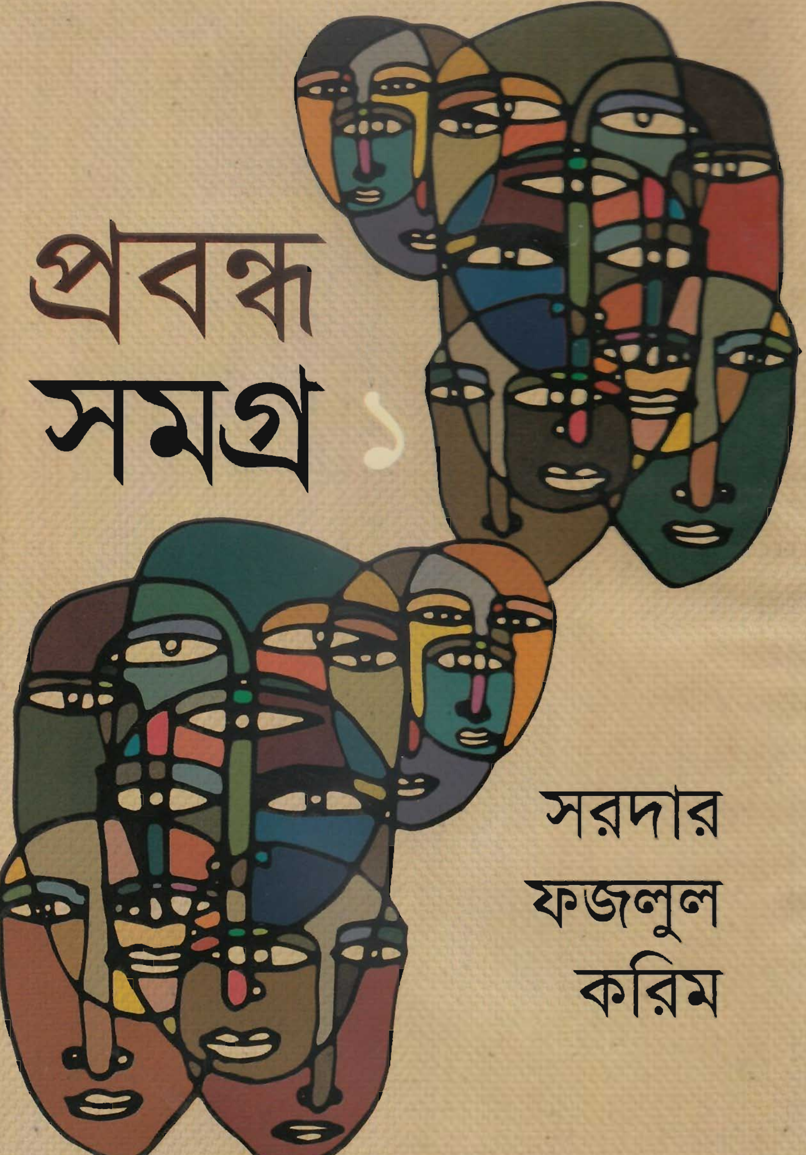

সরদার ফজলুল করিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

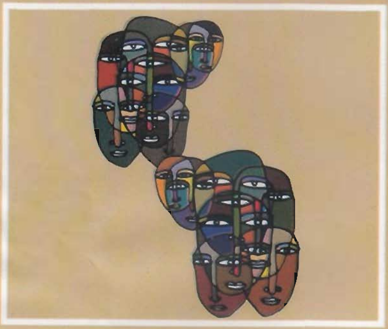

দার্শনিক সরদার ফজলুল করিমের প্রবন্ধ-নিবন্ধ সমূহ বেশ কিছু গ্রন্থে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বলা বাহুল্য সবগুলো গ্রন্থ পাঠকের কাছে সহজপ্রাপ্য নয়।

'অন্বেষা প্রকাশন' সরদার ফজলুল করিমের মূল্যবান প্রবন্ধসমূহ প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা প্রকাশ করছে।

প্রচ্ছদ : সব্যসাচী হাজরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

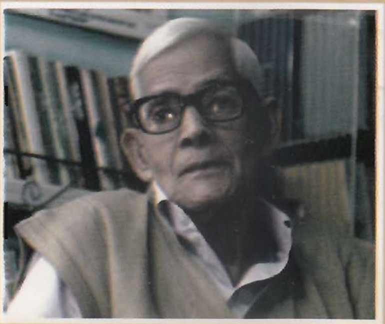

সরদার ফজলুল করিম জন্মেছিলেন ১৯২৫ সালের পহেলা মে বরিশালের আটিপাড়া গ্রামের এক কৃষক পরিবারে। বাবা খবিরউদ্দিন সরদার। মা সফুরা বেগম।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৪৫ সনে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স ও ১৯৪৬ সনে এম.এ. ডিগ্রি অর্জন করে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। সরদার ফজলুল করিম ছাত্রজীবন থেকেই শোষণমুক্ত মানবতাবাদী একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন জীবনের বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে একের পর এক লড়াই করেছেন। রাজবন্দি হিসেবে দীর্ঘ ১১ বছর তিনি কারাভোগ করেন। ১৯৫৪ সালে জেলে থাকাকালে সরদার সাহেব পাকিস্তান সংবিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৩-১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমীর সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যক্ষের পদে কাজ করেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর সরদার ফজলুল করিম ১৯৭২ থেকে ১৯৮৫ সন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সরদার ফজলুল করিম অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করে শিক্ষাক্ষেত্রে দীপ্যমান অবদান রেখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *প্লেটোর সংলাপ*, *প্লেটোর রিপাবলিক*, *অ্যারিস্টটলের পলিটিক্স*, *এঙ্গেলসের অ্যান্টি ডুরিং*, *রুশোর সোস্যাল কন্ট্রাক্ট*, *নানা কথার পরের কথা*, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক*, *চল্লিশের দশকের ঢাকা*, *নূহের কিশতি*, *রুমীর আম্মা*, *দর্শনকোষ*, *শহীদ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা স্মারকগ্রন্থ* ও *সেই সে কাল*।

সৃজনশীল লেখক হিসেবে তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার পদকে ভূষিত হন। শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সরদার ফজলুল করিমকে 'স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার ২০০০' প্রদান করা হয়। Now he is a national proffesore in our country.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবন্ধ সমগ্র ১

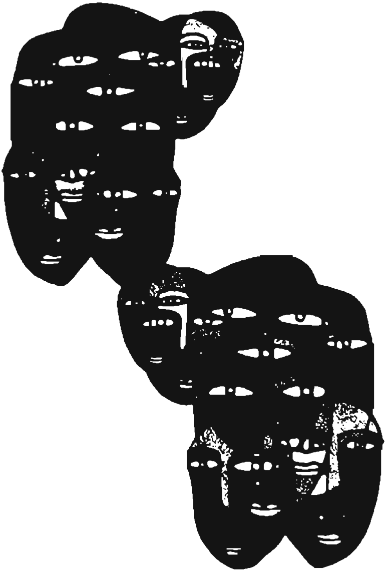

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবন্ধ সমগ্র ১

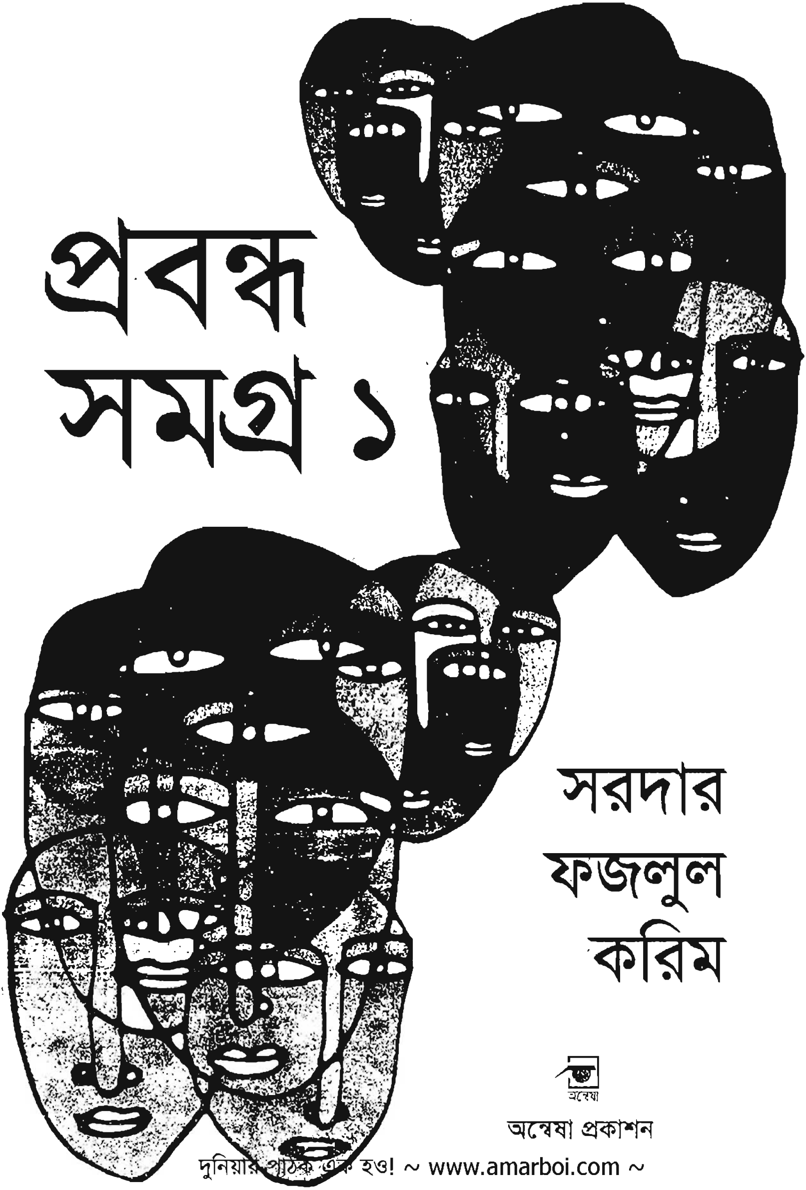

সরদার ফজলুল করিম

অন্বেষা প্রকাশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবন্ধ সমগ্র ১
সরদার ফজলুল করিম

স্বত্ব © লেখক

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১২

অন্বেষা ২৬১

অন্বেষা

প্রকাশক
মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন
অন্বেষা প্রকাশন
৯ বাংলোবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১২৪৯৮৫

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

অক্ষর বিন্যাস
মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন

মুদ্রণ
পানিনি প্রিন্টার্স
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক
মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন

মূল্য : ৫০০.০০ টাকা মাত্র

Probandho Somagra 1 by Sardar Fazlul Karim
First Published February Book Fair 2012.
Mohammed Shahadat Hossain
Annesha Prokashon, 9 Banglabazar, Dhaka.

www.anneshaprokashon.com
e-mail : annesha_prokashon@yahoo.com
Price : Tk. 500.00 only **US $ 20.00**
ISBN : 978 984 7116 35 8 Code : 261

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

আফসানা করিম স্বাতী
সরদার মারুফ করিম জ্যোতি
সরদার মাসুদ করিম তিতু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনভর লেখালেখির মাধ্যমে অনেক কিছু জানতে এবং জানাতে চেয়েছি। বলা যায় প্রবন্ধই আমার লেখালেখির মূল ধারা। মানবজীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে যা ভেবেছি তার কিছু প্রতিফলন ঘটেছে প্রবন্ধগুলোতে। এর মাধ্যমে ভাবনাকে আমি বহুমুখী ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছি। ভাষা ও সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, রাষ্ট্র ও রাজনীতি, দর্শন ও দার্শনিক ইত্যাদি বিষয় রয়েছে এসব প্রবন্ধে। বিষয়গুলো জটিল বটে, কিন্তু লেখার চেষ্টা করেছি সহজভাবে। জটিল কোন বাক্য বিন্যাসে এসব জটিল বিষয়কে আরও জটিল করে তোলা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করেছি। ভাবনার সরলীকরণের মাধ্যমে অনেক কঠিন ভাবনাকেও পাঠকের বোধগম্য করে তোলাই ছিল আমার লক্ষ্য। সহজ করে তুলতে চেয়েছি চিন্তার জগতকে, যা এসব জটিল বিষয়ের গভীরে প্রবেশে সাহায্য করে।

আমার 'প্রবন্ধ সমগ্র' প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে অন্বেষা প্রকাশন। এতে পাঠকের সুবিধা, আমার প্রবন্ধগুলো তাঁরা একসঙ্গে পড়ার সুযোগ পাবেন। এই উদ্যোগকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সরদার ফজলুল করিম
১৯.১১.১৭

সরদার ফজলুল করিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

সাহিত্যে সমস্যাটা কি?	১৩
গোর্কী প্রসঙ্গে	২৫
মার্কসীয় দর্শনের ভূমিকা	৩৩
ম্যাটেরিয়ালিজম অ্যান্ড এমপিরিও ক্রিটিসিজম	৪০
দর্শনের দর্শন	৪৬
বায়ান্নরও আগে	৫২
সতের বছরের একটি তরুণ	৫৭
উনসত্তরের স্মৃতি	৬০
উনসত্তরের ফসল	৬৩
নজরুল জন্মোৎসব প্রসঙ্গে	৬৭
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	৭১
লোককবি রমেশ শীল স্মরণে	৭৬
আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের 'ইসলামাবাদ'	৮৩
সোমেন চন্দ কে?	৮৮
ছড়া প্রসঙ্গে	৯৪
বান্ধব পাঠচক্র	১০২
বই পড়ার স্মৃতি	১০৬
গল্প নয়	১১১
আমরা আত্মাকে ডাকলাম	১১৬
বঙ্গবন্ধু	১২১
২৫ বছর আগের কথা	১২৬
গুজবে কান দেবেন না	১৩১
বাংলা মাধ্যমের প্রশ্নে	১৩৭
সমাজতন্ত্র : গণতন্ত্র : ধর্মনিরপেক্ষতা	১৪২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেবের জীবন দর্শন ১৪৭
বন্ধুর স্মৃতি ১৬৩
সত্যেন সেন প্রসঙ্গে ১৭১
একজন প্রাক্তন রাজবন্দীর ডায়রী ১৮০
১৩৫০ ১৯৮
বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রসঙ্গে ২০৬
একটি আন্দোলনের শক্তি এবং সীমাবদ্ধতা ২১৬
সেই ডিসেম্বর এবং এই ডিসেম্বরের ভাবনা ২২৫
'মধ্যরাতের অশ্বারোহী'র সঙ্গে আলাপ ২৩৪
একুশ থেকে একুশ ২৪৬
পোরট্রেট ২৫৬
বাংলাদেশে দর্শন চর্চার ভূমিকা ২৬৪
ভাষার প্রশ্নে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ২৭৪
রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষাদান– ভাষার প্রশ্ন ২৮৩
বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত ২৯৩
বুদ্ধিজীবী কে এবং তার ভূমিকা ২৯৯
নূহের কিশতি ৩০৯
সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ প্রসঙ্গে ৩১৪
গণতন্ত্র এবং সহনশীলতা ৩১৭
'৮৫-র 'রক্ত খরচ' ৩২৪
অবিকৃত আয়নার অপরিহার্যতা ৩২৮
'সোভিয়েট সাম্যবাদ : এক নতুন সভ্যতা' ৩৩৩
সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘটনাবলী এবং সমাজতন্ত্র ৩৩৯
শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' ৩৪৫
রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্বে আমাদের অস্তিত্ব ৩৫০
মানুষের অধিকার ৩৫৭
প্রগতি সাহিত্যের অগ্রপথিক : সোমেন চন্দ ৩৬১
'সাম্যবাদের ভূমিকা'র লেখক ৩৬৫
'নির্বাসিতের আত্মকথা' ৩৭২
একুশে ফেব্রুয়ারি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ৩৭৮
কোথায় '৭১? ৩৮৬
আমাদের অস্তিত্বের সংকট ৩৯৩
আঞ্চলিক ভাষার অভিধান ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ৩৯৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : সেকাল, একাল ৪০৬
যাহা ইংলিশ, তাহা গ্রীক ৪১৫
বিবর্তিত একুশে : বন্দী একুশ ৪১৯
জহুর ভাই-এর ভাষায় 'জহুর হোসেন চৌধুরী' ৪২৭
১৯৯২ : সামনে এবং পেছনে ৪৩৩
এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম ৪৩৮
অজিতদা'র 'বুলু' ৪৪৬
'বিষাদ-সিন্ধু' এবং একটি কিশোর ৪৫০
'আপনারাই আমাদের ডুবাবেন!' ৪৫৫
'আমায় ভোট দেন, আমি গণতন্ত্র দেবো' ৪৬৩
পাবলো নেরুদার স্মৃতিকথা ৪৬৮
চার ঘণ্টার প্যারোলে ৪৭৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যে সমস্যাটা কি?

[বর্তমান প্রবন্ধটির রচনাকাল বাংলা ১৩৫৪ সাল অর্থাৎ ইংরেজি ১৯৪৭ সন। প্রায় ২৩ বছর পূর্বের। বলা চলে এটি লেখকের কিশোর কালের একটি রচনা। এত বছর পূর্বের রচনা হারিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক ছিল। লেখকের স্মৃতিতেও সে ছিল না। তাকে পাওয়া গেল পুরাতন মাসিক সওগাতের ১৩৫৪ সনের বৈশাখ সংখ্যায়। তাঁরা প্রবন্ধটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাগাজিন থেকে পুনর্মুদ্রণ করেছিলেন। রচনাটি অধিকতর স্বল্পায়তনের হতে পারত। এর মধ্যে পুনরাবৃত্তির ত্রুটিই প্রধান। কিন্তু সে ত্রুটি সংশোধন করে বর্তমানে প্রকাশ করার কোন অর্থ নেই। প্রবন্ধের আলোচিত বিষয় কিছু নতুন নয়। কিন্তু রচনাটিতে ২৩ বছর পূর্বেকার বাংলাদেশের সামাজিক ও সাহিত্যিক সমস্যাসমূহের কিছু আভাস রয়েছে দেখে লেখাটি এ কালেও পুনর্মুদ্রিত হলো।]

ঝগড়াটা এখনো আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের মনে তেমন প্রবল কিনা জানি না, কিন্তু চালু যে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ঝগড়াটা এখনো চলছে : সাহিত্যে কোন যুগের কিংবা সমাজের সমস্যা প্রবেশ লাভ করতে পারে কিনা। অর্থাৎ সাহিত্য কি শুধুমাত্র মানুষের আদিম ও চিরন্তন প্রবৃত্তি প্রেম ও কামনার সুন্দর প্রকাশই মাত্র কিংবা সাহিত্যে প্রত্যেক যুগের ও সমাজের বিশিষ্ট সমস্যার আলোচনা এবং চিত্রণও থাকতে পারে। এ দ্বন্দ্ব আজ আর এর পূর্বের স্তরে নেই, পূর্বের রূপ নিয়েও নেই। তবু এর চিরন্তন নিরসনও হয়নি। আজ পর্যন্ত প্রশ্নটা চিরকালই কোন না কোন ধরনে চলে আসছে। কিন্তু একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, প্রশ্নটা থাকা সত্ত্বেও সমাজ সাহিত্য হতে নির্বাসিত হয়নি কোন দিন। কেননা এ পর্যন্ত দেখা গেছে যে, কোন বিশিষ্ট যুগের আত্মপরিচয় ইতিহাস যত সম্যকভাবে দিতে না পেরেছে তার চেয়ে বেশি পেরেছে সে যুগের সাহিত্য। অবশ্য যুগের আত্মপরিচয় বলতে আমি মাত্র রাজারাজড়ার কাহিনী বলছিনে। যুগের পরিচয় দ্বারা আমি বলতে চাচ্ছি কোন বিশিষ্ট যুগের সমাজের রীতি নীতি, অবস্থা ব্যবস্থা, তার বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি। অবশ্য এ সম্পর্কেও নিশ্চয়ই মতবিরোধের অবকাশ রয়েছে। সাহিত্য ক্ষেত্রে সমাজ-বিমুখ চিরন্তনীদের মতো এখানেও অনেকে সমাজের পরিচয় নিতে তার ভিতরের ছোটখাটো ঘটনা, তার উৎপাদন-রীতি কিংবা এই উৎপাদন ব্যাপদেশে শ্রেণীতে শ্রেণীতে সম্পর্ককে বেশি আমল দিতে চান না। তাঁরা দেখেন কোন রাজা কত সালে কোন দেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আক্রমণ করল, কোন রাজা কোন সেনাপতিকে পরাজিত করল। এই জয়-পরাজয়ের পিছনে যে অসংখ্য সেনাবাহিনী রয়েছে, মানুষ রয়েছে, তাকে সংখ্যার হিসাব ব্যতীত অন্য কোন গণনায় ঐতিহাসিক আনেন না। তাই আলেকজান্ডার, পুরু কিংবা অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, বাবর, আকবর কিংবা আওরঙ্গজেবের এত লক্ষ অশ্বারোহী, কিংবা পদাতিক ছিল বলা ব্যতীত ঐতিহাসিক রাজার রাজ্যের মানুষের অন্য কোন পরিচয় দিতে নারাজ। ঐতিহাসিকের এই 'রাজপ্রীতি' আর চিরন্তনী সাহিত্যিকদের সমাজোর্দ্ধ প্রেম-বিলাস এক দিক দিয়ে সমতুল্য: এরা উভয়েই বৃহত্তর জীবনকে ফাঁকি দিতে চান। অবশ্য বলা চলে, কোন যুগের সাহিত্যই যদি সে যুগের আসল পরিচয় হয় তাহলে আমরা প্রতি যুগের ইতিহাস না পড়ে সাহিত্য পড়লেই তো পারি। প্রশ্নটা এভাবে খড়গহস্ত করে দাঁড় করালেও এ কথার মধ্যে সত্যও যথেষ্ট নিহিত রয়েছে। অবশ্য যে অভাবটা আমরা অনুভব করছি সে হচ্ছে এই যে, এ পর্যন্ত অতীত যুগের ইতিহাস (অর্থাৎ রাজা-বাদশার জয়-পরাজয়ের দিন তারিখসহ কাহিনী) যদি বা পাওয়া যায় তায় সাহিত্য অতি বিরল। শুনতে পাই আগের দিনে রাজা-বাদশারা পাথরে-পর্বতে খোদাই করতেন তাঁদের বিজয় ইতিহাস, মুন্সী আর ইতিবৃত্তকার রেখে লিখিয়ে রাখতেন তাঁদের রাজত্বের বড় বড় সব কাহিনী, রাজারাজড়ার কাহিনী। কিন্তু তাই বলে কি কেউ খোদাই করে রেখেছে পাহাড়-পর্বতের গায়ে সেই যুগে গ্রামে গ্রামে প্রচলিত প্রবাদ, রাখালের মুখের বাঁশির গান, কিংবা কোন অখ্যাত সাহিত্যিকের রচনার ইতিহাস? তা না হলে অতি প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে প্রতি যুগের বিস্তৃত সাহিত্য যদি থাকত তা হলে সে সাহিত্যের কাহিনীতে রাজা-বাদশাহের নাম হয়ত আমরা পেতাম না, কিন্তু সমাজের বৃহত্তর মানুষের জীবনালেখ্য সুস্পষ্ট প্রতিকৃতিতে দেখতে পেতাম। তখন কোন ঘটনা কোন সনে ঘটেছিল তার সঠিক দিন-ক্ষণ হয়ত পেতাম না কিন্তু কোন সমাজ ও মানুষ সে ঘটনাকে সম্ভব করেছিল এ কথা জানতে পেতাম। অর্থাৎ তখন ইতিহাসকে না জানলেও জীবনকে জানতাম। আজ প্রচলিত পদ্ধতিতে যুগের 'ইতিহাস' যদি বা জানি, তার জীবন পাইনে!

অবশ্য বিষয়টার অন্য দিকও আছে। প্রশ্ন হতে পারে একেবারে প্রাচীন কালের সাহিত্য নাই-বা পেলাম, কিন্তু তার পরবর্তীকালের সাহিত্য তো আমরা কিছু-না কিছু পাই। কিন্তু তাই বলে তাতে কি সে যুগের ইতিহাস পাই? গ্রিসের হোমার, গ্রেট ব্রিটেনের চসার কিংবা ভারতের বাণভট্ট, কালিদাসের সাহিত্য কি আমরা পাইনে, কিন্তু এদের সাহিত্যে 'ইতিহাস' নিরপেক্ষভাবে কি এই সমস্ত দেশের সমাজ জীবন পূর্ণভাবে দেখতে পাই? পাইনে– এ কথা ঠিক। তবু ইতিহাসের চেয়ে বিস্তৃততরভাবে দেখতে পাই। ইতিহাসে যদি শুধু রাজা-উজীরের নাম পাই তো এখানে রাজার প্রেম-কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ পাই, আর সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবরণের ফাঁকে ফাঁকে বৃহত্তর সমাজের চামার, ধোপা, সৈনিক, কৃষক, তাঁতি, জেলের জীবনের আঁচও কিছুটা পাই। শুধুমাত্র ইতিহাসে এটুকুও পাইনে।

তবু এ কথা সত্য যে, এই সমস্ত সাহিত্যেও সমাজের পুরো রূপটা দেখতে পাইনে– অথবা বলা চলে, সমাজের যে সাধারণ লোক, যারা সমাজ-দেহের তিন-চতুর্থাংশ বা তারও বেশি সেই সাধারণ লোকের জীবনকে আমরা এঁদের সাহিত্যে পূর্ণভাবে পাইনে। [প্রাচীন যুগের যে সাহিত্য আমরা এ পর্যন্ত উদ্ধার করেছি তা যে সে সমস্ত যুগের একমাত্র সাহিত্য, এ কথাও কেউ নিশ্চয় করে বলতে পারে না।] সমাজের পূর্ণ রূপ কেন এঁদের সাহিত্যে পাইনে? এর কারণ খোঁজ করতে হলে যে প্রশ্নকে আমরা চিরন্তন বলে আরম্ভ করেছি– সাহিত্যে সমাজ ও সমস্যার স্থান হতে পারবে কি পারবে না এবং এই সম্বন্ধে 'চিরন্তনী' শাশ্বত সাহিত্যিকের যে থিওরি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, সাহিত্যে কোন সাময়িক সমস্যা থাকবে না– সে প্রশ্ন ও থিওরির অতীত প্রতিপত্তিকে স্মরণ করা দরকার। আজ যদিবা এ কথা কিছুটা পরিমাণে স্বীকৃত হয়ে থাকে যে, বস্তুহীন বিষয়ের সুন্দর প্রকাশই মাত্র সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়, সমস্যাবহুল সমাজের বাস্তব রূপকে চিত্রিত করা ও ভবিষ্যৎ মুক্তি-পথের নির্দেশ দেওয়াও তার কর্তব্য, তাহলেও এমন দিন নিশ্চয়ই ছিল যে-দিন সাহিত্যিক সমাজের মধ্যে লক্ষ্মীর বরপুত্রদের জীবন কাহিনী, প্রেম ও ভালোবাসা, তাদের ব্যঙ্গ, রূপ ও রস নিয়ে সাহিত্য করাই কর্তব্য বলে মনে করতেন। এ কর্তব্যবোধের পিছনে যে তাগিদটা প্রধানতঃ কাজ করত সে হচ্ছে তার জীবিকার উপায়। আজকের যুগে বেকার সমস্যা, কাজেই মাত্র আজকের সমাজের সাহিত্যিক পেটের জন্য তার সাহিত্য-সৃষ্টিকে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে এবং তার সাহিত্যের বাজার দর দেখে সাহিত্য সৃষ্টি করছে, এ কথা ঠিক নয়। প্রতি যুগের সাহিত্যিক তার সাহিত্যকে বিক্রি করে এসেছে এবং খদ্দেরের মন মতো সাহিত্য তৈরিও করেছে। এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। আজকের যুগে যেমন প্রজাকে বাঁচতে হলে জমিদারকে খুশি রাখতে হয়, সংবাদপত্রকে চালু রাখতে হলে সরকারকে মেনে চলতে হয়, সাহিত্যিককে জেলের ভয়ে, বই বিক্রি না হবার ভয়ে, বড়লোকের বিরুদ্ধে লিখলে মার খাবার ভয়ে অনেক কিছু গোপন করে লিখতে হয়, আগের দিনেও সাহিত্যিকের দশা মোটামুটিভাবে ঠিক এমনি পরনির্ভরশীলই ছিল। 'উদর জগতের' নিয়মই এটা– 'ছোট জাত'কে 'বড় জাতে'র কাছে অর্থাৎ ছোট শ্রেণীকে বড় শ্রেণীর কাছে আত্মবিক্রয় করতে হয় এবং সাহিত্যিককে যে খদ্দের খুশি করার জন্যে হাতের কলমে খদ্দের মাফিক কথাই লিখতে হতো তাই নয়, খদ্দেরের মন তুষ্ট করতে সাহিত্যিকের নিজের আত্মসত্তাই আসত দুর্বল হয়ে, ক্রমে যেত নিশ্চিহ্ন হয়ে। এটা অবশ্য একটা কি দুটা বছরের কার্যপ্রণালী, তার অভ্যাস ও ফলের কথা নয়। যুগ যুগের শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব, অর্থ ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষমতাসম্পন্ন উচ্চ শ্রেণীর উপর অর্থহীন ও শক্তিহীন শ্রেণীর নির্ভরশীলতার ফল। অর্থাৎ সমাজ সব সময়েই শ্রেণীবিভক্ত রয়েছে এবং যেহেতু সাহিত্যিক মানুষ; সুতরাং সে-ও কোন-না-কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কিংবা নির্ভরশীল হয়ে রয়েছে। এবং তার সাহিত্য সৃষ্টিও তার শ্রেণী-স্বার্থ, শ্রেণী-বোধ, অপর শ্রেণীর সাথে সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করে হয়েছে। তার সাহিত্য শুধুমাত্র তার কল্পনারই প্রকাশ হতে পারে নি। মানুষের কল্পনাও যেমন একেবারে বাস্তব অবস্থা-নিরপেক্ষ হতে পারে না, তেমনি তার রস-কল্পনা এবং তার প্রকাশও বিশিষ্ট শ্রেণী-প্রভাবের উর্ধ্বে হতে পারে না। প্রতি যুগে শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব যেমন সমাজ জীবনের মূল-কথা, তেমনি আবার কাল হতে কালান্তরে এই শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই কোন শ্রেণীর লয় হয়, কোন শ্রেণীর রূপান্তর হয়, নতুন শ্রেণীর উদ্ভবও হয়। তা' না হলে শ্রেণী-সংগ্রাম চিরন্তন বলে বিশিষ্ট শ্রেণীগুলোও যদি চিরন্তন হতো তাহলে বিভিন্ন যুগের সাহিত্যেও আমরা একই শ্রেণীর চিত্রই দেখতে পেতাম। শ্রেণীর রূপান্তর ঘটে বলেই জমিদারবহুল সমাজে অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের সাহিত্যে যে শ্রেণীর আলেখ্য, যে শ্রেণীর মানুষের কাহিনী আমরা সবচেয়ে বেশি পাই– কলকারখানা যুগের সাহিত্যে তাদের কাহিনী আর তত পাইনে। আসল কথা যেটা সেটা হচ্ছে এই যে, যুগের পরিবর্তন ও সমাজের শ্রেণীসমূহের নানাভাবে রূপান্তরের ফলে নতুন সমাজের উদ্ভব হয়, আর সেই নতুন সমাজের কাহিনী নিয়ে, তার সমস্যা নিয়ে নতুন সাহিত্য সৃষ্ট হয়। এ দিক দিয়েই সাহিত্য সমাজের আত্মপরিচয়। অন্যথায় সমস্ত কালের সাহিত্যের মধ্যে যেহেতু প্রেম ও কামনার প্রকাশ আছে, সেহেতু তাকে সমস্যাবহুল সমাজের উর্ধ্বে প্রেমময় চিরন্তন সাহিত্য নাম দেওয়ার অর্থ খুব একটা বিরাট পরিধিমূলক কথা বলা, যে পরিধির মধ্যে আরো অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য রয়ে যায়। এবং যে তথ্য না জানলে এই বিরাট পরিধির ভিতরে প্রকৃতির কোন খবরই আমরা পেতে পারিনে। পৃথিবীকে গোল বললে আমরা নিশ্চয়ই খুব একটা বড় সত্য ঘোষণা করি, কিন্তু তাই বলে কি পৃথিবীর সম্যক পরিচয় আমরা তাতে পাই?

যে কোন যুগের সাহিত্যিক সমাজতত্ত্বের এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দিয়ে বিচার করলে এটাই প্রতীয়মান হবে। প্রমাণিত হবে যে, যুগের শ্রেণী-সংগ্রামই যুগের সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু সাথে সাথে আর একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংগ্রাম হয়, এক কি একাধিক শ্রেণী সে সংগ্রামে জয়ী হয় এবং অন্য শ্রেণী কিংবা শ্রেণীসমূহকে শোষণ করে। এতদিনকার সাহিত্যে যে শোষিত শ্রেণীর জনমানবের ব্যথা বেদনা, আনন্দ আহলাদের কোন বিশেষ ও প্রধান চিত্র রূপ পায়নি তার কারণ এই যে, অতীত কালের সাহিত্যিক গোষ্ঠী প্রধানতঃ শোষক শ্রেণীভুক্ত ছিল কিংবা শোষক শ্রেণীর উপর নির্ভরশীল বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একেবারে শোষিত শ্রেণীর কোন চিত্র তাদের সাহিত্যে ফুটে ওঠেনি। এ কথা মনে রাখলে যে কোন দেশের যে কোন যুগের সাহিত্যের বিশিষ্ট রূপ বেশ পরিস্ফুট হয়ে যায়। দৃষ্টান্তস্থলে অতীত গ্রিসের প্লেটো কিংবা এরিস্টটলের দর্শন ও সাহিত্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রাচীন গ্রিক সমাজে দাস প্রথা চালু ছিল। সমাজের একেবারে নিম্নতম স্তরে ছিল দাস শ্রেণী। উচ্চ শ্রেণীসমূহ দাসকে মানুষ বলে গণ্য করত না, মনে করত সাধারণ ভারবাহী পশু। প্লেটো-এরিস্টটলের সাহিত্যের কোথাও এই দাস শ্রেণীর কোন চিত্র ফুটে ওঠেনি! (অবশ্য এদের কথা প্লেটো-এরিস্টটল যে কোথাও উল্লেখ করেন নি এমন নয়; করেছেন ততটুকু যতটুকু তাঁদের নিজস্ব সমাজের মানুষের কথা বলতে তার প্রয়োজন হয়েছে।) তাদের সম্বন্ধে কোন দার্শনিক সমস্যা নিয়ে প্লেটো 'ডায়ালোগ' লিখেন নি। কেন লিখেন নি, তার উত্তর আমাদের কছে এখন স্পষ্ট মনে হয়। আমরা কি গরু কিংবা ছাগলের সমস্যা নিয়ে, তাদের জীবন নিয়ে গল্প কি উপন্যাস রচনা করি? তেমনি যে সাহিত্যিক দাসকে মনুষ্য সমাজের বহির্ভূত জীব বলে মনে করে তার সাহিত্যে কি সেই শোষিত দাস শ্রেণীর কোন প্রধান রূপ পাওয়া স্বাভাবিক? কিন্তু প্রশ্ন ওঠে : গ্রিসের দাস সমাজ তো আর অমানুষ ছিল না। সত্যি কথা। তারা অমানুষ ছিল না। আর তাই তাদের সমাজের, তাদের শ্রেণীর যে সাহিত্য অর্থাৎ তাদের সমাজে প্রচলিত ছিল যে সমস্ত ছড়া ও গান, প্রবাদ ও কাহিনী তা যদি আমরা জানতে পেতাম তাহলে দেখতাম প্লেটো-এরিস্টটলের সমাজই গ্রীসের আসল কিংবা একমাত্র সমাজ নয়, সে সমাজের বাইরেও আর এক বৃহত্তর সমাজ ছিল যার নিজস্ব সাহিত্যে ছিল, রূপ ছিল, রস ছিল, আর সে সাহিত্যে প্লেটো-এরিস্টটলের মতোই তার নিজস্ব সমাজ ভেসেও উঠতো। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, তারা তো মানুষ ছিল না, তাই তাদের প্রত্নতাত্ত্বিক কিংবা ঐতিহাসিক গবেষণা চলে না।

প্রত্নতাত্ত্বিক কিংবা ঐতিহাসিক গবেষণা না চলুক, একটা বস্তু এ থেকে পরিষ্কার হল। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতিভূ সাহিত্য ও সাহিত্যিক দুই-ই থাকে। এ পর্যন্ত আমরা কেবলমাত্র সমাজের প্রবল ও শোষক শ্রেণীর সাহিত্য ও সাহিত্যিককেই জানতে পেরেছি, শোষিত শ্রেণীর সাহিত্যিক কিংবা সাহিত্যকে নয়। যদি-বা কোন যুগের শোষিত শ্রেণীর সাহিত্যের পরিচয় কোন রচনা, জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছড়া, গান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পেয়েও থাকি তো সে খুবই সামান্য।

কথাটা সত্য প্রতীয়মান হলেও এবং বাস্তব ক্ষেত্রে প্রমাণিত হলেও এর বিরুদ্ধে আপত্তি বিরল নয়। প্রথমত, সমাজ যে শ্রেণীবিভক্ত এ কথাটা সত্য হলেও আমরা স্বীকার করতে চাইনে। সব মানুষ ভাই ভাই, কেউ কারও চেয়ে হীন নয়, সবাই তার নিজস্ব গুণে আত্মসম্মান ও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করবে– এই হচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের সমস্ত ধর্মের আদর্শ। সে ক্ষেত্রে সমাজের এক দল অপর দলকে শোষন করে এ কথা বলার অর্থ সেই আদর্শের মধ্যে হিংসার ও দ্বেষের বীজ ছড়িয়ে দেওয়া। কাজেই সমাজে শোষণ আছে এ কথা মিথ্যা : অর্থাৎ সমাজে শোষণ নাই, আমরা সবাই ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে স্বর্গসুখে বাস করছি। দ্বিতীয়ত, যদি-বা স্বীকার করি না, আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা আমাদের নাই, মানুষ ভাই ভাই এ কথা সবাই আজ আর কার্যত মানে না, তাহলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঐ শ্রেণী-সংগ্রামের থিওরি আমরা কিছুতেই ঢুকতে দেব না। কেননা সাহিত্যিক হচ্ছে দ্রষ্টা, সাহিত্যিকের কাছে ধনী-দরিদ্র ভেদাভেদ নেই। সাহিত্যিক তার হাসি-কান্নার, ব্যথা-বেদনার রস যেখানেই পায় সেখান থেকেই তাকে সে তার সাহিত্যে তুলে নেয়। 'চিরন্তনী' সাহিত্যিকদের থিওরির এটাও আর এক প্রকাশ। আমরা দেখেছি সাহিত্যিক কোন বিশেষ শ্রেণীর জীবন সাহিত্যে রূপ দিয়ে সজ্ঞানে কোন অন্যায় করে না। শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে তার নিজের যে অবস্থান অর্থাৎ তার মানসিক দৃষ্টিকোণ জন্মাবধি কিংবা জন্মপরম্পরায় শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেভাবে তৈরি হয়, সেই দৃষ্টিকোণই তার সাহিত্যের বিশেষ রূপের জন্য দায়ী। এ সত্যকে কোন চিরন্তন 'মুক্ত দৃষ্টি'র আদর্শের কথা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

আমাদের দেশের সাহিত্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণে বস্তুটা আরও পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়বে। অতিপ্রাচীন ভারতের আলোচনা এখানে করব না। আধুনিক ঔপনিবেশিক ভারতের কথাই ধরা যাক। ইংরেজ রাজত্বের আসন গ্রহণের পরবর্তী কাহিনী। বাংলাদেশের কথা। কৃষিপ্রধান বাংলা। 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা' কবে ছিল সে কথা গবেষণার বিষয়। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে সে যে অস্থিচর্মসার অর্থাৎ কৃষিপ্রধান বাংলার শতকরা আশিজন অধিবাসীই যে নানা প্রকার অত্যাচারে মুমূর্ষু, এ ব্যাপারটা আমাদের চোখের সম্মুখেই উজ্জ্বল। এর জন্য ইতিহাসের পাতা নিশ্চয়ই ওল্টাতে হবে না। এবার সাহিত্যিকের আদর্শ নিরপেক্ষ 'দৃষ্টি ও সৃষ্টি'র কথা যদি আমরা মনে করি তাহলে স্বতঃই সাহিত্যিকদের নিকট হতে আমরা আশা করতে পারি যে, সমাজের মধ্যের এই যে ব্যাপক শোষণ তার কাহিনীই তার চোখে ধরা পড়বে, আর সেই কাহিনীই তার সাহিত্যে রূপ পাবে। এ প্রশ্নের হয়ত উত্তর হবে : ইচ্ছামতো তো আর সাহিত্য হয় না, ফরমায়েশ অনুসারে তো আর রস সৃষ্টি হতে পারে না। এ উত্তর আসলে কোন যুক্তি নয়। দেশের একটা বিরাট অংশের কাহিনী যখন সাহিত্যে রূপ পায় না, সে সমাজের মানুষ যেখানে সাহিত্যিকের সাহিত্যে প্রধান চরিত্র হয় না, তখন তাকে ফরমায়েশের অজুহাত দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। বরঞ্চ সে ক্ষেত্রে এ কথা স্বীকার করাই সত্যাশ্রয়ীর ধর্ম যে, উক্ত সাহিত্যিক কিংবা সাহিত্যিক গোষ্ঠী সমাজের ঐ বিরাট অংশের অঙ্গীভূত নয় এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোষিত শ্রেণীর সাথে তার উদর-স্বার্থের সম্পর্ক তেমন ঘনিষ্ঠ নয় এবং তারই জন্য সমাজের ঐ বিরাট অংশের রূপ তার সাহিত্যে প্রকাশ পায় নি। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে এ জিনিসটাই টের পাওয়া যাবে। (সম্পূর্ণ বাংলা সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করলেও তার শ্রেণীরূপ অর্থাৎ তাতে বিশিষ্ট শ্রেণী কিংবা শ্রেণীসমূহের প্রাধান্য এবং অন্য বিশিষ্ট শ্রেণীর চিত্রের অনুপস্থিতি সহজেই ধরা পড়বে। কিন্তু গোটা বাংলা সাহিত্যের বিশ্লেষণ বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নয়।) অবশ্য বলা চলে কৃষিপ্রধান বাংলার মানুষের রূপ যে এঁদের সাহিত্যে একেবারে প্রকাশ পায়নি তা নয়– যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের এমন অনেক প্রবন্ধ রয়েছে যার মধ্যে তিনি কৃষকদের অভাব-অভিযোগ নিয়ে কথা বলেছেন, যেমন রবীন্দ্রনাথও এমন অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন যার মধ্যে শোষিত শ্রেণীর কথা আছে। এখানেই একটা বিস্ময়কর বস্তু লক্ষ্যে পড়ে। এই সমস্ত খ্যাতনামা সাহিত্যিক যখন বুদ্ধি দিয়ে বিচার করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন, তখন বাংলাদেশের বিরাট শোষিত অংশকে বাদ দিতে পারেন নি, তার সম্বন্ধে চিন্তা করেছেন, বই-পুস্তক ঘেঁটে তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছেন, অন্য দেশের সাথে তুলনা করেছেন, উদাহরণ দেখিয়েছেন; কিন্তু মনের রাজ্যে অর্থাৎ রসের রাজ্যে বুদ্ধির সে বিচার প্রবেশ লাভ করতে পারেনি এবং তাই তাঁদের গল্প-উপন্যাস কি কাব্যে এই বৃহত্তর সমাজই আসল চরিত্র হয়ে দেখা দেয়নি, দিয়েছে তাঁদের নিজস্ব সমাজ। এরই জন্য এই সমস্ত সাহিত্যিকের চরিত্র চিত্রণে সাধারণ লোক সেই পরিমাণে প্রবেশ লাভ করেছে, যে পরিমাণে সাহিত্যিকের নিজস্ব সমাজের আসল যে চরিত্র তাকে রূপ দিতে সে সাহায্য করেছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আমাদের দেশের সাহিত্যিকের দৃষ্টিও তার নিজস্ব শ্রেণী-স্বার্থ বহির্ভূত নয়।

আমার এ ব্যাখ্যায় আপত্তি উঠবে : কেন, রবীন্দ্রনাথ শুধু তো প্রসঙ্গক্রমেই সাধারণ লোকের নাম উল্লেখ করেন নি, এমন কি পুরো গল্প-কবিতাও তিনি সাধারণ লোককে নিয়ে লিখেছেন। এ কথা সত্যি। কিন্তু নিরপেক্ষ সাহিত্যিকের আদর্শ অনুসারে এবং বাস্তবের দাবিতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের বারো আনাই কি তাহলে সাধারণ লোকের চরিত্র চিত্রণে, তাদের দুঃখ-বেদনা প্রকাশে এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণে পূর্ণ থাকা উচিৎ ছিল না? কিন্তু হয়েছে তো তার উল্টোটি। ধনী কিংবা মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনযাত্রা পেতে রবীন্দ্রসাহিত্যকে ঘাঁটতে হয় না; কিন্তু কোনখানে কোথায় রবীন্দ্রনাথ সাধারণ চাষী কি ঐ শ্রেণীর শোষিত বাঙালীর কথা লিখেছেন সে কথা বার করতে রবীন্দ্রসাহিত্যের উপর গবেষণা বসাতে হয়। এটাই যে স্বাভাবিক, রবীন্দ্রনাথ কিংবা অন্য কোন সাহিত্যিকই যে শ্রেণী-নিরপেক্ষ ন'ন সে কথাই আমি বলতে চেয়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যিক সমাজকে দেখে আর যা দেখে তাকে সে সাহিত্যে রূপ দেয়। কথাটা সত্যি। কিন্তু এ কথা বলার সাথে যদি কেউ বলে যে, তার দৃষ্টিতে কোন স্বার্থবোধ নেই, সে সবই সমানভাবে দেখে তাহলে সে কথা হবে ভুল।

নির্দিষ্ট বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে সেটা কোন শ্রেণীর সাহিত্যিক কি ভাবে সাহিত্যের রূপ দিয়েছে, সে কথা বিচার করলেই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। ধরা যাক-না ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনের কথা? ভারতবর্ষ পরাধীন। ভারতবর্ষকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছে বহুদিন পূর্বে; শুধুমাত্র কংগ্রেস কিংবা কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই নয়। বাংলাদেশের কথাই ধরি না কেন? এখানে যে কৃষক সমাজ রাজা-বাদশাহ ও নবাবের আমলেও শোষিত হত, অত্যাচারিত হত, ব্রিটিশ আমলেও সে তেমনি ও ততোধিক অত্যাচারিত হচ্ছে, শোষিত হচ্ছে। কাজেই তার যে স্বাধীনতার আন্দোলন সেটা চলছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অব্যাহতভাবে : জমিদারের সাথে খাজনা দেবার বাদ-বিসংবাদ নিয়ে, মিথ্যা দেনার ডিক্রির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নিয়ে। ব্রিটিশ আমলে তার এ অত্যাচার আরো বাড়ল। কাজেই ভারতবর্ষের মুক্তির বৃহত্তর প্রচেষ্টাতে কৃষকদের এবং বর্তমান কালে শ্রমিকদেরও যে দৈনন্দিন সংগ্রাম চলছে তাকেই যেকোন রাজনৈতিক আন্দোলনের উচিৎ ছিল সংঘবদ্ধ করা এবং বিদেশী সাম্রাজ্যকে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের মুক্তির সংগ্রামকে সফল করে তোলা। আর সাহিত্যিক যখন শ্রেণী-নিরপেক্ষ দ্রষ্টা তখন তারও উচিৎ ছিল কৃষক-মজুরের সংগ্রামের এই কাহিনীকেই সাহিত্যে ফুটিয়ে তোলা। কিন্তু অর্ধশতাব্দীর রাজনৈতিক আন্দোলনের বিফলতার পরও কৃষক-মজুরের আন্দোলন যে স্বাধীনতার আন্দোলন এ বোধটা আমাদের প্রত্যয় হল না। তাই স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ করার জন্য প্রতিজ্ঞা নিয়ে সভাপতি করে আমাদের সংঘ করতে হল। তবেই না আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলন আরম্ভ হল। স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাস বিশেষভাবে বিশ্লেষণ না করেও বলা যায় যে, এতদিন পর্যন্ত স্বাধীনতা যাদের সবচেয়ে আগে প্রয়োজন, যাদের স্বাধীনতার প্রশ্ন দৈনন্দিন জীবনধারণেরই প্রশ্ন, তাদের আন্দোলনের কোন হদিস না রেখে প্রথমে উচ্চ ধনিকশ্রেণী তার পরে কল্পনাপ্রবণ উচ্চ ও নিম্ন মধ্যবিত্তই তাদের নিজেদের স্বার্থবোধ থেকে পরাধীনতার সমস্যাটাকে দেখেছে এবং তার বিরুদ্ধে যৎকিঞ্চিত রয়ে সয়ে কিংবা মাঝে মাঝে হঠাৎ গরম হয়ে আন্দোলন করছে, তবু শ্রমিক কৃষকের মুক্তির দাবি প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে মেনে নিয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামকে সফল করে তুলেনি। এ কথা যদি রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সত্য হয়ে থাকে তো সাহিত্য ক্ষেত্রে হয়েছে এরই প্রতিফলন। সমস্ত বাংলা সাহিত্যে এই নিয়মের একমাত্র ও বিস্ময়কর ব্যতিক্রম দেখা যায় দীনবন্ধু মিত্রের নীল-বিদ্রোহের কাহিনী লিপিবদ্ধ করায়। দীনবন্ধু মিত্রই একমাত্র লেখক যিনি তাঁর একখানি বইয়ে সেই সময়কার সাধারণ কৃষক সমাজের উপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীলকর ব্যবসায়ীদের অত্যাচার ও সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষক সমাজের বিদ্রোহের কাহিনীকে বলতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এ প্রচেষ্টা যে ব্যতিক্রম মাত্র, তার সাক্ষ্য দিচ্ছে বাংলা সাহিত্যের বাকি সমস্তটা ইতিহাস। আর তাই রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়', 'ঘরে-বাইরে', কিংবা শরৎবাবুর 'পথের দাবী'তে যে চিত্র ফুটে বেরিয়েছে তাতে মনে হবে যেন বাংলাদেশের কোন একটা স্তর দিয়ে স্বাধীনতার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে, আর অপর স্তরগুলো হয় নিষ্ক্রিয়ভাবে শান্ত নয়তো একেবারে অস্তিত্বহীন। (অতি আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে একদল সাহিত্যিকের লেখায় পরিবর্তনের ইঙ্গিত স্পষ্ট। কিন্তু সে কথার উল্লেখ পরে করা হবে।) এর কারণ কি? কারণ, লেখক নিজে সমাজের যে স্তর থেকে এসেছেন সে স্তরের লোকের এই হচ্ছে স্বাধীনতা আন্দোলন : ভাবে গদগদ ভাব, ভারত মাতার প্রতীককে অসীম শ্রদ্ধা, বন্দুক-রিভলবার হাতে দুর্গম পথে যাতায়াত আর মাঝে মাঝে গরিব লোকের দুঃখে মর্মাহত ভাব। গরীব লোকের মধ্যেও যে তার নিজস্বভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে এবং যেহেতু গরীবই হচ্ছে দেশের পেণে ষোল আনা সেই হেতু তাদের আন্দোলনকে সাফল্যের পথে পরিচালনা না করলে দেশের অন্য কোন আন্দোলন সত্যিকারভাবে সফল হতে পারে না, এ মনোভাব মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী "বিপ্লবী"র নেই। আর এ মনোভাব যদি আন্দোলনকারীদের নিজেদের মনেই থাকে অনুপস্থিত তাহলে সে যে মধ্যবিত্ত সাহিত্যিকের কলমের মুখেও থাকবে অনুপস্থিত, এতে আর বিস্ময়ের কি আছে?

বর্তমান সময়ে অবস্থা বদলে গেছে, হয়ে উঠেছে আরো জটিল। কেননা বর্তমান কালে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনও ঠিক আগের মত চাষী-মজুর হতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে নেই। আজ মধ্যবিত্তের মোটা অংশ যেমন পৃথিবীর ও দেশের আভ্যন্তরীণ নানা অবস্থার চাপে দেশের সর্বনিম্ন স্তরের আন্দোলনকে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে, [যদিও এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে আবার অনেকখানে গরীব কৃষক-মজুরের আন্দোলনকে বানচাল করে দেওয়ার ইচ্ছাও অতি আধুনিককালে ফুটে বেরুচ্ছে] তেমনি সেই মধ্যবিত্তের একটা অংশ, ক্ষুদ্র হলেও, মজুর-কৃষক আন্দোলনকে মনে-প্রাণে স্বীকার করে সেই আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। এই আন্দোলনকে এরা শুধু স্বীকারই করেনি, স্বীকার করে মজুর-কৃষকের নিজস্ব নেতা তৈরি করে মজুর-কৃষকের আন্দোলনকে সত্যিকার চাষী-মজুরের নিজস্ব শক্তিশালী আন্দোলনে রূপান্তরিত করছে। যুগ হতে যুগান্তরের শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেমন নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হয় কি রূপান্তর ঘটে– আমাদের দেশেও আজ তেমনি মধ্যবিত্তের একটা অংশ শ্রেণীবদল করছে, নিচে নেমে আসছে। কিন্তু এ প্রক্রিয়া এখনো বেশ প্রকৃষ্ট রূপ নেয়নি, ভাঙ্গা গড়া চলছে। মধ্যবিত্তের একটা অংশ যেমন শ্রমিক-কৃষকের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে, তার অপর ও বৃহত্তর অংশও তেমনি নানারূপে উচ্চতর শ্রেণীসমূহের সাথে এক হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধংদেহিভাবে শ্রমিক-কৃষকের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াচ্ছে। [এপ্রিল মাসে বোম্বে শহরের ধাঙ্গড় শ্রমিকদের ধর্মঘট ভাঙতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাস্তা পরিষ্কার করার 'দেশপ্রেমিক' কাজ এই নতুন পরিস্থিতির ইঙ্গিত মাত্র।] যার ফলে ভারতবর্ষে আজ শুধুমাত্র বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ হতে মুক্তি পাবার জন্য শ্রেণী নির্বিশেষে স্বাধীনতার আন্দোলনই চলছে না, একই সাথে শ্রেণীতে শ্রেণীতে শ্রেণী-সংগ্রামও আরম্ভ হয়েছে। এই নতুন অবস্থার প্রতিফলন বাংলার সাহিত্যেও হচ্ছে। বাংলার সাহিত্যিক গোষ্ঠী এই শ্রেণী স্বীকৃতি, শ্রেণীবদল ও শ্রেণী-সংগ্রামের ঊর্ধ্বে নেই। বাংলা সাহিত্যে এমন একদিন ছিল যেদিন সাহিত্যিক তাঁর মনের কথা অর্থাৎ তাঁর শ্রেণীর কথা লিখে যেতেন, সমাজের নিম্নতম শ্রেণীসমূহের জীবনালেখ্য বাদ দিয়ে। আজ কিন্তু নিম্নতম শ্রেণীর প্রতিভূ সাহিত্যিক এবং উচ্চতর শ্রেণীর প্রতিভূ সাহিত্যিক-এ রীতিমত সংগ্রাম চলছে বলা যায়। কোলকাতার বুকের উপর যেদিন প্রগতি লেখক প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ গাঁয়ের কৃষক-কবি রমেশ শীলকে এনে সম্মানের আসন দিলেন সেদিন বাংলার এক শ্রেণীর সাহিত্যিক মনে ও মুখে প্রাণপণে নাক সিঁটকেছেন। কিন্তু আবার তখন হতেই পূর্বের অবস্থার রূপান্তরটাও নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একটামাত্র উদাহরণ দিলুম।

কিন্তু এই সংগ্রামই কত মারাত্মক হয়ে রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে সাহিত্যের ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তার লাভ করতে পারে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পঞ্চাশের মন্বন্তর।* এই মন্বন্তরকে বিভিন্ন শ্রেণীর সাহিত্যিকরা যে ভাবে দেখেছেন, যে ভাবে তাকে সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন তাকে বিশ্লেষণ করলে বাংলার সাহিত্যিকদের শ্রেণীভেদ আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মন্বন্তরটা একটা বিরাট ও আকস্মিক বিপর্যয়ের রূপ নিয়ে বাংলার জীবনে এসে দেখা দিল। আগে যদিবা চিরন্তনী সাহিত্যে ও সমস্যা সাহিত্যে দ্বন্দ্বটা চলছিল, এবার প্রায় বন্ধ হয়ে এল। কেনা সাহিত্যিক মাত্রকেই এই সময়ে কোন কিছু লিখতে হলে মন্বন্তরকে লক্ষ্য কিংবা উপলক্ষ্য করে লেখা ব্যতীত উপায় ছিল না। যারাই এই সময়ে গল্প উপন্যাস কি কবিতা লিখেছেন তাঁরাই মন্বন্তরের এই বিপর্যয় সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই উল্লেখ করার মধ্য দিয়েই ফুটে উঠছে তাঁদের দৃষ্টিকোণের পার্থক্য। বলা চলে, সহিত্যিকের মধ্যে এই সময়ে দুটো ভাগ হয়ে একদল হলেন যাঁরা দুর্ভিক্ষকে তাঁদের সাহিত্যে রূপ দিলেন সত্য কিন্তু এমন করেই দিলেন যে পাঠক পড়ে মনে করল, দুর্ভিক্ষ একটা দৈব দুর্বিপাক, বিধাতার লীলা কিংবা ইংরেজ রাজত্বের যদিও ফল তবু এর বিরুদ্ধে আমাদের করার কিছুই নাই। রাজনৈতিক নেতারা জেলে, আমরা পরাধীন জাত, পরাধীন দাসের মৃত্যু ব্যতীত পথ কোথায়? ভাবটা এমনি। ইংরেজ রাজত্বের সাথে আমাদের নিজেদের সমাজের একটা শ্রেণীর যোগাযোগের ফলেই

* বাংলা ১৩৫০, ইংরেজি ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে দেশের লোকের জীবনের উপরে শোষণ চরমে যেয়ে দুর্ভিক্ষে পরিণতি লাভ করেছে এবং যারা এ দুর্ভিক্ষকে সৃষ্টি করেছে ও সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে তাদের বিরুদ্ধে যতটুকুই পারা যাক না কেন, জনসাধারণকে নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করাই যে একমাত্র পথ একথা এঁরা বলেন না। অবশ্য এঁরা যে নিছক ইচ্ছা করেই বলেন না, এমন নয়। বাইরের মধ্যবিত্ত রাজনীতির আবহাওয়াই তখন এমনি। যে লোক নিজের ব্যবসায়ে লাভের লোভে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মণ চাল মজুত করল, দশ টাকায় কিনে একশ টাকা হাঁকল, অজস্র ঘুষ ঢেলে আমলাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের আইন ও ন্যায়ের শেষ মুখোসকেও আবৃত করে দিল আর বাইরে এসে স্বাধীনতার বুলি আওড়াল আর বলল, মজুত বলে কোন কথা নেই, দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিতেও এটা কোন একটা কারণই না, তখন তাকে মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক আন্দোলনকারীর মধ্যে অধিকাংশই বিশ্বাস করল। দেশের মধ্যে দুর্ভিক্ষ মহা সমারোহে চলতে লাগল। মানুষ নির্বিকারে মরতে লাগল আর মধ্যবিত্ত, দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সেরা অংশ, তখন জাপানের বিজয় অভিযানের দিকে তাকিয়ে দিন গুণলাম কবে জাপান এসে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে তাড়িয়ে আমাদের মুক্তি দেবে। মধ্যবিত্ত রাজনীতির যে ধারা গোড়া হতে চলে আসছে সে ধারা এবার চরম রূপ নিল, সে ধারা এবার দেশের সমস্ত চোরা কারবারী, ঘুষখোর, মজুতদারকে দেশপ্রেমিক করে দিল আর দুর্ভিক্ষকে প্রায় দৈব দুর্বিপাক বলে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুকে স্বীকার করে নিল। এই আবহাওয়ায় প্রভাবান্বিত সাহিত্যিককে যদি মন্বন্তরকে সাহিত্যে প্রকাশ করতে হয় তাহলে স্বভাবতঃই একান্তভাবে নিরাশামূলক চিত্র আঁকা ব্যতীত সাহিত্যিকের গত্যন্তর থাকে না। লাভ কম হল না। এ সমস্ত সাহিত্যিকের সাহিত্যে মন্বন্তরের ট্রাজেডি জম্‌ল ভালো।

অপর একদল সাহিত্যিকও এ সময়ে নিজস্ব কর্তব্য অন্যভাবে বেছে নিলেন। এঁরা সংখ্যায় নিতান্তই কম। তবু এঁরা সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামের দিক থেকে সমস্ত মন্বন্তর সমস্যাটাকে দেখতে চেষ্টা করলেন। সাধারণ লোকের কাছে মন্বন্তরটা কিভাবে দেখা দিয়েছিল? সাধারণ লোক জানে, তাদের কাছে বৃটিশ গভর্নমেন্টের অত্যাচার তহশিলদার, জমিদার, মহাজন, মিল মালিক এদের রূপ নিয়ে আসে। তারা জানে, মূল অত্যাচারীর এরাই হচ্ছে সহায়ক। কাজেই এদের অত্যাচারীর দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার অর্থ সমস্ত অত্যাচারকেই মাথা পেতে মেনে নেওয়া। গ্রামের হাটবাজারের চাল উধাও হতে হতে হল দুর্ভিক্ষ। বাইরের অন্য কারণ নিশ্চয়ই ছিল : যুদ্ধ ছিল, রেঙ্গুনের পতন ছিল, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মরণ কামড় ছিল। কিন্তু লোকে একথা না বলে পারল না যে, এই কারণসমূহের সাথে যুক্ত হয়েছে বাংলার দাস-মন্ত্রিত্ব, মিল মালিক, ব্যবসাদার, মজুতদার, মহাজন, জমিদার ইত্যাদি। কারণসমূহের কোন একটার বিরুদ্ধেই অন্যগুলোকে রেহাই দিয়ে সংগ্রাম করা চলে না। তাই এঁরা দেখালেন মন্ত্রিত্বের অবহেলা ও দাস মনোভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, জমিদার মিল মালিকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অত্যাচার ও মজুতদারীর জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করা স্বাধীনতা- আন্দোলনের অপরিহার্য অঙ্গ। অবশ্য এ রকম সাহিত্যিক ও রাজনীতিক কর্মীরা এ কথা লিখে ও বলেই যে মৃত্যুর স্রোতকে রোধ করতে পেরেছেন তা নয়। কিন্তু মুমূর্ষু দেশের সম্মুখে মুক্তির পথও যে রয়েছে, আর এ বিপর্যয় যে দৈব দুর্বিপাক নয়, আমাদের সমাজের এক অংশের একান্ত শ্রেণী-স্বার্থপরতাই যে শোষণকারী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে যুক্ত হয়ে সৃষ্টি করেছে এ মন্বন্তর, এ কথাটা অন্ততঃ পক্ষে তারা বলল। এই সত্য কথাটা বলা ও না-বলার মধ্য দিয়েই আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের শ্রেণীভেদটা ও শ্রেণী-রূপান্তরটা স্পষ্টতর হয়ে উঠল।

সাহিত্য এবং সাহিত্যিকের এমনি করে শ্রেণী-পার্থক্য করতে যেয়ে আমি শুধু সমাজ ও সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দিতেই চেষ্টা করেছি; এর মধ্য দিয়ে কোন শ্রেণীর প্রতিভূ সাহিত্যিকের সাহিত্যিক-প্রতিভার বিচার কিংবা বিশ্লেষণ করতে নয়। উক্ত আলোচনায় তাই যে বস্তুটা পরিষ্কার হয় সে হচ্ছে এই যে : প্রশ্নটা সত্যি করে এই নয় যে, আমরা সাহিত্যে সামাজিক সমস্যা আঁকব কি আঁকব না, সমস্যার বিভিন্ন দিক আমাদের গল্প উপন্যাসে ফুটে উঠবে কি উঠবে না। [কেন না, আমরা দেখেছি সব যুগের সাহিত্যেই সমস্যা প্রবেশ লাভ করেছে, সমাজের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে।] আসলে প্রশ্ন হচ্ছে, কোন সমাজের সমস্যা আমি আঁকব : সর্বহারা সমাজের, কৃষক-মজুরের, না মধ্যবিত্ত কিংবা ধনী সমাজের? এ প্রশ্নের উত্তর আজকাল সব সাহিত্যিক একই সুরে দেয় না। সাহিত্যিকের মধ্যেও আজ ভেদ হয়ে গেছে। [যে ভেদটা আগে হয়ত এত স্পষ্ট ছিল না] ফলে একদল যেমন স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে এক সমাজ, যেমন মধ্যবিত্ত কি ধনী সমাজ মাত্র নিয়েই সাহিত্য লিখছে, অপর দল জন-মজুর কৃষকের সমাজ নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করছে। কেননা, বর্তমান যুগের সাহিত্যিক নিজেকে শুধু বাস্তব ঘটনার বর্ণনাকারকই মনে করে না, নতুন জীবনের রূপকারও মনে করে। [এবং অপর দলও আর নিজেকে শুধু মুক্ত বোদ্ধা দ্রষ্টাই মনে করে না। বরঞ্চ সেও বস্তুগুলি এমনভাবে দেখে ও লেখে যাতে নতুন ভবিষ্যৎ জন্ম নিতে আর না পারে।] অবশ্য একদল সাহিত্যিক একটা নির্দিষ্ট সমাজের জীবন রূপ দেয় বলে একথা সত্য নয় যে, অপর শ্রেণীর উল্লেখ কি আভাস তাতে থাকে না। কিন্তু অপর সমাজ সেখানে প্রধান হয়ে দেখা দেয় না। মন্বন্তর বাংলা সাহিত্যে শ্রেণীভেদের যে প্রক্রিয়া অতীতের চেয়ে স্পষ্টতর করে এনে দিয়েছে তার সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট রূপ এখনো সহজবোধ্য না হলেও, এ প্রক্রিয়ার ভবিষ্যত ইঙ্গিত মন্বন্তর সাহিত্য নিশ্চয়ই দিয়েছে। সমস্যাবহুল যুদ্ধোত্তর বাংলার সাহিত্য সাহিত্যিকের এই শ্রেণীভেদকেই স্পষ্টতর করে তুলবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

১৯৪৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোর্কী প্রসঙ্গে

আমার এ আলোচনা গোর্কীর সাহিত্য নিয়ে নয়। এ কেবল গোর্কী* সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অনুভূতির কয়েকটি কথা।

মহাপুরুষ এবং মহাকাব্যের সংখ্যা পৃথিবীর ইতিহাসে কম। আধুনিক কালে এদের কাউকেই তেমন পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্যক্তির জীবনে এরা অপরিহার্য।

মহাকাব্যে আমরা মহাজীবনের অর্থাৎ সমগ্র জীবনের স্বাদ পাই। যা তুচ্ছ এবং তুচ্ছ নয়, বীরত্ব এবং কাপুরুষতা, সৃষ্টি এবং ধ্বংস, হাসি এবং কান্না, বর্বরতা এবং মহানুভবতা সবকিছুর ধারণা মহাকাব্যে বা মহাকাব্যরূপ সৃষ্টিতে আমরা পাই। সব নিয়ে আমাদের ধারণা হয় যে, এই-ই জীবন। এর কোন অংশমাত্রই সব নয়; এর তুচ্ছতাও বড় নয়; কিংবা এর বীরত্বও তুচ্ছ নয়। কোন চরিত্রের অহঙ্কারই সব নয় কিংবা কোন চরিত্রের পরাজয়ই শেষ নয়।

মহাপুরুষ মাত্রই যে মহাকাব্য সৃষ্টি করেছেন, এমন নয়। কিন্তু কোন কোন মহাপুরুষ নিজেরাই মহাকাব্য। তাঁদের জীবন মহাকাব্যের ন্যায়ই বিরাট এবং সম্পূর্ণ।

গোর্কী উনিশ এবং বিশ শতকের বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক। সাহিত্যের জগতে তিনি নতুন দিগন্তকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি আয়তনেও বিপুল। কিন্তু তার চেয়েও যেটা তাৎপর্যপূর্ণ সে হচ্ছে এই যে, গোর্কীর জীবনটাই একটা মহাকাব্য। সে জীবনের কাহিনী ব্যক্তিমাত্রকে তার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে জীবনের সমগ্রের ধারণা দেয়। অথবা বলা চলে গোর্কী এক সুউচ্চপর্বত বিশেষ যাকে যতো আরোহণ করা যায় তত জনাকীর্ণ জগতের এক সামগ্রিক রূপ অনুধাবন করা সম্ভব হয়। এ রূপের আভাস যদি ব্যক্তি না পায়, পরিমাণে তা কম হোক কিংবা বেশি হোক, তাহলে চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তখন মনুষ্য জীবনের কোন তাৎপর্য থাকে না।

ম্যাক্সিম গোর্কী; জন্ম : ১৮৬৮, মৃত্যু ১৯৩৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ব্যক্তি মানুষ। কি নিয়ে আমি বাঁচব। জৈবিক তাড়নায় আমি সংসারজীবন যাপন করি। আত্মশ্লাঘা, অহঙ্কার, ক্রোধ, লোভ, পরশ্রীকাতরতার আমি দাস। মানুষ হিসাবে কোন আদর্শ নাই। জ্ঞানের কোন মানদণ্ড নাই। যুক্তির কোন অনিবার্যতা নাই। আমি মানুষ। আর মানুষই তো প্রকৃতির কাছ থেকে শক্তি অর্জন করে তা দিয়ে মানুষকে নিশ্চিহ্ন করার যজ্ঞের আয়োজন করে। জাতিমহত্ত্বের তত্ত্বে মানুষের এক জাতি অপর জাতি কিংবা সম্প্রদায়কে নীচ বলে আখ্যায়িত করে। তাদের ধ্বংস করার আদর্শকে নিজেদের মহৎ আদর্শ বলে ঘোষণা করে। গ্যাস- চেম্বারে পুরে শিশু নারী বৃদ্ধকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করাতে মানুষের বাধে না। ছোট্ট শিশুকে রিভলবারের টার্গেট করে কৌতুকবোধে উল্লসিত হয়ে ওঠে মানুষ। নাপাম বোমা দিয়ে ধানের ক্ষেতকে জ্বালিয়ে, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার উপরে বোমা ফেলে তাকে নিশ্চিহ্ন করে 'স্বাধীন' বিশ্ব তৈরি করার পরিকল্পনাকে জোর গলায় প্রচার করে মানুষই তো। আল্লাহর আশ্চর্য জীব মানুষ! এ কথা তাই বলতেই হয়।

কথা উঠবে এ তো মানুষের এক দিক, অন্ধকারের দিক। এই মানুষই সৃষ্টি করেছে এই সভ্যতাকে। এই মানুষই তো অক্ষয়কে রক্ষায় আত্মোৎসর্গ করেছে। ফাঁসির মঞ্চকে জীবনের জয়গানে মুখরিত করেছে।

এ কথা সত্য। মানুষের জীবনের অন্ধকারটাই সব নয়, তার আলোর দিকও আছে। এবং আলো-অন্ধকার সবটা নিয়েই মানুষ, সবটা নিয়েই জীবন। এ কথা সত্য এবং এ সত্যের উপলব্ধি আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে লাভ করিনি, লাভ করেছি মহাপুরুষদের জীবন থেকে, মহাকাব্য থেকে, লাভ করেছি গোর্কীর কাছ থেকে। বস্তুত এ ঋণের অনুভূতি এত বাস্তব যে, একে বিংশ শতাব্দীর দেশ-দেশান্তরের কোন ব্যক্তির পক্ষেই অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই যখন গোর্কীকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্মরণ করার কথা হয় তখন তাকেই অস্বাভাবিক বলে বোধ হয়। আধুনিক কালের ব্যক্তির জীবনে তাঁর দান আলো-হাওয়ার মতোই অপরিহার্য-আলো-হাওয়ার মতোই সত্য। তাকে স্বীকার অস্বীকারের কোন প্রশ্ন ওঠে না।

বিরাট পর্বতের দিকে চাইলে কার না বিস্ময় লাগে। তাই বিস্ময় লাগে গোর্কীর জীবনের দিকে চাইলে। পাঁচ বছর বয়সে ছেলেটি বাবাকে হারাল। ছ'বছরে পা না দিতে নিজের পেটের ধান্ধায় মুটেগিরি থেকে আরম্ভ করে এমন কাজ নেই যা তাকে করতে হল না। এ যেন আমাদেরই পথে-বিপথে হাজার অনাথ ছেলের একটি। জীবনে সুখ কাকে বলে এ কিশোর জানলো না। শোনা যায়, উনিশ বছরে পা দিয়েও যখন দেখল জীবন তার জন্যে তেতো বিষ বই আর কিছু নয়, তখন সে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় সে তেতো হল। কিন্তু কি আশ্চর্য! জীবনকে সে ঘৃণা করল না। মুটেগিরিই হোক আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মহত্যার চেষ্টাই হোক সবই যেন তার কাছে কৌতুকের বিষয়, উপভোগের বিষয়। তিক্ত অভিজ্ঞতার মূর্তি হিসাবেই যেন নাম নিল সে 'গোর্কী'। উপাখ্যানের নীলকণ্ঠের মতোই সে বিষপান করে আমাদের জন্য ঢেলে দিল বিষ নয়, অমৃত; বলল : চেয়ে দেখ মানুষের দিকে, কি বিস্ময়কর আর কি সুন্দর। অন্তহীন দিগন্তের পানে এ যেন এক পদযাত্রী। সেই আদিকাল থেকে যাত্রা করেছে শুরু। কত ঝড়-ঝঞ্ঝা, সংস্কার-ভ্রান্তির কুয়াশা ভেদ করে করে এই পথিক অগ্রসর হয়ে চলছে। গতি তার শ্লথ হতে পারে কিন্তু উঁচু তার শির; দৃঢ় তার পদক্ষেপ; সম্মুখে তার জটিল জিজ্ঞাসা। তবু পথ চলায় তার ক্লান্তি নেই। ঊর্দ্ধাকাশের সংখ্যাহীন তারকার মতোই অধোলোকে সে অসংখ্য। এগিয়ে চলছে এই মানুষ, জিজ্ঞাসায় জিজ্ঞাসায় সে আকুল, পেছন পানে তাকাবার তার সময় নেই, তার গতি সমুখপানে, সমুখপানে আর ঊর্দ্ধপানে।

বত্রিশ বছরের তরুণ তখন গোর্কী। ১৯০০ সাল। ঋষি টলস্টয়কে দেখতে গিয়েছিলেন। হয়ত তাঁকে উপহার দিয়ে এসেছিলেন নিজের কোন বই বা রচনা। ফিরে এসে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন, যদি কোন কথা আসে, আসে কোন বাণী, যুগোত্তীর্ণ সেই ঋষির কাছ থেকে।

কয়েকদিন পরে সত্যি এল কয়েকটি ছত্র। "প্রিয় আলেক্সী পেশকভ, আপনার লেখা আমার ভালো লেগেছে; কিন্তু তার চেয়েও ভালো লেগেছে আপনাকে।"

গোর্কী জবাব পাঠালেন টলস্টয়কে। তাতে কেবল কৃতজ্ঞতা নয়, নিজের জীবনবোধের প্রকাশও সেখানে অকম্পিত : "প্রিয় লিও নিকোলায়েভিচ, আপনি আমাকে আপনার যে ছবিখানি পাঠিয়েছেন এবং আমাকে প্রশংসা করে যে কথা বলেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার রচনার চেয়ে আমি ভালো কিনা তা আমি জানিনে, কিন্তু এ কথা জানি, লেখক মাত্রকেই তার নিজের রচনার চাইতে, নিজের বই-এর চাইতে উত্তম হতে হবে, নিজের রচনার ঊর্দ্ধে তাকে উঠতে হবে। কারণ, বই আসলে কি? একখানা বই, সে যতোই উত্তম হোক না কেন, সে শব্দের কালো ছায়া ব্যতীত আর কিছু তো নয়, তার মধ্যে সত্যের আভাষ মাত্রই থাকতে পারে, সত্য তো নয়। অথচ মানুষ হচ্ছে বিধাতার সাক্ষাৎ দেবালয়। এখানেই তার অধিষ্ঠান। অবশ্য ঈশ্বর বলতে আমি বুঝি ন্যায়, সত্য ও মহত্ত্বের জন্য মানুষের অনির্বাণ সংগ্রামকেই, অপর কিছুকে নয়। আর এ জন্যই একটা খারাপ মানুষকেও একখানা ভালো বইয়ের চাইতে আমি উত্তম মনে করি।

"আমি যথার্থই গভীরভাবে বিশ্বাস করি, সমগ্র পৃথিবীর বুকে মানুষের চেয়ে মহত্তর কিছু নেই। দার্শনিক ডিমোক্রিটাসও এরূপ একটা কথা বলেছিলেন। তাঁর কথাকে একটু ঘুরিয়ে বরঞ্চ আমি বলব : পৃথিবীতে কেবলমাত্র মানুষই সত্য, বাকি সব মায়া। আসলে আমি একজন মূর্তিপূজক, মানুষ পূজক। আমার জীবনের সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়েই আমি মানুষকে পূজা করে এসেছি, আমৃত্যু তাকেই আমি পূজা করব, সেই আমার দেবতা। কিন্তু আমার ভাষা নেই, কেমন করে যে আমার এই অনুভূতিকে ভালো করে, জোরের সাথে বলতে হবে তা আমি জানিনে–”

এই ছিল গোর্কীর জীবন দর্শন। তিনি ভাষার কথা বলেছেন। কোন বইতে কোন ভাবে তিনি এই কথা বলেছেন তা বিশ্লেষণের বিষয়। কিন্তু তাঁর সমগ্র জীবন যে এই কথাই উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই; আর সে ভাষার চেয়ে জোরদার কোন ভাষা হতে পারে বলেও আমার জানা নেই।

জীবনকে গোর্কী ভালোবেসেছিলেন, মানুষ ছিল তাঁর দেবতা। ত্রুটি-বিচ্যুতি, ক্ষমতা-অক্ষমতা নিয়েই মানুষ। মানুষকে তিনি এই সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনদর্শনের যেটা বড় কথা সে হচ্ছে এই যে, এই দেখাতেই তা সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের শক্তি ও সম্ভাবনাই হচ্ছে বড় কথা। তাই হচ্ছে মানুষের জীবন। ব্যক্তি মানুষ, সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের দিনদিনান্তের মানুষ। যে দীন, সে দীনতার ক্ষয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। যে দরিদ্র সে দারিদ্র্যকেই বিধির বিধান বলে জানে। যে বর্বর সে বর্বরতাকেই তার শক্তির চরম বলে ভাবে। গোর্কী বললেন, সাহিত্যিকের কর্তব্য হচ্ছে ব্যক্তিকে নাড়া দেওয়া, যেন সে তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের চার দেওয়ালের বাইরে আসতে পারে, নিজেকে অতিক্রম করে দূর থেকে নিজেকে দেখতে পারে, আর সেখান থেকে নিজেকে করুণা করতে পারে, ঘৃণা করতে পারে, ভালোবাসতে পারে আর পারে নিজের আত্মার জন্য সংগ্রাম করতে।

গোর্কী এই দর্শনেরই যেন পরম সাথী পেলেন অবিস্মরণীয় মহৎশিল্পী আন্তন শেকভের মধ্যে। শেকভকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন ও তাঁর অন্তরের গভীরতম কোণ থেকে তাঁকে ভালোবাসতেন শিশুর মতো দ্বিধাহীনভাবে। পারস্পরিক পত্রবিনিময়ের কতো চিহ্ন ভরে আছে গোর্কীর জীবনে। গোর্কী দেখলেন অদ্ভুত মানুষ এই শেকভ। নাটকে তিনি মানুষের জীবন নিয়ে নাটকীপনা করেন না। তাঁর নাটকে মানুষের জীবন যেমন তেমনি ভেসে ওঠে। তাতে লোমহর্ষক ঘটনার সংঘাত নেই, বাচনিক বীর্য নেই। পথে-ঘাটের সাদামাটা মানুষ, বাড়ি-ঘরের বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে জীবনের মানুষ কথা বলছে, যেমন বলে তারা রাস্তায়, ঘরে, জীবনে। দর্শক সেই জীবন দেখে আর নিজের নিজের দিকে বিস্ময়ের চোখে, করুণার চোখে, অনুশোচনার চোখে, ভালোবাসার চোখে তাকায় আর বলে : এই আমার জীবন, এই আমাদের জীবন! গোর্কী দেখলেন এ ভাষার তুলনা নেই, এ রীতি অভাবিত। জীবনের সর্বোত্তম দর্শক না হলে কেউ পারে না এমন করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবতে, এমন করে তাকে ভাষা দিতে। ১৮৯৬ সালে শেকভের নাটক 'আঙ্কল ভানিয়া' দেখে গোর্কী লিখলেন শেকভকে : "প্রিয় আন্তন পাভলোভিচ! আপনি আমার চিঠির জবাব দিয়েছেন এবং বলেছেন আবার আমাকে লিখবেন। এজন্য আপনি আমার অপরিসীম ধন্যবাদ গ্রহণ করবেন। আপনার চিঠি এবং সেই সঙ্গে আমার গল্পগুলি সম্পর্কে আপনার মতামতের জন্য আমি অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে থাকব। এই সেদিন আমি আপনার 'আঙ্কল ভানিয়া'কে দেখে এসেছি। আমি তাকে দেখেছি আর কেঁদেছি। দস্তুরমতো মেয়েছেলের মতো কেঁদেছি। অথচ আমি যে খুব অনুভূতিপ্রবণ তা তো নয়। 'আঙ্কল ভানিয়া'কে দেখে যখন আমি ঘরে ফিরলাম তখন আমি অভিভূত। আঙ্কল ভানিয়ার দৃশ্য আমাকে যেন মরমে মেরে ফেলেছে, আমার সত্তাকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। ঘরে ফিরে আপনাকে আমি চিঠি লিখতে বসলাম। লিখে ফেললাম চিঠি, সে এক দীর্ঘ চিঠি। তারপরে তা আমি ছিঁড়ে ফেললাম। কি করে সহজ করে পরিষ্কার করে বলি আপনার এই নাটক কি গভীরভাবে একজন দর্শককে আলোড়িত করে তুলতে পারে। আঙ্কল ভানিয়াকে আমি যতো দেখতে লাগলাম ততোই যেন আমার মনে হতে লাগল, কে যেন একটা ভোঁতা করাত দিয়ে নির্মমভাবে আমার সত্তাকে দ্বিখণ্ডিত করে চলেছে। করাতের দাঁতগুলো আমার বুকের মাঝখানটাতে বসে যাচ্ছে। নিচে অন্তরটা বেদনায় শিউরে উঠছে, ডুকরে কাঁদছে আর ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। আমার কাছে আপনার আঙ্কল ভানিয়া দুর্দান্ত এক ভয়নাক সৃষ্টি বলে বোধ হয়েছে। নাট্যশিল্পের এ যেন এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত। মানুষের ফাঁকা মস্তকের উপর হাতুড়ির কি নির্মম আঘাত।...

"আঙ্কল ভানিয়ার শেষ অঙ্কের সেই দৃশ্যটা আমার চোখে এখনো ভাসছে।... কথার বিরাম হয়েছে অনেকক্ষণ, যেন একটা শূন্যতা বিরাজ করছে মঞ্চে। তারপর ডাক্তার আফ্রিকার ভয়ানক গরমের কথা বলল।.. আমার চোখে ভেসে উঠল আমাদের জীবন, মানুষের জীবন, কি ধূসর বর্ণহীন। বৈচিত্র্যহীন। কি পঙ্কিল। আমার ভয় হল। প্রশ্ন উঠল মনে, তাহলে, তাহলে কি হবে, কি করব এই জীবন নিয়ে?... আত্মার উপর আপনার কি শক্তিশালী আঘাত! কি সাংঘাতিক রকমে সঠিক আপনার আঘাতের লক্ষ্য, আর কি অব্যর্থ!! প্রিয় আন্তন! কি অদ্ভুত আপনার শক্তি। কিন্তু আমার আর একটি প্রশ্ন। এই আঘাতে কি হবে? মানুষের মতো আত্মা কি জেগে উঠবে? আমাদের এই জীবন করুণা করার জীবন। এ কথা সত্য। আমরা কি মানুষ! নির্বোধ, নোংরা, বিসদৃশ। এ মানুষকে ভালোবাসতে, করুণা করতে এবং সাহায্য করতে অমানুষিক ক্ষমতার আবশ্যক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা আমরা বুঝি। তবু এই মানুষের জন্য দুঃখ বোধ না করেও তো পারা যায় না। জানি, আমি আদৌ ভালো মানুষ নই। তবু আমি ভানিয়াকে যখন দেখলাম, দেখলাম ওরই মতো আর আর মানুষের জীবনকে, তখন চোখ ফেটে আমার কান্না এলো। দুঃখে, সহানুভূতিতে। অথচ কান্নার মতো বোকামি কিছু নেই। আর তাই নিয়ে কথা বলা, সেও আর এক বোকামি। কিন্তু আপনাকে মনে হয় অনড়, যেন কি নির্মম নির্বিকার দৃষ্টিতে আপনি দেখছেন এই মানুষগুলোকে, কি হিম-শীতল সে দৃষ্টি। আমি জানিনে, আমি ঠিক বলছি কিনা। আপনি আমায় মার্জনা করবেন। প্রিয় পাভলোভিচ! এ আমার ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা। বুঝতেই পারছেন, আপনার নাটক দেখে আমি ভীত হয়েছি, নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছি। এই দূর থেকে আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় আপনার হাত স্পর্শ করতে চাচ্ছি। যা কিছু মহৎ, সুস্বাস্থ্য এবং সৃষ্টির ক্ষমতা, তাই আমি কামনা করছি আপনার জন্য। আপনাকে প্রশংসা করার কথা ওঠে না। যথেষ্ট প্রশংসা বলে কিছু হতে পারে না আপনার। আসলে যারা প্রশংসা করছে তারাও আপনাকে সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি। অনেকে আপনাকে ভুল বুঝছে। আমার শুধু কামনা, আমি যেন আপনাকে ভুল না বুঝি।"

আসলে গোর্কীর কোন চিঠি পড়া শেষ না করে যেমন রাখা যায় না, তেমনি কাউকে শোনাতে চাইলে তার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত না শুনিয়েও পারা যায় না। আর কি অবিশ্বাস্য রকমে বিপুল সেই চিঠির সংখ্যা। সোভিয়েট দেশের গোর্কী গবেষকদের মতে, গোর্কীর যে সমস্ত চিঠি রক্ষা করা গেছে তার সংখ্যাই বিশ হাজার!! রুশ বিপ্লবের আগে কিংবা পরে ইউরোপ খণ্ডের এমন কোন মনীষী ছিলেন না যাঁর সঙ্গে পত্রালাপ করেননি গোর্কী। কত সহস্র লেখক ও কর্মী যে তাঁর কাছে এসেছেন সাহিত্যের সবক নিতে, নিজের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করাতে তার কোন ইয়ত্তা নেই। স্মৃতিচারণে কোন সাহিত্যিকই আজ বলতে পারেন না যে, তাঁদের কোন আবেদন কোনদিন প্রত্যাখ্যাত হয়েছে গোর্কীর কাছে।

এমন সময় ছিল যখন লেনিনের সঙ্গে তাঁর মতামতের পার্থক্য দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তখনো তাঁদের মধ্যে পত্রালাপ কিংবা সাক্ষাৎ আলোচনায় কোন ছেদ পড়েনি। আর উভয়ের প্রতি উভয়ের শ্রদ্ধার কোন হ্রাস ঘটেনি।

মতামতের পার্থক্যের উপর উত্তেজিত আলোচনার মাঝখানেও লেনিন গোর্কী সম্পর্কে যে অভিমতটি প্রকাশ করেছিলেন, তার চেয়ে যথার্থ অভিমত গোর্কী সম্পর্কে বোধ হয় আর কিছু হতে পারে না।

গোর্কীর নিজের স্মৃতিকথাতেই ঘটনাটির অংশ বিশেষ এরূপ : "কথায় কথায় লেনিন উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। এবার তিনি বসে পড়লেন, হাত দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কপালের ঘাম মুছলেন, যে চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছিল তা খেলেন, তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন : "আরে আপনার আমেরিকার ব্যাপারটা বলুন দেখি। আমি কিছু খবরের কাগজে পড়েছি বটে; কিন্তু কি করে ব্যাপারটা ঘটল?"

"আমি সংক্ষেপে আমার আমেরিকা ভ্রমণের কাহিনী বললাম। সে কাহিনী শুনতে শুনতে তিনি শিশুর মতো হাসিতে ফেটে পড়তে লাগলেন । এ আশ্চর্য হাসি! তারপরে তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন : আপনি সত্যি রসিক। আমি কোনদিন ভাবিনি আপনার এরূপ অসম্ভব রসবোধের ক্ষমতা রয়েছে। ব্যর্থতাকে আপনি কি আশ্চর্য পরিহাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন। জীবনকে এমনি সহজভাবে পরিহাসের দৃষ্টিতে গ্রহণ করতে পারার ন্যায় ক্ষমতা আর কিছু হতে পারে না। আমার আফসোস যে, এ ক্ষমতা আমার নেই। আর সত্যিকার বলতে গেলে জীবনটা মজারই বটে। এতে যতো দুঃখ, ততো মজা, ততো কৌতুক।"

গোর্কী-জীবনের কথা যতো জানা যায়, ততো ভাবা যায়, ততো বিস্ময় বোধ হয়। আর একটি ঘটনার কথা বলে এ আলোচনার শেষ করা যাক।

গোর্কী ঋষি টলস্টয়ের কথা শুনেছেন। কিন্তু তখনো দেখেন নি তাঁকে। সাহস করে ১৯০০ সালের গোড়ার দিকে তিনি দেখতে গেলেন টলস্টয়কে। ফিরে এসে তিনি শেকভকে লিখলেন : 'প্রিয় আন্তন! আমি সত্যি নিকোলায়েভিচকে দেখতে গিয়েছিলাম। তারপরে আট দিন পার হয়ে গেছে। কিন্তু এখানো তাঁকে দেখার ভাবটি গুছিয়ে আনতে পারছিনে। টলস্টয়ের যে জিনিসটা আমায় প্রথমেই আঘাত করল সে তাঁর চেহারা! টলস্টয় এমন হবে আমি তা ভাবতে পারিনি। আমার ধারণা ছিল, টলস্টয় হবে আরো লম্বা, আরো চওড়া, আরো শক্ত! কিন্তু আমি সামনে দেখলাম একটি ছোটখাটো বৃদ্ধ মানুষকে। ... কিন্তু এই বুড়ো মানুষটি যখন কথা বলতে আরম্ভ করলেন, তখন আমি অবাক হয়ে তাঁর কথা শুনতে লাগলাম। যাই তিনি বললেন না কেন, আমার ধারণা মতে ভুল কিংবা ঠিক, সবই যেমন গভীর তেমনি সহজ এবং অসম্ভব রকম আকর্ষণীয় বলে আমার বোধ হতে লাগল। তাঁর চরিত্রের সব চেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে তাঁর সরলতা। সবকিছু মিলিয়ে আপনার মনে হবে সে যেন সঙ্গীতের অর্কেস্ট্রা বা ঐক্যতান। সে সঙ্গীতে সব যন্ত্রই যে সুরের সঙ্গত সৃষ্টি করে বাজছে, এমন নয়। তবু সব মিলিয়ে সে দুরারোগ্য। কেননা সে মানবিক। অনেকে টলস্টয়কে বলে জিনিয়াস বা অলৌকিক শক্তি। কিন্তু মানুষকে জিনিয়াস বা অলৌকিক আখ্যা দেওয়ার মতো বোকামি আর কিছু হতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসলে জিনিয়াসের কোন সংজ্ঞা নেই। টলস্টয় জিনিয়াস, অলৌকিক ইত্যাদি বলার চেয়ে কত সহজে বলা যায় যে, তিনি লিও টলস্টয়। দেখুন না এতে কথাটা কতো স্পষ্ট হয়, কতো সহজ, কতো সংক্ষেপ, আবার কতো অতুলনীয়। 'লিও টলস্টয়' কথাটা বললেই বোঝা যায় যে, এর সঙ্গে কারুর তুলনা হয় না, এ এক শক্তিবিশেষ। নিকোলায়েভিচকে দেখতে পাওয়া যে কারুর পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু তাই বলে আমি মনে করিনে যে, তিনি প্রকৃতির কোন অলৌকিক সৃষ্টি। আসল অনুভূতিটা হচ্ছে এই যে, লিও টলস্টয়কে দেখতে দেখতে মন ভরে ওঠে আর মনে হয়, আমিও তো মানুষ। তবু বড় কথা এই নয় যে, লিও টলস্টয় একজন মানুষ। বড় কথা এই যে, একজন মানুষও লিও টলস্টয় হতে পারে।

গোর্কীর কথাকে উদ্ধৃত করেই মাত্র আমরা বলতে পারি, বড় কথা এই নয় যে, গোর্কী একজন মানুষ, একজন সাহিত্যিক। বড় কথা এই যে, একজন মানুষ, একজন সাহিত্যিকও গোর্কী হতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্কসীয় দর্শনের ভূমিকা

"We cannot manipulate reality to accord with any ideal of our mind, but have only to recognise it,"

—Radha Krishnan

"Philosophers have so far interpreted the world; the point is to change it."

—Karl Marx

ইংরেজি বাংলা দুটি শব্দের সঙ্গে আমরা কমবেশী পরিচিত। একটি হচ্ছে ফিলোসফি, অপরটি দর্শন। ফিলোসফি শব্দ আদিতে গ্রিক ভাষা থেকে গৃহীত হয়েছে। অর্থগতভাবে 'ফিলোসফি' দ্বারা জ্ঞান বা জ্ঞানের প্রতি প্রেমকে বুঝানো হত। দর্শন অর্থ দেখা। কিন্তু চিন্তাশীল শিক্ষিত জনাংশের নিকট শব্দ দুটি তাদের সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। ফিলোসফি দ্বারা যেমন জ্ঞানমাত্র নয়, জগত ও জীবনের কিছু সংখ্যক মৌলিক সমস্যার আলোচনা বুঝায়, দর্শন বলতেও চোখের সাধারণ দর্শন ক্ষমতাকে বুঝায় না। দর্শন বলতে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা বুঝায়, আমাদের জীবন জগতের মৌলিক সমস্যাসমূহের বিচার-বিবেচনা বুঝায়।

কিন্তু উভয় শব্দের মধ্যে জ্ঞানলাভের যে বৈশিষ্ট্যটি রয়েছে তা লক্ষ্য করার বিষয়। জ্ঞানলাভের ইচ্ছা মানুষের একটি জন্মগত আদিম বৈশিষ্ট্য। বলা চলে এটা কেবল মানুষ নয়, জীব মাত্রেরই জীবনগত বৈশিষ্ট্য। জীবন যদি তার পরিবেশকে জানার ও জয় করার ইচ্ছা পোষণ না করে তবে তার পক্ষে জীবিত থাকা সম্ভব নয়। জীবনের মধ্যে পরিবেশকে নিজের অনুকূলে জয় করার ইচ্ছার সর্বাধিক বিকাশ ঘটেছে মানুষে। সে বিকাশও ঘটেছে মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

জীবনের জ্ঞানলাভের প্রচেষ্টার মূল প্রয়োজন হচ্ছে বেঁচে থাকা। জ্ঞানের জন্য জ্ঞান একটি আধুনিক আবেগের কথা। আসলে জীবনের ক্ষেত্রে জ্ঞানের জন্য জ্ঞান কথাটি অর্থহীন। জীবনের জন্যই জ্ঞান। জীবন রক্ষার জন্যই জ্ঞান। এ কারণেই আদিতে মানুষ যখন নিজেকে পরিবেষ্টিত দেখেছে ঝড়-ঝাঞ্ঝা, বিদ্যুৎ, সমুদ্র,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্বত, দুস্তর মরুভূমি, অগাধ বন প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা তখন জীবনের তাগিদেই তার বিকশিত অস্তিত্ব থেকে প্রশ্ন বেরিয়েছে : এটার অর্থ কি? ওটার অর্থ কি? সেটার অর্থ কি? যেমন আজো শিশুর মুখে প্রথম প্রশ্ন : এতা কি? ওতা কি? শিশুর মতোই সে আগুনে হাত বাড়িয়েছে আর সে অভিজ্ঞতার জ্বালায় দ্বিতীয় বারে আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করার এবং নিজের স্বার্থে তাকে ব্যবহার করার কৌশল আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছে। বিদ্যুতে স্পৃষ্ট হয়েছে আর বিদ্যুৎকে শক্তির আকর বলে কল্পনা করেছে। কাজেই জ্ঞানের জন্য জ্ঞান জীবনের জন্য সংগ্রামরত মানুষের কাছে অর্থহীন। এ কথাটি আদিকালে খুব সরল ছিল। আজ আর তা সরল নেই। আজ জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানের জন্য জ্ঞান আহরণ বা জ্ঞান চর্চার কথা বলেন। যে জ্ঞানের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যত দুঃসাধ্য হয় সে জ্ঞান তত গভীর বলে আমাদের কাছে বিবেচিত হয়। 'মনের আদর্শ মোতাবেক বাস্তব সত্যকে কৌশল করে আমার হুকুমের চাকর করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের জ্ঞানের আদর্শ তা হবে না। বাস্তব যা তাকে জ্ঞাত হওয়াই আমাদের জ্ঞানের আদর্শ হবে।' কিন্তু বাস্তব যা তাকে আমরা কেন জ্ঞাত হতে চাই। সে কি শুধুই জ্ঞানের জন্য? না, আমার জীবনকে সম্ভব করার জন্যে? আমার জীবন বলতে ব্যক্তিগত জীবন নয়। মানুষের জীবনের অর্থ জীবিত থাকা। বাস্তবকে যথার্থভাবে মানুষ জানতে চেয়েছে বাস্তব জগতে মানুষের বেঁচে থাকাকে সম্ভব করার জন্যই। কিন্তু কালে কালে মানুষ যত জ্ঞান লাভ করল, কৌশল আয়ত্ত করল, তত সে নিজের মধ্যে বিভক্ত হল। বাঁচাকে সে বাস্তবের মধ্যে মানুষের বাঁচার বদলে একের বিরুদ্ধে অপরের বাঁচার সংগ্রাম হিসেবে দেখতে শুরু করল। গোষ্ঠী দেখল গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গোষ্ঠীর বাঁচার কৌশল, দাসপ্রভু দেখল দাসকে পশু করে নিজের বাঁচার পথ, সামন্তপ্রভু দেখল প্রজাকে ভূমির শিকলে আবদ্ধ করে তার শ্রমের ফসল ঘরে তোলার কায়দা। আর পুঁজির মালিক বাঁচাকে দেখল পুঁজির অধিকারে জীবিকার উৎপাদনের সব হাতিয়ার হস্তগত করে পেটের জ্বালায় অস্থির মানুষগুলোকে সেই হাতিয়ারের দাসে পরিণত করে তার শ্রমের বদৌলতে গঠিত সভ্যতার সিংহভাগকে নিজের ভোগে ব্যবহার করার রাষ্ট্রযন্ত্র এবং সেই রাষ্ট্রযন্ত্র বহাল রাখার যুক্তিজাল হিসাবে।

মানুষের অস্তিত্বের স্ববিরোধী এই ব্যাখ্যার চরম যখন পৌছাল উনবিংশ শতাব্দীতে তখন স্বাভাবিকভাবেই মার্কস বলেছিলেন : "দার্শনিকের হাতে জগতের ব্যাখ্যা কম হয়নি; আজ প্রয়োজন হচ্ছে ব্যাখ্যার নয়, প্রয়োজন জগৎকে পরিবর্তিত করার।" একথা শুনে প্রতিষ্ঠিত শাসক সমাজের দার্শনিকগণ তারস্বরে বলে উঠলেন : "এ কেমন কথা! আমাদের কাজ হল জগৎকে জানা, কেবলই জানা। বস্তুকে জানা। সত্যকে জানা। বস্তু তো বস্তুই থাকবে। জগৎ তো যেমন আছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেমনই থাকবে। এবং সত্য তো সত্যই থাকবে। তাকে পরিবর্তিত করার ক্ষমতা আমাদের কোথায়?" এর জবাবে আবার আমাদের আদিতে ফিরে যেতে হয় : কিন্তু জ্ঞান কিসের জন্য? সে তো বাঁচার জন্য। মানুষ বাঁচবে কেমন করে? জগৎকে জয় করেই তো বাঁচবে। জগৎকে সে জয় করবে কেমন করে? নিজের স্ববিরোধিতা দূর করার মাধ্যমেই তো? ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তির এবং শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীর আত্ম-ধ্বংসী ক্রিয়া-কাণ্ডের অবসান ঘটিয়েই তো।

মানুষের অপর নাম যুক্তিবাদী জীব। কার্ল মার্কস মানুষ হিসাবে তাই অতি স্বাভাবিক যুক্তির কথাই তাঁর মূল অভিমতে তুলে ধরেছেন। কিন্তু যুক্তিবাদী জীবের মধ্যে পশুর চেয়েও যেমন সর্বাধিক অযৌক্তিক অভিমতের স্থান তেমনি প্রতিষ্ঠিত দর্শনের ইতিহাসে মার্কসের এই স্বাভাবিক অভিমত আজও স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করা হয়নি। আর তাই এখনো দর্শনের পরিচয় বা দর্শনের ভূমিকা বা ইতিহাস জাতীয় এমন পাঠ্যপুস্তকের অভাব নেই, যে পাঠ্যপুস্তকে মার্কস এবং মানুষের জীবন ও জগৎ সম্পর্কে মার্কসীয় অভিমতের কোন নাম-ঠিকানা আদৌ খুঁজে পাওয়া যায় না।

পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে ঘুরছে, সূর্য পৃথিবীকে নয়। এ কথাটা আজ সত্য বলে গৃহীত। কিন্তু একদিন এ সত্য কথা মানুষের সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে মানুষ কপারনিকাস, মানুষ গ্যালিলিওকে কত না আশঙ্কা, কত না নির্যাতনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। মার্কসের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। সমাজের ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করে তার গতির বাস্তব মূলসূত্রের কথা বলার জন্য দেশ থেকে দেশান্তরে নির্বাসনের দণ্ডে তাকে ভুগতে হয়েছে। আর কপারনিকাস, গ্যালিলিও বা মার্কস কারুর অভিমতই তাঁদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা, অনিচ্ছার প্রকাশ নয়। তবে দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সত্যসন্ধানী কপারনিকাস বা গ্যালিলিও থেকে মার্কস এইখানে পৃথক যে মার্কসের দর্শন মার্কসকেও. তাঁর নির্যাতনের কার্যকারণ উপলব্ধিতে সাহায্য করেছে, যে উপলব্ধি কপারনিকাস বা গ্যালিলিওর মধ্যে সম্ভব ছিল না। গ্যালিলিও হয়ত জানতেন না পৃথিবী ঘুরছে এ সত্যে যে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং ধর্মসংস্থা আপত্তি করছে তাদের আপত্তির কি কারণ আছে এবং নির্যাতনের চরমে তিনি হয়ত অসহায় ব্যক্তির মতো উচ্চারণ করেছেন : হে ঈশ্বর, তুমি এদের ক্ষমতা করো; এরা জানে না এরা কি করছে' কিন্তু নির্যাতিত মার্কস তাঁর দুর্দশার চরমেও কখনো মনে করেননি যে, প্রতিষ্ঠিত সমাজ তাঁকে নির্যাতন করে ভুল করছে কিংবা ভুল করে তাঁকে নির্যাতন করছে। তাঁর প্রতি নির্যাতনকে তিনি তাঁর বিশ্লেষণের সত্যতার এক প্রমাণ হিসাবেও যেমন দেখেছেন তেমনি এ কথা তিনি জানতেন যে, অসঙ্গত পুঁজিবাদী সমাজের পক্ষে তাঁর বিশ্লেষিত সত্য মরণকাঠি স্বরূপ। এ মরণকাঠির প্রচার আহত শিকার প্রাণপণে রোধ করার প্রয়াস পাবে তাতে অস্বাভাবিকতার কি আছে? আর এও সত্য যে, অসঙ্গতির চরম যে সমাজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৌঁছেছে সে সমাজ তার মরণকাঠির বাহকের কণ্ঠ রোধ করে নিজের পরমায়ু নিশ্চিত করতে পারবে না। অসঙ্গতি সৃষ্টি বাদে পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার যেমন সম্ভব হয়নি তেমনি অসঙ্গতির বিরামহীন সৃষ্টি সে সমাজের নির্ঘাত রূপান্তরকে ক্রমান্বয়ে নিকটতর না করে পারে না। সঙ্গতি-অসঙ্গতির বিরোধ বস্তুজগতের গতির ন্যায়ই সমাজ জীবনের গতিরও মূল কারণ। বিরামহীন পরিক্রমার প্রকাশ হচ্ছে বস্তুজগত। এ সত্য আমি মানি কিংবা না মানি তাতে বস্তুজগতের কিছু যায় আসে-না। যে আমি তাকে মানছিনে সে আমিও সেই গতিময় বস্তুরই প্রকাশ। ফরাসি দার্শনিক দেকার্ত চরম সত্যের সন্ধানে একদিন বলেছিলেন, আমি সন্দেহ করতে পারি সব অস্তিত্বকেই– কেবল আমি সন্দেহ করতে পারিনে নিজের অস্তিত্বকে : 'কজিটো আরগো সাম' ফরাসি ভাষার বিখ্যাত বাক্য; কেননা আমার সন্দেহেই আমার অস্তিত্ব। তেমনি সঙ্গতি-অসঙ্গতির বিরোধই মনুষ্য সমাজের সামাজিক বিকাশের মূলসূত্র। তাকে আমি স্বীকার করতে পারি। তাকে আমি অস্বীকার করতে পারি। তাতে ক্রিয়ারত সেই সত্যের কিছু যায়-আসে না। মার্কস জানতেন মার্কসের আবিষ্কারের জন্য এ সত্য জন্মের অপেক্ষায় ছিল না। সমাজের ক্রমবিকাশের সত্যই মার্কসের আবিষ্কারকে সম্ভব করেছে : মার্কসের আবিষ্কার সমাজের বিকাশের সত্যকে নয়। বস্তু গতিশীল এ বোধ আদিকালের দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাশীলদের মধ্যে ছিল, সে গতিশীলতার মূল কারণ সেদিন তাঁরা হয়ত ব্যাখ্যা করতে পারেননি। ব্যাখ্যার উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ ও উপকরণের সেদিন অভাব ছিল। কিন্তু তার পরে মানুষের শ্রমে সভ্যতার সৌধ যত উঁচু হতে লাগল ততই সৌধের সৌভাগ্যবানগণ বুঝতে পারলেন যে, বস্তু গতিশীল, পৃথিবীটা গতিশীল– এ তত্ত্ব আর যাদের মস্তকে ঢুকুক না কেন সভ্যতার পিলসুজের মস্তিষ্কে যেন কোন ক্রমেই না ঢুকতে পারে; যেন দাস না বুঝতে পারে যে, তাদের হাত-পায়ের পরিশ্রমেই প্রভুর মাথার ওজন বাড়ছে কিন্তু সে ভারী মাথা দাসের পায়ের শিকলের সমবেত বঞ্চনায় কুপোকাত হতে পারে; যেন ভূমিদাস বুঝতে না পারে যে, এতদিনকার অক্ষয় দাসপ্রথারও ক্ষয় ঘটেছে, তার নতুন উৎপাদনের হাতিয়ারের শক্তি তাদের হাতছানি দিকে ডাকছে। সৌধ চূড়ার সুধাকরদের সেই প্রয়াসেই সৃষ্টি হয়েছে বিধাতার বিধান : বিধাতা হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান বানাননি; যুক্ত হয়েছে রাজার সশস্ত্র হাতের সঙ্গে ধর্মীয় সংস্থার পুণ্য বাহুর। কিন্তু যে সত্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা শ্রেণীর স্বীকার-অস্বীকারের অপেক্ষা রাখে না তাকে রোধ করার সাধ্য কোথায়! দাসকে দাবাতেও দরকার হয় ক্রমাধিক উন্নত ধরনের অস্ত্রের; বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে প্রয়োজন হয় দীর্ঘ সড়কের আর দ্রুত যানের। উৎপাদনের উপায়ের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয় উৎপাদককে বঞ্চিত করার পেষণ যন্ত্রেরও। সে যন্ত্র ক্রমাধিক পরিমাণে হয়ে উঠে সুসংহত;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভাগ থেকে বিভাগের সঙ্গে শৃঙ্খলিত ও কেন্দ্রীভূত। সে কেন্দ্রে বসে শাসক ও শোষক যেমন একদিকে আনন্দ মদিরায় ঢুলু ঢুলু আত্মবিশ্বাসে বলে : দেখ, কি আমার কীর্তি; কি বিরাট তার পরিধি। কেন্দ্র থেকে আমার একটি মাত্র সংকেতে তার পেষণযন্ত্র আ-সীমা ঝনঝন করে বেজে ওঠে, নির্মমভাবে সে বিদ্রোহীকে দলে-পিষে শেষ করে দেয়। আবার নিষ্পেষিত মানুষও অসংখ্য হাতের সম্মিলিত শক্তির দিকে চেয়ে আত্মবিশ্বাসে শিহরিত হয়ে নিষ্পেষণ যন্ত্রের কেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে ভাবে : একটি সম্মিলিত আঘাতে ঐ কেন্দ্রের প্রাণভোমরাকে হাতের মুঠায় নিতে পারলেই ব্যাস– আর যায় কোথা এই দর্প-সম্রাট। যেখানে ওর শক্তি, সেখানেই ওর সংহার।

মানুষের প্রয়োজনের চেয়ে বড় দাবি আর কিছুর নয়। মানুষের শ্রমই সেই প্রয়োজনের দাবিকে পূরণ করার একমাত্র মাধ্যম। প্রয়োজন ও শ্রমের ভিত্তিতেই মধ্যযুগের গোঁড়ামির কুয়াশাকে ভেদ করেছে বিজ্ঞান । সেই বিজ্ঞান আবার তৈরি করেছে আধুনিকতম উৎপাদন যন্ত্রকে এবং তার বাহন– শ্রমিককে। পুঁজিবাদের স্বভাব পুঁজি সৃষ্টি করা। কম থেকে বেশি। বেশি থেকে আরো আরো বেশি। এজন্য একদিন সে ভূমিদাসকে সামন্ততন্ত্রের বেড়া ভেঙ্গে কলের শিকলে বেঁধে দিয়েছিল। ভেবেছিল তার হুকুম মতোই দু'হাতী প্রাণীগুলো কেবল কলকবজার নাট বল্টু টাইট করবে আর ভারে ভারে তার শ্রমের ফসল পণ্য দিয়ে তাকে সমৃদ্ধ করে তুলবে।

মার্কসবাদের আবির্ভাব ইতিহাসের এই ক্রান্তি মুহূর্তেই। নাট বল্টু ঘুরাতে ঘুরাতে যন্ত্রদানবকে একটি মোচড়ে নির্বাক করে দেবার কৌশলটির ফাঁক ধরতে পেরে দু'হাতী প্রাণীগুলো বোবা হলেও শক্তির উপলব্ধিতে যখন কেঁপে উঠছিল সেই মুহূর্তে মার্কস সে বোবা মুখের বাঁধন খুলে দিলেন। মার্কস ও এঙ্গেলস দেখালেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রমিককে কেমন কর একদিনের প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ারের বাহন দাস আজ জটিল যন্ত্রের নিয়ন্ত্রক শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়েছে ; আর কেমন করেই বা দাসপ্রভু আজ পুঁজি ও শ্রমিকের একচেটিয়া মালিকে পরিণত হয়েছে। এ বিশ্লেষণ ইতিহাসের বিশ্লেষণ, কল্পনার ফানুস নয়। বঞ্চিতের বেদনা অতীত কালেও বহু সমাজকর্মী ধর্মপ্রাণ মহৎ ব্যক্তি কিংবা দার্শনিক বোধ করেছেন। কিন্তু ইতিহাসের এ বিশ্লেষণ কেবল ঊনবিংশ শতাব্দীতেই সম্ভব হয়েছে। ব্যক্তি হিসাবে মার্কস তাঁর বুদ্ধিমত্তা এবং মহৎ মানুষের মন নিয়ে সংখ্যাধিক নির্যাতিত মানুষের পক্ষ নিয়ে ইতিহাসের অগ্রগতির মূল কারণটিকে ব্যক্ত করে দিয়েছেন। শুধু নির্যাতিত মানুষের জন্য নয়, মনুষ্য সমাজের জন্যই তাঁর সে অবদান মানুষের জ্ঞান এবং সমাজের অসঙ্গতি দূরীকরণের মানবিক প্রচেষ্টায় এক অনন্য বিপ্লব সাধন করেছে। জ্ঞানের চেয়ে বড় শক্তি আর কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই। মার্কস নির্যাতিতের হাতে এতদিনকার লুক্কায়িত সেই জ্ঞান অস্ত্রকে তুলে দিয়েছেন। বিধাতা নাকি মানুষকে আদেশ করেছিলেন : "মানুষ! তুমি নিজেকে জানো।" কিন্তু এ বিধান যাদের মাধ্যমে তিনি এই বিশ্বভূমণ্ডলে পাঠিয়েছিলেন তাঁরা বুঝেছিলেন এমন মারাত্মক অস্ত্র আপামর সব মানুষের হাতে পড়লে বিধাতাসহ বিধাতার বাহনদেরও রক্ষা থাকবে না। তাই 'মানুষ, নিজেকে জানো' বিধানের বদলে জারি হয়েছিল অজ্ঞানতার মোক্ষম বিধান : "মানুষ! তুমি কি আদি পুরুষ আদমের আদি অপরাধের কথা বিস্মৃত হয়েছ? জ্ঞানবৃক্ষের ফল বিধাতার নিষেধ সত্ত্বেও সে ভক্ষণ করেছিল। তাই মর্তের দুর্ভোগে সে নিপতিত হয়েছে।" এই বিধানের প্রতাপেই নিষ্পেষিত মানুষ যুগ থেকে যুগে কেবল তার নিজের হাতের উৎপাদিত জীবিকার উপায় থেকেই বঞ্চিত থাকেনি, সে বঞ্চিত রয়েছে সেই বঞ্চনার কার্য কারণের জ্ঞান থেকেও। মার্কস সেই নিষিদ্ধ জ্ঞানবৃক্ষের ফল পরিবেশন করলেন বঞ্চিত মানুষের সামনে। বঞ্চকের কাছে এর চেয়ে মারাত্মক অপরাধ আর কি হতে পারে?

আদি থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকালীন সময় অবধি মানুষের ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করে মার্কস বললেন :

(১) কেবল মাত্র বস্তুই গতিশীল নয়; মানুষের সমাজও গতিশীল।

(২) বস্তুর গতি যেমন বস্তুর অন্তর্নিহিত কণায় কণায় দ্বন্দ্বে, মানুষের সমাজের গতিও তেমনি উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে উৎপাদানের সম্পর্কের অসঙ্গতির দ্বন্দ্বে। একদিন ছিল যেদিন মানুষ যূথবদ্ধ ছিল প্রকৃতির বিরুদ্ধে। সেই আদিম অবস্থায়ও তার গতির মূলে ছিল প্রকৃতিকে জয় করার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব। আবার একদিন আসবে যেদিন মানুষ উৎপাদনের উপায় ও সম্পর্কের কৃত্রিম কৃত্রিম দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে আদিম অবস্থার চেয়ে একেবারেই নতুনরূপে যূথবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে আবার প্রকৃতিকে অচিন্ত্যনীয়ভাবে জয় করার জন্য।

(৩) বস্তুর গতির ক্ষেত্রে পরিমাণগত পরিবর্তন যেমন একটি চূড়ান্ত মুহূর্তে গুণগত রূপান্তর সৃষ্টি করে, মানুষের সমাজেও অসঙ্গতির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব চরম মুহূর্তে বিপ্লব ও সামাজিক রূপান্তরের সূচনা করে।

(৪) সমাজ দ্বন্দ্বমূলক গতির নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। যদি একে দ্বন্দ্বমূলক ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলা যায় তাহলে বলতে হবে ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ মানুষের সমাজের বিকাশে বস্তুজগতের মৌলিক নিয়মের ন্যায়ই অমোঘ। পঁচিশ-পঞ্চাশ বছরের হিসাবের হেরফেরে এ নিয়মের মৌলিক কোন হেরফের ঘটতে পারে না।

মার্কসবাদ হচ্ছে মানুষের সমাজ ও জগৎকে সামগ্রিকভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার সর্বাধিক পরিপূর্ণ দর্শন। জগৎ ও জনগণের সর্বক্ষেত্রে এর মূল সূত্রের প্রয়োগ। উপরে কেবল সামাজিক বিশ্লেষণের দিকটির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ঐতিহাসিক এতদিন ইতিহাস রচনা করেছেন; সমাজবিদ সমাজের ঘটনা স্তূপীকৃত করেছেন; অর্থনীতিবিদ অর্থশাস্ত্রের এক নিয়ম তৈরি করেছেন আর এক নিয়ম ভেঙ্গে দিয়েছেন; ধর্মতত্ত্ব ঈশ্বরের বিধান বহন করে মানুষকে বিমুগ্ধ রাখার চেষ্টা করেছে। সব মিলে সমস্ত শক্তির আধার মানুষের সমাজ অধিকাংশ মানুষের কাছে অলৌকিক রহস্যময় রঙ্গমঞ্চ বলে বোধ হয়েছে। সে রঙ্গমঞ্চে মানুষ নিজেকে অসহায় দর্শক কিংবা পার্শ্ব চরিত্র হিসাবেই দেখেছে। এ নাটকের সূচনা ও পরিণতি তার কাছে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের যবনিকাতেই আচ্ছন্ন ছিল। মার্কসবাদ রহস্যের সেই যবনিকাজাল ছিন্ন করে নির্যাতিত মানুষকে জীবননাট্যের মূল নায়কের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং পরিণামে মনুষ্য সমাজের সামনে সঙ্গতিপূর্ণ একটি স্বাভাবিক সমাজের অনিবার্য সম্ভাবনাকে তুলে ধরেছে। এখানেই তাঁর ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদিত; এখানেই তার ভূমিকার অভিনবত্ব।

১৯৬৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম্যাটেরিয়ালিজম অ্যান্ড এমপিরিও ক্রিটিসিজম

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস তাঁর একখানি গ্রন্থের নাম রেখেছিলেন 'অ্যান্টি-ডুরিং'। সেই নামের কারণেই 'ডুরিং' আমাদের কাছে পরিচিত শব্দ। না হলে ইতিহাসের পাতায় হের ডুরিং এমন কোন দাগ কাটেননি যাতে তিনি বিশ্বব্যপী স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন।

সংগ্রামী বস্তুবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা লেনিনও তাঁর দর্শন বিষয়ক গ্রন্থের শিরোনামে 'অভিজ্ঞতাবাদে' উল্লেখ করেছেন এবং গ্রন্থের মধ্যে এই তত্ত্বের রুশ প্রচারক বাজারভ, বোগদানভ, লুনাচারস্কি, বারমান প্রমুখ ব্যক্তিদের অভিমত বিশ্লেষণ করে তার ভাববাদী প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র উদঘাটিত করছেন।

বাজারভ, বোগদানভ, লুনাচারস্কিদের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। অথচ এদের উপর লেনিনের কি নির্মম ক্রোধ! ক্ষুরধার যুক্তিতে প্রাচীন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত দর্শন ও বিজ্ঞানের বিকাশের মূলসূত্র উদঘাটনের মারফত বাজারভদের অভিজ্ঞতাবাদের তত্ত্বকে লেনিন উন্মোচিত করে তার খোলস থেকে তার ভাববাদী সারকে ছিন্ন করে এনেছেন। আর এই উদঘাটনে প্রতি পৃষ্ঠায় নবভাববাদীদের প্রতি বর্ষিত হয়েছে লেনিনের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ আর কটাক্ষ।

এ এক অদ্ভুত ধরনের দর্শনের বই। আমি কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন পড়েছি। মনে করেছি দর্শন কেবল আলোচনার বিষয়। দর্শন নিরপেক্ষ! সে মানুষের জীবনের বৃহৎ বৃহৎ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করবে। ক্ষুদ্র মানুষকে বৃহৎ প্রশ্নের ধমকে ভীত করে বলবে : তুমি কী জানো? তুমি যা দেখো, যা বিশ্বাস করো তাই যে সত্য তার নিশ্চয়তা কী? এই অসীম বিশ্বে তুমি জীবনের কণা মাত্র। বিশ্বকে জানার তোমার ক্ষমতা কোথায়? কিংবা বলবে : বস্তুকে তুমি বৃহৎ মনে করছ কেন? বস্তুর অস্তিত্বের প্রমাণ কী? মনের চেয়ে শক্তিশালী কে? মনই স্রষ্টা। বিধাতার সৃষ্টি মন। আর মনের সৃষ্টি জগৎ। মনেই জগতের শুরু। মনেই জগতের শেষ।

লেনিন নিরপেক্ষ দর্শনে বিশ্বাস করতেন না। দর্শন মানুষের চিন্তার বিলাস নয়। সে তার বাঁচার ভাবগত হাতিয়ার। বাঁচার প্রয়োজনে আদিকাল থেকেই মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছে : আমি কী, আমি কেন এবং আমি কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করব? বাঁচার প্রয়োজনে সে প্রকৃতিকে জয় করতে চেয়েছে। প্রকৃতিকে জয় করার জন্য সে তাকে জানতে চেয়েছে, তার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে চেয়েছে। সে ও তার পরিবেশ : সব নিয়েই জগৎ; সব নিয়েই বিশ্বপ্রকৃতি। নিজেকে ও জগৎকে সে ধীরে ধীরে জেনেছে এবং জানছে। জ্ঞানের বিকাশে চরম জ্ঞান বলে কোন কথা নেই। অজানা থেকে জানার দিকে মানুষ এগিয়ে গেছে; এগিয়ে যাচ্ছে। কোন কিছুকে আদৌ জানা যাবে না– এ সিদ্ধান্ত যেমন জীবনের জন্য আত্মঘাতী, জীবনের স্বভাব বিরুদ্ধ, তেমনি সবকিছু জানা হয়ে গেছে, আর জানার নেই সে সিদ্ধান্তও জীবনের গতিকে স্তব্ধ করে দিবে।

আদিকালে মানুষের সামাজিক জীবনে জটিলতা ছিল না। সেদিন জটিলতা ছিল না তার ভাবজগতেও। প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের জন্য সংগ্রামরত মানুষ জ্ঞানকে দেখেছে বাঁচার মাধ্যম হিসাবে। কালক্রমে সেই বাঁচার প্রক্রিয়াতেই মানুষের সমাজ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে; তাতে জটিলতা বেড়েছে। মানুষের সমাজ বাঁচার উপায়ের অধিকারের ভিত্তিতে দ্বন্দ্বমান শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে। আর দ্বন্দ্বমান শ্রেণীতে বিভক্তির কারণে প্রকৃতির ব্যাখ্যায় পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। স্বার্থ তথা জীবন রক্ষার চেয়ে বড় প্রয়োজন আর কিছু হতে পারে না। সেই প্রয়োজনে সমাজের প্রভু শ্রেণী জগৎকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে তার নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী। শোষিত শ্রেণীও জগৎকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছে নিজেদের জীবন রক্ষার উপযুক্ত করে। জগতের ব্যাখ্যায় এমনি করে উদ্ভব হয়েছে ভাববাদী ও বস্তুবাদী দর্শনের দুই ধারা। যুগ থেকে যুগে পরিবর্তন এসেছে। সমাজের রূপান্তর ঘটেছে। কিন্তু শ্রেণী বিভক্ত প্রত্যেক সমাজের প্রভু শ্রেণী নিজের বাস্তব সম্পদ ও শোষণকে রক্ষা করার জন্য বৃহত্তর শোষিত মানুষের সামনে জগৎকে ব্যাখ্যা করেছে মায়া বলে। শোষিত মানুষ যাতে নিজের শক্তির কথা জানতে না পারে সেই কারণে মানুষকে সে চিত্রিত করেছে অতিপ্রাকৃতিক বিধাতার কৃপার পাত্র হিসাবে। শোষিত শ্রেণী সংগ্রাম করেছে শোষক শ্রেণীর এই ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে। কিন্তু বাঁচার হাতিয়ারের চেয়ে শক্তিশালী কিছু নেই। আর তাই বাঁচার হাতিয়ারের একচ্ছত্র মালিকদের কৌশলে ও অত্যাচারে শোষিতের ব্যাখ্যা সাধারণভাবে অস্বীকৃত থেকেছে। তাই ভাববাদের দাপটে বস্তুবাদ অবজ্ঞাত হয়েছে।

শোষিত মানুষ সংগ্রাম করে এসেছে শোষণ থেকে মুক্তির জন্য। মানুষের সঙ্গে সঙ্গত দ্বন্দ্ব কেবল মাত্র প্রকৃতির সাথেই হতে পারে। মানুষের সাথে মানুষের আত্মঘাতী সংঘর্ষ অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক। সঙ্গতিপূর্ণ সমাজ সৃষ্টি হবে সেদিন যেদিন মানুষ মানুষকে বাঁচার উপায় থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করবে না। প্রকৃতির কাছ থেকে বাঁচার উপায় অধিকার করে মানুষ তাকে ব্যবহার করবে মানুষের বিরুদ্ধে নয়; ব্যবহার করবে প্রকৃতির বিরুদ্ধে। অধিকতরভাবে প্রকৃতিকে জানার জন্য, তাকে বশ করার জন্য; তাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্কস এঙ্গেলস সমাজের বিকাশকে ব্যাখ্যা করে উনবিংশ শতাব্দীর শোষিত মানুষের কাছে সেই সঙ্গতিপূর্ণ মানবিক সমাজের স্বপ্ন তুলে ধরেছিলেন। তাঁরা বলেছেন, সংগ্রামী শোষিতের জীবন দর্শন হবে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন। এই দর্শন তার সংগ্রামের সহায়ক; এ দর্শন সমাজ ও প্রকৃতির রহস্য উদঘাটনে তাকে সাহায্য করে। সে কী, সে কেন এবং সে কী করবে– তার জবাব দেয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন।

এই দর্শনের সাহায্যেই মার্কস এঙ্গেলস বলেছেন, সামাজিক ও প্রাকৃতিক যে নিয়মে একদিন দাস সমাজ সামন্ত সমাজে এবং সামন্ত সমাজ পুঁজিবাদী সমাজে রূপান্তরিত হয়েছে, সেই নিয়মে অনিবার্যভাবে পুঁজিবাদী সমাজ রূপান্তরিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজতান্ত্রিক সমাজ এবং একদিন মানুষ তৈরি করবে সাম্যবাদী সমাজ। আজকের সমাজের রূপান্তরের বড় নিয়ামক শ্রমিক শ্রেণী। বস্তুবাদী দর্শন তার জীবন দর্শন। দার্শনিক অর্থাৎ জীবন ও জগতের যে ব্যাখ্যাকারী তাকে প্রথমে জবাব দিতে হবে সে কোন পক্ষের: শোষকের, না শোষিতের? যদি সে শোষিতের হয় তবে তাকে গ্রহণ করতে হবে বস্তুবাদী সংগ্রামী জীবন দর্শনকে। এখানে নিরপেক্ষতার কোন স্থান নেই। যে নিজেকে নিরপেক্ষ বলে দাবি করে সেও আসলে পক্ষভুক্ত : হয় এ পক্ষের, নয় ও পক্ষের।

১৯০৫ সালের রক্তাক্ত ৯ জানুয়ারি রুশদেশে প্রথম বিপ্লবের উদ্বোধন ঘটেছিল। সংগ্রামী লেনিন ও তাঁর সাথীরা চেষ্টা করেছিলেন সেই বিপ্লবকে সার্থক করে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ অবারিত করতে। কিন্তু সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদ : জারতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্র রক্তের বন্যায় ১৯০৫ থেকে ১৯০৭-এর বিপ্লব পর্যুদস্ত করে দেয়। শোষিতের সংগ্রামে জোয়ার-ভাটা আছে। রক্তের বন্যায় ১৯০৫-এর বিপ্লব পর্যুদস্ত হওয়াতে রুশ শোষিতের সংগ্রামে ১৯০৮ থেকে ভাটার টান পড়ে। আর এই প্রতিক্রিয়ার যুগে কেবল যে শোষকের খড়্গই প্রচণ্ড আঘাতে শোষিতের উপর পড়তে শুরু করে, তাই নয়। বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা দেয় বিভ্রান্তি। সংগ্রামের পথ পরিত্যাগ করে তারা নিজেদের জীবন দর্শন হিসাবে গ্রহণ করে রহস্যবাদ ও হতাশাবাদকে। অভিজ্ঞতাবাদ, উপলব্ধিবাদ, প্রতীকবাদ নতুন নতুন শব্দের আড়াল দিয়ে তারা বিকৃত করার চেষ্টা করে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে; মার্কসবাদকে। নিজ দেশে থাকা অসম্ভব দেখে লেনিন ১৯০৮ সালে রুশ দেশ থেকে গোপনে চলে আসেন জেনেভায়। কিন্তু দেশ থেকে চলে আসতে বাধ্য হলেও সংগ্রামের দায়িত্ব তিনি পরিত্যাগ করেননি। ভাটার এই যুগে বিপ্লবী সংগঠনের কী কর্তব্য তা নির্ধারণ করে ১৯০৫-এর ঘটনার বিশ্লেষণ করে এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের সঙ্গে ভবিষ্যতের প্রস্তুতি হিসাবে লেনিন মার্কসবাদকে বিকৃত করার বিরুদ্ধেও আপসহীন সংগ্রাম পরিচালনার আবেদন জানান। কারণ বাজারভ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোগদানভ ও লুনাচারস্কি মার্কসবাদের আলোচনার নামে মার্কসবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে বিকৃত করার যে চেষ্টা শুরু করেছে তার পরিণাম বিপ্লবের জন্য মারাত্মক। এ কারণেই 'ম্যাটেরিয়ালিজম অ্যান্ড এমপিরিও ক্রিটিসিজমের' প্রধান লক্ষ্য বাজারভ, বোগদানভ ও লুনাচারস্কি।

লেনিন দর্শনকে কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের যুক্তির বিষয় বলে মনে করেন নি। তাই দর্শনের সংজ্ঞা আর তথাকথিত নিরপেক্ষ আলোচনা তাঁর গ্রন্থে স্থান পায়নি। রুশ বাজারভ আমাদের কাছে অপরিচিত; কিন্তু প্রতি যুগেই জন্ম গ্রহণ করেছে নতুন বাজারভ; সংগ্রামী মানুষের দর্শনের প্রতিরোধী দর্শন; সংগ্রামী মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা। কাজেই লেনিনের 'ম্যাটেরিয়ালিজম অ্যান্ড এমপিরিও ক্রিটিসিজম' গ্রন্থের তাৎপর্য বিশিষ্ট কোন দার্শনিকের দর্শনের বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ নয়।

বিশ্ব জগতে অর্থাৎ বস্তু জগতে একদিন মানুষ ছিল না। বস্তুর জটিল বিকাশে সৃষ্টি হয়েছে মানুষ। আর সেই মানুষেরও জটিল বিকাশের পথে সৃষ্টি হয়েছে তার চেতনা, তার জ্ঞানের রাজ্য, দার্শনিক মতবাদের জগৎ। সে জগতের ইতিহাসের বিশ্লেষণ আবশ্যক। বিশ্লেষণ আবশ্যক আজকের যুগের সংগ্রামী জনতার পক্ষ থেকে; শোষণহীন সমাজ তৈরির স্বার্থে। দর্শনের ইতিহাসের মার্কসবাদী বিশ্লেষণের সাহায্যে লেনিন দেখিয়েছেন, প্রভু শ্রেণী শোষিতের কাছে বস্তুকে, দর্শনকে যখন মায়া বলে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে তখন সে চেষ্টা করেছে সেই বিশ্ব জগৎ সম্পর্কে মানুষের জানার ক্ষমতা সম্পর্কে সংশয় তুলতে। এই কারণেই আঠারো শতকে ইংল্যান্ডের ধর্মযাজক বার্কলী বললেন : বস্তুকে মানুষ আদৌ জানতে পারে না। কারণ মানুষ জানে মনের সাহায্যে, আর মন শুধু মনের ভাবকে জানে। মন বস্তুকে জানতে পারে না। বস্তু মনের একটা ভাব মাত্র। মন-নিরপেক্ষ বস্তু আছে একথা মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এ যুক্তির পথ ধরে বিকাশলাভ করেছে হিউম ও কান্টের অজ্ঞেয়বাদ। এ দর্শনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। এর প্রচারকগণও এ উদ্দেশ্যকে আড়াল করে রাখার চেষ্টা করেন নি। ধর্মযাজক বার্কলী বলেছেন, বস্তুবাদ স্বীকৃত হলে বিধাতা বিলীন হয়ে যাবে; বিজ্ঞান জয়লাভ করবে। অথচ বিশ শতকে সংগ্রামী জনতার পক্ষে আছেন বলে মনে করেন যে বুদ্ধিজীবী বাজারভ ও লুনাচারস্কি তাঁরাও বলছেন, মানুষ নিজের 'অভিজ্ঞতাবাদে' আর কিছু জানতে পারে না। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার নাকি বস্তুর অস্তিত্বকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। লেনিন বিশ্লেষণ করে দেখালেন, এই নব অভিজ্ঞতাবাদ ও পুরানো ভাববাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আর সংগ্রামী মানুষের এই তথাকথিত 'বন্ধুদের' দর্শনের চুলচেরা বিশ্লেষণ ও খণ্ডনকালে লেনিন আপন মন্তব্য ও ব্যাখ্যা দিয়ে মার্কসবাদকে নতুনভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। মার্কসবাদের জ্ঞানবাদকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈজ্ঞানিকভাবে উপস্থিত করেছেন। মানুষের জ্ঞান যে দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়াতেই অগ্রসর হয়, কার্যের মাধ্যমে জ্ঞান এবং জ্ঞানের মাধ্যমে কর্ম– মার্কসবাদের এ তত্ত্বকে লেনিন পুনরায় জোরের সঙ্গে তাঁর এই গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন।

সমাজের পুঁজিবাদী যুগের সবচেয়ে শোষিত এবং সবচেয়ে অগ্রসর বিপ্লবী শ্রেণী হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী। শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবের প্রয়োজনে এবং তার এক সংকটকালে লেনিন লিখেছেন তার 'ম্যাটেরিয়ালিজম অ্যান্ড এমপিরিও ক্রিটিসিজম'। সেই বিপ্লবের পটভূমির সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে সাধারণ পুস্তকের ন্যায় এ গ্রন্থ পাঠ করা সম্ভব নয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পটভূমিতে এ গ্রন্থের অপরিসীম তাৎপর্য।

লেনিনের এ গ্রন্থ ভাবধারার ক্ষেত্রে তাঁর আপসহীনতারও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। লুনাচারস্কি, বোগদানভ, বাজারভ পুঁজিবাদের লোক ছিলেন না। তারাও নিজেদের মার্কসবাদী বলে পরিচয় দিতেন। আর এ কারণে ম্যাক্সিম গোর্কী এবং আরো কিছু বলশেভিক নেতা লেনিনকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন যেন তিনি দর্শনের ক্ষেত্রে বোগদানভ ও বাজারভদের আক্রমণ করে তাদের রুষ্ট না করেন। কিন্তু আদর্শের ক্ষেত্রে লেনিন ছিলেন নির্মম। বাজারভদের সঙ্গে আপসের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে লেনিন গোর্কীকে বলেছিলেন : "আপনি নিশ্চয়ই একদিন স্বীকার করবেন যে, আদর্শের ক্ষেত্রে কোন মতকে যদি দলের কর্মী স্বপ্রত্যয়ে ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর বলে জানে তবে সে ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর মতের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম করাই তার অনিবার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়; তার সঙ্গে আপস করা নয়।"

'ম্যাটেরিয়ালিজম অ্যান্ড এমপিরিও ক্রিটিসিজম' সংগ্রামী বস্তুবাদের ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক সংযোজন। এ গ্রন্থের প্রধান তাৎপর্য ছিল বিপ্লবী আন্দোলনের সংকটকালে মার্কসবাদকে শ্রমিক শ্রেণীর সাফল্যের অমোঘ অস্ত্র হিসাবে প্রমাণিত করার দক্ষতায়। দর্শনের এই সংগ্রামী ব্যাখ্যায় দর্শনের বুর্জোয়া অধ্যাপকের দল সেদিন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাদেরকেই একটি বিশ্বকোষের ভাষায় : "Lenin wrote Materialism and Empirio Criticism attacking Alexander Alexandrovich, Bogdanov and other Bolsheviks who, in his view, were departing from philosophical materialism. In the book he set forth his belief in the inter-relation between philosophy and political practice so categorically that professional philosophers were horrified..."

(Encylopaedia Americana)

লেনিনের 'ম্যাটেরিয়ালিজম অ্যান্ড এমপিরিও ক্রিটিসিজম' গ্রন্থের উল্লিখিত প্রসঙ্গটির পরিশেষে এ কথা বলা যায়, 'ম্যাটেরিয়ালিজম অ্যান্ড এমপিরিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রিটিসিজম' সমাজ, জীবন ও জগতের ব্যাখ্যায় প্রত্যেক দেশের সংগ্রামী জনতা ও বুদ্ধিজীবীর হাতে এক অমূল্য অস্ত্র বিশেষ।

মার্কসবাদের কোন গ্রন্থই ঘটনা, সমস্যা ও কাল নিরপেক্ষ নয়। 'ম্যাটেরিয়ালিজম অ্যান্ড এমপিরিও ক্রিটিজিসম' ও সংগ্রামী শ্রমিক শ্রেণীর সমস্যা নিরপেক্ষ নয়। কিন্তু তবু বিশেষ দেশ, ঘটনা ও কালের মধ্যেও এ গ্রন্থ সীমাবদ্ধ নয়। সমাজের বিকাশ সূত্রের পরিচয়ে, জীবন ও জগতের ব্যাখ্যায় আমরা যেখানে আজো মধ্যযুগীয় রহস্যবাদের অন্ধকারে সেখানে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের নিকট 'ম্যাটোরিয়ালিজম অ্যান্ড এমপিরিও ক্রিটিসিজমে'র গুরুত্ব এবং এর পঠন-পাঠনের প্রয়োজনীয়তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১৯৭০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দর্শনের দর্শন

[একটি ব্যক্তিগত কৈফিয়ৎ]

"A philosopher is a blind man searching for a black cat in a dark room *which is not there.*"

মাথার উপরের এ গল্প ইংরেজিতে না বলে বাংলায় বলতে কোন অসুবিধে ছিল না। কেবলমাত্র আশঙ্কা, পাছে না এর অধিক প্রচার ঘটে। কারণ আমি নিজে দার্শনিক না হলেও পাঠ্য বিষয় হিসাবে আমি একদিন দর্শন গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু যেদিন ক্লাসে ভর্তি হয়ে দর্শনে অনার্স নিয়েছিলাম সেদিন যদি জানতাম জীবনভর তার এত কৈফিয়ৎ দিতে হবে তাহলে আর যে কোন বিষয়ই নিতাম না কেন, দর্শনকে আমি বাছাই করতাম না।

আসলে আমার মুরুব্বীরা আমার বিদ্যার বিষয় ঠিকই নির্বাচন করেছিলেন। তখন ইংরেজ ও ইংরেজির দোর্দণ্ড প্রভাব। সেই ১৯৪২ সালের কথা বলছি। এই ঢাকা শহরেও। আজকের ঢাকা নয়। '৪২ সালের ঢাকাতে সেদিনও রমনার গাছের ছায়ায় ঢাকা রাস্তায় ছাত্রদের বেরুতে দেখেছি। আর সে মিছিলের উপর অস্তহীন সূর্য-সাম্রাজ্যের তল্পীবাহক বাহিনীর বাঁশের লাঠি ভাঙ্গার ফটাফট আওয়াজ শুনেছি; সবুজ কি তেরঙ্গা ঝাণ্ডাকে ওদের বেয়নেটে বিদ্ধ হতে দেখেছি। সেদিন তাই ইংরেজদের উপর সমীহটা স্বাভাবিক ছিল। সমীহ্ থেকেই শ্রদ্ধা। হয়ত সে কারণে আমরা মুরুব্বী আমার জন্য বাছাই করেছিলেন ইংরেজি সাহিত্য। কিন্তু ইংরেজিতে ভর্তি হলেও আমি ইউনিভার্সিটির করিডোরে দর্শনের ক্লাসের পাশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনতাম হরিদাস ভট্টাচার্যের। অত্যদ্ভুত এক দরাজগলা। বাংলা-ইংরেজিতে খই ফুটিয়ে ছাত্রদের বলছেন : সত্য কী? যা আমরা রোজ দেখছি, তাই কি সত্য? সত্য কথাটারই বা সংজ্ঞা কী? যে বুদ্বুদ মুহূর্ত না যেতেই মিলিয়ে যায় তাকে আমরা অধিকতর স্থায়ী কোন বস্তুর সঙ্গে তুলনা করে বলি ক্ষণস্থায়ী। যে ক্ষণস্থায়ী তাকে আমরা ক্ষণকালের মূল্য দিই। অনন্তকালের মূল্যের মর্যাদায় তাকে ভূষিত করিনে। তাই যে অনিত্য সে অসত্য। সত্য কেবলমাত্র সেই যার স্থিতি নিত্যকালব্যাপী। এই সত্যের সংজ্ঞা আমায় সেদিন হাতছানি দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেকেছিল। আমি আত্মস্বার্থ বিস্মৃত হয়ে সেদিন সত্যের সেই হাতছানিতে দর্শনের ক্লাসে যেয়ে ভর্তি হয়েছিলাম। অবিভক্ত ভারতের প্রখ্যাত দার্শনিক, বাগ্মী হরিদাস ভট্টাচার্যের কাছে সেদিন সম্বর্ধনাটি তেমন সোৎসাহ হয়নি। তিনি বলেছিলেন : কি হে, দর্শন কেন নিয়েছ? শেষ পর্যন্ত টিকবে তো? এও এক চ্যালেঞ্জ বিশেষ। জীবনের কাছ থেকে এ চ্যালেঞ্জের শেষ আজো হয়নি। টিকে থাকার চ্যালেঞ্জ। সত্য যাকে বলে তাকে অন্বেষণ করার চ্যালেঞ্জ।

অপর কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে এই ঝঞ্ঝাট নেই। বাংলাতে এম. এ. পাস করলে কেউ বলে না, তুমি বাংলা কেন নিয়েছ? ইংরেজি তো সাহেবদের বিষয়। অর্থনীতি, সমাজতন্ত্র, রাজনীতি কিংবা ব্যবসায়নীতি বাছাই করার তাৎপর্য এতই স্পষ্ট এবং সম্মানীয় যে, এদের কোন বিষয়ের পাঠই কারু মনে প্রশ্ন মাত্রের উদ্রেক করে না। কিন্তু দর্শন নিলেই প্রশ্ন হবে : কেন তুমি দর্শন নিয়েছ? তুমি দার্শনিক! কথাটার মধ্যে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের টোন এতবেশী যে, প্রশ্নাহতের পক্ষে নিজ পায়ে অবিচল থাকা সুকঠিন ব্যাপার।

আত্মস্বার্থের কথা বলছিলাম। আত্মস্বার্থ কতখানি বিপন্ন তা বাস্তব জগতের আদান প্রদান, লাভালোভের ক্ষেত্রে ক্রমাধিক পরিমাণে উপলব্ধি করছি। পারিবারিক এবং সামাজিক জীব হিসাবে জীবিকা উপার্জন তো করতে হবে। সে জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে যোগ্যতার প্রশ্ন প্রথম। লেখাপড়া কী শিখেছেন তার একটা জবাব যদি বা দিতে পারি, দর্শন পড়ার কথা প্রকাশ পেলে সে যোগ্যতাও অযোগ্যতার নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। আগে শুনতাম কবিতা লিখলে ভাত মেলে না। কবিতা লেখা বা কবিতাকে পছন্দ করলে পারিবারিক এবং সামাজিক মুরুব্বীদের নিকট কবিদের বিদ্রূপের পাত্র হতে হোত। কিন্তু কবিদের আজ দিন ফিরেছে বলে মনে হচ্ছে। একাডেমী পুরস্কার থেকে আদমজী, দাউদ, পারিতোষিক প্রতিষ্ঠানের যত্নের প্রথম লক্ষ্য কবিকুল। সেই পারিতোষিকের আর্কষণে কিনা জানি না জরিপ নিলে হয়ত দেখা যাবে কবিকুলের সংখ্যা বৎসর থেকে বৎসরান্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি নিজেও কবিতার একজন ভক্ত। আধুনিক কবিদের সঙ্গে বোধের ক্ষেত্রে আমার সঙ্গে ব্যবধান দুর্বোধ্যতার কারণে যত বৃদ্ধি পাচ্ছে কবিতার রহস্যময় হাতছানি আমার জন্য তত বাড়ছে। জীবনে কবিতার প্রয়োজনীয়তাকে আমি অস্বীকার করতে পারিনে। দর্শনগুরু প্লেটো অবশ্য কবিকে ভাবোন্মাদ বলে ঘোষণা করে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অনুপযুক্ত বিবেচনা করেছেন। কিন্তু দর্শনের ছাত্র হলেও গুরুর সে কথাকে আমি স্বীকার করতে পারিনে। আমাদের সমাজপতিরা কবিদের আদর করেন কী কারণে তা আমি জ্ঞাত নই। এঁরা কেউ যে কবিতা পড়েন বা বুঝেন এমন দাবি তাদের পক্ষ থেকেও কেউ করেছেন বলে আমরা জানা নেই। হয়ত এ কারণে তাঁরা কবিদের আদর করেন যে, তাদের আদর যত্ন না করলে কবিরা তাদের দুর্বোধ্যতা বাদ দিয়ে সহজ করে তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে ছড়া কাব্য শুরু করে দিতে পারেন এবং সে ছড়া জনসাধারণের সম্মিলিত আওয়াজে পরিণত হতে পারে।

প্লেটো তাঁর কল্পনার আদর্শ রাষ্ট্রের দায়িত্বভার দার্শনিকদের দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, একমাত্র দার্শনিকরাই রাষ্ট্র-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে, অপর কেউ নয়। কারণ দার্শনিকদের থাকবে যুক্তি এবং পরিমিতিবোধ। তিনি অবশ্য তার দার্শনিকদের কাছে আরো অনেক কঠিনগুণের দাবি করেছিলেন। আর তাই তার কল্পনার রাষ্ট্র কোনদিন বাস্তব রূপ লাভ করে নি। শোনা যায় একটা দ্বীপকে তার কল্পনার রিপাবলিকে পরিণত করার চেষ্টা করায় দ্বীপের সমাজপতিগণ নিজেদের বিপন্ন বোধ করে প্লেটোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আয়োজন করলে প্লেটোকে জীবন রক্ষার প্রয়োজনে দ্বীপ ত্যাগ করতে হয়েছিল। অর্থাৎ প্লেটো তাঁর কল্পনাকে বাস্তব করার পরিকল্পনায় ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তবু মানুষের চিন্তার ইতিহাসে তাঁর ব্যর্থতার চেয়ে তাঁর কল্পনাই অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। কারণ মানুষ যেমন স্বপ্নকে বাস্তব করতে চায় তেমনি কেবলমাত্র বাস্তবেই তাঁর বাঁচা সীমাবদ্ধ নয়। স্বপ্নের টানেই তাঁর গতি। জীবনে সে স্বপ্ন দেখে। যা বাস্তবে নাই, তাই সে বাস্তবায়িত করতে চায়। কিন্তু যা চায় তাই যদি চাওয়া মাত্র তার হয়ে যেত তাহলে চাওয়া এবং পাওয়ার সব ব্যবধান বিলুপ্ত হয়ে যেত, চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকত না। তেমন অবস্থায় চাওয়াটাই তাৎপর্যহীন এবং অসম্ভব হয়ে পড়ত।

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, যা নিয়ে এত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সেই 'দর্শন' বস্তুটা কী? তারই কোন কিনারা আমি করতে পারিনি। তবু একে পরিত্যাগ করতেও পারিনে। হরিদাস ভট্টাচার্যের বাগ্মীতায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যায় দর্শন যে কিছু বুঝেছিলাম এমন বলতে পারব না। এমন অবস্থায় আজকালকার ছাত্র হলে তাকে মূর্খ বলে অপমানিত করে তার দর্শনের বিভাগ পরিত্যাগ করে আসতাম। তাঁকে জ্ঞানহীন বলার বালসুলভ ইচ্ছা যে সেদিন আমার আদৌ জাগেনি তাও বলতে পারিনে। হয়ত সে মনের ইচ্ছা মুখের ছায়ায় ধরতে পেরে দর্শনের কঠিন তত্ত্ব বুঝতে বুঝাতে তিনিই গভীর আবেগের সঙ্গে বলেছেন : আরে, আমিও কি বুঝতে পারছি সব সমস্যা? তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করে আমিও বুঝতে চাচ্ছি এ সমস্যাকে। এমন উক্তি কেবল যে সেই মহাপণ্ডিতের জ্ঞানের গভীরতার জন্য আমাদের মনে অপার শ্রদ্ধার সঞ্চার করেছে, তাই নয়। জ্ঞানের চর্চায় আমাদের মনকেও অধিকতর একনিষ্ঠ হতে সাহায্য করেছে।

যে গল্প শিরে ধারণ করে কৈফিয়তের শুরু করেছি তার কথা বলা যাক। বিড়ালশূন্য অন্ধকার ঘরে কালো বিড়ালের অন্বেষণ করছেন দার্শনিক। কথাটায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিহাস আছে। কিন্তু অন্বেষণকে পরিহাস করা সহজ নয়। কারণ অন্বেষণই জীবন। অন্বেষণ না করলে সত্য-মিথ্যার ভেদাভেদ আমরা কিছুই বুঝতে পারিনে। অন্বেষণ জীবনের মৌলিক চরিত্র। দর্শনেরও মৌলিক চরিত্র অন্বেষণ করা, প্রশ্ন তোলা। তাই দর্শনকে ব্যঙ্গ করা মানে জীবনকে ব্যঙ্গ করা। কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না। ব্যঙ্গের মধ্যেও তো প্রশ্ন এবং প্রশ্নের মধ্যেও দর্শন। তাই দর্শনহীন মানুষ এবং জীবনহীন জীব দুইই অসম্ভব। কথাটা অমোঘ করে বলেছিলেন ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসি দার্শনিক দেকার্ত। মধ্যযুগের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের গায়ে সন্দেহের সুঁচ দিয়ে তিনিই আঘাত হানতে শুরু করেছিলেন। সেই রন্ধ্রপথেই বিজ্ঞান অনুপ্রবেশ করে একদিন মধ্যযুগের দুঃস্বপ্ন থেকে ইউরোপকে মুক্ত করেছিল। এতদিন তর্ক চলত একটি সুঁচের মাথায় কত হাজার দেবদূত নৃত্য করতে পারেন। প্রশ্নটার সমাধান সহজ ছিল না। দেকার্ত একেবারে নতুন সুরে কথা বললেন। সংশয় ব্যতীত সত্যের প্রতিষ্ঠা নেই। সন্দেহ বাদে কোন সত্যকেই আমি গ্রহণ করব না। আর মান্য করব কেবলমাত্র তাকে যাকে সন্দেহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আর এই সংশয়ের সড়কে তিনি পৌঁছেছিলেন তার 'কজিটো আরগো সাম'-এ : আমি চিন্তা করছি, সন্দেহ করছি। কাজেই আমি আছি। আমার অস্তিত্বের চেয়ে সংশয়াতীত আর কিছু হতে পারে না।

যার কাছে যা ঋণ আছে তার স্বীকার করা ভালো। দর্শনের কাছে আমারও কিছু ঋণ স্বীকারের দায় আছে। না হলে জাগতিক জীবনে এর সোহবতের সিদ্ধান্তে আফসোসর শেষ থাকত না। দর্শন আদৌ কোন বিষয় নয়। এ ধর্মীয় বিশ্বাস নয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নয়। এ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ নয়। তবু এ আমাকে কিছু বোধ দিয়েছে। কিছু দৃষ্টি দিয়েছে। হাতির চেয়ে মানুষ অনেক ছোট। সেই মানুষের মধ্যে আমি অনেক ছোট : আকারে, বিকারে, বিকাশে, চিত্তে সর্বপ্রকারে। রোজ তাই মার খাচ্ছি : সবার কাছে, প্রকৃতির কাছে, প্রভুর কাছে, প্রয়োজনের কাছে।

তবু সেই ক্ষুদ্র মানুষ বাঁচার চেষ্টা করছি, বাঁচছি। সে বাঁচার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে আনন্দবোধ করছি। একদিকে যখন দেখি সায়গনের রাস্তায় মার্কিন সৈন্য স্বদেশপ্রেমিক কিশোরকে দাঁড় করিয়ে তার মাথা লক্ষ্য করে রিভলবারের বুলেট ছুঁড়ছে তখন প্রাণটা রিরি করে ওঠে, ঘৃণায়, লজ্জায়। তখন মানুষ হিসাবে পরাজয়ের গ্লানিতে মরে যেতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সেই মুহূর্তে রিভলবারের সামনে কিশোরটির অকুতোভয় চোখের দিকে তাকিয়ে মনুষ্যত্বের মর্যাদাবোধে ক্ষুদ্র মানুষ আমারও গর্বে বুক ভরে ওঠে। মনে হয়, মানুষের জীবনে ধিক্কারই সব নয়। সেখানে গৌরবেরও স্থান আছে। যখন দেখি মার্কিন দেশের নভোচারী মহাশূন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাড়ি দিয়ে চাঁদের বুকের খবর এনে মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে তখন মনে করি নিশ্চয়ই ভিয়েতনামের মার্কিন সৈন্যের বর্বরতা মার্কিন নভোচারীর লজ্জা অসহ্য করে পৃথিবীর বুকে এ অসঙ্গতির দিনকে মুছে ফেলতে সাহায্য করবে। এ বোধটুকুর জন্য আমি দর্শনের কাছে ঋণী।

কথা হতে পারে, এ বোধ কেবল দর্শন পাঠকেরই থাকবে, এমন কী কথা আছে? এ প্রশ্ন যথার্থ। বস্তুতঃ এ বোধ কেবলমাত্র দর্শন পাঠকেরই যে থাকবে *এমন কোন* কথা নেই। এবং তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে যে, এমন বোধ দর্শন পাঠক বা দার্শনিকের আদৌ যে থাকবে এমনও কোন নিশ্চয়তা নেই। মানুষ মাত্রের মধ্যেই মানবতাবোধের নিশ্চয়তা কোথায়? তাহলে তো আর মানব সমাজে কোন অসঙ্গতিরই সৃষ্টি হতে পারত না। আসল কথা হচ্ছে দর্শন মানে কোন বিশেষ বোধ নয়। যাকে আমি মানবতাবোধ বলেছি সেও এক দর্শন; আবার যাকে আমি মানবতাবিরোধী-বোধ বলেছি সেও এক দর্শন। দর্শন মানে দৃষ্টি : জীবন ও জগৎকে দেখার দৃষ্টি; তাকে অনুভব করার দৃষ্টি। এদিক থেকে সাধারণ-অসাধারণ জ্ঞানী-অজ্ঞানী এমন কোন ব্যক্তি নাই যার কোন দর্শন নাই। এমন শ্রেণী নাই যার কোন দর্শন নাই। এমন কোন রাষ্ট্রীয় যন্ত্র নাই যার কোন দর্শন নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে এ দর্শন সচেতনতার বাইরে থাকতে পারে। দৈনন্দিন জীবনে যখন আমরা বলি : আল্লা হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান তৈরি করেননি : সব মানুষও তাই সমান নয়, তখন সচেতন কিংবা অচেতনভাবে জীবন ও জগতের ন্যায়-অন্যায় সাম্য-অসাম্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ অভিমতেরই প্রকাশ করি। আর অভিমতই দর্শন। দর্শন চর্চার দিক থেকে বলা যায়, এখানেই দর্শনের শুরু। তাই চেতনশীল মানুষের আদিকালে যে যখন তার চারিদিকে অজ্ঞাত-অজানিত প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জকে প্রত্যক্ষ করেছিল তখন জীবন রক্ষার আদিম প্রয়োজনেই সে প্রশ্ন করেছিল : এটা কী? ওটা কী? নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই যেমন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তৈরী করেছিল তেমনি জীবন পরিক্রমায় অভিজ্ঞতার ধাপে ধাপে সে পুরাতন জবাবের জায়গায় নতুন জবাব আবিষ্কার করেছে। সেই নতুন জবাবের ভিত্তিতে নতুনতর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আবার নতুনতর জবাবে সে উত্তীর্ণ হয়েছে। এ কারণেই দার্শনিক কৌতূহল বা দর্শনের আগ্রহ থেকেই জ্ঞান পরিক্রমার শুরু। এ দিক থেকেই দর্শনকে বলা চলে জ্ঞানের ভিত্তিভূমি। দর্শন থেকেই বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে। আবার বিজ্ঞানের বিকাশেও ঘটেছে যুগে যুগে দার্শনিক তত্ত্বসমূহের উদ্ভব ও রূপান্তর।

মোট কথা, সবটাই একটা পরস্পর সংযুক্ত পরিক্রমার ব্যাপার। এর কোনটা থেকে কোনটা আলাদা নয়। আবার আলাদা যে নয় এ উপলব্ধি দর্শনালোচনায় যতটা মেলে অপর কোন আলোচনায় ততটা নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশ্য এ কথা সুনিশ্চিত যে, দর্শন পাঠের এই খতিয়ান আমার জাগতিক উপকারে তেমন আসবে না। দর্শনের কাছে আমার ঋণ স্বীকারের দর্শন আমার আর্থিক কোন ঋণ বা দায় সমাধা করবে না। তবু এ কথা ভেবে আশঙ্কা হয় যে, সাম্প্রতিক সমাজজীবনে দর্শনকে নাকচ করার যে দর্শন জোরের সাথে চলছে তার লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের সাধারণ ব্যক্তির মনে ব্যাপকভাবে এক অসহায় ভাব ও শূন্যতা সৃষ্টি করা। জাগতিক ঋণ শোধের বাইরে বিবেকের অপর কোন ঋণ শোধকে যারা মূল্য দেন তাদের এ দিকটা নিয়ে চিন্তা করার একটা কর্তব্য আছে মনে করেই আমার বর্তমান কৈফিয়তটি আমি পেশ করলাম। এ দিকটিতে আরো আলোকপাত হবে, এই আমার আশা।

১৯৬৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বায়ান্নরও আগে

বায়ান্ন সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির অমর শহীদদের স্মরণে রচিত হয়েছে শহীদ মিনার। মাটি থেকে অসংখ্য সিঁড়ির ধাপ। সেই ধাপের পরে বিস্তীর্ণ চত্বর। চত্বরের পেছনে সারিবদ্ধ দণ্ড। একদিন এখানে সিঁড়ির ধাপ ছিল না। চত্বর ছিল না। মিনার ছিল না। মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের ছাউনির পাশে একটুখানি খালি জমি। সে জমি আমাদের দেশের কিশোর সালাম বরকতের রক্তে ভিজে লাল হয়েছিল। সে রক্ত নয় বীজ। সে বীজ থেকে শুধু মিনার হয়নি। সে বীজ থেকে একটা জাতি জন্মলাভ করেছে। অমৃতের কথা আমরা শুনেছি। রূপকথায়। পুরাণের কাহিনীতে। অমৃত আহরণের জন্য একদিন দেবতারা সপ্তসিন্ধু মন্থন করেছিল। অমৃত সুধা পান করে দেবতারা অমর হয়েছিল। আমরা তো কেউ দেবতা নই। আমরা সাধারণ মানুষ। বর্বর দস্যু যখন আমাদের মারে তখন আমরা অসহায় হয়ে কাঁদি। ওরা যখন আমাদের মুখ বেঁধে দেয় তখন আমরা বোবা হয়ে যাই। আমরা গুমরে মরি। ওদের মারে আমরা মরে যাচ্ছিলাম। আমরা কে তা আমরা জানতাম না। আমাদের গর্ব করার কী আছে তা আমরা জানতাম না। আমাদের বোবা মনে সেদিন একটাই আর্তনাদ ছিল : কোথায় অমৃত? কোথায় অমৃত-সন্তান যারা আমাদের মুমূর্ষু জীবনে নূতন প্রাণ জাগাবে। যারা আমাদের মুখে ভাষা জোগাবে।

আমরা দেবতা নই। কিন্তু আজ আমরা বলতে পারি আমরা বরকত সালামের মা, বাবা, ভাই, বোন, বন্ধু, দোসর। আমরা বরকত সালামের প্রিয়জন। বরকত সালামকে আমরা ভালোবাসি। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, বরকত সালাম আমাদের ভালোবাসে। ওরা আমাদের ভালোবাসে বলেই ওদের জীবন দিয়ে আমাদের জীবন রক্ষা করেছে। ওরা আমাদের জীবনে অমৃতরসের স্পর্শ দিয়ে গেছে। সে রসে আমরা জনে জনে, প্রতিজনে এবং সমগ্রজনে সিক্ত। আমরা তাই অমরতা পেয়েছি। আজ আমরা বলতে পারি দস্যুকে, বর্বরকে ও দাম্ভিককে : তোমরা আর আমাদের মারতে পারবে না। কেননা বরকত সালাম রক্তের সমুদ্র মন্থন করে আমাদের জীবনে অমৃতের স্পর্শ দিয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহীদ মিনারের পাশ দিয়ে বড় রাস্তা। বাস চলে। হর্ন দেয়। মানুষ চলে। চিৎকার করে। ঢাকা শহরের জীবন বয়ে যায়। মানুষের জীবন বয়ে যায়। আমরা শহীদ মিনারের পাশ দিয়ে আসি যাই। আমরা হাসি। তর্ক করি। দেয়ালের গায়ে ছবি আঁকি। পোস্টার লাগাই। আমরা কেউ ছাত্র। কেউ কেরানি। কেউ দোকানী। কেউ কর্মচারী। শহীদ মিনারের দিকে আমরা সব সময় তাকাই না। বরকত সালামকে আমরা সব সময়ে হাত তুলে সালাম জানাইনে। ওদের জন্য মোনাজাত করিনা। কিন্তু ছাত্র শিক্ষক দোকানী কেরানি কর্মচারী কেউ আমরা কল্পনা করতে পারি না যে, শহীদ মিনারটা ওখানে নেই। কেউ কি কল্পনা করতে পারে যে বরকত সালাম আর তার সাথীরা আমাদের অমর রক্ষী হয়ে ওখান আর পাহারা দিচ্ছে না? না, তা আমরা কেউ ভাবতে পারি না। তেমন হলে যে ভয়ানক শূন্যতার সৃষ্টি হবে, তাতে আমরা কেউ আর আমাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাবো না। কেউ না। আমি না। ছাত্র না। দোকানী না। কর্মচারীও না। বরকত সালাম আমাদের দিনের সূর্য, রাতের তারা। আমাদের আলো। আমাদের বাতাস। আগের দিনের মানুষ সূর্যের বন্দনা গাইত। সকালে উঠে হাত তুলে সূর্যকে স্বীকার করত, নমস্কার জানাত। কেননা তারা জানতো সূর্য বাদে তাদের অস্তিত্ব নেই। আজকের মানুষ আমরা সূর্যকে বন্দনা করি না। কিন্তু তবু সূর্যের অস্তিত্বকে কি আমরা অস্বীকার করতে পারি? সেই আদিকালের মতো আজ এ কথা সত্য যে, সূর্যের তাপেই আমাদের অস্তিত্ব। আর প্রায় বিশ বছর আগের মতো আজো এ কথা সত্য যে, বরকত সালামের জীবন তাপেই আমরা জীবিত।

AMARBOI.COM

কিন্তু বরকত সালামও আকস্মিক নয়। জীবনেই জীবন সৃষ্টি। জগতের কোন কিছুই হঠাৎ নয়। আকস্মিক নয়। বরকত সালাম নিজেরাই সেদিন বলেছিল ওরা হঠাৎ খসা নক্ষত্র নয়। বরকত সালাম মুমূর্ষু দেশের কানে বহু দিন ধরেই আশ্বাস দিয়ে বলছিল : তোমরা ভয় করো না। আমরা আসছি। আমরা আসছি। আমরা আসব। কেউ আমাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। কেননা আমরা আমাদের মায়ের মুখের ভাষা। আমরা আমাদের পিতার মনের আশা। আমরা আমাদের বোনের চোখের স্বপ্ন। আমরা আমাদের জাতির সম্মান। জাতির মর্যাদা। আমাদের অপর নাম জীবন। কোন মৃত্যুই জীবনকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। আমরা আসব।

বায়ান্নর শহীদ মিনারের চত্বরে পৌঁছতে কতটা সিঁড়ি পেরোতে হয় তা আমি আজো গুণিনি। কিন্তু যখনি আমি ঐ সিঁড়ির ধাপ বেয়ে চত্বরে উঠতে চেয়েছি তখনি আমার মনে হয়েছে, এ সিঁড়ি শুধু সিঁড়ি নয়। এ সিঁড়ির ধাপ চত্বরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রস্তুতি। এই প্রস্তুতির মধ্যে রয়েছে বরকত সালামেরই পূর্বাভাস। ওদের আগমনের ধ্বনি।

আজ যারা কিশোর, যারা ছাত্র তাদের কাছে মধুর ক্যান্টিন আর বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা কতো পরিচিত। মধুর ক্যান্টিন শুধু ক্যান্টির নয়। মধুর ক্যান্টিন কতো বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের অগ্রদূত। বটতলা কেবল বৃক্ষমূল নয়। বটতলা কতো ঐতিহাসিক জোটের মঞ্চভূমি। কিন্তু পুরানো বিশ্ববিদ্যালয়ের আমগাছটিকে আজ অনেকে চেনে না। আমরা কিন্তু ঐ আমগাছটিকে চিনতাম। ঐ আমগাছের নিচেই একদিন বরকত সালামদের আগমনী-সড়ক রচিত হয়েছিল।

ঘটনা তারিখ বুঝে ঘটে না। ঘটনাকে আমরা তারিখ দিয়ে স্মরণে রাখি। ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখ নয়, ঘটনা। কিন্তু বায়ান্ন সালের আগের সেই প্রস্তুতি পর্বের ঘটনাকে মনে করতে যেয়ে আজ তার তারিখ খুঁজে পাইনে। কিন্তু ঘটনার যে টুকরো আমার মনের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে তাদের আমি চোখ বুজলেই দেখতে পাই।

একদিনের কথা মনে পড়ে। ১৯৪৮ সালেরই কোন একদিন। আমার নিজের ছাত্রত্ব শেষ হলেও তখনকার আর্টস বিল্ডিং-এর সামনের আমগাছের আকর্ষণ আমি তখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি। আমগাছের তলায় সভা বসবে। কে সভাপতিত্ব করেছিল, আজ আর তা মনে নেই। রাস্তায় ১৪৪ ধারার নিষেধ। কিন্তু সেই নিষেধের বেড়াজাল ভেঙ্গে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' মুখে নিয়ে মেডিকেল কলেজের লোহার রেলিং টপকে, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের মাঠ পেরিয়ে, জগন্নাথ হলে প্রতিষ্ঠিত আইনসভার উল্টো দিকে যে আমরা হাজির হয়েছিলাম সে স্মৃতি কিছুতেই মুছে যেতে চায় না। সেদিন কোন রক্তারক্তি হয়নি। কেমন করে ঘটনার সংকট সেদিনের জন্য কেটে গেছিল, তা মনে নেই। হয়ত বা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের মন-জয়-করা কথা বলার শক্তিতে। কারণ এখনো স্মৃতির পটে সেদিনকার ছাত্র জমায়েতের সামনে সেই বিপুলকায় পুরুষটির হাজির হওয়ার ছবিটি ভাসছে।

আর একদিনের স্মৃতি।

মিছিল বেরিয়েছে। কোনখান থেকে তার শুরু হয়েছে তা আমি জানিনে। আমার চোখে ভাসছে কার্জন হল আর হাই কোর্টের মাঝখানের রাস্তা দিয়ে মিছিল এগুচ্ছে। ছাত্রদেরই মিছিল। আওয়াজ উঠছে অনেক। কিন্তু সব আওয়াজের মূল আওয়াজ হচ্ছে ঃ রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। মিছির এবার হাজী ওসমান গনি রোডে ঢুকে পড়েছে। মিছিলের গতি বেড়ে যাচ্ছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিছিল ইডেন বিল্ডিংস এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আর কিছুক্ষণ পর দেখলাম ছেলেরা কোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক মন্ত্রীকে তার কামরা থেকে নিয়ে এসেছে। মন্ত্রীকে উঠিয়ে দিয়েছে একটা বাক্স কিংবা কিছু উঁচুর উপর। সেখান থেকে উজীর সাহেব বলছেন : বাবারা, তোমরা বিশ্বাস করো, আমি বাংলা ভাষাকে ভালোবাসি। আমি বলছি, বাংলা ভাষা ভালো। পৃথিবীর সব চাইতে ভালো ভাষা, বাংলা ভাষা। উজীরের কথা শুনে হাসব কিংবা কাঁদব তা আমি বুঝতে পারছিলাম না। উজীর সাহেব বলছেন, বাংলা ভাষা পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো ভাষা। আর এঁরাই তাকে আমাদের রাষ্ট্রের প্রত্যেকটা ক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত করার ষড়যন্ত্র করছেন। আমি অবাক হচ্ছিলাম তরুণদের শক্তি দেখে। একটি একটি করে দেখলে এদের তো কোনই শক্তি নেই। কিন্তু হাজার মিলে এরা কী শক্তিরই না সৃষ্টির করেছে। কিন্তু শক্তি কি কেবল সংখ্যাতে? না। তা নয়। শক্তি আদর্শের ন্যায্যতায়।

আর একদিনের স্মৃতি।

সেও নিশ্চয়ই ১৯৪৮ সালের ঘটনা। কায়েদে আজম এসেছেন পূর্ব-পাকিস্তান ভ্রমণে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে এই তাঁর পূর্ব-পাকিস্তানে প্রথম আসা। হাজারে হাজারে নয়। লক্ষের কোঠায় মানুষ যেয়ে হাজির হয়েছে রেসকোর্সের ময়দানে। পশ্চিম প্রান্তে কায়েদে আজমের মঞ্চ করা হয়েছে। পূর্ববঙ্গে তখন মুখর ছাত্র-জনতার আওয়াজ 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। নাজিমুদ্দিন আর নূরুল আমীন সাহেবরা তখন পূর্ববঙ্গের শাসন চালান। লক্ষ জনতা হাজির হয়েছে রেসকোর্সে, কায়েদে আজম পূর্ববঙ্গের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে কী বলেন তাই শুনতে। এমনিতেই দেরি হয়েছে কায়েদে আজমের আসতে। জনতা অস্থির হয়ে উঠেছে। অবশেষে এলেন তিনি। সেই পরিচিত শীর্ণকায় দীর্ঘ মানুষটি। অস্থির জনতাকে শান্ত করার জন্য ধমক দিয়ে বললেন : বৈঠ্ যাও। খামোশ ছে শোন। তাঁর সুরের কঠিনতা আমার কানকেও সেদিন উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। সেই উদ্বেগ শেষ হতে না হতে শুনলাম তিনি বলছেন ইংরেজিতে : আই টেল ইউ, উর্দু অ্যালোন শ্যাল বি দি স্টেট ল্যাংগোয়েজ অব পাকিস্তান। "আমি সোজা বলছি, কেবল উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।" এই অকরুণ আঘাতে জমায়েত লক্ষ মানুষ সেদিন স্তম্ভিত হয়েছিল। ছাত্রদের বেদনা ফেটে পড়েছিল তাদের নিজেদের হলের সাজানো তোড়ন ভেঙ্গে ফেলার মধ্য দিয়ে। আর পড়েছিল পরের দিন কার্জন হলের সমাবর্তনে। সেদিন সেই সমাবর্তনে আমিও শরীক হয়েছিলাম। তার স্মৃতি মনের পটে এমন করে আটকা পড়ে থাকতো না যদি বরকত-সালামের অগ্রদূতরা সেদিন গম্ভীর আর মিলিত কণ্ঠে হঠাৎ তিনটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ না করত। আর শব্দ তিনটি ছিল : নো, নো, নো। না, না, না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বায়ান্নরও আগে

সমাবর্তনে পাস করা ছাত্রদের সার্টিফিকেট বিতরণ হয়ে গেছে। কায়েদে আজম এবার প্রধান অতিথির ভাষণ দেবেন। উপযুক্ত মর্যাদায় কার্জন হলের বিরাট মিলনায়তন শান্ত। কায়দে আজম বক্তৃতা করে চলেছেন। ইংরেজি ভাষাতে। কাটা কাটা তাঁর কথা। অকরুণ কাঠিন্যে আজো তিনি বললেন : 'আই টেল ইউ : উর্দু অ্যালোন শ্যাল বি দি স্টেট ল্যাংগোয়েজ অব পাকিস্তান।' আহত তরুণের দল জাতির বিবেকের বাণী হয়ে এক অপূর্ব ঐক্যতানে বেজে উঠল : 'নো, নো, নো।'

আমার এটুকুই মাত্র মনে আছে। আর সেদিন এটুকুই মাত্র ঘটেছিল। তিনটি মাত্র শব্দ : না, না, না। অন্যায়কে আমরা মানবো না, মানবো না, মানবো না। এমন কথা বরকত-সালামের ভাই– এরাই তো বলতে পারে। আর ঠিক তারাই বলেছিল। আর সেই আওয়াজই প্রতি-মুহূর্তে জমতে জমতে বরকত-সালামদের আসার পথ তৈরি করেছিল। অপরাজেয় ন্যায়ের সড়ক বানিয়েছিল। শহীদ মিনারের সিঁড়ি এমনি করে তৈরি হয়েছিল।

১৯৭০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সতের বছরের একটি তরুণ

গত বছর এই ফাল্গুনে ও ষোল ছিল। এবার ফাল্গুনে ও সতেরতে পা দিল। সতের বছরের একটি তরুণ। কী কান্তিময়, লাল গোলাপের রক্তঝরা রঙে রঙিন! কী সুন্দর। কতো বীর্যবান। কী সাহসী। ওর সাহসের দিকে চাইতে আমাদের প্রাণ কাঁপে। আমরা সাধারণ। আমরা ভীতু। দৈনন্দিনের বেড়াজালে আবদ্ধ। সূর্য কখন উঠে, কখন অস্ত যায়, আমরা তা জানিনে। সূর্যের রং কী, আমরা জানিনে। সতের বছরের তরুণ সতের বছর আগে এসে সূর্যের দিকে আমাদের মুখ ফিরিয়ে দিয়েছিল। সূর্যের আশা দিয়ে আমাদের ভরে তুলেছিল। আশাহীনের চরম হতাশা ও গ্লানিকে মুছে দিয়ে ও আমাদের নতুন জীবন দান করেছিল। তা না হলে মরেই যেতাম, তা না হলে আমরা জানতাম না বর্বরতারও জবাব আছে; দম্ভেরও পরাজয় আছে।

ভাবতে আমাদের অবাক লাগে, ওর বয়স সতের হয়ে যাচ্ছে। এই না সেদিন বায়ান্ন সালে ওর জন্ম হল! সেদিনও শিশু। আমাদের আদরে-আহ্লাদে, শপথে, ভালোবাসায়– দানে-প্রতিদানে আমরা পরস্পর এত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত যে, বছরে বছরে ওর বৃদ্ধি আমদের নজরেই পড়েনি। ও আমাদের এত কাছে যে, ওর অস্তিত্ব বছর ভর যেন আমরা টেরই পাইনে। ওর সত্তাকে চিন্তাই করিনে। আসলে ওর অস্তিত্বেই যে আমাদের অস্তিত্ব সেটাই আমরা ভুলে যাই। যেমন ভুলে যাই আমরা আলো, হাওয়া ও পানিকে।

কিন্তু রক্তপলাশ ফাল্গুনের এই সময়টাতে ওর আগমনীর হাওয়াকে আর আমরা অস্বীকার করতে পারিনে। রক্তের শপথ নিয়ে, রক্ত ঝরাবার দাবি নিয়ে আমাদের সত্তায় নতুন বসন্তের দোলা লাগিয়ে এ দিনটাতে ও আসে। তখন সেই দোলায় আমাদের সবার প্রাণ আবার কেঁপে উঠে। কেঁপে উঠে শঙ্কায়, শিহরণে, সাহসে ও স্বপ্নে। কেঁপে উঠে সবাই। যারা ওকে ভালোবাসে না তাঁরাও কেঁপে উঠে। তাদের আতংকিত করে ও আমাদের মনে ভরসা যোগায়। আমরা সেদিন নিজের মনে গুণ গুণ করে বলে উঠি : আমাদের বাঁচার তাহলে সার্থকতা আছে। এত দুঃখ এত গ্লানির মধ্যে বেঁচে রয়েছি বলেই তো ওকে আর একবার দেখলাম। এর চেয়ে বড় সার্থকতা আর কী আছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বিস্ময় লাগে। ওকে কেউ ভালো না বেসে পারে, এটা আমি ভাবতেই পারিনে। কিন্তু তা হবে না কেন? শুভ শক্তিতেই যদি সব পূর্ণ হত তাহলে আর এত গ্লানির কী কারণ থাকত? কিন্তু যারা ওকে ভালোবাসে না তারা যে ওকে ভয় পায় সেটাই আমাদের দুর্জয় বর্ম, আমাদের রক্ষা-কবচ।

ও কেমন করে এল, তাই ভাবি। কিন্তু ভেবে কূল পাওয়া যায় না। একটি জীবনের অমিত শক্তির বাহন জীবনের আগমন কি এমনিতেই ঘটে! তার জন্য কতো দিন থেকে কতো প্রকারে প্রস্তুতি চলে। আকাশে বাতাসে পথে প্রান্তরে পাথারে তার প্রস্তুতি হয়। প্রস্তুতি হয় জীবনের অপমানে, অপমানের প্রতিশোধের কামনায়, আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে, দাম্ভিকের দম্ভ চূর্ণ করার শপথে। ব্যক্তিগতভাবে আমরা জীবনের সেই আগমনীর আভাস কি বুঝতে পারি? আমরা তা পারিনে। তার কোন কোনটা হয়ত আমাদের চকিত করে। কিন্তু পলে পলে তার শক্তি সঞ্চয়কে আমরা প্রত্যক্ষ করিনে। তাই আমরা অসহায় বোধ করি।

ওর জন্মের প্রায় বছর চারেক আগের কথা। রাজধানীর ঘোড়দৌড়ের মাঠটাতে প্রায় লক্ষ লোকের জমায়েত হয়েছে। দেশের নেতা এসেছেন। তাঁর কাছ থেকে জনতা আশার বাণী শুনবে। শুনবে আশ্বাসের কথা যে, এদেশের মানুষের কত মহৎ স্বপ্ন বিদেশী শাসক শক্তির দম্ভে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পিষে মেরেছে, সেই স্বপ্ন সফল করাই হবে তাঁর জীবনের সাধনা। তাঁর বদলে তারা শুনতে পেল দেশের কর্ণধারের মুখ থেকে ইস্পাতের কাঠিন্যে ভরা হুঁসিয়ারী : আমি সাবধান করে বলতে চাই : বাংলা ভাষার দাবি, শত্রুর দাবি। কেবল উর্দুই হবে এদেশের রাষ্ট্রভাষা।

কে দেবে এই ইস্পাত কাঠিন্যের জবাব! কার এত সাহস! লক্ষ মানুষই যেন বোবা হয়ে গেল, আর তাই কার্জন হলের মঞ্চ থেকে কর্ণধার আবার উচ্চারণ করলেন : আমি বলছি; উর্দু কেবলমাত্র উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা। বিরাট হলঘরে নিস্তব্ধতা। হয়ত রাষ্ট্রনায়কের ইস্পাত কঠিন বাণীই ইস্পাতের প্রাকারে প্রাকারে ঢেউ তুলে প্রতিধ্বনি হয়ে বেজে ওঠে : না, না, না।

শুধুমাত্র তিনটি উচ্চারণ। সমবেত সুধীমণ্ডলী আতঙ্কিত চোখে অন্বেষণ করল সেই উচ্চারণকে। পিছনের কাতারের তরুণদের মধ্য হতেই বেরিয়ে এসেছে ধ্বনি; অকম্পিত তার ব্যঞ্জনা, অদ্ভুত তার ঐক্য। সবার মনে সেই তিনটি উচ্চারণ সেদিন অনাস্বাদিত এক শিহরণের সৃষ্টি করেছিল। সেদিন বুঝিনি। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি সে ছিল আমাদের গর্ব ও গৌরবের আধার, আমাদের আশার প্রতীক আজকের এই অমিত তরুণেরই আগমনের আভাস।

কী দুর্বার আকর্ষণী শক্তি ওর। এই সতের বছরে কতো উত্তরাধিকার ও তৈরি করেছে। সৃষ্টি করেছে কতো সাথীকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী নামে ওকে ডাকবো আমরা? বরকত-সালাম-রফিক? কিংবা আরো অনেক? এবার এসেছে ও আসাদ-হাফিজ-মনির, মজিবর-কামাল-লতিফ, রুস্তম-মজিদ-মুসা-সিদ্দিক-জব্বার কতো জানা-অজানা সাথীদের হাত ধরে। এক দুর্জয় বাহিনী নিয়ে। ওরা জীবন দিয়েছে। এ কথা কেমন করে বলা যায় যে, ওদের মৃত্যু ঘটেছে। যারা মরে যায় তাদের জীবন কি এমনি করে বৃদ্ধি পায়? এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন। সে কি শিশু থেকে কিশোরে পরিণত হয়? ওরা সবাই জীবনের সাথে জীবন মিলিয়ে এক মহাজীবনের সৃষ্টি করেছে। ওরা আমাদের মহাজীবনের স্বাদ দিয়েছে। ওদের মৃত্যু ঘটেনি এবং কোনদিন মৃত্যু ঘটতে পারে না।

একুশে ফেব্রুয়ারির শহীদ মিনার ওদের জীবনের প্রতীক হয়েছে। কিন্তু শহীদ মিনারের স্তম্ভে ওদের প্রতিকৃতি পাইনে। একুশে ফেব্রুয়ারি জাতির জীবনে কেবলমাত্র একটি তারিখ নয়। একুশে ফেব্রুয়ারি দুর্জন জীবনময় এক তরুণ, যে এবার ফালগুনে সতেরতে পা দিল। আনন্দের আর গর্বের অশ্রু দিয়ে সমগ্র জাতি আজ ওকে স্বাগত জানায়।

১৯৬৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঊনসত্তরের স্মৃতি

আমরা জানতাম না ঊনসত্তর আসছে। আমরা আটষট্টি সালের মানুষেরা। কেউ জানত না। আমাদের অফিসের বড় সাহেব জানত না। সেই সাহেবের বড় সাহেবও জানতো না। সেই বড় সাহেবের যে বড় সাহেব সেও জানতো না। কেননা সে ভাবতো জীবনের গতি তার ফরমানে তার পোষা কুকুরের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে গেছে। আমরা তার হুকুমে স্বপ্ন দেখতাম, দুঃস্বপ্নে কেঁপে উঠতাম। তার হুকুমে হেঁ হেঁ করে হাসতাম। তার ছোট সাহেবের হুকুমে দরবারে হাজির হতাম। আচ্ছালামু আলায়কুম স্তব্ধ করার জন্য দৌড়রাতাম। আমরা সরকারি আধাসরকারি, অফিসের সাহেবেরা, বড় বাবুরা, বড় সাহেবের গোমস্তা পেয়াদারা। আমরা অধ্যাপকরা, প্রফেসাররা, ডক্টর অব সায়েন্স, ফিলোসফি এবং লিটারেচাররা। আমরা কবিরা, সাহিত্যিকেরা, গবেষকরা।

আমরা সবাই মিলে মহাপ্রভুর জয়গানে সমগ্র আটষট্টিটাই কাঁপিয়ে তুলেছিলাম– মহা সুখের, মহা উন্নতির, মহা বিপ্লবের, মহাদশকের মহা ঢাক বাজাচ্ছিলাম। আমাদের অফিসের সাহেবের ও বড় সাহেবের ছবির সাইজ ঠিক করছিলাম : কে আঠারো ইঞ্চিতে যাবে আর কে সাড়ে ষোলতে তা স্কেল ধরে তৈরি করছিলাম। এই স্তব গাইতে গাইতে ভাবছিলাম আটষট্টি আর কোনদিনও শেষ হবে না। আমাদের ব্যক্তির জীবনে, জাতির জীবনে আর কিছু নাই। সবকিছু আটান্ন থেকে আটষট্টিতে আটকা পড়ে গেছে।

এমন সময়ে ঊনসত্তরের সাড়া এল। এল আটষট্টির নভেম্বরের শেষে, ডিসেম্বরের প্রথমে আর শেষে ঊনসত্তর এসেই গেল। কেউ রুখতে পারল না। আমার অফিসের সাহেবের বড় সাহেব হুকুম দিলেন : খবরদার ঊনসত্তর, আর এক পাও এগুবি না। কিন্তু অকম্পিত পায়ে ঊনসত্তর এল। বড় সাহেবের বড় সাহেবকে দূরবার্তায় দুর্দিনের খবর পাঠানো হল। বড় সাহেবের বড় সাহেব ছোট সাহেবকে বললেন : আর কিছু না পারো হেলিকপ্টার একটা তৈরি রাখো।

তারপর ঊনসত্তরের আগমনী। জীবনের সে কী বন্যা! বন্যার দেশ পূর্ব-বাংলা। রুদ্ধ নদীর বুকে পানির সয়লাব আমরা দেখেছি। ও যখন আসে তখন সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তার চেয়েও বড় বড় হয়ে এল উনসত্তরের বন্যা। সে রক্তের ঢেউ তুলল। রাস্তাকে লাল করল। শোকের পতাকায় দিনের আকাশ কালো করল। সংগ্রামের মশালে রাতের আকাশ গনগন করে তুলল। আমরা সাধারণ মানুষেরা, সরকারি আধা সরকারি অফিসের কেরানি কর্মচারীরা, শিক্ষার ব্যবসায়ী অধ্যাপকেরা, ছাপোষা মধ্যবিত্তরা জীবনের সে বন্যায় এক দিকে ভয় পেলাম আর এক দিকে মুক্ত স্বর্গের ভরসাতে নিজের মনে নতুন আশার স্বপ্ন দেখলাম। আমাদের আসাদ- মতিয়ুররা (ওদের সংখ্যা কতো কেউ কি তা নিরূপণ করতে পারে?) ঘরের বাঁধন মানল না; আমাদের বকুনি শুনল না। ওরা সংগ্রামে গেল; ঝাঁকে ঝাঁকে শহীদ হল। আহা! আমাদের কতো ভাগ্য যে, ওরা আমাদের কথা শোনে নি। ঘরের বাঁধ ওরা মানে নি। ওরা দিনে-রাতে ডাক দিত : সংগ্রাম! সংগ্রাম! সে ডাকে আমাদের বুকের রক্ত কেঁপে উঠত। ওরা ডাক দিত হরতালের, মিছিলের। আমরা ভয় পেতাম। এড়িয়ে চলতে চাইতাম। আর অবাক হয়ে মুহূর্ত বাদে দেখতাম এড়িয়ে চলার উপায় নেই। আমাদের ডানে বাঁয়ে সড়কে গলিতে মিছিলের বন্যা। তার পরে কখন যে ওরা আমাদের মন থেকে ভয়টুকুও ওদের জীবনের স্পর্শে মুছে দিয়েছিল তা আমরা কেউ জানিনি। ওরা সবকিছুকে যেন বদলে দিল। ওদের ডাককে এড়াবার আর পথ কেউ পেলাম না।

ওরা, আমাদের সন্তানরা, মা-বাবার বকুনি-খাওয়া ছেলেরা আর মেয়েরা, ব্যক্তিগতভাবে যাদের অনেককে মনে করেছি বখাটে কিংবা বেয়াড়া; ওরা সবাই মিলে একটি মহৎ তরুণে পরিণত হয়ে গেল; আসাদ-মতিয়ুর সেই বায়ান্ন সালের বরকত-সালামদের হাত ধরে এক হয়ে গেল। ওরা আমাদের সর্বমান্য নেতা হয়ে দাঁড়াল। ওরা ডাক দিয়ে বলেছে : তোমরা এসো, দেখো আমরা জীবন দিচ্ছি : বর্বরতার বিরুদ্ধে সুখী ভবিষ্যতের স্বপ্নে। আমরা ঘরে থাকতে পারিনি। ছুটে এসেছি। ওরা ডাক দিয়েছে পল্টনের ময়দানে। বলেছে : আমরা শপথ নেবো। এসো তোমরা আমাদের সঙ্গে হাত তুলে শপথ নাও। আমরা হাজারে লক্ষে হাজির হয়েছি।

উনসত্তরের সেই পল্টনের স্মৃতি আমাদের কারুর চোখের পাতা থেকেই মুছে যাবার নয়। ওরা শাদ্দাদের বেহেশত কাঁপিয়েছে। ওরা নমরুদের আসন টলিয়েছে। ওরা আমাদের জীবনে এক ক্রান্তি মুহূর্তের ফলক প্রতিষ্ঠা করে গেছে।

আজ সত্তরের ফেব্রুয়ারিতে উনসত্তরের সেই দিনগুলোকে আমরা স্মরণ করছি। আজও আমরা ঝাঁকে ঝাঁকে পল্টনের ময়দানে হাজির হই। পল্টনের পথ আসাদ-মতিয়ুররাই মুক্ত করে দিয়ে গেছে। আজ পল্টনে আওয়াজের বৈচিত্র্য। ডাকে ডাকে ভিন্নতা। কিন্তু এ কথা কারুর বিস্মৃত হওয়ার উপায় নেই যে, উনসত্তরের কৃষক-শ্রমিক ও তরুণ সমাজের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই খুলে দিয়েছে পল্টনের ময়দান; উন্মুক্ত করে দিয়েছে সমগ্র বন্দী জাতির শৃঙ্খলিত হাত এবং পা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কে। উনসত্তরের বন্যা কেবল আওয়াজের বৈচিত্র্যের জন্যই স্বপ্ন নিয়ে। সেই জীবনের জন্য আসেনি : এসেছিল আপামর জনসাধারণের জন্য মহত্তর এক জীবনের জন্য সব আওয়াজ যদি মিলিত না হয় তাহলে আর্থিক সামাজিক রাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতিক কোনোদিকের সম্ভাবনাই বাস্তবায়িত হতে পারবে না; স্বৈরতন্ত্রের এক দশকের পরে হয়তবা বিভ্রান্তির আর এক দশকে আমরা নিপতিত হব। কিন্তু বিভ্রান্তির সে প্রয়াস আপামর মানুষের জীবনের স্বপ্নকে নিশ্চয়ই ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। বায়ান্নর উত্তর-পথিক উনসত্তরে এসে যেমন স্বৈরতন্ত্রের শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলেছে; তেমনি উনসত্তরের অনাগত উত্তর-পথিক এসে বিভ্রান্তির এই জাল একদিন নিশ্চয়ই ছিন্ন করে ফেলবে।

১৯৭০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনসত্তরের ফসল

আমাদের একটা আফসোস ছিল। আমাদের সামাজিক পর্ব আছে, কিন্তু সে পর্বোপলক্ষে কোন মননশীলতা নেই, কোন সাংস্কৃতিক সৃষ্টি নেই। আমাদের ঈদুল ফেতর আছে। রমজান মাসের রোজার পরে ঈদের চাঁদ ওঠে। মুসলমান সমাজে ছেলে বুড়ো সবার মনে একটা আনন্দের ঢেউ জাগে। ঈদের দিন আমরা ঈদগাহ কিংবা মসজিদে যেয়ে জমায়েত হয়ে নামাজ পড়ি। নামাজ শেষে কোলাকুলি করি। খানাপিনারও একটা সমারোহ পড়ে যায়। এ উপলক্ষে প্রত্যেক পরিবারে জামাকাপড় এবং খানাপিনার বাড়তি খরচও হয় প্রচুর। বস্তুতঃ মুসলিম সমাজে ঈদুল ফেতরের পর্বেই খরচ হয় সবচেয়ে বেশি। আর আছে ঈদ-উল-আজহা। তখনো একই রকম খরচ হয়। কোরবানীর ধর্মীয় অনুশাসনও আমরা ব্যাপকভাবে পালন করি। কিন্তু এ দুটি ধর্মীয়-সামাজিক পর্বের কোনটির সঙ্গেই সাহিত্য-সংস্কৃতির সৃজনশীল প্রচেষ্টা আজো পর্যন্ত যুক্ত হয়নি। রমজানের ঈদ উপলক্ষে দৈনিক পত্রিকার সাহিত্যপত্রের ঈদ সংখ্যা যা বেরোয় তা কলেবর কিংবা বিষয়গুণে বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধতর হওয়ার পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে দীনতর হচ্ছে।

বাঙ্গালী সমাজ শুধু মুসলমানের নয়। বাঙ্গালী সমাজ হিন্দুরও। সাতচল্লিশ সালের পূর্ব-কালে হিন্দু-মুসলমান মিলে বৃহত্তর যে বাঙ্গালী সমাজ ছিল, তার হিন্দু সমাজের এমন একটি ধর্মীয় ও সামাজিক পর্ব ছিল, যে পর্ব শুধু ধর্মীয় অনুশাসন পালনে কিংবা সামাজিক অনুষ্ঠানে শেষ হত না। এ পর্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এর সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক সৃষ্টি। বাংলার শারোদৎসবের সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তারাই এ কথার সত্যতা মানবেন। আজ পশ্চিমবঙ্গের এই পর্বের সাহিত্য-সংস্কৃতির সৃষ্টির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ যোগ নেই। তাই তার বিকাশের পরিস্থিতির কথা জানিনে। তবু পুরনো দিনের যতটুকু স্মৃতি আছে তাতেই দেখি যে, সেদিন হিন্দু সমাজের শারদীয় পূজার সময়ে প্রত্যেকটি দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিকের শারদীয় সংখ্যা প্রকশিত হত। এ ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিযোগিতা। কোন পত্রিকা কতো বৃহৎ আকারে সাহিত্য সম্ভার নিয়ে এই সময়ে বেরোতে পারবে– এ ছিল রীতিমত প্রতিযোগিতা। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিযোগিতায় এবং পত্রিকা সংস্থার আর্থিক উৎসাহে ছোট-বড় সব কবি-লেখকরাই লিখতেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশে শারদীয় সাহিত্য-সংখ্যার অবদান নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। শারদীয় সাহিত্য-সংখ্যার কিংবা শারোদৎসব উপলক্ষে সাহিত্য-সৃষ্টির এই বন্যা বিভাগপূর্ব মুসলিম সমাজকেও প্রভাবান্বিত করেছিল। মুসলিম সমাজের তৎকালীন দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলি শারদীয় পূজার পাল্টা ঈদুল ফেতর উপলক্ষে যত্ন সহকারে যথাসাধ্য সাহিত্যের সম্ভার নিয়ে ঈদ সংখ্যা বার করার চেষ্টা করতেন। সেদিনকার ঈদ সংখ্যা 'আজাদ' পাকিস্তানোত্তর কালের যে কোন বছরের যে কোন পূর্ব পাকিস্তানি পত্রিকার ঈদ সংখ্যার চেয়ে গুণ ও আকার উভয়তঃ মূল্যবান বলে বোধ হবে। সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পাকিস্তান উত্তর কালের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে আমরা মুসলমানরা একচ্ছত্র সম্রাট। আমাদের কোন প্রতিযোগী নেই। অপর কারুর রচনার সঙ্গে আমাদের রচনার তুলনা করার অবকাশ নেই। কাজেই আমরা রহিম রহমান সাদেক সমীর সবাই অতুলনীয়। রাষ্ট্রনীতির কথা তুলছিনে। কিন্তু মতামত নির্বিশেষে এ কথা সকলেই হয়ত স্বীকার করবেন যে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ, বৃদ্ধি এবং শক্তির মূল উৎস প্রতিযোগিতা। মননের ক্ষেত্রে যে সমাজে মতামতের চিন্তায় ও প্রকাশে প্রতিযোগিতার অভাব যত বেশি, সে সমাজ ফুলে-ফসলে তত অধিক পরিমাণেই দীন।

কিন্তু যে আফসোসের বিষয় নিয়ে এ আলোচনার শুরু সে আফসোস করার আজ আর কোন কারণ নেই। পূর্ব-বাংলার তরুণ সমাজ সে আফসোসকে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন থেকে দূর করে দিয়েছেন।

আজ পূর্ব-বাংলায় বছর ঘুরে কেবল ঈদের উৎসব আসে না। আজ পূর্ব বাংলায় বছর ঘুরে ২১শে ফেব্রুয়ারি আসে। তার উত্তর পথিক ২০শে জানুয়ারি আসে। ২৪শে জানুয়ারিও। হিন্দুদের হোলি খেলাকে আমরা পছন্দ করিনি। কিন্তু উজ্জ্বল লাল রং-এর আকর্ষণকে পরিত্যাগ করতে পারিনি। আর তাই বছরের পর বছর আমাদের শাসকরা আমাদের তরুণদের, শ্রমিকদের এবং কৃষকদের রক্তের হোলি খেলেন : গত বাইশ বছর ধরেই খেলে আসছেন।

আজ তাই রক্তের খেলা আমাদের বাৎসরিক পর্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বরকত-সালামরা কেবল জীবন দেয়নি; কেবল তারা বাংলা ভাষার বাঁচার দাবিকে অপরাজেয় করেনি। তারা সমগ্র পূর্ব-বাংলার আপামর জনতার জন্য সুখী এক মানব সমাজের স্বপ্ন যেমন সৃষ্টি করেছে তেমনি আমাদের সমাজের সাহিত্য-সংস্কৃতির জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের যোজনা করেছে। নূতন পর্বের তারা সূচনা করেছে। আর তাই প্রতি বছর একুশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেব্রুয়ারি কেবল পৌনঃপুনিকতার আনুষ্ঠানিকতায় আমাদের জীবনে প্রত্যাবর্তন করে না। সে প্রতি বছরে নূতনতর মননের, নূতনতর চেতনার এবং নূতনতর সাহিত্য সৃষ্টির উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের সাহিত্যিকরা নানা যুগের নানা বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন। তাতে তারা ডক্টর উপাধিও লাভ করছেন। কিন্তু আজও কেউ একুশের সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করেন নি। আজো সাহিত্যের ইতিহাসে একুশের অবদান অবজ্ঞাত, অনালোচিত এবং অস্বীকৃত।

একুশে ফেব্রুয়ারি সৃষ্টি করেছে আটষট্টির ডিসেম্বর থেকে উনসত্তরের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিকে। এ উত্তর পথিক একুশের প্রাণদানের প্রেরণায় আরো অবিস্মরণীয়। এর কোন তুলনা আমাদের বাইশ বছরের ইতিহাসে নেই। শুধু পূর্ব-বঙ্গে নয়– এমন আবেগময় প্রাণদানের বন্যা সাম্প্রতিক কালের অপর কোন দেশের ইতিহাসেও বিরল।

একুশে ফেব্রুয়ারি জীবনোৎসবের দিন; তারুণ্যের দিন। তরুণরা কত নামে একুশে ফেব্রুয়ারিকে ডাকতে চায়। উনসত্তরের ফেব্রুয়ারির দিনগুলোতে তারুণ্যের মহামিলন ক্ষেত্র পল্টনের ময়দানে যেতেই কেউ বাড়িয়ে দিয়েছে 'লাল পলাশ', কেউ দিয়েছে 'লাল সূর্যের স্বপ্ন', কেউ সূর্যাবর্ত, 'রক্ত শপথ', 'রক্ত কমল', 'প্রতিরোধ', 'প্রদাহ', 'শোণিতাক্ত একুশ', 'সংগ্রামী পূর্ব বাঙালা'– কেউ বা 'উনসত্তুরের ছড়া'। এ হচ্ছে উনসত্তরের আর এক স্মরণীয় ফসল : সাহিত্যের ফসল। উনসত্তরে বরকত-সালামের উত্তর সাথী আসাদ-মতিয়ুর এবং অগণিত কিশোর তরুণ ছাত্র মধ্যবিত্ত, কেরানি, শ্রমিক ও কৃষক কেবল জীবন দেয়নি, কেবল নমরুদের আসন টলায়নি– তারা আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুন্দরতর অসংখ্য লাল পলাশের সৃষ্টি করে গেছে।

এতে ক'টি গল্প হয়েছে, ক'টি কবিতা হয়েছে, ক'টি প্রবন্ধ সেটা বড় কথা নয়। একুশের এই শপথ-সংকলনগুলির বেশির ভাগ লেখকই তরুণ। তারা ছাত্র। কিন্তু তাদের শপথের দৃঢ়তা, জীবনের আবেগ তাদের লেখনীতে যে শক্তি সৃষ্টি করেছে তা আমাদের সাহিত্যের প্রৌঢ় কোন স্রষ্টার মধ্যে নেই– থাকতে পারে না। আজ পূর্ব-বাংলার সাহিত্যিকদের যদি নাম করতে হয় তাহলে প্রথমেই একজন অনন্য সাধারণ লেখকের নাম করতে হবে, সে হচ্ছে "একুশের সঙ্কলন"। এখানে কোন একজন লেখক বিশিষ্ট নয়, একজন কবি বিশেষ নয়। সব লেখক, সব প্রাণ মিলে হচ্ছে একুশের সঙ্কলন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনসত্তরের ফসল

উনসত্তরের ফেব্রুয়ারিতে তরুণ বন্ধুদের দেওয়া লাল পলাশের গুচ্ছ কুড়িয়েছি। জমিয়েছি। জানতাম এর মধ্যে আছে প্রাণ। সবার প্রাণ। শিক্ষক, কর্মচারী, কৃষক, শ্রমিক সবার। জীবন যাদের কামনা, নতুন স্বপ্ন যারা দেখে, তরুণের রক্তের ধারায় সৃষ্ট রক্ত পলাশ তাদের মধ্যে প্রাণের সাড়া জাগাবে। সেদিন তুলে রেখেছিলাম যত্ন করে। যেমন করে রাখি কোন মহাকাব্যকে, মহৎ উপন্যাসকে, একখানি মহৎ জীবনচরিতকে। কেননা এ তো রহস্য রোমাঞ্চ নয়। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে মুহূর্ত আসবে যখন চারদিক অন্ধকার মনে হবে, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসবে। একটু উদার মন, উদার আকাশের স্পর্শের কামনায় মহত্ত্বের স্পর্শ দিবে, আশা দিবে, স্বপ্ন দিবে। জীবনের সার্থকতা আমরা খুঁজে পাবো।

সত্তরের একুশে উনসত্তরের লাল পলাশের গুচ্ছ খুলে খুলে দেখি আর অবাক হই, কতো রক্ত! কতো রঙ! কী দৃঢ় শপথ– আর কী দুর্বার তার আকর্ষণ!

১৯৭০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজরুল জন্মোৎসব প্রসঙ্গে

চিন্তা করলে, আমাদের দেশে কবি-সাহিত্যিকদের জন্মদিবস পালনের বিষয়টি অশেষ কৌতুকের উৎস এবং তাৎপর্যের আকর। কোন কবি বা সাহিত্যিককে আমরা ঘটা করে জাঁকজমকের সঙ্গে স্মরণ করি, আবার কোন কবি বা সাহিত্যিক যাতে স্মরণে না আসে সতর্কতার সঙ্গে তারও ব্যবস্থা করি।

রবীন্দ্রনাথ, নজরুল বাংলা সাহিত্যের দু'জন কবি ও স্রষ্টা। আমাদের কাছে দু'জনই 'বিদেশী'। কিন্তু নজরুলকে আমরা জাতীয়ভাবে জাতীয় কবি ঘোষণা করার চেষ্টা করি, অপরজনকে বিজাতীয় এবং অস্মরণীয় বলে আকারে-ইঙ্গিতে, ধোঁকায়-ধমকে বুঝতে প্রয়াস পাই। আমরা প্রচার করি যে, রবীন্দ্রনাথের চাইতে নজরুল অনেক বড়। কিন্তু নজরুলের সৃষ্টির বৈচিত্র্য স্বীকারের সাহস আমাদের নাই। আমাদের প্রমাণের ইচ্ছা এই যে, গজল ছাড়া নজরুল আর কিছু রচনা করেন নি এবং তিনি বাংলা ভাষায় লিখলেও তাঁকে বাঙ্গালী বলা অন্যায়।

শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিকরা যখন জীবিত থাকেন, তখন আমরা তাঁকে আঘাত করি। যখন তাঁরা মারা যান, তখন শ্রদ্ধার উত্তুঙ্গতায় আমরা তাঁদের স্থাপন করি এবং তাঁদের সৃষ্ট সম্পদকে লাখেরাজে পরিণত করে তাকে খণ্ডিত, বিকৃত ও বিবৃত করে আমাদের যার যেমন প্রয়োজন তেমনি তা ভোগ দখল করি। আমরা নিরাপদ। কারণ ধার্মিক হয়েও আমরা বৈজ্ঞানিক। আর তাই মৃতের অশরীরী আত্মার অভিশাপের কোন বাস্তব শক্তিতে আমরা বিশ্বাস করি নে।

নজরুলের ক্ষেত্রে আমরা আরো নিরাপদ। নজরুল মরেন নি, কিন্তু মৃতের অধিক। তাঁর এককালের বিদ্রোহী অগ্নিক্ষরা ভাষা আজ মূক; তীরের মতো চোখ আজ অর্থহীন নিস্পলক। আগুন আর ছাই-এ, ঝংকৃত বীণা আর ছিন্ন-তার যন্ত্রে, বিদ্রোহী আর বোধ-অবোধের অতীত নির্বাক দ্রষ্টার মধ্যে কত বৈপরীত্য। কত প্রভেদ। আমরা অধিকতর নিরাপদ। কারণ আমাদের অতি উচ্ছাসের শঠতাকে ব্যঙ্গ করতে পারত যে মূক অবয়বটি, তাও আমাদের সাক্ষাতে অনুপস্থিত।

আমাদের উচ্ছ্বাস বা উপেক্ষায় নজরুলের কিছু যায়-আসে না। নজরুল সাহিত্যেরও তাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। যা কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি সে আমাদের। আর সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষতি হচ্ছে শঠতার নীতিকে একটি মহৎ নীতি হিসেবে প্রচার এবং ব্যাপকভাবে তাকে উত্তম বলে স্বীকৃতি দানে।

নজরুলকে একদিন যারা কাফের বলেছিল আজ তারাই তাঁকে মুসলমান বই অপর কিছু স্বীকার করতে নারাজ। হিন্দু কিংবা মুসলমান ধর্ম নির্বিশেষে নজরুল আঘাত করেছিলেন সমাজের যা কিছু স্থবির, কুসংস্কার ও সংকীর্ণতা তার বিরুদ্ধে। সে কারণে স্বাভাবিকভাবে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমাজের স্থবিরতা, কুসংস্কার ও সংকীর্ণতার প্রতিভূ সেদিন নজরুলের উপর আঘাতের খড়্গ হেনেছিল। এবং স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু কিংবা মুসলমান নির্বিশেষে জীবন, জঙ্গম, মুক্তবুদ্ধি, উদারতা, সাহস ও ত্যাগ এবং জীবন পথে এগিয়ে চলার সৈনিকদের প্রতিভূ তরুণ সমাজ সেদিন নজরুলকে বাঁধভাঙ্গা প্রাণের উচ্ছ্বাস নিয়ে স্বাগত জানিয়েছিল; তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল; মাথায় তুলে নিয়েছিল। আর সেই প্রাণবন্যায় সমাজের ঊর্ধ্ব মহলে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল।

ভাব অবশ্যই শক্তি। নির্যাতিতের জন্য সে একমাত্র শক্তি। যে ভাবকে আমরা আমাদের স্বার্থের বৈরী মনে করি, তাকে নিষ্ফল করার দুটো পথ আছ। গোড়াতেই সেই ভাবের ভাবুককে ধনে জনে শেষ করে দাও; আঘাতে আঘাতে তাকে থেতলে দাও। তাতেও যদি সে আরও অদম্য হয়, তাহলে তাকে মাথায় তুলে নৃত্য করো। যে মাটি থেকে তার জন্ম আর যে মাটি তার শক্তি, সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রশংসার অলিক প্রাসাদে তাকে স্তব-স্তুতির ধূপে আচ্ছন্ন করে রাখো। যুগ থেকে যুগে এ দু'টি পথ বিরামহীনভাবেই অনুসৃত হয়ে আসছে।

কিন্তু বাংলাদেশে নজরুলের ক্ষেত্রে এই পন্থাকে যত নির্মমভাবে অনুসরণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে, তেমন দৃষ্টান্তের তুলনা বিরল।

আমরা যখন উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি করি:

বল বীর
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি আমারি
নতশির ওই শিখর হিমাদ্রীর!

তখন সমাজজীবনে ত্যাগ কিংবা সংগ্রামের কোন উন্নত শির বহন করে আমরা পথ চলি নে বা চলার তিলমাত্র কল্পনাও করি নে। আমরা আবৃত্তি করি, কেননা আমাদের কণ্ঠ ভালো এবং কবির লাইন ক'টি আবৃত্তি করতে আমাদের কণ্ঠকে উচ্চগ্রামে তুলে দিতে পারি। যখন আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে নজরুলের আদর্শের প্রশংসা করি এবং বলি:

মহাবিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না।
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ্
ভীম রণভূমে রণিবে না–

তখন কবির এই আদর্শকে আমাদের সমাজজীবনে প্রয়োগের কথা আদৌ চিন্তা করি নে! কবির গান গাইলে যে পদ আমরা পছন্দ করি নে, সে পদ আমরা কেটে দেই।

দুর্গমগিরি কান্তার মরু
দুস্তর পারাবার
লংঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে
যাত্রীরা হুঁশিয়ার
... ...
হিন্দু না ওরা মুসলিম
ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন
কাণ্ডারী বল ডুবিছে মানুষ
সন্তান মোর মার।

'হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন'– এ কথা উচ্চারণ করতে আজো আমাদের বাঁধে। নজরুলের গজল, হামদ ও নাতকে যখন প্রশংসা করি, তখন সে প্রশংসা কৃত্রিম। কেননা নজরুলের সুরের জগৎ থেকে শ্যামাসঙ্গীত ও কীর্তনকে নির্বাসন দেওয়া আমাদের জাতীয় কর্তব্য বলে বিবেচনা করি। অর্থাৎ নজরুলকে শতখণ্ডে খণ্ডিত করে, তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সঙ্গতির সূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে যেটুকু আমরা যেমনভাবে ব্যবহার করতে পারি, যেটুকু আমাদের যে স্বার্থ সাধন করে, সেটুকু আমরা সেই স্বার্থে ব্যবহার করবো। কেননা নজরুলের উপর আমাদের অধিকার আছে। নজরুল আমাদের জাতীয়কৃত সম্পত্তি। তদুপরি আমরা তাঁকে মাসিক তিনশ' টাকা মাসোহারা পাঠাই!

নজরুল সম্পর্কে আলোচনার সংখ্যা আজ কম নয়। তাঁর সাহিত্যকর্ম নিয়ে পণ্ডিতজনরা সারগর্ভ আলোচনামূলক পুস্তক লিখেছেন। শোভন সংস্করণে নজরুলের রচনাবলি আমাদের গৃহের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করছে। নজরুলের একাধিক জীবনীও রচিত এবং প্রকাশিত হয়েছে।

কবিতার জন্য কবিতা লেখা অসম্ভব নয়। কিন্তু নজরুল-জীবনের একটি অক্ষয় ঘোষণা হচ্ছে, নজরুল কবিতার জন্য তাঁর একটি কবিতাও লিখেন নি। নজরুল কবিতা লিখেছেন জীবনের জন্য, সমাজের জন্য। তাঁর নিজ জীবনের ও সাহিত্যের এ উদ্দেশ্য কোথাও নিম্নকণ্ঠ নয়। সর্বত্রই এ আদর্শ উচ্চকণ্ঠ। উচ্চকণ্ঠ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ আদর্শ তাঁর কাব্যের সূক্ষ্মতাকে আঘাত যে করে নি তা নয়। এ কথা কবি নিজেও অস্বীকার করেন নি। কিন্তু জীবনকে তিনি কবিতার চেয়ে বড় মনে করেছিলেন বলেই জীবনের দাবি কবিতায় কোথাও উহ্য বা অনুচ্চারিত রাখতে পারেন নি। সবচেয়ে বড় কথা, সেই জীবনের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর সমগ্র জীবন দিয়েই কাব্য তৈরি করেছেন। নজরুলের জীবন তাই একটি মহৎ কবিতাবিশেষ। পরিধিতে এ ছোট হতে পারে, কিন্তু সাহসে, ত্যাগে, চেতনায়, প্রেমে, উদারতায়, জয়ে-পরাজয়ে এ কাব্য একটি পূর্ণাঙ্গ মহাকাব্যের অবয়বে গঠিত।

গণ-জীবন, গণ-কবিতা ও গণ-কবি এখনো আমাদের পরিহাসের শব্দ। কিন্তু সেই গণ-জীবন, গণ-কবিতা যিনি বাংলা সাহিত্যে অস্বীকারের অতীত করে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন– তিনি গণ-কবি নজরুল।

শুধু গণ-কবি নয়। নজরুল তারুণ্যের কবি। যে তারুণ্য একটি দেশ, সমাজ ও জাতির জীবনের সঙ্কটকালে একমাত্র মুক্তিদাতা। নজরুলকে স্মরণ করার আজ যদি কোন তাৎপর্য থাকে তবে এই যে, তারুণ্য ও বিদ্রোহের সেই অপরাজেয় কবিকে আমাদের সমাজের বার্ধক্য আজ মিথ্যা স্তবের ধূপে আচ্ছন্ন করে কবির সতীর্থ তরুণদের নিকট থেকে ছিন্ন করে নিয়েছে। কবিকে নিষ্ফল করে দেবার সে ব্যাপক প্রচেষ্টার কারণেই চলছে নজরুলের খণ্ডিত বিচার, বিকৃত ব্যাখ্যা এবং গবেষণার গুপ্তগু। আমাদের বার্ধক্য নজরুলকে মৃত বলে ঘোষণা করেছে। আমাদের তারুণ্যকে সেই ঘোষণা মিথ্যা করে দিতে হবে। নজরুলকে উদ্ধার করতে হবে বার্ধক্যের জরা ও মৃত্যুর হাত থেকে। প্রতিষ্ঠা করতে হবে তাঁর সৃষ্টির বর্ণাঢ্যে, বাঙ্গালীর সব ধর্ম ও সংস্কৃতির যে ঐতিহ্য অতুলনীয়ভাবে কবি নিজের জীবনে সম্পৃক্ত করেছেন সেই ঐতিহ্যের পটভূমিতে– সামগ্রিক শক্তি এবং মহিমায় তরুণদের মধ্যে এবং জনতার মধ্যে। এ দায়িত্ব ও কর্তব্য একমাত্র আমাদের তরুণদেরই।

১৯৬৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

১৮৮৫ সালের সাক্ষাৎ ১৯২৫ সালের পক্ষে পাওয়া কম কথা নয়। কিন্তু কেবল ১৯২৫ নয়, ১৯৫৮ সালে জন্মলাভ করে যে কিশোর আজ দশ বছরে পা দিয়েছে, সেও তার জীবনের কোন না কোন ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ পেয়েছে ১৮৮৫ সালের ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর। এটা যেমন ব্যক্তিগতভাবে, তেমন জাতীয়ভাবে এক বিরল সৌভাগ্যের ব্যাপার। এ সাক্ষাৎ প্রায় এক শতাব্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। সেই শতাব্দীর স্মৃতিচারণ সম্পূর্ণরূপে করা সমসাময়িক কোন এক ব্যক্তির পক্ষেই হয়ত সম্ভব নয়। সে স্মৃতিচারণ করতে পারতেন একমাত্র স্মৃতিধর এবং শতাব্দীর প্রতিভূ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নিজে। তাঁর সম্পর্কে কোন কথা বলা আমার নিজের পক্ষে একেবারেই দুঃসাহস হত, যদি না জীবন পরিক্রমায় আকস্মিকভাবে আমি তাঁর কিছুটা নৈকট্য লাভের সুযোগ পেতাম।

আমি প্রথম দেখেছিলাম ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে ১৯৪২ সালে। তখনো আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই নি। বিখ্যাত হাইকোর্ট বিল্ডিং-এ তখন ঢাকা কলেজের ক্লাস হত। আমি তখন ঢাকা কলেজের ছাত্র। বর্তমান ফজলুল হক হল তখন ঢাকা কলেজের হোস্টেল। প্রায় ২৭ বছর আগে দেখা সেই দেহাবয়বটির খুব পরিবর্তন ১৯৬৯-এর ১৩ই জুলাই শেষ শয়নেও আমি দেখি নি। তাই আমার মনের পটে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর কায়িক স্মৃতির কোন পরিবর্তন ঘটে নি। তাঁকে যারা দেখেছেন, সেই সহস্র সহস্র তরুণ-তরুণী, ছাত্র-শিক্ষক, সমাজকর্মী, দেশবাসী কারুর মনেই সেই স্মৃতির পরিবর্তন ঘটে নি। প্রথম দেখার স্মৃতিকে পরবর্তী সাক্ষাতের স্মৃতি জমাট করেছে, আঘাত করে নি।

কিন্তু '৪২ সালের স্মৃতি কেবল দেহাবয়বেরই নয়। কেবলমাত্র বৃহৎ মস্তিষ্কের, শরীর বেয়ে নেমে পড়া শুভ্র শ্মশ্রুর ক্ষুদ্রাকারের মানুষটিরই নয়। ১৯৪২ সালের প্রথম দিকে ঢাকার মুসলিম ছাত্রসমাজে হঠাৎ একটা আলোড়ন দেখা দিল। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তখন ফজলুল হক হলের প্রভোস্ট। তিনি থাকতেন বর্তমান বিজ্ঞান অ্যানেক্স-এর দক্ষিণ পাশের বাংলোতে। ফজলুল হক হল তখন মেডিক্যাল কলেজের দোতলায়। ছাত্রদের আলোড়নটা ছিল রাজনৈতিক। এ. কে. ফজলুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হক সাহেব ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে নিয়ে একটি যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। ঢাকার নবাব হাবীবুল্লাহও এ. কে. ফজলুল হকের পক্ষ নিয়েছেন। কিন্তু মুসলিম লীগ এ মন্ত্রিসভার বিরোধিতা করছে। সে কারণে মুসলিম ছাত্রসমাজও তার বিরোধী। কিন্তু ছাত্রসমাজে হক সাহেবের সমর্থনকারী ছিল না এমন কথা ঠিক নয়। বেশ কিছু সংখ্যক মুসলিম ছাত্র ছিল হক সাহেবের সমর্থনকারী। অবশ্য মুসলিম সমাজের প্রধান আন্দোলন তখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য এবং রাজনৈতিক প্রতিটি ঘটনা তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হত।

তবু এই বিশেষ ক্ষেত্রে ছাত্রদের মধ্যে সেদিনও কিছুটা বিভক্তি দেখা দিয়েছিল। কেবল রাজনীতি নয়, সমাজের বৃহত্তর জনসংখ্যার অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতেও যারা ঘটনার বিচার করতে চাইত ছাত্রসমাজের তেমনি অংশ সেদিনও হক সাহেবের সমাসেবী চরিত্রের জন্য তাঁকে সমর্থন করেছিল। ছাত্রসমাজের প্রধান অংশের মধ্যে তখন এ চিন্তা ছিল না। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কেবল পণ্ডিত নন; দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপারেও তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত আগ্রহ পোষণ করে গেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর মতামতও দৃঢ় ছিল। যে মানুষ কিংবা ব্যবস্থা দারিদ্র্য প্রপীড়িত অসংখ্য মানুষের জন্য চিন্তা করে, তাদের দুঃখভার কিছু লাঘব করতে চায়, তার জন্য তাঁর সহানুভূতি কারুর অগোচর ছিল না। সেদিনও ছাত্ররা জানত যে, ড. শহীদুল্লাহ ফজলুল হক পন্থী। আজ কথাটা শুনতে এত খারাপ না লাগলেও সেদিন এ কথাটি বিপজ্জনক ছিল। বিপজ্জনক ছিল এই কারণে যে, একদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম তরুণগণ এবং অপরদিকে নবাব হাবীবুল্লাহ এবং এ. কে. ফজলুল হকের ভক্ত ঢাকার মহল্লার জনসাধারণ। এই দ্বিধাবিভক্ত ঢাকার মধ্যে হক সাহেবকে সম্বর্ধনা জানানো নিয়ে ঢাকা রেল স্টেশনে একটি সংঘর্ষ ঘটে। সেই সংঘর্ষে স্থানীয় জনসাধারণের জমায়েতের প্রবলতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হকবিরোধীগণ পর্যুদস্ত হয়। পর্যুদস্ত হয়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসে হকপন্থী ছাত্রদের উপর পাল্টা হামলা চালায়। কিন্তু যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য সে হচ্ছে, হক-বিরোধী ছাত্রদের বিরূপতার আক্রমণ থেকে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহও বাদ যান নি। এ ঘটনার উল্লেখ করলাম এ জন্য যে, পণ্ডিত শহীদুল্লাহ যেমন রাজনীতিকভাবে সব সময়েই সচেতন ছিলেন, তেমনি কোন প্রতিকূল জোয়ারের স্রোতেও যা তিনি সমর্থন করতেন বা সমর্থনযোগ্য মনে করতেন, তাকে বিসর্জন দিয়ে খ্যাতির সহজ পন্থা বেছে নেওয়ার প্রবণতা তিনি জীবনে খুব কমই দেখিয়েছেন।*

---

* জন্ম: ১০ই জুলাই ১৯৪২, মৃত্যু: ১৩ই জুলাই ১৯৬৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা শুনেছি, তাঁর বড় ছেলে সে যুগেই বৃটিশ সরকারবিরোধী বিপ্লবাত্মক ছাত্র-রাজনীতি করতেন। সে কারণে তাঁর বড় ছেলের বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকারের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরিয়েছে। পিতার কাছে সরকারি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট থেকে শুরু করে তার অনুচর এসে হুমকি দিচ্ছে : আপনার ছেলের সন্ধান দিন। আপনার ছেলেকে আপনি নিবৃত্ত করুন। কিন্তু সব হুমকির জবাবে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর সেই চিরকালীন উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বলেছেন : আমরা ছেলে বড় হয়েছে। তার কর্তব্য-অকর্তব্য সে বেছে নেবে। আমি তাকে বাধা দেব কেন? শুধু বড় ছেলেই নয়, পরবর্তীকালে অপরাপর ছেলেরাও কেউ সক্রিয় রাজনীতি এবং কারাবাসের পথ বেছে নিয়েছে, কেউবা শিল্পচর্চার পথ, কেউ নিজ ক্ষমতানুযায়ী জীবিকানির্বাহের পথও বেছে নিয়েছে। ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, জীবনবোধ কোন ক্ষেত্রে তাঁর কোন ছেলেরই তাঁর সঙ্গে বিরোধহীন ঐক্য ঘটে নি; কিন্তু কারুর উপর তাঁকে অসন্তুষ্ট হতে আমরা শুনিনি। সকলকে তিনি তাদের মতামতে, জীবন যাত্রায় বন্ধুর ন্যায় উপদেশ দিয়েছেন; পিতার অধিকার নিয়ে কারু জীবনে হস্তক্ষেপ করেন নি। আবার নিজের জীবনপথে চলতে গিয়ে কেউ কারাগারে কিংবা অর্থাভাবে বিপন্ন হলে নিজে তার সাহায্যের জন্য হাজির হয়েছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর এই পারিবারিক জীবনের ঔদার্য ও বিচারবোধ তাঁর ধর্মীয়, সামাজিক, সাহিত্যিক সমস্ত জীবনেরই যে নীতি ছিল, এটা তাঁর নৈকট্যের যেটুকু সুযোগ আমি লাভ করেছি তা থেকেই জোরের সঙ্গে বলতে পারি।

১৯৪২-এর পরে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সঙ্গে জীবিকার ক্ষেত্রে কিছুটা ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎ ঘটে আমার ১৯৬৩ সালে। বাংলা একাডেমীর অনুবাদ বিভাগে আমি তখন যোগ দিয়েছি। সৈয়দ আলী আহসান একাডেমীর পরিচালক। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' এবং 'ইসলামী বিশ্বকোষের' প্রধান সম্পাদক। তখন বিষয়টি চিন্তা করি নি। কিন্তু আজ চিন্তা করতে অবাক লাগে। পাশের ঘরে কাজ করছেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ১৮৮৫ সালে তাঁর জন্ম হয়েছে। আর এখানে কাজ করছি আমরা যাদের কারুর জন্ম ১৯২৫-এ, কারু বা ১৯৩০-এ, কারুর বা আরো পরে। সাড়ে ন'টা অফিসের সময়। তরুণরা যদিবা বিলম্বে আসেন, ড. শহীদুল্লাহর কোন বিলম্ব নেই। একবার নাকি পরিচালক অফিসের সময়ের নিয়মানুবর্তিতার জন্য অফিসের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে ড. শহীদুল্লাহ সেদিন কয়েক মিনিট দেরিতে পৌঁছেছিলেন। পাছে তিনি মনে করেন যে, তাঁর কারণেই পরিচালক দাঁড়িয়ে আছেন, এজন্য সৈয়দ আলী আহসান দ্রুত সরে গিয়েছিলেন প্রবেশ পথ থেকে। কিন্তু শহীদুল্লাহ সাহেব নিজেকে ক্ষমা করেন নি। নিজের ছাত্রকে যেমন তিনি মোবারকবাদ জানিয়ে পরিচালক মেনেছেন, তেমনি উন্মুক্ত হৃদয় নিয়ে তিনি তাঁকে গিয়ে তারপরেই বলেছেন : দেখ, আজকে আসতে আমার একটু দেরি হয়ে গেছে। তাঁর এ কৈফিয়ত পরিচালকের জন্য অধিক বিব্রতকর হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন : 'স্যার, আপনি আমার অপরাধ মাফ করবেন। আপনার জন্য বিলম্বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন প্রশ্ন নেই। আপনি যখন আসা সম্ভব মনে করবেন তখন আসবেন।' কিন্তু এ তো আমাদের অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য যে, নিয়ম হিসাবে কখনো তিনি বিলম্বে আসার নিয়ম করেন নি।

এ মানুষটিকে এত কাছে পেয়েছি বলে আমাদের সৌভাগ্যের এই আকস্মিকতার বিষয় আমরা চিন্তা করি নি। নিজের ধর্ম-প্রাণতা, জাগতিক মূল্যবোধে নিজের বিচার যেমন তিনি কোন দিন ত্যাগ করেন নি, তেমনি নতুনকে উদার হৃদয়ে স্বীকার করতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন নি। দীর্ঘ ব্যবধানের পর ১৯৬২ কিংবা '৬৩ সালে যখন এসে তাঁর পায়ে হাত রেখে সালাম করে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম : 'স্যার, আমাকে কি আপনার মনে আছে? আমি আপনার...' আমরা কথা শেষ হবার আগেই তিনি বলে উঠলেন : 'তুমি আমাদের ফজলুল হক হলের ছাত্র ফজলুল করিম না?' তারপর প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে আমাকে সঙ্কুচিত করে তুললেন। বললেন : 'ইয়া আল্লাহ! দশ বছর তুমি বন্দী ছিলে!' আমি বললাম : 'হ্যাঁ স্যার, এককালীন না হলেও মোট তাই।' তিনি বললেন : 'তুমি লিখ না তোমার জেল জীবনের কথা!' আমি আরো সঙ্কুচিত হয়ে বললাম : 'স্যার, সে কিছু নয়। কিন্তু আমরা চাই আপনি লিখুন আপনার জীবনের কথা, আমাদের জন্য। আপনার তো একটি শতাব্দীর ইতিহাস। সে ইতিহাসে আমরা বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের নবজাগরণের ইতিহাস পাব।'

এমন দাবিতে তিনি বিচলিত হলেন। বললেন : 'দেখ, আমার সময় কোথায়? এই তো 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধানে'র কাজ করছি। 'ইসলামী বিশ্বকোষে'র রচনার দিকও দেখতে হচ্ছে। তারপর ইউনিভার্সিটি গুলোর পেপার– সেটার খাতা দেখার কাজ রয়েছে। দেখি আল্লাহ যদি সময় দেন।'

হয়ত আমরা মনে করেছি, তিনি এ কাজ না করে সে কাজ করলে পারতেন। তিনি কেন সাধারণ পাঠ্য বই-এর প্রবন্ধ লেখেন। তিনি কেন যে কোন মজলিসে যান। কেন তিনি গবেষণামূলক কাজে আরো গভীরভাবে নিবিষ্ট হন না। কিন্তু এ কথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিরামহীন কাজের লোক ছিলেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ক্লান্তিহীন পরিশ্রমের লোক ছিলেন তিনি। যে কোন মজলিসে তিনি যেতেন। কোন দাওয়াতকে তিনি নামঞ্জুর করেন নি। কেউ ফোনে কথা বলেছে : 'স্যার, আপনি আগামী মাসের এই তারিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আমাদের স্কুলের মাহফিলে প্রধান অতিথি হবেন।' তিনি ফোন ধরে বলেছেন : 'একটু রাখুন, আমার নোট বইটি দেখে নিই।' এই বলে ফোন রেখে খড়মের খুট খুট শব্দ তুলে নিজের ঘরে যেয়ে নোট বই এনে মিলিয়ে নিতেন সেই তারিখে অপর কোন ওয়াদা তিনি ইতিপূর্বে করেছেন কিনা। শুধু শহরের অনুষ্ঠান নয়, দূর কিশোরগঞ্জ, রাজশাহী, রংপুর কিংবা বরিশাল– বাংলাদেশের এমন কোন প্রত্যন্ত অঞ্চল ছিল না যেখান থেকে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ডাক না আসতো। প্রতিটি ডাকে তিনি সাড়া দিতেন। আমি নিজেও বলেছি: 'এই শরীরে এত বেশি যাতায়াত আপনি নাই-বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেন।' তিনি হেসে বলতেন : 'লোকের আবেদন নাকচ করি কেমন করে?' একদিন বললেন : ডাক তো কেবল আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের গ্রাম থেকে নয়, ডাক তো আমার দেশের বাইরে থেকেও আসে। এই তো এসেছিল ডাক সারা ভারত ভাষা সম্মেলনের পক্ষ থেকে। কিন্তু সেখানে যাওয়া তো দূরের কথা, কেন তারা ডাকল তার কৈফিয়ত দিয়েই তো কূল পাচ্ছি নে।

এমন অভিযোগর জবাব আমাদের পক্ষে দেওয়ার কোন উপায় ছিল না।

শিশুর মতো সরল ছিলেন তিনি। রিক্সাওয়ালার সাথে দর করে ভাড়া ঠিক না করে রিক্সায় উঠতেন না। দরে না বনলে যতক্ষণ না রিক্সা পাওয়া যায়, ততক্ষণে হেঁটে এগুতে থাকতেন। আমরা হয়ত তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে সরল মন্তব্য করেছি। কিন্তু ড. শহীদুল্লাহর নীতিটি বুঝা কষ্টকর নয়। তাঁর নীতি ছিল : 'রিক্সায় যখন উঠি, তখন আমি যাত্রী, সে মালিক। তার সঙ্গে চুক্তি না করে আমি কেন উঠব এবং চুক্তির ক্ষেত্রেও তারও যেমন দাবি থাকবে, আমারও তেমনি বক্তব্য থাকবে। আর রিক্সা না পেলে এক পা-ও হাঁটতে পারব না এবং রিক্সা পেলেই উঠে পড়ব, নতুন যুগের এমন নীতি নিলে পায়ের বল যা আছে, তাও তো আমি হারিয়ে ফেলব।' এ তাঁর সচেতন নীতি ছিল। তাই এতে কোন সঙ্কোচ ছিল না। এই সক্রিয় থাকার কথা তিনি সব সময়েই বলতেন। তিনি বলতেন, আল্লাহর কাছে আমার একমাত্র প্রার্থনা, আমি যেন কাজ করতে করতেই তাঁর কাছে চলে যেতে পারি। কাজের জন্য যে দৃঢ় মনোবল তিনি পোষণ করতেন তার জোরেই তিনি ইতিপূর্বের গুরুতর অসুস্থতার আঘাতকে কাটিয়ে উঠে আবার পড়াশুনায় মন দিয়েছিলেন, আর সেই কাজের মধ্যেই তিনি লোকান্তরে যাত্রা করেছেন।

একদিন তাঁকে খুব ক্ষুব্ধ দেখেছিলাম। কত লোক কত খেতাব পাচ্ছে। উচ্চ খেতাব, মধ্য খেতাব, নিম্ন খেতাব। রাষ্ট্রীয়ভাবে তিনি কোন খেতাব পেলেন না। খেতাবটা যে মানবীয় ব্যাপার এবং বিশেষ মানুষের রুচি, চিন্তা, বিচারবোধ, বিবেচনা যে রাষ্ট্রীয় খেতাবের ঘোষণায় প্রকাশিত হয়, এ সত্য নজরে রাখা কঠিন বই কি! ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বললেন : 'কিন্তু দেখ, আমি কিছু পেলাম না।' এমন ক্ষেত্রে কিছু বলা অসম্ভব। এ ব্যাপারে সেদিন কেবল আমার আন্তরিক অনুভূতির কথাই বলতে পেরেছিলাম। বলেছিলাম : 'স্যার, আপনি যে পেলেন না, এটাই কিন্তু আমাদের কাছে একটা বড় সম্মানের ব্যাপার হয়ে থাকবে।' আজও আমাদের কাছে ড. শহীদুল্লাহর এটাই একটা বড় পরিচয় যে, তিনি কোন খেতাব পাননি, যা আর দশজনে পেয়েছে। কেননা তিনি অপর দশজনের চেয়ে পৃথক ছিলেন।

১৯৬৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোককবি রমেশ শীল স্মরণে

প্রায় পনের বছর আগে বন্দী নিবাসে বসে লেখা নিচের রোজনামচাটির কোন কথা পরিবর্তন করার কিছু নেই। রোজনামচা রাখার অভ্যাস এই বন্দীর ছিল না, এটি একটি একক ব্যতিক্রম। দেওয়ালের বৃত্তে ঘেরা বন্দী নিবাস যেন মহাশূন্যে ঘূর্ণায়মান একটা উপগ্রহ। পৃথিবীর আকর্ষণে পৃথিবীর পরিক্রমের সঙ্গে তারও পরিক্রমণ। তবু মোহময় পৃথিবীর সঙ্গে তার কি দূরতিক্রম্য ব্যবধান, মানুষগুলোর জীবনে কি মর্মান্তিক বর্ণহীন একঘেয়েমিঃ কেবলি সূর্য ওঠা আর সূর্য ডোবা। দেয়ালঘেরা সেই পৃথিবীতে একঘেয়েমিটা বিস্ময়ের ছিল না। বিস্ময়ে জাগত যখন দেখতাম আচম্বিতে সেই জগতেও জীবনের জোয়ার বইছে। বদ্ধ ডোবার বাঁধ ভেঙ্গে তখন যেন কলকল করে জীবন নদীর স্রোত চলত। এমনি জীবনের ধারা নিয়ে এসেছিলেন ১৯৫৫ সনের কোন একদিন একজন বন্দী, যাঁর বয়স তখন ৭৪ পেরিয়ে ৭৫-এ পড়েছিল, মাথার বিরল চুল ক'গাছি যাঁর রেশমী সুতার মতো, চক্ষু যাঁর কোটরাগত। এমন মানুষের মধ্যে আমরা জীবনের স্রোত ও বেগের কথা ভাবতে পারি নে। কিন্তু এ বৃদ্ধ বন্দী সেদিন যে আমাদের এই সাধারণ ধারণাকে এক বিস্ময়কর আঘাতে বদলে দিয়েছিলেন তাই নয়, শত বন্দীর মৃতপ্রায় দেহে তার জীবনের তাপে নতুন জীবন সঞ্চার করেছিলেন। সেদিনের অভিজ্ঞতা আজকের ভাষায় তুলে ধরা সম্ভব নয়। পুরানো ছিন্নপ্রায় কাগজের বুকে বিলীয়মান রেখায় সেদিনের রোজনামচাটিতে চোখ বুলিয়ে সেই বৃদ্ধ মানুষটিকে আবার আমি নিজের চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখলাম। এ বৃদ্ধ আজ আর এ জগতে নেই। কিন্তু তাঁর কাছে জীবন লাভের একটা ঋণ রয়ে গেছে। এ ঋণের শোধ নেই। নিজের মনে সে জন্য কৃতজ্ঞতাবোধেরও শেষ নেই। হয়ত এমন ভাবটি আরো কোন সুহৃদের আছে, কোন পাঠকের। সে ধারণাতেই সেদিনের এই রোজনামচাটি আমি নিচে তুলে দিলাম।

কবি রমেশ শীল* ।

---

* জন্মঃ ২৬শে বৈশাখ ১২৮৪ বঙ্গাব্দ, মৃত্যুঃ ৬ই এপ্রিল ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামটি অনেকের কাছে অপরিচিত। এঁকে যাঁরা দেখেন নি তাঁদের পক্ষে এই মানুষটির অসাধারণত্বের বিষয় কল্পনা করা সম্ভব নয়। আর যাঁরা দেখেছেন, তাদের পক্ষেও তাঁকে বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব। আজ হয়ত তাঁর জন্মদিন নয়। কিন্তু কবি রমেশ শীল কেবল তাঁর জন্মদিনেই স্মরণীয় নন।

১০ই মে, ১৯৫৫ : ২৬শে বৈশাখ, ১৩৬২ : ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার। কবি রমেশ শীলের জন্মদিবস... অনুষ্ঠানের একটা সময়ে সমস্ত বন্ধুর তরফ থেকে কবি রমেশ শীলকে কিছু বলতে অনুরোধ করলাম। সহজ অনবদ্য ভঙ্গীতে তিনি ছড়া কেটে সভাস্থ সকলকে ধন্যবাদ জানালেন।

বন্ধুগণ আজ আমরা জন্মদিনে
আমি নিরক্ষর জনে
যে আদর করালে প্রদর্শন
আপনাদের সৌজন্যে
আমিও হয়েছি ধন্য
তাই অভিনন্দন করিতেছি জ্ঞাপন

দীর্ঘ অনুষ্ঠানের একঘেঁয়েমি কোথায় যেন উড়ে গেল। বন্ধুরা খাট ছেড়ে কম্বলে নেমে জ্যাঠামশাইকে ঘিরে বসলেন। মনে হল ঠাকুরদা তার সামনের নতুন যুগের পরম স্নেহাস্পদদেরকে পরম তৃপ্তির সঙ্গে তাঁর আশীর্বাদ দিচ্ছেন : ৭৪ বছরের অভিজ্ঞতার আশীর্বাদ; চুয়াত্তর বছর ধরে তৈরি করা দীর্ঘ-জীবন সড়কের অভয়বাণী শোনাচ্ছেন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলাম, প্রতিটি কথা শুনলাম আর অবাক বিস্ময়ে ভাবলাম, জীবনের প্রতি বিশ্বাস, গতির প্রতি ভালোবাসা কতখানি আত্মজাত হয়ে গেলে এমনি সহজভাবে এমন শক্তির সৃষ্টি করে একজন লোক কথা বলতে পারে। সত্যের জন্য, মুক্তির জন্য স্বামীজীর শরণাপন্ন হয়েছেন তিনি, মাইজভাণ্ডারে আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু জীবনের ও সমস্যার অস্বাভাবিক ব্যাখ্যায় তিনি ঘা খেয়েছেন। জীবনের স্বাভাবিকতা, সৌন্দর্য ও গতির আকর্ষণ তাঁকে আবার জীবনের স্বাভাবিক পথে নিয়ে এসেছে।... আমি দুঃখ করে ভাবছিলাম: বিষয়কে লিখে তো কিছু হবে না। এ-ভঙ্গীকে আমি ফুটিয়ে তুলব কী করে। এ জীবনবোধকে লিখে রাখব কোন উপায়ে! এমন কোন সংকেত যদি জানতাম, যা শুধু কথা নয়– কথার ভাবকেও এমনিভাবে ধরে রাখতে পারে তাহলে হয়ত একে স্থায়ী করে রাখা সম্ভব হত।

বিচ্ছিন্নভাবে, সন-তারিখের খেয়াল না করে মাটির মানুষ রমেশ শীল কথা বলে বলে এগিয়ে যাচ্ছেন। শুনতে শুনতে এক জায়গায় চমকে উঠলাম : ৭৪ বছরের বৃদ্ধ কবি রমেশ শীল বলছেন :... জীবনের এমন দিনে কে যেন হাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে গেল 'সাম্যবাদের ভূমিকা'। আমি পড়লাম। মনে হল, আমার চোখের সামনে সব যেন বদলে গেল। আমি যেন এক নতুন রাজ্যে এলাম। প্রশ্ন জাগল মনে, কোথায় ছিলাম আমি।

তখনো নিশ্চয়ই তাঁর পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়স। ভাবলাম, নতুন চেতনাকে স্বীকার করার কী সহজ সবল ক্ষমতা! কারাগারে এসে অবধি অশিতিপ্রায় এই বৃদ্ধ গানে, গল্পে, হাসি-ঠাট্টায়, জীবনের উচ্ছ্বাসে সকল বন্দীকে অনুপ্রাণিত করে রেখেছেন; কতজনের কত দ্বন্দ্ব ও সংশয়কে মুছে দিয়েছেন। নিজে কখনও নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেন নি। অথচ কত সংশয়, কত যে ঝড়-ঝঞ্ঝার আঘাত গ্রহণ করে ক্রান্তিকালের পর ক্রান্তিকাল অতিক্রম করে মহৎ থেকে মহত্তর ভবিষ্যৎকে তিনি তৈরি করেছেন। রমেশ শীল বলে চলেছেন : '৪৭ সালের গোলযোগে ভেঙ্গে পড়লুম। কিন্তু '৫২ সালে ঢাকার ছাত্ররা, মুসলিম ছাত্ররা 'গুলি খাইল'। আমি সে ঘটনার কথা শুনে মনে মনে বললাম : 'না, আবার দেশ জাগবে। জাগবে। তারপর নির্বাচনকালের কথা তো বলার দরকার করে না। কিন্তু ৯২ ধারাতে আমার মনে গোশ্বা এল। পুলিশ আমার বাড়িতে হানা দিল। আমি পলাতক হলাম। তারপর একদিন গ্রেফতার হলাম। জেলে আসতে প্রথমে ভয় হয়েছিল। কিন্তু জেলে এসে বন্দী জগতের মানুষের যে স্নেহযত্ন পেয়েছি তাতে আমার মনে হয়েছে আমি যেন স্বর্গে এসেছি!'

AMARBOI.COM

চোখ তুলে দেখলাম, বৃদ্ধ কবি রমেশ শীলের চোখ থেকে তাঁর সামনের শতাধিক রাজবন্দীর প্রতি যেন স্নেহ দৃষ্টি ঝরে পড়ছে। কবি বলে চলেছেন : ২১শে ফেব্রুয়ারি এবার যখন দেয়ালের এপারে বসে ওপারের শ্লোগান শুনলাম আর পরদিন দেখলাম দলে দলে ছেলেরা-মেয়েরা বন্দী হয়ে আসছে, তখন ভাবলাম, না, জীবন মরে নি, জীবন আছে।

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন : ওরা আমার অনেক নিয়েছে, অনেক পাণ্ডুলিপি, অনেক গান।

এবার কণ্ঠ দৃপ্ততর করে বললেন : কিন্তু আছে আমার আরো বেশি। অনেক আছে।

আমরা চেতনার তন্ত্রীতে ঘা পড়ল। অপর কারু মুখে কথাটা দম্ভ বলে শোনাত। কিন্তু সমুদ্রের আবার দম্ভ কী? বহু যুগ আগের এক স্বভাব কবি ঘোষণা করেছিলেন: 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' আর এক যুগে সেই বাংলারই মাটির একান্ত কাছাকাছি আর এক কবি তাঁর সুরে কণ্ঠ মিলিয়ে বললেন : 'মানুষে মানুষে বিভেদ আমাকে বেদনা দিয়েছে।' আর তাই সমস্ত জীবন তিনি এমন এক জীবনের সন্ধান করে এগিয়েছেন, যেখানে মানুষে মানুষে কোন তফাৎ নেই। মেথর, মুঁচি, সম্প্রদায়ের ভেদ এবং শোষণের, অবমাননার যেখানে অবসান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে। সেই অনুসন্ধানে অনুসন্ধানে আজ মানুষের মহৎ স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণের নিশ্চিত সড়কে এসে বলছেন : আমি যেন নতুন জীবন পেলাম। আপনাদের মাঝে এসে মনে হচ্ছে আমার জীবনের স্বপ্ন সফল হবে। এক জাত, এক ভাত, এক কথা, এক ব্যথা আমি বাস্তবভাবে দেখতে পেয়েছি।

I will not rest!' কথাটা কতো সুন্দর। কথাটা শুনলাম আবার রমেশ শীলের মুখে : "আমার শরীরে হয়ত কুলোবে না। কিন্তু আমার মন আছে। আমার ইচ্ছা করে যদি সুযোগ পাই তবে আজ আবার আমি বাংলার সব জেলায় ঘুরে ঘুরে সুখ-দুঃখের গান গাই।"

বন্দীরা সবাই কবিকে জ্যাঠামশাই বলে ডাকে। জ্যাঠামশাই কথা কয়টি শেষ করে হেসে উঠলেন। আমি আফসোসে চমকে উঠলাম : আহ! শেষ হয়ে গেল এমন সুন্দর ভাষণটি।

রমেশ শীলের কবিতা ও গানের বই চট্টগ্রামে হয়ত কিছু পাওয়া যায়। কোন প্রতিষ্ঠান যদি তাঁর সমগ্র রচনা সংকলিত করে প্রকাশ করতেন, তাতে তাঁর জীবন বোধের সমগ্র প্রকাশ পাঠক সমাজ পেতে পারত। বন্দী নিবাসে তাঁর চৌকির কাছে বসে তাঁকে তাঁর কবিতা বলতে অনুরোধ করলেই নিজের স্মৃতির পট থেকে অবিরল ধারায় তিনি তাঁর কবিতা উদ্ধৃত করে শুনিয়েছেন।

'ও বাঙ্গালী ভাই রে, তুই রমনার পথ রক্তে ভাসাইলি' তাঁর এ রকম গান ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রায় সকল মানুষের কণ্ঠের গান ছিল। আমি তাঁর মারফতি ভাবের কয়েকটি গান কবির মুখ থেকে শুনে লিখে রেখেছিলাম। কারণ জন্মগতভাবে হিন্দু হয়েও তাঁর জীবনে ও সৃষ্টিতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের পুরাণ ও কাহিনী যে সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে প্রকাশিত হয়েছে তা আমাকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছে। বন্দী নিবাসে বসে কবির কাছ থেকে শোনা মারফতি কয়েকটি গানের কথা এখানে তুলে দিলাম।

১.
আউয়াল আখেরে মাওলা,
তুই মাওলা তুই রে।
জাহেরে বাতেনে মাওলা তুই রে,
হাসরে নশরে মাওলা তুই
মাটির পুতলা বানাই
সঞ্চারিলি রুহু।
ওঠে আদমের কলবে আওয়াজ...
আল্লাহু আল্লাহু ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়া জলেতে ডুবাই
কেয়ামত দেখালি
ঘোর তুফানে নুর নবীর
কিস্তিখান বাঁচালি ॥
বোয়াল মাছে গিলেছিল
ইউনুস পয়গম্বরে
দোয়া ইউনুস অছিলায়
মুক্ত করলি তারে ॥
খলিলকে আগুনে ঢালে
নমরুদ বেঈমান
জ্বলন্ত আগুনে দেখালি
ফুল বাগান ॥
ছালে জঙ্গীর পরে আসি
দেখালি প্রতাপ
বোগদাদে করে দিলি
কবর আজাব মাফ ॥
মনসুরের কলবে ঢুকি
'আনাল হক' বানালি
শূলেতে চড়াইয়া আবার
জগতকে দেখালি ॥
মানুষের কলবে থাক,
কেউ পায় না চিন
আজমীরে উদয় হলি
খাজা মইনুদ্দীন ॥
(এবার) খাতেমুল বেলায়েত নিয়ে
ভাণ্ডারে* উদয়
রমেশ বলে, ঠিক চিনেছি,
আর তো কেহ নয় ॥

২.
তোর খোদা তোর সঙ্গে আছে
চিনে লও তারে

* ভাণ্ডারের–মাইজ ভাণ্ডারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্ঞান নয়নে দৃষ্টি কর
হৃদি মাঝারে ॥
আগে শিখ পীরের যতন,
পীর উছিলায় পাবি চেতন
দেখবি রে অমূল্য রতন
নিজের ভিতরে।
কীটপতঙ্গ গাছে মাছে
ভুবনে যা যত আছে
এক ভাণ্ডারী খেলিতেছে
সকলে পরে॥
বিশ্বরাজ্যে একজন রাজা
যার গুণে এই জগৎ তাজা
রমেশ কয় সে মারে মজা
যে বুঝতে পারে।

৩.

মাওলা, এশকের মামেলা বুঝে
সাধ্য আছে কার
এশকেতে মজিয়া প্রভু
সৃজিল সংসার।
আশেকীরা এশকের জোরে
অঘটন ঘটাইতে পারে
মেয়েমানুষ পুরুষ করে
বোগদাদে প্রচার।
এশকবাজী সহজ নয়।
ডাকাইত আউলিয়া হয়
সাক্ষী আছে নিজামউদ্দীন
আউলিয়ার সর্দার।
করনেতে ওয়াজকরনী,
নবীর দন্ত পড়ে শুনি
সর্বদন্ত ফেলে দিল
এশকে আপনার।
শমশের তবরেজ প্রেমে ব্যস্ত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুলে দিল নিজের পোস্ত*
মাওলার প্রেমে হেস্তনেস্ত
মস্তই কারবার।
রমেশ বলে ভাবি মনে,
সাধন হয় না, এশক বিনে
শুকনা গাছে ফুল ফোটে না,
করে চাও বিচার।

৪.
নিশি তোরে যায় ফাঁকি দিয়া রে
 সোনার আদম
নিশি তোরে যায় ফাঁকি দিয়া।
অজু কইরে হও পাক।
তনুমন কর ছাপ
বস নিজের তজবী হাতে লইয়া।
পড় মাবুদের কালাম
মুর্শিদ আউলিয়ার নাম
মুশকিলেতে যাবে আসান হইয়া।
আলেম তালেব যত
নিশিতে হয় অনুগত
... ...

---

* পোস্ত- চামড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের 'ইসলামাবাদ'

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের 'ইসলামাবাদ' কিংবা 'ইসলামাবাদ'-এর আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ– যেভাবেই বলি না কেন, এ কথা বলতে আমার মনে একটি সশ্রদ্ধ আবেগের সঞ্চার হয়।

বয়োজ্যেষ্ঠদের অনেকের সঙ্গে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। আমার সে সৌভাগ্য হয় নি। প্রবীণ সাহিত্যিকদের পরিচয়দান থেকেই সাহিত্য বিশারদের সাধনা, জীবন এবং তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কিছু কথা আমি জানতে পেরেছি। কিন্তু যদি সেরূপ পরিচয়ও দুর্লভ হত, তাহলেও আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের একমাত্র 'ইসলামাবাদ' পুস্তকখানি আমার ন্যায় যেকোন আগ্রহী পাঠকের মনে লেখক সম্পর্কে অসীম শ্রদ্ধার ভাব উদ্রেক না করে পারবে না।

শব্দ দিয়ে সাহিত্য হয়। শব্দ দিয়ে পুস্তক রচিত হয়। শব্দের যারা কারিগর তাদের পক্ষে পুস্তক রচনা অনায়াস সাধ্য ব্যাপার। প্রবন্ধ, কাব্য, উপন্যাস সর্বক্ষেত্রেই এ কথা সত্য। কিন্তু শব্দ স্রষ্টার স্বাক্ষর খুব কম ক্ষেত্রেই বহন করে। আমরা কতো উপন্যাস, গল্প কিংবা প্রবন্ধ পাঠ করি। কিন্তু তার ক'খানার মধ্যে শব্দের সঙ্গে শব্দের স্রষ্টাকেও মূর্ত হয়ে উঠতে দেখি? শব্দ মাত্রই স্রষ্টাকে মূর্ত করে না বলেই শব্দ নিয়ে খেলা করা আমাদের পক্ষে যেমন সম্ভব, তেমনি শব্দের কারচুপিতে জীবনকে ফাঁকি দেওয়াও আমাদের পক্ষে সহজ। আমরা তাই করি। কিন্তু এমন জীবন-শিল্পীরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যাঁরা ফাঁকি কাকে বলে জানেন না। তাঁদের যে কোন সৃষ্টিতে, যে কোন আচরণে জীবনের প্রতি তাঁদের অবিচল সততার সাক্ষাৎ অনস্বীকার্যভাবে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে। এমন শিল্পীর কোন সৃষ্টির সংস্পর্শে যখন আমরা আসি, তখন কেবল যে স্রষ্টার একনিষ্ঠতার আভাস আমরা পাই, তাই নয়; তাঁর ঘনিষ্ঠতর সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য মনে আমাদের আগ্রহের সঞ্চার হয়।

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ এমন একজন শিল্পী ছিলেন। নিজের দেশ, সমাজ, পরিবেশ, প্রকৃতি, ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম সবকিছুকে তিনি একান্ত করে ভালোবেসেছিলেন। সেই ভালোবাসা থেকে তিনি বাংলাদেশের, বাংলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যের এবং মুসলমান সমাজের অনাবিস্কৃত ও অনাহৃত সম্পদ ও ঐতিহ্যকে আবিষ্কার ও আহরণ করার সাধনাকে বরণ করে নিয়েছিলেন। এ সাধনায় কেউ তাকে বৃত্তি মঞ্জুর করে নি, নিজের সমাজ তাকে তেমন সাহায্য বা স্বীকৃতিও দেয় নি। এ ক্ষোভ আমৃত্যু তাঁর সমস্ত আলোচনা, ভাষণ ও বক্তব্যেই উচ্চারিত হয়েছে। জীবিকার ক্ষেত্রে উচ্চপদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন না; বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার কোন পদবি প্রাপ্ত হয়ে সে পদবির দাবি নিয়ে ঘুরে বেড়ান নি। তাই গ্রামবাংলার ভাষা ও সাহিত্যের প্রমাণপঞ্জী সংগ্রহের যে ব্যাকুলতা ও একনিষ্ঠতা তাঁর জীবনে দেখা যায় তা সাধারণ শিক্ষিত সমাজে একেবারেই একক ও দুস্প্রাপ্য। আর সে কারণেই অসীম বিস্ময়ের সঞ্চারক।

অসংখ্য পুঁথির সংগ্রহ চেষ্টা, সংগ্রহ ও পরিচয় প্রদান ছাড়া আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের বিখ্যাত কবি সৈয়দ আলাওলের পদ্মাবতীর সম্পাদনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্পাদিত সে গ্রন্থ আজো কেউ প্রকাশ করে নি। এ ঘটনা আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের সাধনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার আন্তরিকতার সাক্ষ্য বহন করে না। সাহিত্য বিশারদের যে কোন ভাষণ ও প্রবন্ধের মধ্যেই আমাদের দেশ ও তার সাহিত্যিক ঐতিহ্যের প্রতি গভীর আবেগ ও ভালোবাসার ঘোষণা রয়েছে। এ সমস্ত ভাষণও এখনও পর্যন্ত সংকলিত হয় নি।

AMARBOI.COM

এক্ষেত্রে তাই বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে ১৯৬৪ সালে সাহিত্য বিশারদের 'ইসলামাবাদ' প্রকাশ এ কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলা একাডেমী অন্ততঃ তাঁর একখানা পুস্তক প্রকাশ করে তাঁকে পাঠক সাধারণের সামনে উপস্থিত করে দিয়েছেন।

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ চট্টগ্রামের পুরাতন নাম ইসলামাবাদকে পছন্দ করতেন। চিটাগাং, চট্টগ্রাম কিংবা চাটগাম নামও আধুনিক নয়। "খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে ইহা সম্পূর্ণভাবে আরাকানের মগরাজ কর্তৃক অধিকৃত হয়। কথিত আছে, দেশ অধিকার করিয়া এই রাজা চট্টগ্রামে 'চিৎ-ত-গৌঙ্গ' (Tsit-ta-gung) বা 'যুদ্ধ করা অন্যায়' এই বাক্য সম্বলিত ও রাজ্যের সীমা নির্দেশক এক জয় স্তম্ভ স্থাপন করেন।" কিন্তু "মুসলমান আমলে 'চাটগাম' এই নাম পরিবর্তিত হইয়া 'ইসলামাবাদ' নাম প্রচারিত হয়। কেহ কেহ বলেন, নবাব ইসলাম খাঁ মাশহাদী মগ ও পর্তুগিজ বম্বেটিয়াদিগের অত্যাচার নিবারণার্থ চট্টগ্রাম জয় করিয়া নিজের নামে ইহার 'ইসলামাবাদ' নামকরণ করিয়াছেন।" পূর্বে প্রচলিত এই ধারণা যে আজকাল স্বীকৃত নয় সে কথাও লেখক উল্লেখ করেছেন। "নবাব শায়েস্তা খাঁর পুত্র বুজুর্গ উমেদ খাঁ-ই চট্টগ্রাম জয় করিয়া মগ ও পর্তুগিজদের অত্যাচার হইতে এই অঞ্চল নিরাপদ করেন। তিনি 'চাটিগাম' নাম পরিবর্তন করিয়া উহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসলামাবাদ নাম প্রচার ও উহাকে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ইহাই এখন সর্ববাদী সম্মত সত্য।"

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ১৩২৫-২৬ সালের মাসিক সওগাতে 'ইসলামাবাদ' নামে যে ধারাবাহিক প্রবন্ধমগুলী প্রকাশ করতে থাকেন তার সংকলনেই বর্তমান পুস্তক। কিন্তু ইসলামাবাদ নামেই বইখানির সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় আমাদের কাছে ধরা পড়ে না। গ্রাম বাংলার মাটি রসের নরম প্রাণ, আবেশ ও উদারতার পরিপূর্ণ প্রতীক স্বরূপ যেমন ছিলের আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ নিজে, তেমনি তাঁর 'ইসলামাবাদ' পূর্ববাংলার একটি বিশিষ্ট অঞ্চলের মানুষের আচার-আচরণ, ধর্ম, বিশ্বাস, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তার ভৌগোলিক বিবরণ, রাজনৈতিক বিবর্তন, ইতিহাস, অর্থনীতি, বাণিজ্যিক ঐতিহ্য ও তার ভাষার সম্ভারের উপর গভীর আন্তরিকতা ও পরিশ্রমের সঙ্গে লিখিত একখানি সংক্ষিপ্ত জ্ঞানকোষ বিশেষ। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত সংস্করণের সম্পাদনা করেছেন সৈয়দ মুর্তজা আলী। ঐতিহাসিক বিবরণের ক্ষেত্রে যেখানে তথ্যগত ভুল তাঁর নজরে পড়েছে পাদটিকা সহযোগে তিনি তার উল্লেখ করেছেন। এতে পুস্তকখানির গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ঐতিহাসিক ছিলেন না। তিনি তাঁর প্রিয় জন্মভূমি ইসলামাবাদকে তাঁর সাধ্যমতে পরিপূর্ণরূপে বিশ্বের রসিকজনের সামনে পরম আকর্ষণীয় ও মহৎ ঐতিহ্যপূর্ণ দেশ হিসাবে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছেন। লোককথা, বিশ্বাস, সংস্কার, ইতিহাস, সাধু-অসাধু বুলির ব্যবহার সব নিয়েই মানুষ, সব নিয়েই মানুষের আবাসভূমি। তার সত্যিকারের পরিচয়ের ক্ষেত্রে কোন দিকই অবজ্ঞাত, অনালোচিত থাকতে পারে না। তাই একদিকে যেমন ইসলামাবাদের কোন দরগা বা মন্দিরের পরিচয় এবং তার স্থাপনা সম্পর্কিত লোক বিশ্বাসকে তিনি উপেক্ষা করেন নি, তেমনি পূর্ব-বাংলার শাসনেতিহাসের কোন তথ্যকে সংগ্রহ করে উল্লেখ করতেও তিনি তার স্বভাবজাত নিষ্ঠা ও পরিশ্রম ব্যয়ে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নি। এই অপরিসীম পরিশ্রমের কথা উল্লেখ করে সৈয়দ মুর্তজা আলী বলেছেন, "এই বইতে চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক বিবরণ, বাণিজ্য, বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়, মুসলমান অধিবাসী ইত্যাদি অধ্যায় অত্যন্ত মূল্যবান। এগুলো তাঁর গবেষণা ও ভূয়োদর্শনের পরিচায়ক। প্রাচীন ইতিহাস, ত্রিপুরার অধিকার, মুসলমানদের চট্টগ্রাম বিজয়, পর্তুগিজ অভিযান, শায়েস্তা খাঁর চট্টগ্রাম বিজয়, ইত্যাদি অধ্যায় প্রধানতঃ চিটাগাং ডিসট্রিক্ট গেজেটিয়ার ও আরাকানের ইতিহাস থেকে সংগৃহীত।" পুস্তকের প্রারম্ভে সম্পাদকের লিখিত সাহিত্য বিশারদের জীবনী থেকে আমরা তাঁর শিক্ষা ও চাকরি জীবনের নানা কষ্ট ও যন্ত্রণার কথা জানতে পারি। স্কুলের শিক্ষকতা, চট্টগ্রামের কমিশনার অফিসের কিংবা শিক্ষা বিভাগে কেরানি হিসাবে নিযুক্ত থাকা অবস্থাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর অহোরাত্রির চিন্তা ছিল অবজ্ঞাত পুঁথি সংগ্রহ এবং তার পরিচয় প্রদান। এজন্য কবি নবীনচন্দ্র সেনের উৎসাহে যেমন তিনি স্থানীয় 'জ্যোতি' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে বলেছিলেন, "যাঁরা আমাদের হাতে-লেখা পুঁথি সংগ্রহ করে দিবেন তাঁদের বিনামূল্যে এক বছর 'জ্যোতি' দেওয়া হবে।" তেমনি শিক্ষা বিভাগে কর্মরত অবস্থায় স্কুলসমূহের আর্থিক সাহায্যাদির নথির কাজ ত্বরান্বিত করার শর্ত হিসাবেও তিনি বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক বা সেক্রেটারীর কাছে পুঁথি সংগ্রহ করে দেওয়ার দাবি জানাতে কসুর করেন নি। এতে বিভিন্ন সময়ে নীচমনা সহকর্মীদের কাছ থেকে শুধু অপবাদেরই তিনি লক্ষ্য হন নি; কমিশনারের অফিসের চাকরিটিও তাঁকে হারাতে হয়েছিল।

চট্টগ্রামের ইতিহাস এবং জনসাধারণের ঐতিহ্যের পরিচয় ব্যতীত 'ইসলামাবাদ' পুস্তকের অপর যে মূল্যবান বৈশিষ্ট্য সে হচ্ছে পূর্ব বাংলার এবং বিশেষ করে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার শব্দভাণ্ডারের বৈচিত্র্য, জটিল ভাবের অনুপম বাহক তৈরিতে চট্টগ্রামের ভাষার ক্ষমতা এবং জনতার মুখের ভাষার অন্তর্নিহিত ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ের সুবিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ। পুস্তকের একদিকে যেমন সাহিত্য বিশারদ নিজেকে একজন ঐকান্তিক দেশপ্রেমিক বলে প্রকাশ করেছেন, অপর অংশে তেমনি নিজেকে একজন বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক হিসাবে প্রমাণ করেছেন। আমাদের ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিতগণই সাহিত্য বিশারদের এ কর্মের সঠিক মূল্যায়ন করতে পারবেন। এখানে কেবল বর্তমান পুস্তকের প্রকাশক বাংলা একাডেমীর তৎকালীন পরিচালক সৈয়দ আলী আহসানের এবং পুস্তকের সম্পাদক সৈয়দ মুর্তজা আলীর স্বীকৃতির উল্লেখ করে বলা যায়, "উক্ত অঞ্চলের ভাষা সম্পর্কে তাঁর আলোচনা ভাষাতত্ত্ববিদের দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য", কারণ "চট্টগ্রামের কথ্য ভাষার ব্যাকরণ, এর মৌলিক উপাদান ও মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে লেখকের গবেষণা অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের।"

সাহিত্য বিশারদের 'ইসলামাবাদ' সম্পর্কে যেটি সবচেয়ে বড় কথা সে হচ্ছে, এই বইতে তাঁর আর একটি মনোমুগ্ধকর বৈশিস্ট্যের সাক্ষাৎ পাই। এ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর রচনার আশ্চর্য সুন্দর দ্যোতনা। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ কেবল পুঁথি সংগ্রাহক ছিলেন না। তিনি চট্টগ্রামের লোক বলে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার বিশ্লেষণেই কেবল দক্ষতা দেখান নি। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ জাতীয় আন্তর্জাতিক সাহিত্য ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ সম্পদের সঙ্গে যেমন ছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, সাহিত্যের জ্ঞানে তিনি যেমন ছিলেন জ্ঞানী, তেমনি ছিলেন তিনি বাংলা ভাষার একজন মহৎ শিল্পী। ইতিহাসের পুস্তক মনে করেই এতদিন ইসলামাবাদ পড়ি নি। কিন্তু পাতা খুলে যেদিন পড়তে আরম্ভ করলাম :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ইসলামাবাদ প্রকৃতির চির লীলা নিকেতন! প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ইহার সহিত তুলনীয় হইতে পারে, ভারতে এমন স্থান অতি অল্পই আছে। প্রকৃতি সুন্দরী তাহার সকল সুন্দর বস্তু হইতে তিল তিল সৌন্দর্য আহরণ করিয়াই যেন আমাদের জন্মভূমির গায়ে মাখাইয়া দিয়াছেন। ইহাকে সৌন্দর্য ললাম ভূতা সৌন্দর্যের রানী বলিলেও তাহার কিছুই বর্ণনা করা হয় না। সৌন্দর্যের উপাসকগণ ইহার মুনিমন লোভন চিত্র দেখিয়া ভাবে আত্মহারা হইবেন। ঘোর সংসারী হইতে সংসারবিরাগী যোগীজন পর্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষেই ইহা পরম মনোরম স্থান। আমাদের এই তালতমাল তরুরাজিনীলা শস্য শ্যামলা জন্মভূমির চতুর্দিকে অনন্তবিস্তৃত বারিধি ও পর্বতশ্রেণী প্রিয় সহচরীর ন্যায় সৌন্দর্য সম্ভার হস্তে সতত দণ্ডায়মান!" তখন এ ভাষার ব্যঞ্জনা, শব্দের সম্ভার, বর্ণনার অনায়াসগতি ও আবেগ 'ইসলামাবদ' এর সঙ্গে আমাকে যেন এক আনন্দময় আকর্ষণে বেঁধে দিল। বস্তুতঃ উপরের কয়েকটি মাত্র ছত্রের উদ্ধৃতি লেখকের এই ব্যঞ্জনাকে স্পষ্ট করে তুলতে পারে না। এ ভাষার সঙ্গে আজ আর আমরা পরিচিত নই। আমাদের সাহিত্যিকরা আজ সাদামাটা ভাষায় কথা বলেন। সে কথার বস্তু একেবারেই আভরণহীন। সাহিত্য বিশারদ কেবল কথা বলেন নি। সুন্দর করে বলেছেন। এ রচনা রীতিতেই প্রকাশ পায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আরবি-ফার্সি-সংস্কৃত সমস্ত ঐতিহ্যকে তিনি কিরূপ আন্তরিকতা ও দক্ষতার সঙ্গে আত্মস্থ করেছিলেন। সাহিত্য বিশারদের বিভিন্ন অভিভাষণের মধ্যেও তাঁর এই সাহিত্যিকগুণের পরিচয় পাওয়া যায়, এতেই বুঝতে পারা যায় এই রচনারীতি তাঁর হাতে কিরূপ অনায়াস কর্মের স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছিল। মর্যাদাবান রচনা শৈলীর একটি উত্তম দৃষ্টান্ত হিসাবে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের 'ইসলামাবাদ' পুস্তকের মুখবন্ধটি আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য পাঠভুক্ত হওয়ার দাবি রাখে।

১৯৬৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোমেন চন্দ কে?

১৯৬৯ সালের সেই উত্তাল উত্থানের দিনের কথা। কিছু সংখ্যক তরুণ সোমেন চন্দের স্মৃতি বার্ষিকী পালন করবেন বলে একটি উপযুক্ত স্থান খোঁজ করছেন। শেষ পর্যন্ত স্থানের জন্য আবেদন করলেন তাঁরা একটি সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাছে। আবেদন দেখে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন : কে এই সোমেন চন্দ? প্রশ্নের অবজ্ঞার ভঙ্গী ও উগ্রতায় আবেদনকারী তরুণটি হতবাক। তার পক্ষ হয়ে আমি বললাম : ঢাকারই একজন সাহিত্যিক। সাহিত্য প্রধান বললেন : আমাদের স্মরণে নেই। জবাবে তেমনি অস্বীকারের জেদ। তবু সেদিন যে তাঁকে সোমেন বার্ষিকীর জন্য একটু স্থান ছেড়ে দিতে হয়েছিল সে তাঁর ঔদার্য নয়, সে উনসত্তরের অপরাজেয় আন্দোলনেরই জের।

কিন্তু সেমেন কে, এ প্রশ্ন আজ পূর্ববঙ্গের সমগ্র অগ্রসর মন ও মানসের প্রশ্ন। পূর্ববঙ্গের যা কিছু মহৎ ঐতিহ্য তাকে অজ্ঞতা ও অস্বীকারের গহ্বর হতে খনন করে সূর্যের আলোয় জীবনের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায় সোমেন চন্দের পুনরুদ্ধার এবং সোমেনের পরিচয় দান আজ অপরিহার্য।

সোমেন সাহিত্যিক ছিলেন, এটাই সোমেনের বড় পরিচয় নয়। বাইশ বছরের একটি যুবক। গরিব মধ্যবিত্ত মা-বাবা। অনেক ভাই-বোন। মিটফোর্ডে ডাক্তারী পড়ার জন্য ভর্তি হয়েছে। কিন্তু ডাক্তারী পড়ার চেয়ে অধিক আগ্রহ মানুষের জীবনকে জানার, ইতিহাসের ঠিকানাকে উপলব্ধি করার। ১৯৪২ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীকে গ্রাস করেছে। ফ্যাসিস্ট ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সেদিনকার একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দেবার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর আঘাত হানছে। পরাধীন দেশের মানুষ শতধাবিভক্ত। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা চলছে। ভাই ভাই-এর বুকে ছুরি হানছে। অসহায় নিষ্পাপের রক্তে মাটি লাল হচ্ছে।

ইতিহাসের এই জটিল যুগ-সন্ধিক্ষণে সেই বাইশ বছরের যুবক সোমেন আশ্চর্য স্বচ্ছ দৃষ্টি দিয়ে বিভ্রান্তির সমস্ত কুয়াশা ভেদ করে আগামীর দিকে তাকিয়েছেন। ইতিহাসের সড়ক স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি হয় না। তাকে তৈরি করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়। ইতিহাসের সেই সড়ক তৈরিতে সোমেন নিজের হাত লাগিয়েছেন এবং মানুষের জন্য সুন্দরতর সমাজ গড়ার কামনায় সেই ইতিহাসের সড়কে নিজের জীবন দান করেছেন।

১৯৪২ সালের ৮ই মার্চ সোমেন নিহত হয়েছেন।

তখন তিনি হয়ত বাইশ বছরে মাত্র পা দিয়েছেন।

সোমেন কেবল সাহিত্যিক ছিলেন না। সোমেন ছিলেন জীবনের সৈনিক। বয়সের বিবেচনায় অত্যদ্ভুতভাবে সজ্ঞান, সতেজ ও সাহসী। সাহিত্যিক সৃষ্টি এসেছে তাঁর এই জীবনের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও উপলব্ধির ফসল নিয়ে। এজন্যই যুবক সোমেন যে কয়টি গল্প লিখেছিলেন, তাঁর এই অল্প পরিসর জীবনে, তার সব কটিতে আছে দৃষ্টির স্বচ্ছতা ও অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর। আর এ কারণেই সোমেন-রচনার প্রকাশ সেদিনকার বঙ্গ-সাহিত্যে বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার করেছিল এবং তার হত্যা বাংলাদেশকে বেদনায় বিমূঢ় করে দিয়েছিল।

১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকার প্রতিরোধ পাবলিশার্স সোমেন চন্দের 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প' নামে একটি সংকলন প্রকাশ করেন। সে গ্রন্থ আজ দুষ্প্রাপ্য।

প্রায় আটাশ বছর পরে কয়েকজন তরুণ বন্ধুর উদ্যোগে সেই দুষ্প্রাপ্য পুস্তকখানা হাতে পেয়ে তার 'রাত্রি শেষ', 'স্বপ্ন', 'একটি রাত', 'সংকেত', 'দাংগা' এবং 'ইঁদুর' গল্প কয়টি পড়তে পড়তে যেন কোনদিন না পড়া সদ্য নতুন সৃষ্টির অনাস্বাদিত এক আনন্দ লাভে মনটা ভরে উঠল।

AMARBOI.COM

সোমেনের আরো কিছু গল্প ছিল। তাদের মধ্যে 'বনস্পতি' সাহিত্যিক মহলে সুপরিচিত ছিল। সোমেনের আর কোন গল্পের বই হয়ত প্রকাশিত হয়নি। পূর্ববঙ্গের প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে সোমেনের 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প'র নতুন সংস্করণ প্রকাশ করে পাঠক সাধারণের কাছে পেশ করা এবং সোমেনের সংগ্রামী জীবনের কাহিনী তুলে ধরা।

সোমেন চন্দের 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প' সংকলনটি বেরিয়েছিল সোমেন নিহত হওয়ার পরে। কিন্তু এই বই-এর ভূমিকাতে প্রকাশক সোমেনের কোন জীবনী জুড়ে দিতে পারেন নি। শুধু 'নিবেদন'-এর শেষে সোমেনের জীবনকালের উল্লেখ মুদ্রিত হয়েছিল :

জন্ম ১৯২০

মৃত্যু ৮ই মার্চ, ১৯৪২।

সেদিন হয়ত সোমেনের জীবনীর প্রয়োজন ছিল না! সোমেন সেদিন উদ্বেলিত বাংলার রাজনৈতিক মহলে আর তার প্রাগ্রসর সাহিত্যের দরবারে অপরিচত ছিলেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু আজকের পূর্ব বঙ্গ সোমেনকে আরো অন্তরঙ্গ করে জানতে চায়। কেননা পূর্ববঙ্গের প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলন ও জঙ্গম জীবনবোধের উদগাতা ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সোমেন চন্দ।

১৯৪২ সালের ডিসেম্বরে সোমেনের 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প' প্রকাশ করতে যেয়ে প্রতিরোধ পাবলিশার্স লিখেছিলেন : "প্রত্যেক উদীয়মান সাহিত্যিকের মতো সোমেন চন্দেরও ইচ্ছা ছিল তার ছোট গল্পগুলি একত্র করে একটি বই বার করার। প্রায় দুই বছর আগেই একটি বই তার জমেছিল। কিন্তু আমরা তার বন্ধুরাই তাকে নিরস্ত করেছিলাম। কারণ আমরা দেখেছিলাম যে, তার গল্পের রূপ এমনভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এমন একটা স্তরে তার লেখা উঠেছে যার ফলে কয়েকদিন অপেক্ষা করে বই বার করলেই সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। বাংলা সাহিত্যে তাকে আমরা পরিচিত করতে চেয়েছিলাম এক নতুন রূপ-স্রষ্টা হিসেবে। ...কিন্তু ফ্যাসিস্ট গুণ্ডাদের ছুরিকাঘাতে সোমেন চন্দ প্রাণ হারাল।" প্রকাশক সেদিন সেই ঘটনার কথা আর বিস্তারিত লেখেন নি। কারণ, সেদিন তা বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের কার না জানা ছিল? আর কি ইঙ্গিতময় সে জীবনদান!

রেল শ্রমিকদের মিছিল চলছে ফ্যাসিস্টবিরোধী সম্মেলনে যোগদান করতে। রেল শ্রমিকদের প্রিয় কর্মী সোমেন চন্দ শ্রমিকদের পতাকা হাতে সেই মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছে। মিছিল চলেছে একরামপুরের রাস্তা দিয়ে। অতর্কিতে গুণ্ডাদের হামলা হল সে মিছিলের উপর। হতচকিত সোমেনকে মিছিল থেকে বিচ্ছিন্ন করে ওরা নিয়ে গেল একটা গলিতে। ছুরির নির্মম আঘাতে আঘাতে সোমেনকে ওরা খুন করল। আর তারপরে ছুরির অগ্রভাগ দিয়ে সোমেনের চোখ ওরা উপড়ে ফেলল। কারা ছিল সেদিনকার হত্যাকারী? এদেশেরই মানুষ। যে বিভ্রান্ত চেতনা থেকেই তারা সেদিন শ্রমিকদের মিছিলে আর তার অগ্রনেতা সোমেনের উপর বর্বর হামলা করুক না কেন, ইতিহাসে তারা চরম প্রতিক্রিয়ার বাহন হিসাবেই পরিচিত হয়ে থাকবে।

সোমেনের বিখ্যাত 'ইঁদুর' গল্পের একখানে গল্পের নায়ক তার শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মীর সংগ্রামী মনের পরিচয় পেয়ে বলেছেন: "এ কথা বলাই বাহুল্য যে, ইতিহাস যেমন আমাদের দিক নেয়, আমিও ইতিহাসের দিক নিলুম। আমি হাত প্রসারিত করে দিলুম জনতার দিকে। তাদের উষ্ণ অভিনন্দনে আমি ধন্য হলুম।" ইতিহাসের সেই অগ্রপথিককে সেদিন হত্যা করে নিস্তব্ধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু জনতার সংগ্রামী রাস্তা তার বুকের রক্তে আরো দৃঢ় হয়েছিল, আরো সহজ হয়েছিল। সেই অগ্রপথিকের জীবনের ইতিহাস না জেনে আজকের জঙ্গম জীবনে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোমেনের গল্প সংকলনটিতে ছয়টি গল্প আছে। এ গল্পগুলির প্রত্যেকটি যে ছোটগল্পের কাঠামোতে নিটোল, এমন নয়। গল্পগুলি লেখক গল্প তৈরি করতে যত না লিখেছেন তার চেয়ে বেশি তিনি যেন এতে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর রাখতে চেয়েছেন। আর তাই এর কোনটিকেই কৃত্রিম বলে বোধ হয় না! 'একটি রাত' রাজনৈতিক কর্মী সুকুমারের জীবনের একটি টুকরা। দারিদ্র্যে পোড়া জননীর মর্মব্যথা, ছেলের জন্য ব্যাকুল উদ্বেগ। নায়কের জন্য একটি পড়শী তরুণীর কারুর না-জানা আবেগ, বাড়িতে রাজনৈতিক কর্মীদের গমনাগমন এবং পুলিশের হামলা। 'সংকেত'-এ লেখক শ্রমিকদের রুটি রুজির লড়াই আর তাকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য মালিকদের ষড়যন্ত্রের একটি কাহিনী দিয়েছেন। 'দাংগা' লেখকের জীবনবোধের আর একটি অবিস্মরণীয় প্রকাশ। এ কাহিনী ঘটনার দিন-ক্ষণকে অতিক্রম করে ভ্রাতৃঘাতী দাংগার কুয়াশা ভেদের অগ্নিশিখার মতো আজো কাজ করছে।

সাম্যবাদী দলের কর্মী অশোক বাড়ি আসতে দেখেছে নওয়াবপুরের রাস্তায় ঢুকতে রেলক্রসিং-এ একটি গ্রাম্য নিরীহ লোককে নিহত হতে।

" লোকটা মাঠ ছেড়ে রাস্তায় পড়লো। তার পরনে ছেঁড়া ময়লা একখানা লুঙ্গি, কাঁধে ততোধিক ময়লা একটা গামছা, মাথার চুলগুলি কাকের বাসার মতো উস্কুখুস্কু, মুখটি করুণ। তার পায়ে অনেক ধুলো জমেছে, কোনো গ্রামবাসী মনে হয়।

"এমন সময় কথাবার্তা নেই দুটি ছেলে এসে হাজির, তাদের একজন কোমর থেকে একটা ছোরা বার করে লোকটার পেছনে একবার বসিয়ে দিল, লোকটা আর্তনাদ করে উঠলো, ছেলেটি এতুটুকু বিচলিত হল না, লোকটার গায়ে যেখানে সেখানে আরো তিনবার ছোরা মেরে তার পর ছুটে পালালো...লোকটা আর্তনাদ করতে করতে গেটের কাছে গিয়ে পড়ল, তার সমস্ত শরীর রক্তে ভিজে গেছে, টাটকা লাল রক্ত..." মানুষের মন কি অদ্ভুতভাবে বিভ্রান্ত। ভাই ভাইকে মারছে। মানুষ মানুষকে মারছে। কিন্তু এ বিভ্রান্তির জাল ভেদ করে সেদিন দৃষ্টি প্রসারিত করতে পেরেছিল ক'জন? আজো পারছে ক'জন? বিভ্রান্ত সমাজের উপর সমালোচনার কশাঘাত এসেছে কিংবা আসছে এমনভাবে ক'জনার হাতে, যেমন এসেছে সোমেনের রচনায়?

"কারফিউ জারি হয়েছে। পাড়া ঘেরাও হয়েছে...

"অশোক মন্থর পায়ে হেঁটে বাসায় গেল। এই মাত্র আর একটা ঘটনার সংবাদ পাওয়া গেল। দোলাইগঞ্জ স্টেশনের ডিসটান্ট সিগনাল পার হয়ে এক বৃদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাচ্ছিল– ঘটনার বিবরণ শুনতে আর ভালো লাগে না! কখনো নিজেকে এত অসহায় মনে হয়।"

অশোকের বাবা মধ্যবিত্ত কর্মচারী। হিটলারের বিজয় অভিযান তাকে গর্বিত করে তোলে। তার ভবিষ্যদ্বাণী, হিটলার রাশিয়াকে শেষ করে দিল বলে। অশোকের ভাই অজয় 'হিন্দু সোসালিস্ট।'

"সম্প্রতি দাংগার সময়ে জিনিসটির পত্তন হয়েছে। এই বিষয়ে শিক্ষা নিতেই সে পাগলের মতো ঘোরাফেরা করে, হিটলারের জয়গান করে। হানাহানিতে প্রচুর আনন্দিত হয়। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে: নবাব বাড়ি সার্চ হয়ে গেছে।

অশোক চোখ পাকিয়ে বললে : এটি কোত্থেকে আমদানি শুনি!

: বারে! আমি এই মাত্র শুনলুম যে!

: তোমার দাদারা বলেছে নিশ্চয়?

: বারে! আমি নিজের কানে শুনেছি। একটা সোলজার আমায় বললে।

: তোমায় কচু বলেছে।

অজু কর্কশ স্বরে বললে : তোমরা তো বলবেই। তার পর মৃদুস্বরে : তোমরা হিন্দুও নও, মুসলমানও নও–

"আমরা ইহুদির বাচ্চা না রে?" অশোক হা হা হেসে উঠল...

"কয়েকদিন পরে। অশোক সাইকে চড়ে একটা সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মিটিং-এ যোগদান করতে যাচ্ছিল। এক জায়গায় নির্জন পথের মাঝখানে খানিকটা রক্ত দেখে সে সাইকেল থেকে নেমে পড়লো। সারা-দিন আকাশ মেঘাবৃত ছিল বলে রক্তটা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় নি। এখনো খানিকটা লেগে রয়েছে। কার দেহ থেকে এই রক্তপাত হয়েছে কে জানে? অশোকের চোখে জল এল, সবকিছু মনে পড়ে গেল। সে চারিদিক ঝাপসা দেখতে লাগলো। ভাবলো, এই চক্রান্ত ব্যর্থ হবে কবে?"

সোমেনের 'ইঁদুর' গল্পটি প্রকাশিত হওয়ার পথে তখনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিল। অনেক রসগ্রাহী তাকে ভাষান্তরিত করেছেন। একটি গরিব মধ্যবিত্ত ঘরের কাহিনী। অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার প্রকাশে এ গল্প লেখকেরই জীবনাংশের ছবি বলে বোধ হয়। সে ঘরের কাহিনীতে, বাবা-মার ঝগড়ার বর্ণনায়, তাদের পুনর্মিলনের প্রচেষ্টায়, ছোট ভাই-বোনের আদরে-আব্দারে, কিশোর রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন কর্মী নায়কের চিন্তায় এবং অনাগত এক সুন্দর মনুষ্য সমাজের কল্পনার প্রকাশে সোমেনের 'ইঁদুর' সমগ্র বঙ্গ সাহিত্যের এক অনুপম সৃষ্টি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোমেন কবি ছিলেন কিনা আমি জানি নে। তাঁর কোন কবিতা আমি দেখি নি। কিন্তু কবিতা লিখেই কবি কবি হয় না। কবি কবি হয় তার কল্পনায়, সৃষ্টির প্রসারতায়, তার চেতনার ঔজ্জ্বল্যে। শুধু 'ইঁদুর' নয়, সোমেনের প্রত্যেকটি গল্পে ছড়িয়ে আছে সোমেনের কাব্যিক মনের প্রকাশ।

আটাশ বছর আগে সোমেনকে হয়তো আমরা চিনি নি। আমি নিজে সোমেনকে সাক্ষাৎভাবে দেখি নি। আজকের পূর্ববঙ্গের মানুষের কাছে আপাতভাবে সোমেন অপরিচিত। কিন্তু সংগ্রামে, স্বপ্নে ও সাহিত্যে আজকের পূর্ব বঙ্গের সংবেদনশীল স্বাপ্নিক তরুণের কাছে সোমেনের চেয়ে অন্তরঙ্গজন আর কেউ নয়। সেই সোমেনের পরিচয়ের আলোকে সে তাঁর নিজের চলার পথ নিঃসন্দেহে আলোকিত দেখবে।

১৯৭০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছড়া প্রসঙ্গে

মনে করেছিলাম বিষয়টি সহজ। কিন্তু পরে দেখলাম, তা নয়।

ছোট্ট মেয়ে আমার। পাঁচ পেরিয়ে ছয়ে সে এখনো পা দেয় নি। অক্ষর পরিচয় পুরো হয় নি। কিন্তু মুখ এত ফুটেছে যে, তার মুখের ফুটন্ত খৈ-কে শান্ত করতে দিন-রাত আমি গলদঘর্ম হচ্ছি; "চাঁদ কোথায় থাকে? পৃথিবী বড়, না সূয্য বড়? মানুষ কী করে হয়? পিঁপড়া কী করে হয়? লজ্জাবতী লতা কেন ছুঁলেই নুয়ে পড়ে? ও কি লজ্জা পায়?" প্রশ্নগুলো নিজের মন থেকে আমি তৈরি করছি নে। ওর প্রশ্নের জবাবে আমি যদি বলি: 'আম্মু, তোমার প্রশ্নের আমি জবাব জানি নে। অত জ্ঞান আমার নেই', ও হাততালি দিয়ে বলে ওঠে, 'যা! তুমি কী বোকা! তুমি জানো না সূর্য্য থাকে ওদিকে, আর মানুষ পড়ে আকাশ থেকে'!

মেয়ে আমার আপন মনে আবোল তাবোল ছড়া কাটে। সে ছড়ার ছন্দ নেই, অর্থ নেই। তবু সে সুন্দর। ও যখন আড়াই লাফ দিয়ে বলে

এক, দুই, সাড়ে তিন
আমার বাসায় ঘোড়ার ডিম

তখন আমার সাংসারিক সমস্ত উদ্বেগ ও চিন্তাকে পাশে ঠেলে ফেলে ওর দিকে না তাকিয়ে পারি নে। আমি ভাবলাম, বাজারে কতো ছড়ার বই। ওকে কিছু এনে দিই। তা থেকে পড়ে শোনালে ওর কঠিন কঠিন প্রশ্ন থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

তাই ভেবে কয়েকখানা বই-এর দোকানে ঘুরেছিলুম। ভাবনা ছিল, ভালো মনমাতানো ছড়ার বই কি পাওয়া যাবে দোকানে? কিন্তু বই চাইতেই দোকানদার বেশ কিছু ছবি ভরা ছড়ার বই এগিয়ে দিলেন : 'টুটুর হাওয়াই সফর', 'রাত নিঝঝুম', 'ঝড়ের দেশ', 'জোনাকী', 'কাগজের নৌকা', 'তাক ডুমাডুম', 'আগডুম-বাগডুম', 'ঝুনঝুনি'।

এবার দেখলাম, আমার পক্ষে বাছাই করা কঠিন। সবখানাতেই উজ্জ্বল লাল, নীল, হলদে রঙের চমক, হরেক রকম ছবির সওগাত আর ছড়ার গাঁথুনী। এমন সম্ভার দেখে মন খুশিতে ভরে না উঠে পারে না। কয়েক বৎসর আগেও ছোটদের জন্য এত রঙের আয়োজন ছিল না। সাহিত্যের ক্ষেত্রে শিশুদের দিকে চাইবার মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরদী সাহিত্যিক খুব কমই দেখা যেত। কিন্তু আজ যেন শিশুদের চাহিদাকে উপেক্ষা করা আর সম্ভব হচ্ছে না। মনে হচ্ছে শিশু সাহিত্যের যেন বাজার খুলে গেছে। সে বাজারে দোকান খুললে আজ দু'পয়সা লাভের মওকা এসেছে। পেছনকার সত্যটা কী তা জানি নে। বাহ্য দৃষ্টিতে তাই মনে হয়। এবং এটিকে আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্রের বিস্তৃতি এবং প্রকাশনার ক্রমোন্নতি চিহ্ন বলেই ধরতে হয়।

একদিনে না হলেও পর পর কয়েকখানা বই-ই আমি কিনে নিলাম। তার কোনখান থেকে ওকে পড়ে শোনালাম :

... ব্যাঙের ছাতায়
লুকিয়ে মাথা
গুবরে তোলে রা
ভাঙা ঘাটের
ইঁটের খাঁজে
মাগুর ঘষে গা...
[রাত নিঝঝুম]

কোনখান থেকে :

শুনেছ কি গান তার
রাগ জন গাম্ভার?
গিয়েছিল বুধবারে
তবলায় কিল মেরে
করেছিল সঙ্গত
গেয়েছিল ওস্তাদ
দীলরাণা হরকৎ...
[ঝড়ের দেশ]

কোন খান থেকে বা :

...তাক ডুমাডুম ঢোলক বাজে
চমকে ওঠে ময়না
ঢ্যাম কুরুকুর ফড়িং গেলে
ভালুক পরে গয়না...
[তাক ডুমাডুম]

ভাবলার এবার ওর জ্বালাতন আর প্রশ্ন থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। সুস্থ ভাবে একটু লেখাপড়া করা যাবে। কিন্তু দেখলাম, ওকে তুষ্ট করা অত সহজ নয়। সেদিন যখন তেল নুন লাকড়ির হিসাবে আমি উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত তখন দেখি মেয়ে আমার বিরাট এক কেতাব টেনে এনে তার মাঝখান থেকে একটা যায়গা বার করার চেষ্টা করে বলছে : 'আব্বু, সেইটে আবার পড়ে শোনাও'। আমি বললাম, 'কোনটা?' ও আভাস দিয়ে বলল : ওই যে- দাদাগো দাদা শহরে যাও...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপারটা ছিল এই : রবীন্দ্রনাথের ছড়ার উপর লেখা প্রবন্ধটি পড়তে গিয়ে আমি ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে পড়েছিলুম :

দাদা গো দাদা শহরে যাও।
তিন টাকা করে মাইনে পাও॥
দাদার গলায় তুলসী মালা।
বউ বরণে চন্দ্রকলা॥
হেই দাদা, তোমার পায়ে পড়ি।
বউ এনে দাও খেলা করি॥

এত যে ওর জন্য আধুনিক ছড়ার বই আনলাম, মেয়ে আমার সে সব বাদ দিয়ে সেই সাধারণ কোন কালের অলিখিত ছড়ারই কিছুটা মনে রেখেছে আর তাই বারবার আমার মুখে শুনতে চাচ্ছে।

শিশু মনের আমি বিশেষজ্ঞ নই। তার সাথে আমার পরিচয় কম। সে কেন একটা পছন্দ করে, আর একটা করে না, কেন কোন কথা তার মনকে আকর্ষণ করতে পারে, কোন কথা পারে না; কী তার মনের প্রতিমুহূর্তের নূতন নূতন দাবি এ অবশ্যই গবেষকদের গবেষণার বিষয়। যে কোন শিশু সাহিত্যিককে সে জন্য অবশ্য কিছুটা গবেষক হতে হবে, অবশ্যই শিশু মন নিয়ে কিছুটা পরিমাণ গবেষণা করতে হবে। তা না হলে শিশু সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্যের হাত মক্স করার জন্য শিশুর জন্য ছড়া কাটতে পারেন, কিন্তু তার মানের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় না থাকলে তাকে তুষ্ট করার কৃতিত্বের দাবিদার হতে পারেন না। এরূপ গবেষণা শুধু কেতাব পড়ে হয় কিনা, আমি জানি নে। আমার কষ্ট করে সংগ্রহ করার এবং যত্ন করে পড়ে শোনানো ছড়ার বইগুলোর ওরূপ নিঃসঙ্কোচ বিচার দ্বারা আমার মেয়েটি এ সম্পর্কে আমার মনে অনেক প্রশ্ন তুলছে। তা না হলে এ প্রসঙ্গ অবতারণারও আমার সাহস হোত না। সমস্যাটি হয়ত একান্ত ব্যক্তিগত। তবু একটি শিশু হয়ত তার প্রতিক্রিয়া দিয়ে অনেক শিশুর মুখপাত্র হয়ে দাঁড়াতে পারে। সে জন্য মনে প্রশ্ন জাগল : ওকে আমি 'টুটুর হাওয়াই সফরে'র কাহিনী পড়ে শোনাবার চেষ্টা করলাম, 'রাত নিঝঝুম' আর 'আগডুম বাগডুমে'র মন মাতানো রঙ দিয়ে ভুলিয়ে দিতে চাইলাম, তবু কেন ও আমার পায়ের উপর বসে দোল দিয়ে দিয়ে নিজেই বলতে থাকে

'ঘুঘু সই
বাসা কই?
শিমুল গাছে।
শিমুল গাছ কই?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূতারে কাটে।
সূতার কই?
হাটে গেছে।
হাট কই?
পুড়ে গেছে।
ছাই কই?
উড়ে গেছে।
এই! তুমি সোনার ঘাটে পড়বে, না...'

কে কোন দিন লিখেছিল এ ছড়া, তা হয়ত গবেষণা করেও পাওয়া যাবে না। তবু যুগ থেকে যুগান্তরেও আজ সমস্যাকীর্ণ গৃহের মধ্যে বিরল অবসরটুকুতে মায়ের মুখে শিশুর সোহাগে যদি কোন ছড়া ফুটে ওঠে তা এমনি ছড়া; শিশুর খেলায় যদি কোন ছড়া বা গীতের গুনগুন শুনি তো সে

এক দুই সাড়ে তিন
আমার বাসায় ঘোড়ার ডিম

কিংবা :

তাই তাই মামা বাড়ি যাই
মামি দিল দুধ ভাত
দুয়ারে বসে খাই
মামা এল ঠেঙা নিয়ে
পালাই পালাই।

হয়ত রসের দিক দিয়ে, বা শিক্ষার দিক দিয়ে এরা আদর্শ নয়। তাই ইচ্ছা হয়, যেন একালের শিশুর মুখে খেলার ছলে উচ্চারিত হয়–

এসো ভাই এসো রে
আছি ভালো যশোরে
কেশো নাকো হেসো নাকো
ঠিক হয়ে বসো রে
এ দেশের লোকে কয়
বারো বাজে দুপুরে
বৌঝিরা চান করে
হাটে নয় পুকুরে

কিন্তু আমার মেয়ের প্রত্যক্ষ রায়ে তেমন ভরসা পাই নে।

কোন লেখা কার জন্য, এটি বড় প্রশ্ন : শিশুদের জন্য চাইতেই যেসব বই পাওয়া যায় তার মধ্যে একমাত্র বাঙলা একাডেমী প্রকাশিত 'ঝুনঝুনি' ব্যতীত সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বই-ই 'শিশু-কিশোর' উভয় সাহিত্যের মিশ্র সৃষ্টি। মনে হয়েছে একজন লেখক ঠিক বড়োদের দরবারে যা চালাতে পারেন নি তার সবই যেন দ্বিবর্ণ, ত্রিবর্ণ, বহুবর্ণের ছাপায় ছাপিয়ে শিশুমহলে চালাতে চেষ্টা করেছেন। এরই জন্য কোন একটি ছড়ার প্রথম তিনটি ছত্র যদি সুন্দর সহজ ছড়ার রূপ পেয়েছে তো অবশিষ্টাংশ দীর্ঘ কবিতার আকার নিয়েছে। একই বই-এর একটি কবিতা যদি ছোট্ট ছড়া হয়েছে তার অপর কবিতাগুলি বয়স্কদের উপযুক্ত কঠিন শব্দপূর্ণ এবং সহজ বুদ্ধির অগম্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঙলা একাডেমী শিশু ও কিশোর সাহিত্যিকে শ্রেণী হিসাবে ভাগ করে ৩ থেকে ৭ বৎসর বয়স্ক শিশুদের জন্য রচনাকে 'ছড়া' বলেছেন। এদিক থেকে তাঁদের প্রকাশিত সংগৃহীত ছড়ার 'ঝুনঝুনি' অবিমিশ্র ছড়ার বই। এর কোন ছড়া দীর্ঘ নয়। কোন ছড়া কঠিন শব্দপূর্ণ নয়। আর এর কোন ছড়া শিশুর পক্ষে দুর্বোধ্য নয়। সৃষ্টির এ কৃতিত্ব অবশ্যই বাঙলা একাডেমীর নয়। এ কৃতিত্ব নামহীন সেই সমস্ত লোকসাহিত্যিক অর্থাৎ চিরন্তন ছড়াকার মায়েদের, যারা আবহমান কাল ধরে তাদের কান্না ভরা দুষ্টু শিশুকে পা বিছিয়ে পায়ের উপর রেখে সোহাগ দোলায় দুলিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ছড়া কেটে বল আসছেন

আয় আয় চাঁদ মামা টিপ দিয়ে যা
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা

কিংবা : মালী চুলি তেলে বাটি
তেল দাও পিঠা বাটি
একটা পিঠা কাঁচা
সব কথা সাঁচা।

ছড়ার বই হাতে নিয়ে যেটুকু বিস্ময়কর বোধ হয়েছে, সে হচ্ছে : ইতিমধ্যেই আমাদের শিশু সাহিত্যে যেন ছড়ার বই-এর প্রাচুর্য এসেছে! আমার মেয়েকে আমি ভয় করি। তাকে ধমক দিয়ে আমি কাঁদাতে পারি। কিন্তু সুন্দর গল্প বলে, ছড়া কেটে, কথা বলে তার মনকে মুগ্ধ করে উন্নত করে তোলার ক্ষেত্রে আমার দুর্বলতা ও অক্ষমতাকে আমি নিজের মনে জানি। হয়ত সেই অক্ষমতাকে ঢেকে রাখতেই আমি ধমক দিয়ে তাকে চুপ করিয়ে দিতে চাই। এ বিষয়ে বিবেকের দংশন কিছু ছিল বলেই শিশু সাহিত্যিকদের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। আমি জানতাম ছড়া লেখা বা তৈরি করা কঠিন। কেননা একদিকে শিশুকে তুষ্ট অপর দিকে অতি সূক্ষ্মভাবে তার চিন্তার বিকাশ ঘটাবার চেষ্টা করে ছড়া লিখতে হলে আগেই লেখকের মধ্যে শক্তির পরিচয় থাকতে হবে। সে পরিচয় প্রকাশ পাবে সৃষ্ট ছড়ায় ব্যবহৃত শব্দের স্বচ্ছন্দতা ও শ্রুতি মাধুর্যে, বিষয়বস্তুর সহজবোধ্যতায় ও শিশুর চোখে স্বপ্নময় স্পষ্ট ছবির অঙ্কনে। বিষয়টি এত কঠিন না হলে লেখকদের বই না কিনে আমরা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানে ছ পয়সার বাসযাত্রী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাপেরা যখন কাচ্চা-বাচ্চাদের ছেঁড়া ফ্রক সেলাই করে দুটো পয়সা বাঁচাবার চেষ্টা করতে পারি, তখন কি ওদের জন্য দু'চারটে ছড়াও সেলাই করে আর দুটো পয়সা বাঁচাতে পারতুম না? তাই ভয় আমার প্রচুরই ছিল। কিন্তু যখন আমার কেনা বই-এ পড়লুম :

আমলী বুবুর কামলা নাই
টলেন বুবু তাই সদাই।
ঝোলেন গাছের ফাঁক দিয়ে
হাওয়ায় দোলেন পাক দিয়ে
নড়েন শুধুই নড়বড়ি
খাবেন বুঝি থোড়বড়ি
ছিঁড়বে কখন ঝোলনাটাই
ভাবেন বুবু তাই সদাই।
[আগডুম বাগডুম]

তখন কবিতার ছবিটি এবং তার বিষয়বস্তুর আকার আকৃতি বুঝতে না পারলেও বুঝতে পারি ছড়া তৈরি মোটেই কঠিন নয়। শব্দের সাথে শব্দের মিল টেনে গেলেই ছড়া হয়। আর তাতেই শিশুর মন ভোলে। কেননা লিখলেই হল :

আম গাছ গাব গাছ
তার মাথায় নাচে মাছ
উড়ে এল চিলটা
কেঁদে মরে শকুনটা......
[আমার রচনা!]

এইটাই দুঃখের দিক। শিশুদের জন্য ছড়া সাহিত্য তৈরি করার যে প্রশংসনীয় চেষ্টা চোখে পড়ে তার দুঃখজনক ক্রটির দিক হচ্ছে এই যে, শিশুর হাতে তুলে দেবার বা কানে শোনাবার জন্য ছড়া বা কবিতা তৈরিতে যে আন্তরিকতা, চিন্তা, পরিশ্রম ও শিল্প কুশলতার আবশ্যক তার পরিচয় খুব বেশি মেলে না। এ যেন শিশুরা আবোল তাবোল বকে বলেই আমরা বুড়োরা আবোল তাবোল ছড়া কেটে তাদেরকে খুশি করতে পারবো বা তাই করা সংগত। শিশুদের ছড়া অর্থহীন হতে পারে। কিন্তু অর্থহীন চিন্তা দ্বারা শিশুদের জন্য উপযুক্ত অর্থহীন ছবি ও ছড়া তৈরি করা যায় না। শিশুদের বই-এর নাম 'আবোল তাবোল' হতে পারে, কিন্তু সে আবোল তাবোল সৃষ্টিতে যে কত চিন্তা, দরদ, জ্ঞান এবং শিল্প কুশলতার প্রয়োজন তা অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যিক সুকুমার রায় দেখিয়েছেন। প্রবীণ সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্করও তাঁর 'শিশু-রচনা'য় প্রবীণ চিন্তা ও দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। এটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের শিশু-সাহিত্যিক মাত্রই জানেন। অন্যান্য প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিকদের নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমাদের শিশু-সাহিত্যিকগণ সমস্ত দিক দিয়ে তাঁদের পূর্ব-সূরীদের অতিক্রম করে যাবেন; অন্তত তাদের সৃষ্টি সে প্রয়াসের স্বাক্ষর বহন করবে, এটি তো আমাদের ন্যায্য দাবি।

অবশ্য নেতিবাচক আফশোস দিয়ে কথা শেষ করা অর্থহীন। বস্তুত যখন পড়ি–

রাত নিঝঝুম
গা ছমছম
তেঁতুল তলায় কে?
গগন ঢুলির
মংলী বাছুর
পালিয়ে এসেছে
[রাত নিঝঝুম]

তখন বুঝতে পারি কবিতাটির এ অংশটি খুবই সুন্দর একটি ছড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরূপ নরম শব্দের আবেগ ও ছবি শিশুর দুরন্ত মনটিকেও নরম করে আনবে। কিংবা যখন পড়ি–

হীরামন তোতা রে
যাস তুই কোথা রে?
আয় সোনা উড়িয়া
আকাশটি ফুঁড়িয়া।
[তাক ডুমাডুম]

তখন দেখি ঘুমপাড়ানী ছড়ার সুন্দর সুরটি এতে ফুটে উঠেছে। 'জোনাকী'র মধ্যেও ছড়ার অনেকগুলি গুণের সাক্ষাৎ পাই।

বুদ্ধি যাহার বেজায় পাকা
মাথায় ভালো টিকি রাখা
এই কথা সে মেনে চলে
হয় সে খুশি টিকি হলে
[জোনাকী]

এবং : মেজাজ ছিল তিরিক্ষি তার
মাথায় ছিল চুলের বাহার
শুনতে পেলাম তার সে চুলে
কোত্থেকে এক চড়ুই ভুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনের সুখে বানিয়ে বাসা
কাটাচ্ছে দিন বেশ তো খাসা
[জোনাকী]

সহজ শব্দ; ছোট্ট লাইন; ছোট্ট ছবি আর ছোট্ট কৌতুক– ছড়ার কয়েকটি আদর্শ গুণে 'জোনাকী' গুণী। কিন্তু যখন দেখি টিকি আর চুলের রসিকতা শুধু চুলেই সীমাবদ্ধ না থেকে তা একই পুস্তকে এবং প্রতিটি কবিতায় টাক, নাক, গলা, গোফ, দাঁড়ি, চিবুক, কান, পেট– দেহের সর্ব অঙ্গে বিস্তার লাভ করেছে, তখন তাকে অস্বাভাবিক এবং কিছুটা স্থূল বলে বোধ হয়। শিশুর দরবারে বড়োদের হাতে পরিবেশিত রসে অবশ্যই স্বাচ্ছন্দ্য ও ছন্দ থাকবে। দেহের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেই ছড়ার একমাত্র বিষয়বস্তু করায় যে আধিক্যের পরিচয়, তাতেই সে রসের ছন্দভঙ্গ, তার স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট। ছন্দভঙ্গ শুধু রসে নয়, ছন্দ ও শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও দেখি, যখন পড়ি :

'সেই গান শুনিয়ে
টাক নে রে শুনিয়ে'
কিংবা: 'দাড়ির বনে বাসা বাঁধে হুতুম
মুরগী বলে দাড়ির মাঝে শুতুম!'
অথবা: 'ঘোগেরা সব গুম্ফে মারে চাড়া
যখন তখন বাঘকে করে তাড়া'
বা, 'কালো মেঘ সাদা মেঘ গগন ফাটে
রাক্ষস-খোক্কস সাঁতার কাটে'
এবং 'ছেলেগুলো পড়ে আর গুরু দ্যান শিখিয়া
ক্ষুধা পেলে খায় দায় আছে তাই টিকিয়া।'

নামহীন স্রষ্টাদের সৃষ্ট লোক ছড়ার আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত 'ছড়া' প্রবন্ধে বলেছেন : 'আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল। বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছা ভাসমান।... মেঘ বারি ধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু-শস্যকে প্রাণদান করিতেছে। এবং ছড়াগুলিও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনা বৃষ্টিতে শিশু-হৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে।' লোক ছড়ার এ গুণেই আমাদের আধুনিক সাহিত্যিকদের সৃষ্ট শিশু-ছড়া ও কবিতা সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক। ছড়ার প্রাচুর্য দেখে স্বাভাবিক আনন্দের সাথে এ কামনা আমার স্বাভাবিক।

১৯৬৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বান্ধব পাঠচক্র

নারায়ণগঞ্জের তরুণদের প্রতিষ্ঠিত সুধীজন পাঠাগার নামটি সুন্দর। আমারও একটি পাঠাগার ছিল। নাম 'বান্ধব পাঠচক্র'। সে অনেককাল আগের কথা। ১৯৪৪-৪৫ তো বটেই। শুনলেই বুঝা যায় 'সুধীজন' আধুনিক আর 'বান্ধব পাঠচক্র' সেকেলে। তবু এ কালের যে-তরুণরা সেকালকে কিছুটা প্রীতি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখেন তাঁদের কাছে সেকালের এই 'বান্ধব পাঠচক্রের' কাহিনীটিও তত খারাপ না লাগতে পারে মনে করেই এ কথার অবতারণা।

আসলে আমার ব্যক্তিগত পাঠাগারটিকে কোন কাহিনীর নায়ক করে আমি সেদিন তৈরি করি নি। তার কোন ঘর ছিল না, কোন দোরও ছিল না। তার কোন মুখপাত্র ছিল না, মুখপত্রও নয়। তার বার্ষিক রিপোর্টেরও কোন ব্যাপার ছিল না। তবু আজ স্মৃতিচারণ করতে যেয়ে ব্যাপারটিকে একটা কাহিনীই বলতে হচ্ছে। আস্তে আস্তে সে দস্তুরমতো কাহিনীরই রূপ পেয়েছিল।

আদপে মহৎ কি অমহৎ কোন উদ্দেশ্য নিয়েই আমি 'বান্ধব পাঠচক্র'কে তৈরি করি নি। স্কুলে থাকতেই বই পড়ার ও কেনার কিছুটা বাতিক ছিল। তার কারণ, বই পড়ার মতো সংসারের আর কোন কাজই যে সহজ নয় তা বেশ অল্প বয়স থেকেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। বাড়িতে অতিথি মেহমান এলে হুঁকায় তামাক সেজে আগুনে ফুঁ দিয়ে দিয়ে নিয়ে আসার ঝকমারির চেয়ে একখানা বই পড়া যে বেশ নির্ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার তা বুঝার পর থেকেই বই-এর মধ্যে ডুবে থাকার দুষ্টবুদ্ধি আমি আয়ত্ত করেছিলাম। কিন্তু সে তো অনেক ছোটকালের কথা। পরবর্তীকালে এই নিরাপদ কাজের মধ্য থেকে আর একটা মনোভাব এই গড়ে উঠল যে, কোন একখানা বইকে ভালো লাগলে অপর বন্ধুকে তা না বলে, এমন কি না শুনিয়ে স্থির থাকতে পারতাম না।

বই পড়ুয়াদের সাধারণতঃ ভালো ছেলে বলা হয়। আসলে আমি মোটেই ভালো ছেলে ছিলাম না। তাই স্কুলে এমন কি কলেজ জীবনেও পেছনের বেঞ্চে বসা আমি উত্তম মনে করতাম। এই সূত্রে আমার বন্ধুত্ব গড়ে উঠল পেছনের বেঞ্চেরই ছাত্রদের সঙ্গে। পেছনের বেঞ্চের বন্ধুদের একটা গুণ ছিল যে, ওদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখাপড়ার ব্যাপারে কোন অহঙ্কার ছিল না। আর বই পড়াটা যে আদৌ কোন ক্রেডিট বা অহঙ্কারের ব্যাপার নয় এটা বুঝতে পেরে লেখাপড়া সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কোন বন্ধুকে আমি সাহায্য করতে পারলে নিজেকেই ধন্য মনে করতাম। ভাবতাম তবু যা হোক, ওকে তো একটু সাহায্য করতে পারলাম।

তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বি. এ-তে ভর্তি হয়েছি। কার্জন হলের পেছনের বাড়িটা ফজলুল হক হল। আমি ফজলুল হক হলের ছাত্র। এখানে এসে বন্ধুর সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পেল। এখন দেখলাম আমার একটা দায়িত্বও বেড়েছে। কোন বন্ধুর সময় কাটছে না, তাকে একটা পড়ার বই দিতে হবে। কারুর রাত্রে ঘুম হচ্ছে না, তাকে একটা গল্পের বই দিতে হবে। হলের লাইব্রেরি যে না আছে তা নয়। কিন্তু তার দ্বার কি সরদারের ঘরের মতো অবারিত? এ দায়িত্ব থেকেই এবার বই কেনার প্রয়োজনও বেড়ে গেল। আমার সিটের পাশের দেয়াল-শেলফগুলো বইতে ভরে গেল। এতদিন এর কোন নাম ছিল না। এবার স্বাভাবিকভাবে এর নাম হয়ে গেল 'বান্ধব পাঠচক্র'। আমি একটা ইস্যু রেজিস্টারও করলাম। হলের যে কোন বন্ধু যখন ইচ্ছা শেলফ থেকে বই নিয়ে ইস্যু রেজিস্টারে বইয়ের নামটি লিখে রেখে যেতেন। ঘর বন্ধ থাকলেও খুলতে পারতেন। কেননা তালার চাবিটা তাঁদের জানা মতেই দরজার এক ফাঁকে ঝুলিয়ে রাখা হত। বই কেনার জন্য কোন চাঁদা চাই নি। কিন্তু কিছুদিন পরে বন্ধুদের অনেকেই আগ্রহভরে যে যা পারতেন বই কেনার জন্য দিয়ে দিতেন। বিষয়টা শুনে খুব বড় মনে হচ্ছে। আসলে তা নয়। বই এর সংখ্যা হয়ত পাঁচশতও ছিল না।

তবে ব্যাপারটা যে একেবার ছোট নয়– তা টের পেলাম কিছুদিন পরে। আমার সঙ্গে লাইব্রেরি গড়ার কম্পিটিশন শুরু হয়ে গেল। ছাত্রদের মধ্যে কোন কোন মহল শঙ্কিত হয়ে বলল, বান্ধব পাঠচক্র সমস্ত ছাত্রদের বিপ্লবী করে দিচ্ছে। এসো আমরা পাল্টা লাইব্রেরি করি আর তার নাম দেই ইসলামী পাঠচক্র। আমার আনন্দ হল এই ভেবে, এমন মহৎ প্রতিযোগিতা তো আর কিছু হতে পারে না। এরূপ লাইব্রেরি হলে আমি নিজেই তার পৃষ্ঠপোষক হব।

এরও কিছুদিন পরে বুঝলাম যে, কম্পিটিশনটা মহত্ত্বের নয়– কম্পিটিশনটার সূত্রপাত ভয়ে ও আশঙ্কায়। জ্ঞানের আশঙ্কায় হলে এবার আমার বিরোধিতাটা বেশ সংঘবদ্ধ রূপ নিতে লাগল।

আমার সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারিত হতে লাগলো : খবরদার, কেউ যেন আমার কাছ থেকে কোন বই না পড়ে, আমার সঙ্গে কোন আলাপে রত না হয়। তাহলে নির্ঘাত তারা সত্য পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

আসলে আক্রমণটা ব্যক্তিগতভাবে কেবল আমার ওপর ছিল না। আক্রমণটা এল এ যাবত হলে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আলাপ আলোচনায় যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত আবহাওয়া ছিল তার উপর। এই উপলক্ষে কত সুন্দর রাত্রির কথা মনে পড়ে। হলের প্রত্যেকটি ঘরে হয়ত আলো নিভে গেছে। জ্বলছে তিন সিঁড়ি ঘরে তিন আলো। তারই কোন একটায় পূর্ব কিংবা পশ্চিম ব্যারাকের সিঁড়িতে আলোর নিচে জড়ো হচ্ছে একটি দুটি করে বন্ধু। আলোচনা হচ্ছে হিটলার মুসোলিনি স্টালিন থেকে শুরু করে দেশের সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক সব ধারা উপধারা নিয়ে। আলাপে মতের ঐক্যের উপর জোর নয়, জোর হচ্ছে যেমন ইচ্ছা তেমন করে নিঃশঙ্ক প্রকাশের।

কিন্তু এ আবহাওয়া দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে গেল। অবাধ আলোচনার যায়গায় সন্দেহ ও আক্রমণের পরিবেশ তৈরি হতে লাগল। প্রগতিমূলক পুস্তক রাখা হত বলে শহরের একটি বিশিষ্ট বই-এর দোকানে হিংসাত্মক হামলা হল। দোকানের বই পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে হাত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিল একদল লোক। তারপর তার উপর দিয়ে ডলে মলে চলে গেল। হামলা শুরু হল হলে হলে। আমি বোকার মতো হাসতাম আর নির্বোধের মতো সত্য কথা বলতাম বলে আমাকে দৈহিক পীড়নের যুঁৎসই লক্ষ্য না পেয়ে আক্রমণ হল সলিমুল্লাহ হলের একটি অংশের ছাত্রদের উপর। তাদের বইখাতা জ্বালিয়ে দেওয়া হল। তবুও সেদিন ভেবেছিলাম এটা ব্যতিক্রম। (আজকালকার ঘটনায় বুঝতে পারছি ব্যতিক্রম নিয়মের পর্যায়েই এসে গেছে।)

এম. এ. পরীক্ষা হয়ে গেছে। কিছুদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাও করলাম। বছর খানেক কাটতে না কাটতে শুনতে পেলাম আমি নাকি বহু অন্বেষিত ব্যক্তি। কিন্তু আমার চিন্তা সেজন্য নয়। চিন্তা হল বাক্সভর্তি বইগুলো নিয়ে আমি কী করি। এক বছর দু বছর নয়– বহু বছর ধরে বৃত্তির টাকায় কিংবা নাস্তার পয়সা বাঁচিয়ে তৈরি করেছি আমার এ লাইব্রেরি। একদিন এ ছিল কতো তরুণ মনের প্রিয়পাত্র। কিন্তু আবহাওয়াটাই এমন হয়ে উঠল যে, মনে হল, বইমাত্রই যেন নিষিদ্ধ বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিরাট একটা বাক্স ভর্তি করে রাতের অন্ধকারে জোসুয়া কুনিজের 'ডন ওভার সমরখন্দ', গোপাল হালদারের 'একদা', শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', অনিল মুখার্জীর 'সাম্যবাদের ভূমিকা', হাবিবুল্লাহ বাহারের 'ছোটদের পাকিস্তান', সোমেন ঠাকুরের 'লক্ষ্মীর স্বর্গলাভ', প্যাট স্লোয়ানের 'রাশিয়া উইদআউট ইলিউশন' কিংবা নেহেরুর 'গ্লিম্পসেস অব দি ওয়ার্লড হিস্টরি' নিয়ে এ বন্ধুর বাড়ি থেকে ও বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে উঠি,– অনুরোধ করি, আমাকে রাখার দরকার নাই, আমার এ বইগুলোকে রাখো। আমার প্রস্তাবে ওঁরা আঁৎকে ওঠে, বলে– তোমার চেয়েও ওরা বিপজ্জনক।

অবশেষে এক বন্ধুর বাড়িতে গছিয়ে দিয়ে এলাম আমার বইভর্তি ট্রাঙ্কটাকে– সেই 'বান্ধব পাঠচক্রে'র মূল পুঁজিকে। মনে আশা ছিল আবহাওয়ার পরিবর্তন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিন নিশ্চয়ই হবে। সেদিন আমি না থাকি কিংবা এ বইগুলো আমি না পড়ি, আর পাঁচজন তরুণ তো পড়তে পারবে।

তারপরে প্রথম কিস্তিতে এক দুই তিন করে প্রায় ছ'বছর পরে কারাগার থেকে একদিন মুক্তি পেয়ে প্রথমেই খোঁজ করতে লাগলাম সেই বন্ধুর, যাঁর কাছে গচ্ছিত রেখেছিলাম আমার বইগুলি। অনেক চেষ্টার পরে তার সাক্ষাৎ না পেলেও আমার ট্রাঙ্কটার সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। বন্ধুর বাড়ি থেকে আমার সেই সুবৃহৎ ট্রাঙ্ক আমাকে ফেরত দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাতে বই ছিল না একখানাও। তাতেও আমার আফসোস ছিল না। ভাবছিলাম– বইগুলো হয়ত বিভিন্ন বন্ধু-বান্ধব পড়তে নিয়েছে। তারই হদিস করতে জিজ্ঞেস করায় জানলাম– না, কেউ পড়তে নেয় নি, পাছে কেউ পড়ে সে আতঙ্কে বইগুলিকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

মানুষ পোড়ানোর চেয়ে বই পোড়ানো সহজ। বই একটুও বাধা দেয় না। হাত পা ছুঁড়ে না।

সে যা হোক। সব চেয়ে বড় কথা হল, বন্ধু আমার বৃহৎ ট্রাঙ্কটি ফেরত দিয়েছে; সে ট্রাঙ্কটি আমার বেশ উপকার দিয়েছে; তাতে সংসারের টুকিটাকি জিনিসপত্র আমি রাখতে পারি। আর তার চেয়েও বড় কথা, আমার সে বন্ধু একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হয়েছেন।

কথাটা এ পর্যন্ত টানলাম আমার ব্যক্তিগত 'বান্ধব পাঠচক্রে'র পরিণামের কাহিনীটা বলার জন্যই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বই পড়ার স্মৃতি

আগে পারা যেত; কিন্তু ঢাকার রাস্তায় আজ আর নিরুদ্বেগে হাঁটা এবং নিজের মনে চিন্তা করা সম্ভব নয়। তবু যদি কখনো একটু খোলা যায়গার সাক্ষাৎ পাই, একটু নিরুদ্বেগে হাঁটার কিংবা নির্ঝঞ্ঝাটে বসার অবকাশ তাহলে নিজের মনে স্মৃতিচারণ করতে আমার বেশ ভালো লাগে। সেই শিশুকাল থেকে আজ পর্যন্ত জীবনের পর্যায়গুলির কথা ভাবতে ভালো লাগে। আবার সেই স্মৃতিচারণকে যখন একটু আত্মবীক্ষণের দৃষ্টিতে দেখতে চাই তখন নিজেই অবাক হয়ে যাই। অবাক হয়ে যাই এই ভেবে যে, বছরের হিসাবে বয়সের পরিমাণ কম না হলেও কত সামান্য সংখ্যক ঘটনার কথাই না এই স্মৃতিপটে ভেসে উঠে। খুবই সামান্য। সেই ছোটকালে স্কুলে যাওয়ার দু'একটি দিনের কথা। মা বাবার মুখ। কিশোর বয়সের প্রিয় সাথীদের কারুর নাম, বিস্মৃত নামের, কোন মুখ, অপর কারুর কণ্ঠের শব্দ। কিন্তু এর চেয়েও বিস্ময় জাগে যখন দেখি এই প্রিয়জনদের মুখের সঙ্গে, তাদের কোন ব্যবহার বা ঘটনার সঙ্গে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ভেসে ওঠে কয়েকখানি বই-এরও স্মৃতি।

আর এই বই-এর স্মৃতি প্রসঙ্গেই আমার মনে প্রশ্ন এসেছে : আমরা যতো বই পড়ি তার ক'খানাকে আমরা স্মরণ করতে পারি। স্কুল কলেজের পাঠ থেকে পরবর্তী জীবনে জীবিকার ক্ষেত্রেও যারা বই পুস্তকের সঙ্গে কম-বেশি জড়িত থাকি তারা হয়ত নিত্য নতুন বই-এর নৈকট্যে আসি। পরিচয়ের সংখ্যা কারুর কম, কারুর বেশি হতে পারে। কিন্তু সঙ্গীহীন একাকীত্বে যখন আমরা নিজেরা নিজেদের মুখোমুখী হই তখন ক'খানা বই আমাদের স্মৃতির পটে ভাস্বর হয়ে ওঠে? আর যারা ওঠে তারাই বা কী কারণে ওঠে? এ দুটিই আমার কাছে নিরতিশয় কৌতুকজনক প্রশ্ন বলে মনে হয়েছে।

এ প্রশ্নের কোন নিয়ম বা জবাব আমি নিজের স্মৃতি থেকেও পাই নি। আমি ঠিক জানি নে কেন শরৎবাবুর 'পথের দাবী' আমার মনে একটি প্রিয় সাথীর অবয়ব নিয়ে ভেসে ওঠে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অন্যান্য বই-এর নাম যে আমি জানি নে তা নয়। নাম হয়ত আমি অন্যান্য বড় সাহিত্যিকদের আরো কিছু বই-এর জানি। তাঁদের সে সমস্ত বই-এর কিছু আমি পড়েছিও। কিন্তু সে জানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্ঞানের কথা। আবেগের কথা নয়। তার কোন বই পড়া ঘটনা হয়ে মনের পটে দাগ কেটে বসে নেই, যেমন রয়েছে 'পথের দাবী' পড়ার ঘটনা।

সে একটি রাতের কাহিনী। আমার কিশোর কালের কথা। কিন্তু কিশোর কালে আমি নিশ্চয়ই এই একখানি মাত্র বই-ই পড়ি নি। সন তারিখের কথা মনে নেই। হতে পারে ৩৯ কিংবা ৪০। রাতটির কথা মনে আছে। আর মনে আছে কিশোর বন্ধু মোজাম্মেলের কথা। ও-ই আমাকে বইখানা দিয়েছিল। সন্ধ্যার দিকে। কিন্তু বইখানার কোন নাম ছিল না। তার লেখকের কোন হদিস ছিল না। নাম-পৃষ্ঠাটি যত্ন করে কাটা ছিল। কেবল নাম-পৃষ্ঠা নয়। প্রতি পৃষ্ঠার মাথায় ডানে কিংবা বামে বই-এর নামের যে পুনর্মুদ্রণ থাকে সযত্নে তিনশ' সাড়ে তিনশ' পৃষ্ঠার বই-এর প্রতি পৃষ্ঠার সেই জায়গাটুকুও কাটা ছিল। বন্ধুর বলে দেওয়ার আবশ্যক করে নি যে, এ অতি নিষিদ্ধ দ্রব্য। বমাল ধরা পড়লে সেদিনই কয়েক বছর হয়ে যেত। কিন্তু সে ধমকানিও নিশ্চয়ই সেদিনের কিশোর আমিকে নিরস্ত করতে পারতো না।

সন্ধ্যার অন্ধকার না হতে পড়তে শুরু করেছি। ভারতী শব্যসাচী আর ভারতীর সেই ভালো মানুষটির কথা যার নাম এই মুহূর্তে আর মনে পড়ছে না। হাঁ, এবার মনে পড়েছে, অপূর্ব। রঙ্গমঞ্চ ব্রহ্মদশ। রেঙ্গুনের শহরতলীতে শব্যসাচী। তার আস্তানার সামনে 'পথের দাবি' বলে দুটি কথা লেখা আছে। দেশের স্বাধীনতার সে অগ্নিপুরুষ। ডান বা দু'হাতে তার সমান চলে রিভলবার। স্বাধীনতার সংগ্রামে বিন্দুমাত্রও দুর্বলতার ক্ষমা নেই। কিন্তু স্নেহাস্পদ কোমল ভারতী আর তার প্রেমাস্পদকে তিনি স্নেহ না করে পারেন না। শব্যসাচী আজ রেঙ্গুনে, তো কাল পেনাং-এ, তার পরে সিঙ্গাপুর বা জাকার্তায়। জাহাজ এসেছে কোত্থেকে। পুলিশের লোক অবতরণের সময়ে প্রতিটি যাত্রীকে তন্ন তন্ন করে তল্লাশী চালাচ্ছে। শব্যসাচী এসেছে এই জাহাজে। তারা খবর পেয়েছে। কত লোককে তারা আটকাল। কিন্তু শব্যসাচীর সন্ধান পেল না।

যাদের আটকাল তাদের মধ্যে হ্যাংলাপনা ময়লা কাপড় পরা এক গাঁজাখোর-ও ছিল। তার ট্যাকে পাওয়া গেল গাঁজার কলকে। পুলিশ বলল : 'তুমি গাঁজা খাও।' সে অম্লানে বলে দিল : 'না হুজুর'। 'তবে এ কল্কি কেন?' লোকটি নিঃসঙ্কোচে বলে : 'যারা খায় তাদের জন্য আমি কল্কি বহন করি।' এই বলে শব্যসাচী বেরিয়ে এল পুলিশের জাল ভেদ করে। গা শির-শির করা এক রোমাঞ্চকর পরিবেশের কাহিনী। পরাধীন দেশের তরুণের মনকে উদ্বেল করে তোলে এমন সংলাপ ভরা কাহিনী।

'পথের দাবি'কে শরৎ সমালোচকগণ তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে মনে করেন না। লেখক নিজেও করতেন না। কিন্তু এ রচনার জন্য লেখকের একটি সস্নেহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবেগের কথাও সাহিত্যিক সমাজে পরিচিত। বয়স কালে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের অন্যান্য রচনা পড়েছি, হয়ত একাধিকবার পড়েছি। কিন্তু তাঁর অন্য কোন বই পড়া ঘটনা হিসাবে এমন আবেগের সঙ্গে আমার মনের স্মৃতিতে বিজড়িত হয়ে নেই, যেমন বিজড়িত হয়ে আছে 'পথের দাবী'। সেই যে সন্ধ্যায় পড়তে বসেছিলাম তারপর কখন যে ঘন্টা পেরিয়ে রাতের অন্ধকার হাল্কা হয়ে সকালের সূর্য আবার উঁকি দিয়েছিল তা টের পাই নি। কিন্তু সেই রাতেই "পথের দাবী" পড়া শেষ করেছিলাম। এমন একাগ্রতায় সে বয়স পর্যন্ত আর কোন বই পড়িনি বলেই হয়ত 'পথের দাবী' পড়ার ঘটনা এমনিভাবে বিস্মরণের অতীত হয়ে আঁকা রয়েছে স্মৃতির পাতায়।

পার্ল বাকের 'গুড আর্থ' পড়ার ঘটনাটিও মনের পাতায় চোখ দিলেই আমি দেখতে পাই। হয়ত তখন আই. এ. পড়ি। এখন যে দালানে ফজলুল হক হল, তখন সেটাই ছিল ঢাকা কলেজের হোস্টেল। আমি ঢাকা কলেজে পড়তাম। কলেজের হোস্টেলে থাকতাম। হিন্দু মুসলমান ছাত্র একই হোস্টেলে থাকত। একদিকে হিন্দু ছাত্র। আর একদিকে মুসলমান ছাত্র। আমাদের হোস্টেলের সুপারিন্টেডেন্ট ছিলেন ওয়ালীউল্লাহ্ সাহেব। আজ আর তিনি নেই। শুনেছি মারা গেছেন। তিনি বড় কড়া লোক ছিলেন। রাত দশটার ঘন্টা পড়লেই দারোয়ান তাঁর হুকুম মতো মেইন সুইচ নিভিয়ে দিত। দশটা বাজতেই হোস্টেলের তিন দিকের তিনটা দালানই অন্ধকারে ডুবে যেত। কেবল বাতি জ্বলত সিঁড়ির উপর। তিনটা দালানের তিনটা সিঁড়িতে তিনটা বাতি। কেমন করে জানিনে, 'গুড আর্থ' খানা আমার হাতে এসেছিল। সন্ধ্যার সময়ে হয়ত পড়তে বসেছিলাম। দশটার সময়ে ঘরের বাতি নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি তখন চীনের কৃষক পরিবারে। বাবা কৃষক। ক্ষেতে গরু নিয়ে হাল দিতে গেছে। ছেলেরা বাবাকে সাহায্য করছে। কিংবা হয়ত দেখছি সমস্ত চীন জুড়ে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমেছে। খরার তাপে মাটি ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। চারদিকে 'এক মুঠো ভাত দাও' কান্না ছড়িয়ে পড়ছে। হাজার হাজার মানুষ মরছে। তখনো বাংলা দেশে ১৩৫০ এর দুর্ভিক্ষ আসে নি। কিন্তু তবু পার্ল বাকের আঁকা এ ছবি একটি বাঙ্গালী কিশোরের কাছে আদৌ অপরিচিত নয়। কোন চিত্রের আকর্ষণ নয়। নিরাভরণ ভাষার কী অদ্ভুত আকর্ষণ। ইংরেজি বাইবেলের রীতিতে লেখা। তেমনি প্রাচীন ধরনের। সহজ শব্দের গাঁথুনী। সেই শব্দের তরীতে পাল তুলে আমি যেন আমারই অতি পরিচিত নদীর বুকে তর তর করে এগিয়ে চলেছি। কখনো দেখছি বাঁশের ভারে দু'খানা বোঝা ঝুলিয়ে কৃষক চলছে বাজারের পথে। কখনো বাঁক নিয়ে যাচ্ছে আবার জমিদার-বাড়ির উপপত্নীদের অন্দরমহলে। ঘরের আলো নিভে যেতে সিঁড়ির গোড়ায় যেয়ে একখানি চেয়ার পেতে বসলাম। যখন বইয়ের পাতা থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখ তুললাম তখন হোস্টেলের পূর্ব দালানটার ওপাশে রেল ইঞ্জিনের শেডের মাথায় সকাল বেলাকার সূর্যের লাল রঙ ছড়িয়ে দিতে শুরু করেছে। রাত্রি জাগরণের কোন ক্লান্তি বোধ নেই। সকাল বেলাকার নির্মল হাওয়া আমার মনের আনন্দের সঙ্গে মিশে আমাকে যেন একটা নতুন মানুষে রূপান্তরিত করে তুলল।

এমন স্মৃতি খুব বেশি নেই। যদি আরো থাকত, আরো হতো তাহলে তার সম্পদে নিজেকে আজ ধন্য মনে করতে পারতাম।

কেবল আর একখানি বই পড়ার কথা মনে হয়। কিন্তু সে কেবল নিজে পড়া নয়– পাঁচজনকে নিয়ে পড়ার ঘটনা। সে এক কথকতার কাহিনী।

আমি তখন রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে আবদ্ধ। যে ওয়ার্ডে থাকি সেটার নম্বর হয়ত পাঁচ। এখন ভুলে গেছি। একটা লম্বা হলঘর। পাশে রুম। দুটো লোহার চৌকি পাতলে মাঝখান দিয়ে এক ফালি হাঁটার পথ। রাতে এক ঘরের মধ্যে তালাবদ্ধ থাকতাম। ওয়ার্ডের মধ্যে পঞ্চাশ কি ষাটজন রাজবন্দীর বাস। মোটা মুটি এই সংখ্যা। এর মধ্যে জেলের শাসন কখনো একে চালান করে দিচ্ছে রাজশাহী থেকে রংপুর, কখনও পাবনা থেকে আমদানি করে পুরে দিচ্ছে আর এক রাজবন্দীকে এই ওয়ার্ডে। কখনো বা বাছাই করে কাউকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ডিগ্রিবন্ধ করে ফেলেছে। তবু এর মধ্যে বন্দীরা একটা শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন গড়ে তুলেছে। নিজেরা কিচেন কমিটি বানিয়েছে। তাদের কাজ রান্না-বান্না করা। চাল ডালের হিসাব রাখা। টিনের থাল পিটিয়ে গোসল আর খাওয়ার সময় ঘোষণা করা। পেপার কমিটি বানিয়েছে। এর কাজ হচ্ছে জেলের অফিস থেকে দেওয়া কয়েকখানি দৈনিক খবরের কাগজ এলে যারা ইংরেজি কিংবা বাংলা জানে না তাদের পড়ে পড়ে বুঝিয়ে দেওয়া। সব কিছুরই লক্ষ্য হচ্ছে, কর্মহীন একঘেয়েমীর শ্বাসরুদ্ধকর বোঝা যেন কোন বন্দীর বুক ভারী করে তুলে তার মনকে ভেঙ্গে দিতে না পারে।

বন্দীদের মধ্যে বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত কর্মী। কম-বেশি বাংলা-ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত। এঁরা বই পত্রিকা পড়ে নিজেদের জীবনের শূন্যতা ভরিয়ে রাখেন। কিন্তু বন্দীদের মধ্যে রয়েছে দিনাজপুর-রংপুরের কৃষক আন্দোলনের বেশ কিছু সংখ্যক কৃষক কর্মী ও নেতা। এঁদের মধ্যে যারা বয়স্ক তাদের কারোর বয়স পঞ্চাশ। কারোর পঞ্চান্ন। এরা লেখাপড়া তেমন জানেন না, কিন্তু চারদিকের পাঠের আবহাওয়ায় তাঁদের বৃদ্ধ বয়সেও শেখার ও পড়ার আগ্রহ শিশুর চেয়েও অদম্য। এই সময়ে আমার হাতে এল একখানা রাজনৈতিক ইংরেজি উপন্যাস। যুদ্ধের সময়কার সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ইংরেজ সরকারের কূটনৈতিক সম্পর্কের পটভূমিকায় একজন অস্ট্রেলিয় সাংবাদিকের লেখা প্রায় হাজার পৃষ্ঠার বই 'ডিপ্লোম্যাট'। স্ট্যালিন তখন সোভিয়েট রাশিয়ায় রহস্যময় পুরুষ। তাঁর সঙ্গে সে দেশের কিংবা বিদেশের কোন নেতা বা সাংবাদিকের সাক্ষাতের ঘটনা এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোমাঞ্চকর ঘটনা। সেই রহস্য পুরুষকে ঘিরে এ উপন্যাসের কাহিনী। আমি ঠিক করলাম এ উপন্যাস আমি কৃষক কর্মীদের নিয়ে যৌথভাবে পড়ব। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে রোজ দুপুরে খাওয়ার পরে আমরা গোল হয়ে এই বই পড়তে বসতাম। আমি কয়েক লাইন ইংরেজি পড়তাম। তারপর সেই কয়েক লাইনের বাংলা অনুবাদ করতাম। আবার কিছু দূর ইংরেজি পড়তাম। আবার সেটুকুর বাংলা করতাম। আমার শ্রোতা ক'জন ছিল আজ ঠিক মনে নেই। কিন্তু শ্রোতাদের মধ্যে দু'জনের মুখ এখনো আমি ভুলতে পারছিনে। একজন আভারাম সিং, আর একজন ডোমারাম সিং। দিনাজপুরের আদিবাসী কৃষক। দু'জনার বয়সই ছিল পঞ্চাশের অধিক। নিজেদের বাড়িতে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন রয়েছে। কিন্তু কখনো এঁদের মুখ ভার করতে দেখিনি। আমারই কখনো মন ভার হলে এঁরা এসে এঁদের গাঁয়ের ভাষায় বলতেন, 'কী ভাবছেন কমরেড? মন খারাপ কেনে করছেন?' দুপুরে খাওয়ার পরে আমি একটু বিশ্রাম করতে চাইতাম। কিন্তু সেই ডিপ্লোম্যাট শোনার তাদের আগ্রহ আমার নিজের সব পরিশ্রমের কথা ভুলিয়ে দিত। খাওয়ার পরে মিনিট পনের বিশ্রামের পরেই তাঁরা আমায় ডেকে তুলতেন, 'কেনে আসেন না বাহে? আইসেন। শুরু করেন।' এমনি করে রোজ চলত 'ডিপ্লোম্যাটে'র কথকতা। হাজার পৃষ্ঠার বই হাজার দিন না লেগেলেও পাঁচশ' দিনের কাছাকাছি নিশ্চয়ই লেগেছিল। এত দীর্ঘ দিন ধরে কোন বই আমি জীবনে পড়িনি। কিন্তু এই বৃদ্ধ সাথীদের আগ্রহের উষ্ণতায় কোন বই পাঠে এত আনন্দও কোন দিন লাভ করিনি। কী করে যে পার হয়ে গেল বন্দীত্বের এই পাঁচশ' দিন— তা পাই নি। কেবল যে আমার শ্রোতারাই রোজ পাঠ শেষে আগ্রহ করে থাকতেন পরের দিনটির পাঠ শুরু হবার— তাই নয়; আমিও আগ্রহ ভরে অপেক্ষা করে থাকতাম এই মজলিসটির।

এখন আমরা বই পড়ি একা একা। কেউ কারুর মনের আনন্দের খোরাক অন্যকে দেইনে। আমরা বলিনে কাউকে ডেকে : এই বইখানা পড়েছেন? এই দেখুন না এই জায়গাটাতে কেমন লিখেছে! কিন্তু একদিন ছিল যখন আমরা এমন পরস্পর বিচ্ছিন্ন এক একটি আত্ম-দ্বীপে বিচ্ছিন্ন ও নির্বাসিত হয়ে যাই নি। একের মনের জ্ঞানের আনন্দ অপরকে না দিতে পারলে নিজেকে অতৃপ্ত মনে হত আভারাম সিং ও ডোমারাম সিং-এর সঙ্গে ডিপ্লোম্যাট বই পড়ে যে তৃপ্তি পেয়েছিলাম বন্দীখানাতে তার স্মৃতি তাই এক অমৃতের ভাণ্ডার হয়ে আজো আমার মনে ভেসে উঠে।

১৯৭০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্প নয়

কিশোর কয়েকটি মুখ আমার সামনে। আসরটি বসেছিল একুশে ফেব্রুয়ারির স্মরণে। বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি আমি জেলে ছিলাম।

আসরের ছেলে-মেয়েরা বলল, আপনি কিছু বলুন। আমি বললাম, আমি কী বলব? তোমাদের মধ্যে আজ যারা বড় হয়েছে তারা একুশে ফেব্রুয়ারি মেডিকেল কলেজের রাস্তায় ছিলে। সেক্রেটারিয়েটের সামনে মিছিল করেছ। গুলি ও গ্যাস খেয়েছ। তোমাদের জীবন রোমাঞ্চকর। কিন্তু আমি তো বন্দী ছিলাম। আমি কিছু জানিনে।

ওরা বলল : তবু আপনি বলুন।

আমি বললাম : হাঁ, তবু আমার বলার কথা যে নাই, তা নয়। আমার বলার আছে একুশের কাছে আমার দেনার কথা। ঋণের কথা। কেউ যদি তোমাদের কাউকে কিছু দেয়, দেয় এমন কিছু বিরাট ও মহৎ যা তুমি কল্পনা করতেও পার না, তাহলে সে ঋণের কথা কি তোমরা ভুলতে পার?

AMARBOI.COM

কেউ পয়সা ধার দিলে সে ধার ফেরত দেওয়া যায়। কেউ বই ধার দিলে তাও ফেরত দেওয়া যায়। কিন্তু কেউ যদি আমাকে তার জীবন ধার দেয় তাহলে কি আমি ফেরত দিতে পারি? জীবনের ঋণ কেবল জীবন দিয়েই শোধ করা যায়। কিন্তু তেমন করে শোধ করতে আমরা ক'জনে পারি। কিন্তু জীবনের ঋণ শোধ করতে না পারলেও তাকে ভুলে যেতেও পারিনে। কেননা জীবনদাতার ঋণ ভুলে গেলে জীবনটাই মিথ্যা হয়ে যায়।

এ জন্যই একুশে-কে আমি স্মরণ না করে পারিনে।

আমি গ্রেফতার হয়েছিলাম ২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৯ সালে, তাঁতিবাজারের একটা গলিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি তার আগে অধ্যাপক ছিলাম। আমার কাছে ঘটনাটা এই সেদিনের বলে মনে হলেও হিসাব করে দেখলে সে আজ থেকে প্রায় বাইশ বছর আগের কথা। উনসত্তরে যে কিশোররা ঢাকার বুকে রক্ত ঢেলেছিল তাদের জন্মের আগে। সেদিনও প্রশ্ন এসেছিল আমাদের সামনে : স্বাধীনতা। কিন্তু কার স্বাধীনতা? আজাদী। কিন্তু কার আজাদী?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্নের জবাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ঘরে দেওয়া কিংবা পাওয়া সম্ভব নয় জেনে আমি অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়েছিলাম সেদিন। আর সেই অপরাধের জন্যই পুলিশ আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

গ্রেপ্তার হওয়ার পরে পুলিশ চৌকিতে প্রহার, ডিসেম্বরের কনকনে শীতে প্রায় বস্ত্রহীন থাকা– এসব কথা থাক। আমি ও আমার কয়েকজন বন্ধু গ্রেপ্তার হওয়ার পরের দিন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে প্রবেশ করলাম। তখন সেখানে রাজবন্দীদের দীর্ঘতম অনশন ধর্মঘট শুরু হয়ে গেছে। আমরা যখন গ্রেপ্তার হয়ে ঢাকা জেলে যাই তখন বোধ হয় অনশন ধর্মঘটের আঠারো কিংবা উনিশ দিন চলছে।

জেল গেট থেকে নাজির জমাদার আমাদের ঠেলে নিয়ে ঢুকিয়ে দিল ফাঁসির সেল '৮' ডিগ্রিতে। ওরে বাপ! নাজির জমাদারের সেদিন কী আওয়াজ! কী রোষ চক্ষু। মেষ শাবকের মতো নিরীহ আমাদের চার হাত পাশে আর দশ হাত লম্বা লোহার শিক দেওয়া এক একটা কুঠুরীতে ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দিয়ে সে বলল: এই সেল থেকে আর বেরুতে হবে না।

আমরাও জেলে ঢুকে অনশন শুরু করে দিলাম। আমাদেরও দাবি : রাজবন্দীকে সম্মানের সঙ্গে দেখতে হবে। তার সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু তখন সে অসহায়ের দাবি। জেলখানায় বন্দীর কী শক্তি। একজন রাজবন্দী অপর রাজবন্দী থেকে বিচ্ছিন্ন। সারা বাংলার কেন্দ্রীয়, জেলা ও মহকুমার জেলখানাগুলোতে তারা বিচ্ছিন্নভাবে বন্দী। জেলের উঁচু দেয়াল পেরিয়ে কাকেরও সাধ্য নেই, বন্দীদের দুর্দশার খবর বাইরে এনে ছড়িয়ে দেয়।

আমার গ্রেপ্তারের আগেই, বোধ হয় ৯ই ডিসেম্বর ঢাকা জেলে অনশনরত রাজবন্দী শিবেন রায়কে ওরা মেরে ফেলেছে। অনশন করছে এই অপরাধে জোর করে খাওয়াবার নামে একদিন ষণ্ডা-মার্কা কয়েদী ও জেল কর্মচারী শিবেনের বুকে চেপে একটা রবারের নল নাক দিয়ে ফুসফুসের মধ্যে ঢুকিয়ে দম আটকিয়ে মেরে ফেলেছিল শিবেনকে।

এই অনশন শেষ হয়েছিল আটান্ন দিন পরে। এই অনশনের পরেই ঢাকার প্রখ্যাত রাজনীতিক নেতা ফণি গুহ মারা যান ময়মনসিংহ জেলে। অনশনের মধ্যে চট্টগ্রামের অমর সেন পাগল হয়ে যান।

ঢাকার অনশন শেষ হলে জেল কর্তৃপক্ষ আমাকে বদলি করে পাঠায় সিলেট জেলে। ১৯৫০-এর মার্চ কিংবা এপ্রিল মাসে।

সিলেট জেলে সাক্ষাৎ হয়েছিল আমার কিশোর বন্দী কাজল, গোপেশ ও বিজনের সাথে। গোপেশ আজ মালাকার। আমাদের তরুণ শিল্পীদের অন্যতম। সিলেট জেলের ডিগ্রির কুঠুরীর দেয়ালে সেদিনও দেখেছি অঙ্গারে আঁকা গোপেশের ছবি। বদ্ধ কুঠুরীতে দিন কাটাবার এবং বেঁচে থাকবার স্বাক্ষর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিলেট জেলের বন্দীরাও ঢাকার অনশনের কথা কোন প্রকারে শুনতে পেয়ে অনশন করেছিল। কিন্তু সেখানে বন্দীদের উপর যে নির্যাতন হয়েছিল তার নির্মমতার কথা বাইরে কেউ জানতে পারে নি।

অনশন করেছে, এই অপরাধে কাজল, বিজন ও গোপেশকে ভিন্ন ভিন্ন কুঠুরীতে তালবদ্ধ করে জেলের কর্মচারী, তার সিপাহী, জমাদার ও ষণ্ডা কয়েদীরা একদিকে কিশোর বন্দীদের সামনে ভাতের থালা রেখেছে আর বিরামহীনভাবে প্রহার করে বলেছে : খা, ভাত খা।

ওরা যতই বলেছে, আমরা রাজবন্দী। তোমরা বিনা দোষে, বিনা বিচারে আমাদের আটকে রেখেছ, আমাদের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করতে হবে, ততই ওদের প্রহার বেড়ে গেছে। এত নির্যাতনেও যখন কিশোর বন্দীরা অনশন ভাঙ্গে নি তখন ওদের কুঠুরী থেকে পানির ভাণ্ডটুকুও জেল কর্তৃপক্ষ সরিয়ে নিয়েছে।

কাজলের কথা যেন আমি এখনো শুনতে পাচ্ছি : "এখন আর ওরা পানিটুকুও খেতে দিচ্ছে না। কিন্তু পানির পিপাসা যে বেড়ে যাচ্ছে। ভাত না খেয়ে থাকতে পারি। কিন্তু পানির পিপাসায় শরীর যে জ্বলতে শুরু করেছে। তাই বলে বন্দীশালার সিপাহী শান্ত্রীর কাছে মাথা নোয়াতে আমরা চাই নি। এক দিন যায়। দু'দিন যায়। তবু ওরা একটু পানি দিল না। মুখের ভিতরে যে লালা ছিল তাও শুকিয়ে গেছে। এখন জিভ ঘষলে রক্ত বেরোয়। ডিসেম্বরের কনকনে শীত। ঠাণ্ডা মেঝে। একটু বিছানা নাই সাথে। তবু পিপাসায় শরীর গরম হয়ে উঠেছে। একটু যদি ঠাণ্ডা করতে পারি এই চেষ্টায় গায়ের কাপড় ছেড়ে ফেলে মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে লাগলাম...।"

তোমরা 'বিষাদ-সিন্ধু' পড়েছ, কারবালার কথা শুনেছ। কিন্তু এই বাংলাদেশে একদিন দেশপ্রেমিক রাজবন্দীরা যে এমনি কারবালার প্রান্তরে একটু পানির জন্য আকুল হয়ে কারেছে, সে কাহিনী কি তোমরা শুনেছ?

ঢাকার অনশনে কিছু সুযোগ বন্দীরা যে না পেয়েছিল তা নয়। কিন্তু তাতে কি? চারদিকে যে ঘোর অন্ধকার। দেশময় তখন স্বৈরতন্ত্রের দাপট। সিলেটের সানেশ্বর আর রাজশাহীর নাচোলের কৃষক আন্দোলনকে ওরা নির্যাতন চালিয়ে দমন করে দিতে চেয়েছে। শত শত কৃষক ও কৃষক কর্মীকে বন্দী করে নিয়ে এসেছে। কত যে গুলিবর্ষণ হয়েছে, তার হিসাব আজ পর্যন্ত কেউ জানে না। ইলা মিত্রের উপর অত্যাচারের কোন তুলনা নেই।

এমনি সময়ে ১৯৫০ সালের ২৪শে এপ্রিল ঘটল রাজশাহী জেলের রাজবন্দীদের ঘর খাপড়ায় গুলিবর্ষণ। ঘরের মধ্যে বন্দীদের আটকে জানালার শিকে বন্দুকের নল রেখে ওরা গুলি করেছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল পাঁচ জন বন্দী : দেলওয়ার, হানিফ, আনোয়ার, সুখেন ভট্টাচার্য আর সুধীন ধর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহত হলো আরো অনেকে। আহতদের মধ্যে বিনা চিকিৎসায় সন্ধ্যা না হতে মৃত্যু হল আরো দু'জনের : কম্পরাম সিং আর বিজন সেনের।

সিলেট জেল থেকে আমাকে আবার বদলি করে নিয়ে আসা হল রাজশাহী জেলে। এমনি করে এক জেল থেকে আর এক জেলে যাই। হাতে থাকে হাতকড়া। পাশে থাকে বন্দুক হাতে সিপাহী শাস্ত্রী। রেলের স্টেশনে কিংবা গাড়িতে অথবা জাহাজের ডেকে যাত্রীরা বোবা চোখে চেয়ে থাকে কৃশদেহ লোহার বদ্ধ বন্দীর দিকে। তাদের দৃষ্টির অর্থ পড়তে পারিনে। কি আছে সে দৃষ্টিতে? অভয়, না অভিশাপ? হতাশায় মন ভরে উঠে। তবে কি নাজির জমাদারের কথাই ঠিক? আমরা কি কেউ বেরুতে পারব না এই বন্দীশালা হতে? আমাদের দেশ কি এমনি বোবা হয়ে থাকবে যুগের পর যুগ? আমাদের কি কোন ভবিষ্যৎ নেই? উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ? এ অবস্থা দুঃসহ। এমন জীবন তোমরা কল্পনা করতে পার? এ যে মৃত্যুর চেয়ে অধিক।

এমনি হতাশায় কাটে '৫১ সালও।

তারপর হঠাৎ এলো একুশে ফেব্রুয়ারি। এলো '৫২ সালে। একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের বন্দীদের জীবনদাতা। একটি কিশোর। রক্তে রাঙ্গা।

ওর আসার দিন এখানো আমার চোখের উপর জ্বলজ্বল করে ভাসছে। ও এলো জেলের সুপার, জেলার, হেড জমাদার, সিপাহী, মেট, পাহারা সবাইকে ফাঁকি দিয়ে খবরের কাগজের একটা বিরাট ফাঁকের মধ্য দিয়ে। সে ব্যাপারটা যেমন বিস্ময়ের, তেমনি আনন্দের আর কৌতুকের।

সরকার ও জেলের কর্তারা আমাদের খবরের কাগজ পড়তে দিলেও বাইরের আন্দোলনের কোন খবর আমাদের জানতে দিতে চায় না। তাই আজাদ, মর্নিং নিউজ বা পাকিস্তান অবজারভার যে পত্রিকাই জেলের ভেতরে পেতাম সবগুলোই জেলার ও পুলিশের কর্তারা তন্নতন্ন করে পড়ে তা সেন্সর করে দিত। তাদের সতর্ক দৃষ্টি, বাইরের কোন আন্দোলনের খবর যেন জেলে রাজবন্দীর কাছে পৌঁছাতে না পারে। এজন্য ওরা অনেক সময়ে খবরের কাগজে কোন আন্দোলনের খবর থাকলে তার গায়ে কালি লেপে বা কাঁচি দিয়ে কেটে খবরের কাগজে জানালা করে দিত।

তাতে আমাদের তেমন কোন ক্ষতি হত না! আমরা কাগজের গায়ে ফুটো দেখে আন্দাজ করতাম, ওখানে নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষের কোন খবর ছিল। নিশ্চয়ই বাইরে জনতা অত্যাচারের শেকল ভাঙ্গার চেষ্টা করছে। এই কথা মনে করে আমরা উৎসাহ পেতাম। '৫২ সালের প্রথম দিকেই আমরা দেখছিলাম যে, আমাদের জেলের ভেতরে খবরের কাগজে জানালার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। কাগজের এখানে ফুটো। ওখানে ফুটো। এখানে কালি লেপা। ওখানে কালি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেপা। এ দেখে আমরা ক্রমেই বেশি খুশি হয়ে উঠছিলাম। আমরা কেউ ছিলাম ডিগ্রিবন্ধ। আবার কেউ ছিলাম অপর বন্দীদের সঙ্গে একটা বড় ঘরে। একসাথে যারা থাকতাম তারা খবরের কাগজের এই জানালা আঙ্গুল দিয়ে মেপে দেখতাম। কোনটা ছোট, কোনটা বড়। খবরের কাগজের জানালা যত বড় হত আমাদের মনের আনন্দ তত বেড়ে যেত। আমরা ভাবতাম, এই যে এত বড় করে ওরা কাগজ কেটেছে, নিশ্চয়ই এখানে জনসাধারণের কিংবা ছাত্র আন্দোলনের কোন বড় খবর ছিল।

এইভাবে খবরের কাগজের জানালা বড় হতে লাগল। সেই জানালার ফাঁক দিয়ে বন্দীশালার বাইরের জগতের মুক্ত বাতাসের আমরা কল্পনা করতাম।

একুশে ফেব্রুয়ারি নয়। বাইশে ফেব্রুয়ারির কথা বলছি। কারণ রাজশাহী জেলে ঢাকার কাগজ আমরা এক দিন পরে পেতাম। বাইশে ফেব্রুয়ারি দুপুরে কিংবা বিকেলে সিকিউরিটি জমাদার, মানে রাজবন্দীদের তদারকি জমাদার আমাদের একুশ তারিখের খবরের কাগজ দিয়ে গেল। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম, নতুন কি খবর এসেছে দেখবার জন্য। কিন্তু খবর কই? কাগজই বা কই? অবাক চোখে দেখলাম, কাগজের মাথায় কাগজের নাম বাদে আর কিছুই যে আস্ত নেই। জানালা তো জানালা, সমস্ত কাগজ কেটে ওরা বিরাট এক দরজা বানিয়ে দিয়েছে। সে দরজা দিয়ে ইচ্ছে করলে আমরা পুরো মানুষ মাথা গলিয়ে এপার-ওপার যাওয়া-আসা করতে পারি।

আমরা করলামও তাই। খবরের কাগজের অত বড় জানালা দেখে আমাদের মনে ফূর্তি আর ধরে না। চোখ থেকে আনন্দের পানি ঝরতে আরম্ভ করেছে। আমরা ছেলে বুড়ো, কিশোর অ-কিশোর, কৃষক, শ্রমিক যত রাজবন্দী একসাথে ছিলাম তারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরতে লাগলাম। আমরা চিৎকার করে বলতে লাগলাম : আমরা জীবন পেয়েছি। আর আমাদের মারে কে? দেখ, দেখ, কত বড় জানালা। জানালা নয়ত দরজা। শেকল ভাঙ্গার দরজা। মুক্তির দরজা। আর সেদিনকার সন্ধ্যা না ঘনাতে সত্যি সেই খবরের কাগজের দরজা দিয়েই শুনতে পেলাম ছাত্র-জনতার মিছিলের আওয়াজ : রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। রাজবন্দীদের মুক্তি চাই। ছাত্র হত্যার বিচার চাই।

১৯৭২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা আত্মাকে ডাকলাম

পাকি দখলদার বাহিনীর হাতে বন্দী ঢাকার অসহায় মানুষ আমরা। ওরা ২৫শে মার্চ রাতে অতর্কিত আক্রমণে আমাদের ঘেরাও করে ফেলল। ট্যাংক, কামান, রকেট ও মেশিনগানে ওরা ঢাকার বুকে সে রাতে রাজারবাগ পুলিশ ঘাঁটিতে, পিলখানায়, ইকবাল হল ও জগন্নাথ হলে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করল।

পুরো ২৬ তারিখ ওরা সান্ধ্য আইন জারি রেখে চালাল হত্যালীলা। ২৭শে মার্চ কয়েক ঘণ্টার জন্য সান্ধ্য আইন তুলে নিতেই হাজার নয়, প্রায় লক্ষ অসহায় মানুষ কাপড়-চোপড়ের একটি করে পুঁটুলি নিয়ে অবোধ শিশুদের কোলে কাঁখে মাথায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল, ঢাকা শহর ছাড়ার জন্য। সন্ধ্যা হয়, তবু অসহায় ভয়ার্ত মানুষের বিরাম নেই। বুদ্ধি দিয়ে খুঁজে পেলাম না কোথায় যাবে ওরা? কেমন করেই বা যাবে? হানাদার বাহিনী বিনা অজুহাতে গুলি করছে, আগুন দিচ্ছে। ২৬ তারিখ বিকেলে মতিঝিল কলোনীর বাসা থেকে দেখলাম দক্ষিণ দিকে উর্দ্ধগতি কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলিতে আকাশ অন্ধকার হয়ে গেছে। সেদিন বুঝি নি। পরে শুনেছি, সেদিন ওরা ইত্তেফাককে আগুন জ্বলিয়ে ধ্বংস করেছে। কিন্তু এতো মানুষ কেমন করে বেরিয়ে যাবে এই অবরুদ্ধ ঢাকা শহর থেকে? খবর পেলাম শহর ছাড়ার সময়েও বহু মানুষকে পাকি বাহিনী গুলি করে হত্যা করেছে। জিঞ্জিরা বাজারের নৃশংস হত্যাকাণ্ড তো কয়েক দিন পরের ঘটনা। ২রা কিংবা ৩রা এপ্রিল ওরা চারিদিক ঘেরাও করে সকাল থেকে গুলি করতে আরম্ভ করেছ জিঞ্জিরায় আশ্রয় নেওয়া হাজার হাজার মানুষের উপর। জাহাজের ওপর কামান বসিয়ে জিঞ্জিরা বাজার তাক করে ওরা গোলাবর্ষণ করেছে। চারিদিকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ভয়ার্ত মানুষ কোরান খুলে বসেছে, কলেমা পড়েছে আর পাকি বাহিনী হাসতে হাসতে মেশিনগানের ঝড় তুলে ভয়ার্ত মানুষকে ভূলুণ্ঠিত করে দিয়েছে আর ব্যঙ্গ করে বলেছে : কলেমা পড় লিয়া তো আব শহীদ হো যাও!

এই ভয়ংকর অবস্থায় ছোট্ট তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি আর আমার স্ত্রী কোথায় যাব, কোথায় পাড়ি জমাব? তাই আমরা প্রায় মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। বন্দী ঢাকাতেই রয়ে গেলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার পরের জীবন? সে তো মৃত্যুর পরে মৃতের জীবন। তার আকুতি ও অসহায়তার কথা কোনদিন সাথী কাউকে শোনাতে পারব, এমন কথা সাহস করে ভাবতে পারি নি। যে অযুত প্রাণের সংগ্রাম ও রক্তের বিনিময়ে আমাদের মতো হতভাগ্য মানুষ বেঁচে থাকতে পেরেছে এবং সেই ভয়ংকর দিনগুলির স্মৃতিচারণ করতে পারছে তাদের কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। সে ঋণের কোন প্রতিদান নেই। আজ মনের চোখে যখন এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বরের মাসগুলোর প্রতি দিনের প্রতি মুহূর্তের পাতা উল্টেপাল্টে দেখি তখন সে জীবনকে কী করুণ ও অসহায় বোধ হয়!

বন্দী ঢাকার রাস্তায় লোকজন নেই। বিকেল না হতে খা খা করে। সামরিক বাহিনী টহল দেয়। গাড়ির মাথায় মেশিনগান বসানো। একাডেমী শুধু আমাদের অফিস নয়। একাডেমী বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। এ জন্যই ২৬শে মার্চ সকালে ওরা একাডেমী লক্ষ্য করে কামান দেগে একাডেমীকে ধূলিসাৎ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। গণজাগরণের দিনগুলোতে একাডেমী ছিল সহস্র জনতার পায়ের ধ্বনিতে মুখরিত। এপ্রিল, মে মাসেও একাডেমীতে সকালে গিয়েছি আর দুপুরে ঘরে ফিরেছি, অফিস করতে নয়, উদ্বেগাকুল আর বিপন্ন সহকর্মীদের খবর দিতে, খবর নিতে। কেমন আছেন? কেমন আছ? বিপদ হয় নি তো কোনো? জড়ো হই মনের সাথে যার মনের বন্ধন আছে তার সাথে দুটো কথা বলতে : জয়বাংলা বেতার তরঙ্গটা কাল যে শুনতে পেলাম না। বলতে পার কোন পয়েন্টে ওকে ধরা যায়? কানের কাছে মুখ নিয়ে বলার মতো বন্ধু জবাব দেয় : সেটের একেবারে ডান দিকে, বিবিসির কাছেই। ওরা এখন শর্টওয়েভে ছাড়ছে।

AMARBOI.COM

আলাপ করি : কালকের সংবাদ পরিক্রমা আর সংবাদ বিচিত্রা শুনেছেন? 'এক মুজিবের কণ্ঠ হতে লক্ষ মুজিবের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি' গানটি খুব ভালো লেগেছে। বিবিসি খবর দিয়েছে, ঢাকায় মুক্তিবাহিনী অ্যাকশন শুরু করেছে।

: টিক্কা খান কি সত্যি আছে? অনেকে তো বলে এ টিক্কা সে টিক্কা নয়। অন্য কাউকে টিক্কা বলে চালিয়েছে। আসল টিক্কা খতম হয়েছে।

: পাকি ফৌজ খতম হচ্ছে কম নয়। ওরা তিন দিনে খতম করতে চেয়েছিল বাংলাদেশকে। আজ তিন দিন থেকে তিন মাস গড়িয়ে চলেছে। ভাইজানরা বুঝতে শুরু করেছে, বাংলাদেশ বড় কঠিন জায়গা।

: কিন্তু আর কতকাল?

: অস্থির হয়ো না। দেখো না ভিয়েতনামের যুদ্ধ। বাংলাদেশে নতুন ভিয়েতনামের স্বাধীনতার মরণপণ লড়াই শুরু হয়েছে।

: ভবিষ্যদ্বক্তা জিন ডিকসনের বাণী, দেখো, ঠিক ফলে যাবে। আগেও তো এর বাণী ফলেছে বলে শুনা গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: কী বলেছে জিন ডিকসন?

: কেন শোনো নি, জিন ডিকসন বলেছে, ১৯৭১ সালে এশিয়া ভূখণ্ডে জন্মলাভ করবে নতুন এক স্বাধীন রাষ্ট্র। আর কোন এক রাষ্ট্রনেতা হয় পাগল হয়ে যাবে, আত্মহত্যা করবে, নয়ত নিহত হবে।

: খেয়াল রেখো, আলোচনার সময় সন্দেহজনক কোন লোক যেন না আসে।

: প্লানচেটে বিশ্বাস করো, তুমি?

: আজ সবকিছুতে বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি তাকেই যে আমাকে আশ্বাস দেয় এই নরপিশাচদের মৃত্যুর।

: তোমরা তো প্লানচেটে বিদেহী আত্মা ডাকতে পার। বসো না প্লানচেটে অফিসেই একবার। কী করব আমরা, অসহায় বন্দী মানুষেরা? আমরা তাই করলাম। দুই বন্ধু বসলেন টেবিলে। আঙ্গুলে আঙ্গুল ঠেকিয়ে। চক্ষু বন্ধ। অক্ষরে অক্ষরে আত্মারা প্রশ্নোত্তরের সংকেতভূমি রচনা করা হল। উদগ্রীব হয়ে রইলাম।

: কই এলো কেউ?

চোখ বন্ধ করা প্লানচেটের আসনের বন্ধু প্রশ্ন করলেন আত্মাকে : আপনি যদি এসে থাকেন, আপনার নাম বলুন।

আঙ্গুল কেঁপে কেঁপে চলতে থাকে। অক্ষর থেকে অক্ষরে চলতে চলতে আঙ্গুল নাম বলে : হক সাহেব। হক সাহেবের আত্মা এসেছে। আবার প্রশ্ন হয়।

: বাংলাদেশ স্বাধীন হবে? স্বাধীন হলে বলুন : হাঁ।

আঙ্গুল নড়ে উঠল। ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে অক্ষর থেকে অক্ষর ঘুরে আত্মা জবাব দিল : হাঁ।

আবার প্রশ্ন হল : আপনি বলুন আমাদের এ মুক্তি সংগ্রাম জয়লাভ করবে কোন ফ্রন্টে– অর্থনীতির ক্ষেত্রে– না যুদ্ধের ফ্রন্টে?

আঙ্গুল আবার নড়ে। আবার জবাব তৈরি হয় : অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে।

: আপনি বলুন, কত দিনে বাংলাদেশ স্বাধীন হবে?

আঙ্গুল আবার নড়ে। জবাব বেরোয় : সময় লাগবে।

: আপনি যদি জানেন তা হলে বলুন, কোন বছর এ যুদ্ধের শেষ হবে?

জবাব এলো : '৭২ সালে।

: বলুন, কোন মাসে?

আঙ্গুল নড়ে, জবাব তৈরি হয় : এপ্রিল মাসে।

জবাব শুনে মনটা যেন একটু দমে যায়। কেননা এর আগে কোন কোন আত্মা আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলে যে, ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই পাকিস্তানের চরম পরাজয় ঘটবে।

কী বলব এই প্লানচেট করাকে? কোনদিন এমনভাবে বিদেহী আত্মার আগমনকে বিশ্বাস করি নি বা গুরুত্ব দেই নি। ছাত্রাবস্থায় পরীক্ষার সময়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাত্রছাত্রী নাকি এরূপ প্লানচেট করে থাকেন। পরীক্ষায় তাঁরা কৃতকার্য হবেন কিনা, তা আগাম জানার জন্য। এ কথা শুনে হেসেছি। কিন্তু নিজেদের ভাগ্যের চরম পরীক্ষার ভবিষৎ জানতে আজ আর আত্মাকে ডাকার ব্যাপারটি নিয়ে পরিহাস করতে পারছি নে। বুদ্ধি দিয়ে বুঝি যে, প্লানচেটে আসনগ্রহণকারীর জবাবের আঙ্গুল যেন আমাদের বন্দী মনের স্বপ্নের ইঙ্গিতে অক্ষর গুণে গুণে চলে। তবু, তবু তো তাকে অবিশ্বাস করতে মন চায় না।

কিন্তু প্লানচেটে মজার কাহিনীও ঘটে। বন্ধু বলে : জিন্নাহ সাহেবের আত্মাকে কাল রাতে ডেকেছিলাম।

: ভারী মজার তো। তারপর? তারপর?

: মেজাজটা বড় কড়া। কথা বলতে চায় না। নাম বলতে চায় না।

: কি জিজ্ঞেস করেছিলে?

: জিজ্ঞেস করেছিলাম, পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ কী?

: কী বলল?

: কথা বলতে চায় না।

: তারপর?

: আবার জিজ্ঞেস করলাম, বাংলাদেশ স্বাধীন হবে?

: জবাব দিল, হবে।

: আচ্ছা, বড় মজার জবাব তো। ভূতের মুখে রাম নাম!

: তখন চেপে ধরলাম, বলুন, কবে হবে?

: কী বলল?

: এর আর জবাব দিতে চায় না। বারবার জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু জবাবও দেয় না, আবার আমাদের আঙ্গুল থেকে ভরও সরায় না। অনেক কষ্টে শেষে তাকে তাড়াতে হয়েছে।

প্লানচেটের আত্মা আমাদের ব্যক্তিগত ভাগ্যের হদিস দিতেও কসুর করত না।

জিজ্ঞেস করেছি, বারট্রান্ড রাসেল কিংবা আব্রাহাম লিংকনকে : বলুন, অধ্যাপক...কোথায় আছেন?

জবাব এসেছে : আগরতলায়।

আমি করুণভাবে বললাম : তোমাকে না বলেছিলাম, আমার ভবিষ্যৎটা একটু জিজ্ঞেস করবে।

বন্ধুবর মুখখানা ম্লান করে বলল, করেছিলাম, কাল রাতে।

: কী জবাব দিল আত্মা?

: বলল, ভবিষ্যৎ ভালো নয়। তোমার পক্ষে ইন্ডিয়া চলে যাওয়াই ভালো। আমি জানি, তাতে আমার নিজের জীবনের নিরাপত্তা আসবে। তখন আর দিন-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাতের চব্বিশ ঘন্টার প্রতি মিনিটে, প্রতি সেকেন্ডে মৃত্যুর আতঙ্ক থাকবে না। কিন্তু অবোধ শিশু আর স্ত্রী নিয়ে আমার সংসার। সংসার নয়, ছোট্ট পাখির বাসা। আমার মতোই হাজার হাজার পরিবার অসহায়। আমি কোথায় যাব আমার পাখির বাসাকে বর্বরের হাতে ছেড়ে দিয়ে। না, আমি তা পারবো না। প্রতি রাতে বাসার দুয়ারে জীপের শব্দে শিশুপুত্র আতঙ্কে আমাকে জড়িয়ে ধরে: 'আব্বা, এই জীপ এসে থেমেছে।' আমি জানি, ঐ জীপ একদিন আমার জন্যই আসবে। আসুক। এসে আমাকে টেনে নিক। গুলি করে মেরে ফেলুক। তবু যেন না পাখির ছানার মতো আমার নিরীহ সন্তানদের উপর অত্যাচার করে। শুধু আজ নয়, করুণ হাসি ফুটেছে নিজেরই মুখে সেদিনও, এই নির্বোধ কামনায়। কত শিশুকে ওরা খুন করেছে মা-বাবার সামনে, সে কাহিনী কি কান থেকে কানে ছুটতে ছুটতে সেদিন আমার কানেও পৌঁছে নি? তবু আমি ছেড়ে যেতে পারি নি। আমার অসহায় স্ত্রী আর সন্তানদের আরো অসহায় করে। আমাকে পেলে হয়ত পশুগুলো ওদেরকে হত্যা করবে না, হয়ত শুধু আমাকেই নিয়ে যাবে। কিন্তু আমাকে না পেলে যে ওদের উপর মুহূর্তের বিলম্ব না করে পশুর দল ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর তাই প্রতি রাতে জীপের শব্দ পেলেই বুকের স্পন্দন বেড়ে গেলেও তৈরি হই দরজার উপর সবুট লাথির জন্য: খোল দো, দরওয়াজা খোল দো।...

বিদেহী আত্মার কথা বিফল হোল না। ভবিষ্যৎ আমার ভালো নয়। ৭ই সেপ্টেম্বর একাডেমীতে যেয়ে বসতেই শাদা পোশাক পরা দুটো পাঞ্জাবী পাষণ্ড এসে ঘরে ঢুকে আমার দু'পাশে দাঁড়িয়ে বলল : আর ইউ সরদার ফজলুল করিম। আমি বললাম : হ্যাঁ। ওরা বলল, 'ইউ আর টেকন ইনটু কাস্টডি', 'তোমাকে গ্রেফতার করা হল।' বলেই প্রায় জোর করে অপেক্ষমান জীপে আমাকে তুলে নিয়ে বেদনাহত বন্ধুদের চোখের সুমুখ দিয়ে মুহূর্তে জীপটা বেরিয়ে এল বহু বছরের স্মৃতি বিজড়িত বাংলা একাডেমীর অফিস থেকে।

জীপের মধ্যে শূন্য চোখে বসে বসে নিজের মনের দিকে তাকাই। দেখি মন বলছ : বিদেহী আত্মার কথা তো মিথ্যা হল না। ভূত-ভবিষ্যতের কথা হয়ত জানে এই বিদেহী আত্মারা। তাহলে মিথ্যা হবে না সেই বাণীও : স্বাধীন হবে বাংলাদেশ। আমার মৃত্যুর আশঙ্কা, কিংবা মৃত্যু– সে তো আজ লক্ষ ঘটনার একটি মাত্র ঘটনা। কিন্তু ইতিহাসের চাকা কি বর্বর দস্যুর দল আমাদের হত্যা করে স্তব্ধ করতে পারবে? কোন দস্যুর দলই কি পেরেছে কোনদিন?...

জীপটা এতক্ষণে শহরের রাস্তা ঘুরে ক্যান্টনমেন্টের পথ ধরেছে।

১৯৭২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্গবন্ধু

'তোমার নেতা, আমার নেতা– শেখ মুজিব, শেখ মুজিব'– কোন একদিন এ আওয়াজ যদি কয়েকটি যুবকের বা একটি মাত্র রাজনৈতিক সংগঠনের থেকে থাকে, তবে আর একদিন এ আওয়াজই ফ্যাসিস্ট বর্বর পাকিস্তানি জান্তার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রামে সংগ্রামী বাংলাদেশের একমাত্র সার্বজনীন আওয়াজে পরিণত হয়েছে।

ইতিহাসে মহান নায়কদের নাম আছে। সানইয়াত সেন, লেনিন, স্টালিন, গান্ধীজী, পণ্ডিত নেহেরু প্রমুখ নেতার কথা আমরা পড়েছি। কিন্তু ইতিহাস মানেই অতীত। তা আমার কাছে দূর আর অপ্রত্যক্ষ। আর তাই ইতিহাসের এক কালের মহান নায়কদের জীবনের সঙ্গে অন্য কালের পাঠক আবেগময় যোগ উপলব্ধি করতে পারে না। বুদ্ধি দিয়েই ইতিহাসের মহান নেতাদের জীবনের তাৎপর্য আমরা উপলব্ধি করি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামের সঙ্গে ১৯৭১ সালের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জীবনের যে আবেগময় সম্পর্ক রয়েছে একদিন হয়ত তার ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য ইতিহাসের গবেষণার বিষয় হবে, কিন্তু আজ তা আমাদের প্রতিটি জীবনের গর্বের, গৌরবের আর আনন্দের সাক্ষাৎ উপলব্ধি। আর ইতিহাসেরও এ এক অপার বিস্ময়।

গল্প শুনেছি, শেখ সাহেব গেছেন অপর এক সহকর্মীর বাড়িতে বেড়াতে কিংবা কাজের কথা বলতে। বাড়ির উঠানে পা দিতে সাক্ষাৎ হয়েছে তাঁর পাঁচ থেকে দশ বছরের শিশু মোর্চার সঙ্গে। তারা কাঠির মাথায় কাগজ বেঁধেছে, নিশান লাগিয়েছে। সারিবদ্ধ হয়েছে আর ছোট্ট উঠানে চক্রাকারে ঘুরছে আর বলছে : 'তোমার নেতা, আমার নেতা– শেখ মুজিব, শেখ মুজিব'; 'ভুট্টোর মুখে লাথি মার– বাংলাদেশ স্বাধীন কর; ইয়াহিয়া খানের মুসলমানি–এক পোয়া দুধে তিন পোয়া পানি।' ঘুরে ফিরে আবার : 'তোমার নেতা, আমার নেতা– শেখ মুজিব, শেখ মুজিব।' স্বাধীন বাংলার মুক্ত আকাশের নিচে নিঃশঙ্কচিত্তের ধ্বনি নয়। বিশাল ঝড়ের পূর্বক্ষণে আকাশে ধূসর কালো মেঘগুলো যখন ঈশান কোণে কেবল পুঞ্জীভূত হয়ে চলেছে, সেই মহালগ্নের আওয়াজ কচি কচি কণ্ঠে। জানিনে কর্মব্যস্ত উদ্বেগভরা প্রতিদিনের জীবন থেকে বেরিয়ে এসে শিশুদের এই মোর্চার সামনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ে তাঁর মনে কী আবেগ উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যে মানুষ দোজখের আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়েও জীবনের হাসি হাসতে পারেন, তিনি শিশু মোর্চার সামনে দাঁড়িয়ে কৃত্রিম আতঙ্কে বলে উঠেছিলেন : 'আরে বাবা, তোদের নেতা শেখ মুজিব!! এমন বিচ্ছুদের নেতা হওয়ার আমার সাহস নাই।'

কিন্তু বাংলাদেশ জানে, শেখ মুজিব এই বিচ্ছুদেরই নেতা হয়েছিলেন, যে কিশোর তরুণ বিচ্ছুরা জল্লাদ বাহিনীর হাতের রাইফেল কেড়ে নিয়ে নিজেদের মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য হাজারে হাজারে সংগ্রামের ক্ষেত্রে রক্ত দিয়েছে, শহীদ হয়েছে। ওদের সেই সংগ্রামী চোখের সামনে আশা ও সাহসের দেদীপ্য শিখা হয়ে জ্বলছিল যুদ্ধক্ষেত্রের বাঙ্কারে, অন্ধকার গোপন আড্ডায়, বন্দীর কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে, জ্বলছিল একটি নাম, একটি প্রতীক : শেখ মুজিব।

শেখ মুজিব একজন মানুষ। তা আমরা জানি। তাঁর দেহ আছে। তাঁর সুস্থতা-অসুস্থতা আছে। আমাদের মতো তাঁরও আত্মজন আছে। বৃদ্ধ পিতা আছেন। মা আছেন। তাঁর অবোধ সন্তান আছে। তবু বাংলাদেশের দুর্জয় সংগ্রাম আর সাহাসের প্রতীক শেখ মুজিব যেন ব্যক্তি শেখ মুজিবকে অতিক্রম করে গেছে। এ প্রতীক শিশু, কিশোর, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, বন্দী, মুক্ত সব মানুষের কাছে ৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাত্রি থেকে একটি পবিত্র আশা ও স্বপ্নের রূপ ধরে ভেসেছিল।

২৭শে মার্চ। পাকি জল্লাদ সামরিক বাহিনী কারফ্যু কয়েক ঘণ্টার জন্য হ্রাস করেছে। বাসা থেকে দুরুদুরু বুকে রাস্তায় বেরিয়েছি। মেশিনগান রেডি পজিশনে সৈন্যবাহিনীর গাড়িগুলো টহল দিচ্ছে। দেখতেই বুক কেঁপে উঠছে। হাঁটি হাঁটি পা পা করে ফকিরাপুল বাজারের দিকে এগুচ্ছি। বাজারের মুখ ইটের বেরিকেডে তখনো বন্ধ। ভয়ার্ত মানুষ কিছু জড়ো হয়েছে। একটা মিলিটারী ট্রাক দেখে ভয়ে আবার ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ছে। আমিও ভয়ে ভয়ে ঢুকে পড়েছি টি অ্যাণ্ড টি কলোনীর দেয়ালের মধ্যে। মনে হল, একজন বাঙ্গালী পুলিশকে ঘিরে বেশ কিছু লোক কি যেন বলছে। কাছে গেলাম। শত মুখে কোটি কোটি প্রাণের একমাত্র প্রশ্ন সেই বাঙ্গালী পুলিশটির উপর বর্ষিত হচ্ছে : আপনি ছিলেন শেখ সাহেবের বাসায় ২৫ তারিখ রাতে? আপনি গার্ড ছিলেন? বলুন শেখ সাহেব কেমন আছেন? কোথায় আছেন? কী বললেন? ওরা গ্রেফতার করেছে? হায় আল্লাহ! বেঁচে আছেন তো? বেঁচে আছেন তো শেখ সাহেব? বেঁচে আছেন তো? এই এক প্রশ্ন। এই প্রশ্ন শুধু সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর মনেরই দিনরাত্রির প্রশ্ন ছিল না, প্রশ্ন ছিল বাঙ্গালীর মুক্তি সংগ্রামে সহানুভূতিশীল বিশ্বের প্রত্যেকটি মানুষের।

দখলদার বাহিনীর হাতে বন্দী ঢাকার মানুষ আমি। পাখির মতো ছোট্ট বাসাটির চারপাশে কেবল ঘুরি। ডানে বায়ে সশংকিত চোখে পথ চলি। ফ্যাসিস্ট হায়েনার সাথে দেশি কুকুরও নাকি পথে নেমেছে। যখন-তখন ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথ থেকে, হাট থেকে, বাসা থেকে। রাত-দুপুরে, ভরসন্ধ্যায়। শেষরাতের নিস্তব্ধতায়। তবু এঁর মধ্যে মানুষ ফিসফিস করে কথা বলে। কানের কাছে নিয়ে ট্রানজিস্টার সেটে স্বাধীন বাংলা বেতারের সংবাদ আর চরমপত্র শুনতে চায়। একদিন যদি সে আওয়াজ খুঁজে না পায় তো হতাশায় মনটা ভরে উঠে। 'শুনেছ, যাত্রাবাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গেছে আকাশবাণী শোনার অজুহাতে। শুনেছ, পুরান শহরে আওয়াজ দিয়েছে জল্লাদের দল, আকাশবাণী আর স্বাধীন বাংলা শুনলে গুলি করা হবে।' তবু কানের কাছে মানুষ তুলে নেয় দেবদুলাল বাবুর দরদভরা সহানুভূতির আওয়াজকে : "ভয় নেই বন্ধু। এ মৃত্যুর শেষে জীবনের সূর্য উঠবেই। ঐ শোন মুক্তিবাহিনীর বিষাণ বাজছে।"

হাঁটছিলাম পথ দিয়ে। পাশ দিয়ে যাচ্ছে একটি বৃদ্ধা, বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে। জীবনের আর ভয় কী! এই মৃত্যুর মাঝে। তাই যেন অসম সাহসে কথা বলে চলেছে সঙ্গের মানুষটিকে ডেকে ডেকে : "হুনছো! ফাঁসি দিবে বোলে হারামজাদারা শেখ মুজিবকে। দেশময় ঘরবাড়ি জ্বালাচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ মারছে। আবার ফাঁসি দিবে শেখ মুজিবকে। আল্লাহ কি নাই? সইবে না এ পাপ। ওরা মরবে। এই হারামজাদারা মরবে।..." বৃদ্ধা বলেই চলেছে সেদিনের নিষিদ্ধপুরীতে সবচেয়ে নিষিদ্ধ কথা।

বর্বরের হাস্যকর সাহস দেখাতে কোন চিন্তা হয় না। তাই সাংবাদিকরা যখন প্রশ্ন করেছিল : শেখ সাহেব কি জীবিত আছেন, তখন জল্লাদ ইয়াহিয়া জবাব দিয়েছিল : হাঁ, আজ জীবিত আছে, কিন্তু কাল থাকবে এমন কথা কে বলতে পারে? সেদিন সেই পাপিষ্ঠের এই ব্যঙ্গোক্তিতেও আমরা শিউরে উঠেছিলাম। ঘরে ঘরে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে একে অন্যকে প্রশ্ন করেছিলাম, শয়তানদের এ কথার অর্থ কী? তবে কি ওরা শেখ সাহেবকে মেরে ফেলেছে?

কিন্তু আশার পতাকাকে কি কেউ শেষ করতে পারে? তুমি তাকে যতোই ছিন্ন করতে চাও সে ছিন্ন হতে হতে শত থেকে সহস্রে, সহস্র থেকে অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটিতে পরিণত হয়।

৭ই সেপ্টেম্বর জল্লাদের অনুচররা এসে আমাকে ধরে নিয়ে গেল। জীবন নাশের আতঙ্কে কে-না আতঙ্কিত হয়। প্রিয়জনের বিচ্ছেদের ব্যথা কার না লাগে! সেই আতঙ্কিত বিমর্ষ অবস্থায় ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ঢুকতে প্রথম রাতেই প্রহরারত বাঙ্গালী সিপাহীর মুখে শুনলাম শেখ সাহেবের কথা।

ঃ আপনি তো পুরোনো মানুষ। আপনি এই যে বিশ ডিগ্রিতে আছেন, এর পাশেই দেওয়ানি। সেই দেওয়ানি ফাটকে ছিলেন শেখ সাহেব। সেই যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ওঁকে জড়িয়ে দিল তখন এখান থেকে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী এসে রাতের অন্ধকারে জেলের সব বন্দী যখন তালাবন্ধ, তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁকে জোর করে সরিয়ে নিয়ে গেল ক্যান্টনমেন্টে, সেই ৬৮ সালে। যে সিপাহীদের পাহারায় রেখেছিল জেল কর্তৃপক্ষ আমিও ছিলাম তার মধ্যে। ক্যান্টনমেন্ট যেতেই যখন হবে, তখন আর বাধা না দিয়ে শেখ সাহেব বেরিয়ে এলেন দেওয়ানি ফাটকের বারান্দা থেকে। সামনের মাটি থেকে এক মুঠো মাটি তিনি হাতে তুলে নিলেন। মনে হচ্ছিল যেন ফাঁসির মঞ্চের দিকে বাংলার ক্ষুদিরাম আবার হাসতে হাসতে অগ্রসর হচ্ছে। এক মুঠো মাটি তুলে কপালের কাছে নিয়ে যেন বললেন : 'বাংলা মা আমার, আমি তোমায় ভালোবাসি।' তারপর আমাদের জড়িয়ে ধরে বললেন: 'যাই ভাই। তোমরা আমায় দোয়া করো।'

এ কাহিনী শুনতে শুনতে নিজের মনের বিষাদ যে কখন কেটে গেল তা জানতেও পেলাম না। শেখ সাহেব নিজে যেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে গেছেন পরবর্তী কালের ভয়ার্ত বন্দী মানুষের জন্য আশার টুকরা, সাহসের মণি, আর দেশকে ভালোবাসার মন্ত্র।

আশার পতাকাকে কেউ নিশ্চিহ্ন করতে পারে না। তাই অযুত জনতা '৬৯-এর গণ-আন্দোলনে ফাঁসির সজ্জিত মঞ্চ থেকে ছিনিয়ে এনেছিল তাদের জীবন আর সংগ্রামের প্রতীক শেখ মুজিবকে।

সেই '৬৯ সালের কথা। যখন শুনেছিলাম শেখ মুজিব ক্যান্টনমেন্ট থেকে মুক্ত হয়েছেন, তখন বুদ্ধি আর বয়সের সব বাধা অতিক্রম করে চোখে আবেগের অশ্রু নেমেছিল। জানি, লক্ষ মানুষের বাধা অতিক্রম করে তাঁকে দেখতে পাবো না। তবু যেন কিসের আকর্ষণে সেদিনও ছুটে গিয়েছিলাম তাঁর বাড়ির দিকে। নিজের মনকে বলেছিলাম : না দেখলাম শেখ সাহেবকে। জনতাকে দেখাই তো শেখ সাহেবকে দেখা। জন দিয়েই জনতা। আমি সেই জনতারই একজন হব, আর সেই জনতাকে দেখেই নিজেকে গর্বিত মনে করব।

আমেরিকার সাপ্তাহিক 'টাইম' পত্রিকা পাকিস্তানে কোনদিন নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে, কল্পনায় আর যা কিছুই চিন্তা করে থাকি না কেন এমন কথা কল্পনা করি নি। দখলদার পাকি বাহিনীর হাতে বন্দী বাংলাদেশ আর ঢাকায় সেই 'টাইম' পত্রিকাও নিষিদ্ধ বলে গণ্য হয়েছে। তাদের সাধারণ সংখ্যায় বাংলাদেশের একটি কথাও থাকতো না। কিন্তু গ্রাহকদের বিশেষ সংখ্যায় নাকি বাংলাদেশের সংগ্রামের কথা কিছু থাকছে। গোপনে গোপনে সেইসব সংখ্যা সংগৃহীত হচ্ছে। হাতে কপি করে তা কেউ কেউ বিলি করেছে। দুরু দুরু বক্ষে 'টাইম' পত্রিকার সেই কপি আমরা পড়েছি। এরই এক সংখ্যায় দেখলাম, রমনা ময়দানের ৭ই মার্চের লক্ষ লক্ষ মানুষের জমায়েতের একটি ছবি তুলে পাশে শেখ সাহেবের একটি জীবনালেখ্য দিয়েছে। শেখ সাহেবের একখানি ছবি দিয়েছে। আর তার নিচে লিখে দিয়েছে : 'ফ্রম হিরো টু মারটায়ার, বীর থেকে শহীদ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকার ঠিকই চেয়েছিল আমাদের আশার এই প্রতীককে নিশ্চিহ্ন করতে। আমেরিকার বিবেকবান মানুষ তাদের সরকারের সেই ষড়যন্ত্রে শামিল হন নি। ভারতের গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের অকুণ্ঠ সমর্থন আর সাহায্যের সঙ্গে পৃথিবীময় বিবেকবান মানুষ সহানুভূতির হাত বাড়িয়েছে বন্দী সংগ্রামী বাংলার দিকে।

সহস্র আশঙ্কাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে স্বাধীন-সার্বভৌম গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আশার মূর্ত প্রতীক শেখ মুজিব ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ সালে আবার এসে দাঁড়ালেন সেই রমনা ময়দানে, যেখানে তিনি শেষ আহ্বান জানিয়েছিলেন : 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

দূর মধ্যপ্রাচ্যের ইয়াহিয়ার বন্দীশালার দুর্বিসহ নিঃসঙ্গতা আর চিন্তায় শুকিয়ে যাওয়া দীর্ঘদেহ মানুষটি লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে দাঁড়িয়ে চোখ মুছতে মুছতে যখন বললেন : 'আমি আবার আপনাদের কাছে এসেছি। লক্ষ লক্ষ ভাই, মা আর বোন নিজেদের জীবনের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছেন, আমাকে মুক্ত করেছেন। আমার প্রতি ভালোবাসার কোন পরিমাপ নেই। এর কোন প্রতিদান আমি দিতে পারিনে–', তখন এমন কোন বাঙ্গালী ছিল না, যার নিজের চোখেও পানি জমে নি এবং আবেগে গলাটা রুদ্ধ হয়ে আসে নি।

১৯৭২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৫ বছর আগের কথা

সাতচল্লিশ সালের শেষ কিংবা আটচল্লিশ সালের গোড়ার কথা। দিন-তারিখ মনে নেই। দিন-তারিখের কথা মনে করিয়ে দিতে পারত মুনীর : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনপ্রিয় অধ্যাপক, বাংলা সাহিত্যের সুপরিচিত নাম, মুনীর চৌধুরী।

সেকালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী গুণী অধ্যাপকের অন্যতম কেন্দ্র বলেই যে সারা ভারতে সেদিন আবাসিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ছিল, তাই নয়। ১৯৪০-৪২ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি, সমাজনীতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল উদার জীবনময় একদল মুসলিম তরুণেরও বিকাশ ঘটেছিল। ১৯৪৫-৪৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে পরীক্ষার প্রতিযোগিতায়, বিতর্কের সভায়, সাহিত্যের আসরে, জ্ঞানের ব্যাপকতায় এই প্রগতিশীল মুসলিম তরুণরাই সেদিন সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। ঢাকা শহর এবং বিশ্ববিদ্যালয় সেদিন গোঁড়া ধর্মান্ধ রাজনীতিরও ঘাঁটি ছিল। সেই প্রতিক্রিয়ার সামনে প্রগতিশীল মুসলিম তরুণদের মধ্যে যাদের কথা মনে পড়ে তাঁদের মধ্যে ছিলেন মুনীর, সানাউল, সৈয়দ নূরুদ্দীন, এ. কে. এম. আহসান, হেসামুদ্দীন (বাহাদুর) এবং আরো অনেকে।

মুনীরকে বলতাম আমরা 'কথার রাজা'। ওর মতো সরস কথা বলতে খুব কম লোকই পারত। ওর কথার মধ্যে যেমন থাকতো বুদ্ধির দীপ্তি, পরিহাসের আমেজ, তেমনি পরিবেশনের নাটকীয়তা। মুনীর তখন ছাত্র : ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত হলের বাৎসরিক বিতর্ক কিংবা উপস্থিত বক্তৃতায় মুনীরের প্রথম হওয়াটা ছিল বেশ কয়েক বছর ধরে একবারেই পূর্ব নির্ধারিত।

আমার এখনও মনে আছে, মুনীর সলিমুল্লাহ বিতর্কে যোগদান শেষ করে সাইকেল চেপে দৌড়ে এসেছে একই সন্ধ্যায় ফজলুল হক হলের বিতর্কেও অংশ নিতে।

আমাদের এই দলের কোন নাম ছিল না। গোঁড়া সম্প্রদায় ঢালাওভাবে আমাদের কমিউনিস্ট বলে আখ্যায়িত করতো। আমাদের অপরাধ ছিল, আমরা সে যুগের জনপ্রিয় ইংরেজি সাপ্তাহিক 'পিপলস ওয়ার' পড়তাম, ছাত্রদের মধ্যে বিক্রি করতাম। ঢাকা ছিল তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিতে আন্তর্জাতিক শহর। ইংল্যান্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমেরিকার জ্ঞানী, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী– যাঁরা সেদিন ফ্যাসিস্ট জার্মানি, ইতালি ও জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সামরিক বাহিনীতে যোগদান করে দূরপ্রাচ্যের ফ্রন্টে এসেছিলেন তাঁরা ঢাকায় এসে এই প্রগতিশীল তরুণদের সঙ্গে তাঁদের মনের সম্পর্ক স্থাপন করতেন। ফজলুল হক হল আর ঢাকা হলের মধ্যখানের পুকুরের পাড়ে আমাদের কতো আলোচনায় বিকেল সন্ধ্যার অন্ধকারে যে পৌঁছে গেছে আশরাফের রেস্তোরাঁর চায়ের কাপে তার ইয়ত্তা ছিল না।

প্রগতিশীল এই মুসলিম তরুণদের বিরুদ্ধে সেদিনকার জঙ্গীবাদী মুসলিম লীগের গোঁড়া ছাত্র সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে একটা গোপন কাউন্সিল তৈরি করেছিল। তাকে তারা নিজেরাই ফ্যাসিস্ট কাউন্সিল বলে আখ্যায়িত করত। সমাজের বিকাশ, ধর্মের উৎপত্তি ও ভূমিকা, সাম্যবাদের জন্ম, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সমস্যা, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে তার সমাধানের সম্ভাবনা ইত্যাদি সম্পর্কে কোন আলোচনা করত তাদেরকে এই ফ্যাসিস্ট কাউন্সিল কওমের শত্রু বলে ঘোষণা করে তাদের বেকায়দায় পেলে তাদের উপর নানা রকম অত্যাচার ও জুলুম চালাত।

হয়ত '৪৮ সালের গোড়ার দিকেই হবে। সলিমুল্লাহ হল ছিল মুসলিম ফ্যাসিস্ট কাউন্সিলের কেন্দ্র। মুনীর থাকতো সলিমুল্লাহ হলে। এক রাতে অতর্কিতে এই ফ্যাসিস্টরা আক্রমণ করল মুনীর এবং হলের প্রগতিশীল অপর ছাত্রদের উপর। মুনীরের বিছানাপত্র ঘর থেকে বার করে ফেলে দিল। বইগুলো তছনছ করে মুনীরকে হল থেকে বার করে দিল। মুনীর এবং অপর কয়েকজন ছাত্রকে এমনি করে বার করে দিয়ে জয়ের উল্লাসে ফ্যাসিস্ট অধিনায়কদের একজন আবার মুনীরের ঘরে এল। মুনীরের ঘরে সে রাতে তার খালাত ভাই রফিক ছিল। রফিক তখন কলেজে পড়ত। রফিক এখন কোথায় আমি জানিনে। কিন্তু রফিকের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা আজো আমার মনে পড়ে। রফিকের ঠোঁটে সব সময়ে একটি সহজ পরিহাসময় হাসি ভেসে থাকত। মনে হত জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত সব কিছুকে ও যেন সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে। রফিকও তখন তার কলেজের বিশিষ্ট ছাত্র কর্মী। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের ছাত্রদের কাছে তত পরিচিত নয়। ফ্যাসিস্টপন্থী ছাত্রদের একজন যখন মুনীরের সেই ছত্রছন্ন ঘরে এসে ঢুকলো তখন দেখলো সেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলা বই-এর রাশি থেকে একখানা বই নিয়ে রফিক নিবিষ্ট মনে পড়ছে। বিজয়ীর ব্যঙ্গ নিয়ে আগত ছাত্রটি রফিককে জিজ্ঞেস করল : কি সাব, কি করছেন?

রফিক বলল : বই পড়ছি।

: কী বই পড়ছেন?

: রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'মানব সমাজ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: কেন, আগে আর পড়েন নি এ বই?

: হ্যাঁ পড়েছি।

: তবে আজ আবার কী পড়ছেন?

রফিক এক মিনিট প্রশ্নকারীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ঠোঁটের পরিহাসময় হাসিটি যেন আর একটু তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। নিষ্পলক দৃষ্টিতে সেই ফ্যাসিস্ট কীটের দিকে চেয়ে বলল : বর্বরতার যুগটাকে আজ আবার পড়ে দেখছিলাম!

ফ্যাসিস্ট ছাত্রদের আক্রমণ আমাদের ফজলুল হক হলেও হয়েছিল। সলিমুল্লাহ হলের এই ঘটনার পরেই বোধ হয়। আমি তখন এম. এ. পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে শিক্ষকতা করি। ফজলুল হক হল তখন দ্বিতল দালান। কয়েকজন শিক্ষকও তখন হলে থাকতেন। হলের পূর্ব দালানের দক্ষিণের মাথায় দোতলায় থাকতাম আমি। অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী (বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর) এবং নুরুল ইসলাম চৌধুরী। তিনিও হয়ত তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা শুরু করেছেন।

একদিন হঠাৎ শুনলাম হলের মাঠে হাতবোমা ফাটার শব্দ আর 'নারায়ে তকবীর– আল্লাহো আকবার' ধ্বনি। হলের পশ্চিম দালান থেকে অভিযান শুরু হল। কয়েকজন ছাত্রের অভিযান। হাতবোমা ফাটাতে আর নারায়ে-তকবীর ধ্বনি দিতে দিতে তারা হলের পূর্ব-দালানের দোতলায় উঠে এল। আমার বুঝতে বাকি রইল না, এ অভিযানের লক্ষ্য আমি নিজে। বোমা ফাটাতে ফাটাতে এসে ওরা হাজির হল আমার ঘরের দরজায়। সবাই যেন এগুলো না। আমার মতো নিরীহ লোকের উপর অভিযানের অনুসারীদের হয়ত কিছুটা সঙ্কোচ এসেছিল। দলের নেতা কে ছিল, আজ তার নাম ভুলে গেছি। সে সামনে এসে বলল : আপনি হলে থাকতে পারবেন না।

আমি বললাম : কেন, আমার কী অপরাধ?

দলনেতার জবাব : আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাইনে। আপনি হলে থাকতে পারবেন না।

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম : আপনারা হলের ছাত্র, আমি শিক্ষক। মতামত যাই হোক, একজন ছাত্রও যদি আমার হলে থাকায় আপত্তি জানায় আমি নিশ্চয়ই থাকবো না।

নিরীহ মানুষের কাছ থেকে নিরীহ জবাব পেয়ে আক্রমণকারীর দল বিজয়ীর মনোভাব নিয়ে আবার বোমা ফাটাতে ফাটাতে চলে গেল।

ঘটনা বাড়ছিল। একদিন 'পাকিস্তান' মুসলিম জনতার সার্বজনীন দাবি বলে সমর্থন করেছিলাম। ধর্মের ভিত্তিতে জাতি হয় না। তবু একটি ধর্মাবলম্বী জনতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপুল অংশ যখন সেই ধর্মের নাম নিয়ে কোন দাবি তোলে তখন সে দাবি যথাসম্ভব স্বীকার না করে তার আবেগকে প্রশমিত করা যায় কেমন করে? কিন্তু মুসলিম জনতার দাবির স্বীকৃতিতে সেদিন পাকিস্তানের শাসনাধিকার তো মুসলিম জনতা পায় নি। পায় নি তো কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতা কিংবা তার সন্তানেরা। শাসনের এবং শোষণের একচ্ছত্র অধিকার পেল সামন্ততান্ত্রিক নবাব-নাইট জমিদার আর বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের অনুচরগণ। এরা এদের স্বার্থ চিরস্থায়ী করার জন্য জ্ঞান বিজ্ঞান উদারতা মানবতা– মানুষের সব মহৎ প্রবৃত্তির বিরোধিতা করে ধর্মান্ধতার ধারায় সমগ্র দেশ ও তার যুব সমাজকে আচ্ছন্ন করে দিতে চাইল। এ জন্য তারা রাষ্ট্রযন্ত্রের সমস্ত শক্তিকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, দর্শন, জীবিকা– সর্বক্ষেত্রে চরমভাবে ব্যবহার করতে শুরু করল। এরই পরিণামে নওয়াবপুরের রথখোলায় ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর প্রগতিশীল বই-এর দোকান একদিন শহরের মুসলিম লীগ গুণ্ডারা ভেঙ্গেচুরে লুঠ করল। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার অধিনায়ক কমরেড মুজাফফর আহমদ ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর রথখোলার শাখাটি স্থাপন করেছিলেন। বিজ্ঞান, রাজনীতি, সাহিত্য ও আন্তর্জাতিক জ্ঞানের সেদিনকার একমাত্র প্রগতিশীল পুস্তকাগার ছিল ন্যাশনাল বুক এজেন্সী। ফ্যাসিস্ট গুণ্ডারা দোকানের দরজা ভেঙ্গে বইগুলো রাস্তায় ফেলে পুড়িয়ে মাড়িয়ে দুমড়ে মুচড়ে চলে গেল।

সদরঘাটের লেডিস পার্কের পাশে ছিল করোনেশন পার্ক। সেকালে সেই ছোট্ট মাঠেই সব রাজনৈতিক সভা হোত। সেই পার্কে ৪৮ সালেই আমরা একটা জনসভা ডেকেছিলাম। আমার আর মুনীরের বক্তৃতা দেবার কথা ছিল। দেশের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে শাসকদের কাছে জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা দাবি করার সভা। কিন্তু মুসলিম লীগের গুণ্ডারা সেদিন সে সভাও হতে দেয়নি। আমাদের কোন বাহিনী ছিল না। মানুষের মঙ্গলকর কথা বলার আন্তরিক আগ্রহই ছিল আমাদের একমাত্র শক্তি। কিন্তু সে দিন সে সভায় কথা বলা আমাদের সম্ভব হোল না। গুণ্ডাদের অতর্কিত আক্রমণে সভা ভেঙ্গে গেল।

তারপর দিনের পর দিন গেছে। মাসের পর মাস। বছরের পর বছর। জীবনের আকাশ মেঘে ভরেছে। দিগন্তে কালো মেঘ স্তূপীকৃত হয়ে দুর্মর ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করেছে। গ্রেপ্তার হয়েছি। বছরের পর বছর নিশ্ছিদ্র কারাগারে প্রহর গুণেছি। মাঝে মাঝে আকাশে বিদ্যুতের চমক খেলেছে। যে তরুণরা '৪৭ সালে জন্ম নেয় নি তারা জন্ম নিয়েছে, রক্ত দিয়েছে, জীবনের জয়ধ্বনি তুলেছে। সাহস করে ভাবতে পারি নি ৪৭ সালের ঘটনার কথা কোন দিন প্রকাশ্যে বলতে পারব। মুনীরও হয়ত এমনি করে ভাবত। ভাবত– উত্থানময় যুগান্তরের সেও একদিন স্মৃতিকথা লিখবে। যে কথা কোন দিন লিখতে পারে নি সে কথা একদিন লিখবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৫ বছর আগের কথা

যে বর্বরতা শুরু হয়েছিল ৪৭ সালে তারই চরম রূপ দেখেছি আমরা ১৯৭১ সালে। '৪৭ সালের বর্বর পশুরাই '৭১ সালে মুনীরসহ সহস্র বুদ্ধিজীবীকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। ত্রিশ লক্ষ মানুষের জীবনের বিনিময়ে প্রমাণিত হয়েছে বাংলাদেশের বুকে সমাজবিজ্ঞানের একটি সাধারণ মৌল সত্য : জীবন আর মৃত্যু, প্রগতি আর প্রতিক্রিয়া, দ্বন্দ্বমান দুই শক্তির পরিবর্তনে ভারসাম্যের কোন অস্তিত্ব নেই। সংগ্রামের ক্ষেত্রে জীবন মৃত্যুর উপর জয়লাভ করবেই– হোকনা সে মৃত্যু যতোই ভয়াল, যতোই ভয়ঙ্কর।

১৯৭২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুজবে কান দেবেন না

এপ্রিল শেষ হয়ে মে মাস আসতে না আসতেই বর্বর পাকিবাহিনী ঢাকায় পোস্টার আর মাইক দিতে বাধ্য হল। 'গুজবে কান দিবেন না'। ওদের আওয়াজেই ঢাকার বন্দী মানুষ আমরা টের পেলাম খান সেনাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে।

সময় মনের উপর কেমন ভারী বোঝা হয়ে উঠতে পারে এ অভিজ্ঞতা আমার একদিন হয়েছিল জেলখানার মধ্যে। সেই ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৫, আর '৫৮ সাল থেকে '৬২ সাল পর্যন্ত। জেলের মধ্যে বসে গুণেছি এক দিনে কত ঘণ্টা, এক ঘণ্টায় কত মিনিট, এক মিনিটে কত সেকেন্ড, এক সেকেন্ড কত পল আর এক পলে কত অণুপল। কিন্তু জেলের বাইরে সমস্ত ঢাকা শহর, সমস্ত দেশটাই যে সেই জেলের চেয়েও দুঃসহ আর একটা জেলে পরিণত হতে পারে, এ অভিজ্ঞতা হলো বন্দী ঢাকাবাসীর ২৫শে মার্চের সেই কাল রাত্রি থেকে। সন্ধ্যা না হতেই গা ছমছম করে। নির্জন রাস্তায় বর্বর বাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ি ছুটে বেড়ায়। দরজায় দরজায় যেয়ে হানা দেয়। কারুর টু শব্দটি করার সাহস নেই। নিঃশব্দে গাড়িতে তুলে মুহূর্তে উধাও হয় কিংবা ঘরের দুয়ারেই গুলি করে শেষ করে দিয়ে যায়—বাবাকে মাকে মেয়েকে....। অন্ধকার রাত্রি যদি বা ভোর হয়, ঢাকার মানুষের মনের ভার কমে না। মিনিট কাটে না, ঘণ্টা কাটে না, দিন কাটে না। কী করে সময় কাটবে? কী করবে সে? মৃত্যু বাদে কী ঘটনা আছে আমাদের জীবনে?

তবু সেই মৃত্যুর মধ্যেও আমরা বাঁচতে চেয়েছি। দুরুদুরু বুকে স্বাধীন বাংলা বেতারের তরঙ্গে কান পেতেছি। আকাশবাণীর সহানুভূতিভরা সংবাদ আর পর্যালোচনা শুনে চোখের পাতা ভিজে উঠেছে। ভেবেছি, আহা। তবু তো দুনিয়া জানছে কী মহামৃত্যুর মধ্যে আমরা রয়েছি।

কিন্তু কেবল অসহায় আর্তনাদ নয়। মে মাস আসতেই কান থেকে কানে খবর এল : যাত্রাবাড়িতে অ্যাকশন হয়েছে। দু'ঘণ্টা লড়াই হয়েছে। গ্রীন রোডে কয়েকটা খানসেনা খতম হয়েছে। ওরা পাগলা কুকুরের মতো পাড়াকে পাড়া ঘেরাও করে মানুষগুলোকে ধরে নিয়ে গেছে। দখলদার জল্লাদের দল জোর করে খবরের কাগজ বের করেছে। কিন্তু সে কাগজ রাখে খুব কম লোকেই। পড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো কম লোকে। খবরের কাগজ রাখা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। সেই অভ্যাসেই সেদিন পত্রিকা রাখতাম। হকার নিজের জীবিকার জন্যই হয়ত জোর করে দরজার ফাঁকে দিয়ে যেত একটা কাগজ। কিন্তু কী পড়ব সেই কাগজে? শহর স্বাভাবিক হওয়ার বিবরণ? সে বিবরণের কালি শুকোতে না শুকোতে মতিঝিলে রাত্রির বুক কেঁপে উঠে গ্রেনেডের শব্দে। আনন্দ-আশঙ্কায় মন ফুলে ওঠে। সকালে ফকিরাপুল বাজারের দিকে যেতে দেখি টি অ্যান্ড টি স্কুলের দালানটা শূন্যগর্ভ হয়ে আকাশের দিকে হাঁ করে আছে। সাধ্য নেই কেউ তাকে পাশ কাটিয়ে যায়, না দেখে। পীর জঙ্গী মাজারের বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনেও একদিন গ্রেনেড ছুঁড়লো দামাল ছেলের দল। আমরা জানি একটা গ্রেনেডেই খান সেনার দল খতম হয়ে যাবে না। এ যেন দামাল ছেলের দল ওদের অসহায় বন্দী বাবা মা ভাই বোনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছে : "তোমরা হতাশ হয়ো না। এই দেখ আমরা আছি। তোমাদের পাশেই আছি। তোমাদের জন্যই মরছি। শুধু মরছি নয়, ওদের মারছিও। আমরা রক্ত বীজের ঝাড়। ওরা আমাদের কতো মারবে?"

এবার আমাদের মনের হতাশা কাটতে লাগল। সময়ের পালে যেন হাওয়া ভরে ওঠে। আমাদের খবরের কাগজ তৈরি হয়। বর্বর খান সেনাদের ভাষায় 'গুজব'। এ কাগজকে ওরা বেআইনি করার চেষ্টা করে। হুকুম জারি করে। দেয়ালে দেয়ালে নিষেধনামা টাঙ্গিয়ে দেয়। সে কাগজ হাওয়ায় ভর দিয়ে উড়ে চলে, বেড়ে চলে। আর তার মধ্যে কতো খবর, কতো কাহিনী, কতো ব্যঙ্গ, পরিহাস আর টিপ্পনী।

AMARBOI.COM

বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে আড়ালে ডেকে চোখ টিপে জিজ্ঞেস করি, খবর কী? খবর?

খবর হচ্ছে : ওদের শান্তি কমিটি প্রস্তাব নিয়েছে, 'দুস্কৃতিকারীরা' শহর ঘেরাও করে ফেলতে পারে। তাই তাদের শহরে ঢোকার আওয়াজ পেলেই সাইরেন বাজিয়ে দেওয়া হবে।

খবর হচ্ছে : সদরঘাটে ওরা কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছে। ওদের ধারণা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে মুক্তি বাহিনীর শহরে অনুপ্রবেশ আটকে দিবে। চালুনী দিয়ে পানি ছাঁকবে। দেয়াল তুলে হাওয়া আটকাবে।

খবর হচ্ছে : খানসেনারা কচুরীপানা মাথায় দিয়ে সদরঘাটে রবার বোটে চড়ে বর্ষাকালে মুক্তি ফৌজের মোকাবেলার কসরত আঁটছে। বর্বরের দল এমন মজার দৃশ্যটা টেলিভিশনের পর্দায় দেখাতেও সঙ্কোচ বোধ করেনি।

চরমপত্রের গল্প বানানো নয়। মৃত্যুপণ সংগ্রামী বাংলার জীবনের কাহিনী। তার টুকরো টুকরো ঢাকার বন্দী মানুষ আমরাও পেয়েছি। আমরা দেখেছি রাস্তায় আকস্মিকভাবে জল্লাদের দল বাস থামিয়েছে। যাত্রীদের চেক করেছে আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোয়ান জোয়ান যাত্রীদের বাছাই করে নিজেদের গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেছে ক্যান্টনমেন্টে, ওদের শরীর থেকে রক্ত নিংড়ে নিয়ে মেরে ফেলতে।

এরূপ অসংখ্য ঘটনা আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে মা বাবার বুকে। নিজেদের কিশোর আর যুবক সন্তানকে কোথায় লুকোবে তার পথ পায় নি। মা তার ছেলেকে মুহূর্তের জন্য রাস্তায় যেতে দিতে শঙ্কা বোধ করেছে।

: ওরে আজাদ, তুই বাইরে যাসনে। ওরা তোদের মতো ছেলেদের রক্ত নিংড়ে নেয়।

মাকে ফাঁকি দিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে আজাদ। মুখে দুষ্টুমির হাসি ছড়িয়ে বলে : মা, সে ভয় আর নেই।

: কেন রে?

: আরে জানো না? বাঙ্গালীর রক্তে খান সেনারা ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। ওরা যেইনা বাঙ্গালীদের রক্ত ওদের মর মর জখমী সেনাদের শরীরে ঢুকিয়ে দিয়েছে অমনি ওরা বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে কেবল লাফাচ্ছে আর বলছে : জয় বাংলা! জয় বাংলা!

মা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে দুষ্টু ছেলের বুদ্ধি দেখে।

গ্রামের রাস্তায় খান সেনাদের ট্রাক গর্তে পড়েছে। টেনে তুলতে পারছে না কিছুতেই। গ্রামের মানুষকে ডেকে আনা হয়েছে। তুলে দাও গাড়ি। মানুষ বাধ্য হয়ে হাত লাগিয়ে ঠেলছে, তবু গাড়ি ওঠে না। খান সেনার অফিসার হাঁকছে : কিউ নেহি উঠতা?

গ্রামবাসীদের মধ্য হতে সমস্বরে জবাব আসে : একসাথে আওয়াজ না দিলে উঠবে না।

: আওয়াজ? কেয়া আওয়াজ?

: জয় বাংলার আওয়াজ?

: জয় বাংলাকা আওয়াজ! খান সেনাদের মুখ কুঞ্চিত হয়। মেশিনগান কি টিপে দেবে? না, কুকুর যে গর্তে পড়েছে। তাই বলে : জয় বাংলাকা আওয়াজ? ঠিক হ্যায়। লেকিন জেয়াদা নেহি। শ্রেফ এক মোর্ত্তবা বোলো : জয় বাংলা।

এই নিয়ে আমরা বাঁচি। গল্প নিয়ে। কাহিনী নিয়ে। গুজব নিয়ে। বন্ধু এসে বলে, খান সেনাদের সাহসের কথা শুনেছেন!

: কী।

: কাল রাতে সিদ্ধেশ্বরীতে আমাদের বাসায় এসে পাহারা দিচ্ছে। স্কুলে পরীক্ষা নিবে। তাই পাহারা বসিয়েছে। সন্ধ্যা না হতেই ঘাবড়ে যেয়ে বলছে, দরোয়াজা বন্ধ করো। দরোয়াজা বন্ধ করো। গুলি শুরু হো যায়গা। বলেই ভয়ের চোটে ছুটে একেবারে তেতলার ছাদে। তা ছাদে যাবি তো যা। আমাদের নিয়েও টানটানি : তোম লোগভি আযাও। হামারা সাথ গার্ড দেনে হোগা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাধীন বাংলাদেশ বেতার খবর দিচ্ছে : গত তিন মাসে অন্ততঃ পঁচিশ হাজার খান সেনা নিহত হয়েছে। কী করে মিলাই এ খবর?

সাথী বলেন এক কাহিনী। মিলিটারী জিপ যাচ্ছে। খানসেনা ঠাসা। তার মধ্যের একজন কায়দা করে ডোন্ট কেয়ার ভাব দেখিয়ে সামনের সিটে বাইরে পা ঝুলিয়ে বসেছে। ড্রাইভার হুশিয়ার করে দিয়ে বলেছে : পা আন্দার লাইয়ে। অ্যাকসিডেন্ট হো যায়গা। খান সেনা জবাব দিচ্ছে হতাশ ভঙ্গীতে : আরে ইয়ার ছোড়দো। মরনে তো হোগা। হিঁয়া নেহি তো উহা ফ্রন্টমে। তিন ভাই এসেছিলাম। তার দুজন তো এরই মধ্যে খতম হয়ে গেছে।

কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে আর মুক্তি বাহিনীকে রোখা যাচ্ছে না। সব জায়গায় মুক্তি বাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে। খান সেনারা উদ্ব্যস্ত। যাকে পাচ্ছে তাঁকেই ধরছে 'মুক্তি' বলে। অফিসের কেরানি কর্মচারীর আইডেনটিটি কার্ড রাগে ছিড়ে ফেলে বলছে : ইয়ে সব লোক 'গাদ্দার' হ্যাঁয়। ও দিনকো অফিস করতা আওর উসকা বাদ রাত মে মুক্তি হোতা।

খুবই সত্য কথা। কিন্তু বেধড়ক মানুষ মারলেই তো মুক্তি মরে না। তাই যত মারে তত মুক্তির আঘাত আসে। গাছপালা ঘেরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে খান সেনাদের গাড়ি। শুধু গ্রেনেড নয়। গ্রেনেডসহ একটি যুবক নিজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে গাছের মাথা থেকে ট্রাকের উপর। নিজেকে সহ উড়িয়ে দিয়েছে খানসেনাদের গোটা ট্রাকটাকে।

খান সেনারা ঘাবড়ে যাচ্ছে : ইয়ে তো বড়া আজব চীজ। ইয়ে কাঁহাসে আতা, কাঁহা যাতা, কুই পাত্তা নেহি, মালুম নেহি।

টাঙ্গাইলের বীরত্বপূর্ণ লড়াই-এর কাহিনী খানসেনাদের বিরুদ্ধে পরিহাসের গল্প হয়ে ঢাকায় এসেছে। আমরা শুনেছি, পাকসেনারা বহুদিন পরে যেদিন টাঙ্গাইল ঢুকলো সেদিন টাঙ্গাইলে মুক্তিবাহিনীর জারি করা কারফ্যু চলছে।

খান সেনারা টাঙ্গাইলে ঢুকে দেখে, কোন লোক রাস্তায় বেরোয় না। তারা জিজ্ঞেস করে : কিঁউ।

টাঙ্গাইলবাসীরা জবাব দেয় : বেরুব কেমন করে, মুক্তি বাহিনী কারফ্যু দিয়ে রেখেছে।

কারফ্যুর একচ্ছত্র মালিক খানসেনারা ক্ষেপে যায় : ইয়ে কারফ্যু নেহি চলেগা। ইয়ে কারফ্যু তোড় দো!

বিশ্বব্যাঙ্কের কারগিল মিশনের কাছে বন্দী ঢাকার মানুষ সেদিনও মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। কারগিল মিশন এসেছে বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থা সরেজমিনে দেখতে। মনে সন্দেহ যতোই থাকুক, ইয়াহিয়া-টিক্কার উপায় থাকে নি মিশনকে বাংলাদেশে আসতে না দিয়ে। মিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাঙ্ক মিটিং করে ঠিক করবে পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া যাবে কিনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বব্যাঙ্ক পাকিস্তানকে অর্থনীতিক সাহায্য মঞ্জুর করলে আমাদের মুক্তি সংগ্রাম আরো দীর্ঘকালীন এবং আরো কঠিন হয়ে উঠবে। কিন্তু নিহত বাঙ্গালীর জন্য কারগিল মিশনের সহানুভূতির কথা আমাদের অগোচর রইল না। ইয়াহিয়া-টিক্কার কাগজে কিছু না লিখুক, বন্দী মানুষের কান থেকে কানে, চোখ থেকে চোখে ছড়িয়ে পড়ল সেই কাহিনী।

কারগিল মিশন সামরিক জান্তার অফিসারদের জিজ্ঞেস করল : তোমাদের কারখানা কেমন চলছে?

জবাব এল চটপট : বিলকুল নরম্যাল।

আচ্ছা আমরা নারায়ণগঞ্জের শিল্পাঞ্চল দেখতে যাব। রাজি হতে হল টিক্কার সাগরেদদের। কন্ট্রোল রুম থেকে হুকুম গেল গোপনে : কাল দুপুরে বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা যাবে মিল দেখতে।গ্রাম থেকে লোক ধরে মিলের নরম্যালসি দেখাও।

পরদিন দুপুরে কারগিল মিশনকে নিয়ে যাওয়া হল একটা কাপড়ের কলের মধ্যে। মেশিন চালু করেছে খানসেনারা। মিশনের প্রতিনিধিরা আস্তে আস্তে হাঁটছেন কারখানার মধ্য দিয়ে। মেশিনের শব্দের মধ্যেও কান খাড়া আছে। হাতের কাজ করতে করতে একজন বাঙালি সুযোগ পেয়ে বলে দিল : কাম আফটার টু আওয়ার্স : দু ঘণ্টা পরে আবার আসুন।

মিশনের নেতা যেন শুনতেই পান নি। এক মিল থেকে আর এক মিলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দু'ঘণ্টা পরে বায়না ধরলেন : ঐ আগের মিলটাকে আবার একবার দেখতে চাই। সে মিলে ফিরে এসে দেখেন : মিলের গেট পর্যন্ত বন্ধ। মিশনের নেতা টিক্কা খানকে জিজ্ঞেস করেন : এ কী রকম নরম্যালসি? টিক্কা জিজ্ঞেস করে তস্য টিক্কাকে। তস্য তার তস্যকে। শেষকালে স্বীকার করে। থোরাকুছ গলতি হুয়া।

প্রায় মন্দিরই ওরা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। রমনার ময়দানের মন্দিরের চূড়ায় ন্যায় উঁচু চূড়া ঢাকার অপর কোন মন্দিরের ছিল না। দেশি বিদেশী কোন মানুষ না জানতো যে, এখানে বিরাট এক মন্দির ছিল।

মিশর প্রধান জিজ্ঞেস করলেন খান বাহিনীর অফিসারকে : এ মন্দিরটা তোমাদের কী ক্ষতি করেছিল?

বর্বরের জবাব তৈরি ছিল : হিঁয়াছে গুলি আয়া। এখান থেকে গুলি এসেছিল, মর্টার মেরেছিল।

মিশন প্রধান অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন : ইভেন গডেস কালী ওয়েন্ট অ্যাগনেস্ট ইউ! কী তাজ্জব ব্যাপার। দেবী কালীও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে!

মিশন জিজ্ঞেস করছেন : ঢাকায় আরো অনেক মন্দির ছিল। সবই তোমরা ধ্বংস করেছো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াহিয়ার অনুচররা বলে : নেহি নেহি। অনেক মন্দির আছে।

মিশন প্রশ্ন করেন : সব পুরোহিতকে তোমরা মেরে ফেলেছ?

খান সেনার অফিসার জবাব দেয় : কভি নেহি। প্রিস্টভি হায়।

: ঠিক আছে আমরা পুরোহিত দেখতে চাই আর দেখতে চাই মন্দিরে পূজো হচ্ছে। প্রমাদ গুণে দখলদার সরকার তবু মুখরক্ষার চেষ্টা করে। ঠিক আছে, সন্ধ্যায় তোমরা মন্দিরে পূজো দেখবে।

সন্ধ্যায় এক মন্দিরে নিয়ে যায় খান সেনা আর দখলদার সরকারের পুলিশ বাহিনীর অফিসার। পুরোহিত মন্ত্র আওড়াচ্ছিল জোরে জোরে। মিশন এগিয়ে এলেন মন্দিরের কাছে।

পুরোহিত চোখ তুলে চেয়ে দেখল, পুলিশ অফিসার। অমনি ঘট করে উঠে খট করে সেলাম ঠুকলো পুরোহিতবেশী আই বি ওয়াচার তার পুলিশ অফিসারকে।

মিশনের প্রতিনিধিদের চোখে মুখে হাসি। হেসে বলেন : ওহ! হাউ স্মার্ট এ প্রিস্ট উই সি। বাহবা! কী চতুর পুরোহিত, বলে বেরিয়ে আসেন মিশন মন্দির থেকে।

ঢাকার শাঁখার কথা কোন রসিক বিদেশী না শুনেছে? সেই শাঁখার শিল্পকেন্দ্র শাঁখারী বাজার। তাকে জনশূন্য করে দিয়েছে খানসেনারা মেশিনগান আর মর্টারের গোলাবর্ষণে। সে কথা মিশনের কানে পৌঁছেছে। সেই সত্য যাচাই করার চেষ্টা করছেন মিশন।

নিউমার্কেটে ইংরেজি জানে বলে মনে হয় এরূপ বাঙ্গালী যুবক একজনকে ধরে অনুরোধ করেন মিশন : আমাদের একটু শাঁখারী বাজারে নিয়ে চলোনা? অনুরোধ শুনে আতঙ্কিত বাঙ্গালী যুবক শিউরে ওঠে। বলে, এক্সকিউট মি প্লিজ। আমাকে মাফ করুন।

মিশন প্রধান বলে উঠেন : আমরা যা জানতে চেয়েছিলাম তা পেয়ে গেছি। ধন্যবাদ। আপনার যাবার প্রয়োজন নেই।

আমি কি বন্দী ঢাকার সব কাহিনী জানি? তবু বন্দী ঢাকার মানুষ আমরা কেমন করে বেঁচেছি, কী ছিল আমাদের মনের খোরাক তারই আভাস দিতে চেষ্টা করলাম এই কাহিনী কটিতে।

১৯৭২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা মাধ্যমের প্রশ্নে

অদ্ভুত প্রশ্নের কোন স্বাভাবিক জবাব হয় না।

পা দিয়ে কি হাঁটা যায়?

হাত দিয়ে কি লেখা যায়?

মায়ের ভাষায় কি মাকে ডাকা যায়?

বাংলাদেশকে কি বাংলাদেশ বলা যায়?

বাংলা ভাষায় কি সরকারি সাহেব তাঁর নাম দস্তখত করতে পারেন?

বাংলা ভাষায় কি জ্ঞান বিজ্ঞান আয়ত্ত করা যায়?

সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যমে হিসাবে বাংলা ভাষা কি এই মুহূর্তে চালু করা যায়?

এর কোন প্রশ্নেরই স্বাভাবিক জবাব হয় না। গত ২৪ বছর ধরে এমনি করে চলেছে পা উপরে তুলে মাথায় হাঁটার আত্মবিধ্বংসী প্রয়াস। আর তার পরিণামে যাদের ধ্বংস অনিবার্য তারা ধ্বংস হয়েছে। অযুত প্রাণের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাভাবিক সত্য, সূর্য-সত্য: পা দিয়ে হাঁটা যায়, পা দিয়েই হাঁটতে হয়; হাত দিয়ে লেখা যায়, হাত দিয়েই লিখতে হয়; মায়ের ভাষায় মাকে ডাকা যায়, মাকে মায়ের ভাষাতেই ডাকতে হয়; বাংলাদেশকে বাংলাদেশ বলা যায়, তাকে স্বাধীন বাংলাদেশই বলতে হয়; নিজের ভাষাতে জ্ঞান বিজ্ঞান আয়ত্ত করা যায়, তাই করতে হয়। পৃথিবীর সব দেশে তাই করে। তাই করেছে। এবং সর্বশেষ প্রশ্ন : এই মুহূর্তে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করা যায় এবং তাই করতে হবে।

তবু যদি এই শেষ প্রশ্নের যে শেষ জবাব স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করেছেন তাকে অস্বাভাবিক স্বভাবের কোন শ্রেণী আটকে দেবার, বিলম্বিত করার চেষ্টা করে তাহলে নিশ্চয়ই স্বাভাবিত জবাবে তার মীমাংসা হবে না। হবে অস্বাভাবিতভাবেই।

এই অস্বাভাবিক স্বভাবের কথা মনে আসত না, যদি না এই সেদিনও এবং আজো সরকারী প্রায় চিঠিপত্রের আদান-প্রদান ইংরেজির মাধ্যমে হতে না দেখতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশ স্বাধীন করতে কোটি মানুষের রক্ত ক্ষরিত হয়েছে। তার পরিণতিতেই স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম। সেই স্বাধীন বাংলাদেশের স্বত্ব সার্বজনীন করার জন্য, তাকে শ্রমিক, কৃষক ও গরীব মধ্যবিত্তের স্বদেশে পরিণত করার জন্য এই মুহূর্তে আবশ্যক হচ্ছে শিশু শ্রেণী থেকে শিক্ষার শীর্ষ শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা ভাষায় জীবনের সব জ্ঞান সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে হাজির করার। কেবল এই পথেই খুলে যাবে সমস্ত মানুষের সার্বিক বিকাশের মহাসড়ক। সম্ভব হবে সত্যিকারভাবে ধর্মনিরপক্ষে, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

সেক্রেটারিয়েট থেকে পত্র আসে ইংরেজিতে। সাধারণ কথা। পত্র প্রেরক লিখেছেন পত্র প্রাপককে : এ বিষয়ে আপনার মতামত জানাবেন। কিন্তু এই কথা কটি বাংলায় লেখা সরকারি সাহেবের পক্ষে সম্ভব হয় নি। কারণ হিসাবে তিনি হয়ত বলবেন : তাঁর কাছে বাংলা টাইপরাইটার নেই। কিন্তু অযুত শহীদের প্রতি মমতা কিংবা বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণাকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা থেকে সরকারি সাহেবের এরূপ ইচ্ছাও হয় না যে, চিঠির নিচে তিনি নিজের হাতে বাংলাতে লিখে দেন : টাইপের অসুবিধার জন্য চিঠিখানি বাংলায় লেখা সম্ভব হল না। চিঠির শেষে সুন্দরভাবে ইংরেজিতে তিনি নিজের নামটি দরখাস্ত করেছেন। বাংলাতে দরখাস্ত করলেও বোঝা যেত, বাংলার প্রতি তাঁর একটু মমতা আছে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি নিজে বাংলাতে সহি করতে পেরেছেন; তাঁর দফতর থেকে টাইপের অসুবিধা থাকলেও হাতের লেখায় তৈরি হয়ে তাঁর চিঠি বাংলাতে পৌঁছতে পেরেছে শিক্ষাবিদ সাহিত্যিকদের কাছে।

কাজেই প্রশ্নটা উপায়ের চেয়ে বেশি হচ্ছে ইচ্ছার ঐকান্তিকতার।

আজকের কথা নয়। ১৯৪২-৪৩ সালের কথা বলছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। দর্শনে অনার্স পড়ি। সাথে আছে রাষ্ট্রনীতি আর ইংরেজি সাহিত্য। রাষ্ট্রনীতি খুব সাহিত্যমূলক বিষয় নয়। রাষ্ট্রনীতি বিজ্ঞান। এ বিজ্ঞানের অনেক কঠিন ইংরেজি শব্দ আছে। শুধু স্টেট, পার্লামেন্ট, প্রেসিডেন্ট, প্রাইম-মিনিস্টার নয়। আছে কনসটিটুশন, আলট্রাভায়রস, ডি জুরি, ডি ফ্যাক্টো, অ্যারিস্টোক্রাসি, বুরোক্রেসি– এমনিতর অনেক শব্দ। সব অধ্যাপকই ইংরেজিতে বক্তৃতা দেন। গড় গড় করে ইংরেজি বই-এর ভাষা বলেন : লাসকী, ডাইসি, গেটেল, গিলক্রাইস্ট ইংরেজি পণ্ডিতদের সব পুস্তকই যেন মুখস্থ। এটাই সেদিন রীতি ছিল। আর সেদিন ছিল বলে আজো আমরা তাকে অনড় বলে মনে করি। কিন্তু প্রায় ত্রিশ বছর আগে সেদিনও রাষ্ট্রনীতির অধ্যাপক অজিত কুমার সেন ক্লাসে বক্তৃতা করতেন বাংলায়। আমরা সংক্ষেপে বলতাম এ কে সেন। আমাদের ট্যুটরিয়াল খাতা সংশোধন করতেন বাংলায়। সুন্দর হস্তাক্ষরে খাতার পাশে অভিমত লিখতেন : এ বিষয়ে লাসকীর গ্রামার অব পলিটিক্সের প্রথম অধ্যায়টি পোড়ো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মৌলনীতি ব্যাখ্যা করতেন বাংলায়, দৃষ্টান্ত দিতেন আমাদেরই পরিপার্শ্ব থেকে। ক্লাসে না আসতে পারলে ডিপার্টমেন্টের হেডকে চিঠি লিখতেন বাংলায়। সেদিনকার ইংরেজিতে পড়াবার এবং পরীক্ষা দেবার রীতির মধ্যে তাঁর এ ব্যতিক্রমে কোন জবরদস্তি ছিল না; একে অস্বাভাবিক মনে হতো না। অপর অধ্যাপকদের মুখস্ত করা অলঙ্কারবহুল ইংরেজি বক্তৃতার চেয়ে অধ্যাপক এ. কে. সেনের ক্লাসে আমাদের পাঠ্য বিষয় যে অধিক প্রাঞ্জলভাবে বুঝতাম, ত্রিশ বছরের দূরত্ব থেকে স্মৃতিতে তা আজও উজ্জ্বল হয়ে ভাসছে।

ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, দর্শন, আইন অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞানের কোন শাখাই আজ আর বাংলা ভাষার অধিকারের বাইরে নয়। পশ্চিম বাংলার উচ্চতর শিক্ষার মাধ্যমে বাধ্যতামূলকভাবে বাংলা না হলেও শিক্ষাবিদ ও লেখকদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে সমাজবিজ্ঞানের সমস্ত শাখায় বহু বই রচিত হয়েছে, এমন আভাস আমরা পূর্বেও পেয়েছি। আজ তার তথ্যাদি আমরা পূর্ণতরভাবে পেতে পারি।

বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে অসুবিধার প্রশ্ন আপাতঃদৃষ্টিতে অধিকতর কঠিন বলে বোধ হয়। কিন্তু ঐকান্তিক ইচ্ছাসম্পন্ন বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ মাত্রেই স্বীকার করবেন, বস্তুত বিজ্ঞান ও কারিগরী জ্ঞান বাংলার মাধ্যমে শেখানো সমাজবিজ্ঞানের চেয়েও সহজ। কারণ প্রাজ্ঞজনরা বলেন, বিজ্ঞান ও কারিগরির অধিকাংশ মৌলিক শব্দ আজ আর কোন বিশেষ জাতীয় ভাষার গণ্ডিতে আবদ্ধ নেই। তার প্রায় শব্দই একই উচ্চারণে আন্তর্জাতিকতা লাভ করেছে। তাকে আমরা বাংলা ভাষায় প্রতিলিখনের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারি। যে সমস্ত শব্দের পরিভাষা করা সম্ভব হবে, তার পরিভাষা আমরা করে নেব। বিভিন্ন শাখায় পশ্চিম বাংলা এবং বাংলাদেশ মিলিয়ে পরিভাষা বেশ পরিমাণ তৈরিও হয়েছে। যার পরিভাষা হয় নি তার ইংরেজি শব্দকে বাংলায় লিখে এবং যাদের পরিভাষা হয়েছে তাকে ক্রমান্বয়ে পরিচিত ও অর্থবহ করে তোলার জন্য মূল শব্দকে পরিভাষার সঙ্গে রেখেও আমরা ব্যবহার করতে পারি। ব্যাপকতম ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে পাঠ্যবিষয় যাতে ভালো করে অনুধাবন করতে পারে তার জন্য প্রাঞ্জলভাবে অধ্যাপকদের তরফ থেকে ব্যাখ্যাদান। আর এ ব্যাখ্যা অধ্যাপক বাংলায় দিতে পারুন আর না পারুন, ছাত্রছাত্রীরা যে মাতৃভাষা বাংলাতেই অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, এ সত্যকে কুযুক্তির আড়ালে আর যেন আমরা ঢাকা দেয়ার চেষ্টা না করি।

সাধারণ মানুষের সাধারণ চলতি কথাই জীবনের বড় কথা। বাধ্য হলে সবাই সবকিছু করতে পারে। আজকে প্রয়োজন বাধ্য করার : অনিচ্ছুক মনকে, অনিচ্ছুক ও অহংবোধে আচ্ছন্ন তথাকথিত শিক্ষক ও অধ্যাপক এবং অফিসারকে দেশের সার্বজনীন ও বৃহত্তর কল্যাণের পথ অবলম্বনে বাধ্য করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্তের প্লাবনে যে দেশের জন্ম, রক্ত সমুদ্রের জোয়ারে পৃথিবীর বর্বরতম পশু শক্তির পরাজয়ের মধ্য দিয়ে যে সরকারের প্রতিষ্ঠা, জনকল্যাণের বোধে উদ্বুদ্ধ তার যে কোন আহ্বান অলঙ্ঘনীয়। জনতাই তাকে অলঙ্ঘনীয় করে তুলবে।

সরকার হুকুম করতে পারেন : বাংলা টাইপ থাকুক আর না থাকুক বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ প্রতিটি কাজে বাংলা ব্যবহার করতেই হবে। প্রতি মুহূর্তে করতে হবে। বাংলাকে ব্যবহার করার আন্তরিক প্রয়াসের সাক্ষ্য প্রত্যেক নাগরিকের দেখাতে হবে। অফিস আদালতে যে কর্মচারী, যে অফিসারের বাংলা লেখার চেষ্টা আন্তরিক হবে তার দৃষ্টান্ত আদর্শ হিসাবে অপর পাঁচ জনার কাছে তুলে ধরতে হবে। যার এক্ষেত্রে অনিচ্ছা ও ত্রুটি দেখা যাবে তার দৃষ্টান্তও ধিক্কারসহ অপর সকলকে জ্ঞাত করাতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বস্তরে : প্রবেশিকা, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শ্রেণীর সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা শিক্ষকগণ বাংলাতে পেশ করতে বাধ্য থাকবেন। এজন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত চেষ্টা ও যত্ন তাদের করতে হবে এবং এ ব্যাপারে ত্রুটি, বিচ্যুতি, আন্তরিকতা, সাফল্য-অসাফল্যের পর্যালোচনা প্রত্যেক স্তরের অধিনায়কদের করতে হবে। উচ্চতর শিক্ষার প্রয়োজনীয় সকল পাঠ্যপুস্তক এক বৎসরের মধ্যে অনুবাদ, রচনা ও প্রকাশের জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেকটি বিশেষজ্ঞের সঙ্গে বাংলা ভাষায় রচনার ক্ষেত্রে মোটামুটি দক্ষতা অর্জন করেছেন এরূপ লেখকদের তালিকাবদ্ধ করে তাঁদের অবিলম্বে পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজে নিযুক্ত করতে হবে। এ জন্য যদি সাহিত্যিক, অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞগণকে তাদের বর্তমান দায়িত্ব থেকে এক বৎসরের জন্য অব্যাহতি দিতে হয়, তাহলে সরকার সেরূপ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করবেন।

চীনের নেতৃবর্গের নাম উল্লেখ করতে আজ প্রতিটি বাঙ্গালীর মনে ক্ষোভের উদ্রেক হয়। সংকীর্ণ শক্তির রাজনীতির যূপকাষ্ঠে কোটি কোটি মানুষের স্বাধীনতার সংগ্রামকে বলি দেওয়ার চীনা নীতিতে আমরা ক্ষুব্ধ এবং মহাচীনের মহান ঐতিহ্য আজ আমাদের কাছে কালিমায় আচ্ছন্ন। তবু মাতৃভাষায় শিক্ষাবিস্তরের চৈনিক দৃষ্টান্ত আমাদের স্মরণ করলে কোন ক্ষতি হবে না। শুনেছি, চীনেও ৪৯ সালের পূর্বে বিদেশি ভাষারই প্রভাব ছিল অধিক। একদিন চীন সরকার সংকল্পবদ্ধ হয়ে এক বছরের জন্য সমস্ত স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে তার শিক্ষক, অধ্যাপক, সাহিত্যিকদের নিযুক্ত করেছিল চীনের নিজস্ব প্রধান প্রধান ভাষায় সমস্ত প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তকের অনুবাদ-রচনা ও প্রকাশনার কাজে। একটি বছরেই হাজার হাজার পাঠ্যপুস্তক তাই চীনা ভাষার তৈরি হয়েছিল। তার ভালোমন্দ, মান অ-মানের কথা স্বতন্ত্র। জাতীয় ভাষায় শিক্ষা বিস্তারের এই আপসহীন প্রচেষ্টাই গুরুত্বপূর্ণ। আজ আর চীনে বৈদেশিক ভাষায় কোন কিছু শিক্ষা দেওয়া হয় না। জাতীয় প্রয়োজনে বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ আর কূটনীতিজ্ঞ তৈরির প্রয়োজনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদেশি সব প্রধান ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থাও চীনে আছে। কিন্তু তাই বলে সার্বজনীন শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈদেশিক ভাষা আজ আর চীনের সমাজ জীবনে কোন প্রতিবন্ধক নয়। পার্শ্ববর্তী দেশ বার্মাতেও শিক্ষার স্তরেই জাতীয় বর্মী ভাষাই ব্যবহার করা হয় বলে আমরা শুনেছি। বার্মার অনুবাদ সংস্থা তার কাজের ব্যাপকতা ও প্রয়োগের বিস্তারে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে।

বাংলাদেশ বহু ভাষার দেশ নয়। তাই কোন কোন্ ভাষা আমরা যোগাযোগের মাধ্যম বা শিক্ষার বাহন করব– এরূপ প্রশ্নও বাংলাদেশে কোন মহলকে দ্বিধাগ্রস্ত করতে পারে না। একক ভাষার সৌভাগ্য বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সার্বজনীনতা ও সৃষ্টির এক মহাসুযোগ সৃষ্টি করেছে।

আজ প্রয়োজন হচ্ছে সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্র ও সামাজিক শক্তির একাগ্রচিত্ত হয়ে এই মহাসুযোগেরই পরিপূর্ণ ব্যবহার।

১৯৭২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজতন্ত্র : গণতন্ত্র : ধর্মনিরপেক্ষতা

স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনের আওয়াজ হচ্ছে : সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা। আমরা কেউ বলি ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র। আমরা কেমন করে সাজিয়ে বলব? আগে ধর্মনিরপেক্ষতা বলব, তারপরে গণতন্ত্র এবং শেষে সমাজতন্ত্র? না সমাজতন্ত্রকে আগে বসাব? প্রশ্নটা কৌতুককর মনে হতে পারে। এ লক্ষ্য যদি কেবল শব্দের কারসাজি হয় তাহলে আমরা তা নিয়ে কৌতুক করতে পারি। দাঁড়িপাল্লা দিয়ে ওজন করে তার ভাবের তারতম্যে সাজাবার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু তেমন করে কি আমরা পারি আমাদের সার্বজনীন ও জাতীয় লক্ষ্যের আওয়াজ নিয়ে খেলা করতে?

না, আমরা তা পারিনে।

জীবনকে নিয়ে আমরা ইচ্ছামতো খেলা করতে পারিনে। তার অনিবার্য পর্যায়ক্রমে আমরা ওলট পালট করে দিতে পারিনে। পাকিস্তানি শাসকচক্র বিগত ২৪ বছর ধরে আমাদের জীবন নিয়ে খেলা করার চেষ্টা করেছিল। ইতিহাসের রথের চাকাকে ওরা ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর পরে ঊনবিংশ। তারপর অষ্টাদশ। এমনি করে ওরা আমাদের একেবারে মধ্যযুগের গভীর অন্ধকারে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কারণ ওরা ইতিহাসের নির্মম গতিকে বুঝতে পেরেছিল। বুঝতে পেরেছিল ১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭ সালেই।

বাংলাদেশ ইতিহাসের নির্যাতিত দেশ। কৃষক প্রধান দেশ। আবহমান কাল থেকে সে অত্যাচারিত হয়ে এসেছে। জমিদারের হাতে। জোতদারদের হাতে। মুক্তি চেয়েছিল সেই মানুষ এই অত্যাচার থেকে। স্বাধীন হতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের নিজস্ব শ্রেণীর চেতনা ও সংগঠনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সামন্তবাদী নেতারা বুঝিয়েছিল : হিন্দুরাই তোমার শত্রু। তোমরা মুসলমান। নির্ভেজাল মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেই তোমরা মুক্তি পাবে। বাংলাদেশের মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছিল। ঠিক আছে। জমিদার, জোতদার, মহাজনের অত্যাচার থেকে 'মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ' বললে যদি আমরা মুক্তি পাই, তবে আমরা বলছি : মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ। মুসলিম লীগের আওয়াজ তুললে যদি জমি পাই তবে তুলছি সেই আওয়াজ। বলছি– নারায়ে তকবীর...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই আওয়াজের জোরেই এসেছিল ১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭। কিন্তু ১৪ই আগস্টের পরে তো মুসলমানী আওয়াজের অবকাশ ছিল না। এবার তো হিসাব নিকাশের পালা। কোথায় আমাদের মুক্তি? আমাদের লাঙ্গল? আমাদের জমি? আমাদের কারখানা? আমাদের ভাষা? আমাদের সংস্কৃতি? সামন্তবাদী মুসলিম লীগ নেতৃত্ব বুঝেছিল : এবার সিংহ খাঁচামুক্ত। বিভ্রান্তির শেকল ছেঁড়া। এবার যুদ্ধ। এ যুদ্ধে আর আপসের জায়গা নেই। বাঁচার উপায় নেই। তাই ১৪ই আগস্টের পরে সাম্প্রদায়িকতার বিলোপ ঘটলো না। পাকিস্তান সরকার ধর্মীয় গোঁড়ামীকে পুনর্জাগরিত করার অধিকতর সচেতন চেষ্টায় নেমে পড়ল। আধুনিক রাষ্ট্রযন্ত্রের সমস্ত শক্তি সে নিয়োগ করল বাংলাদেশের মানুষের মনে ধর্মীয় কুসংস্কার সৃষ্টি করতে। মুক্তবুদ্ধি তরুণের সব প্রতিবাদ আর হুঁশিয়ারীকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র আঁটতে শুরু করল। চেষ্টা করল সে বাঙ্গালীর মন থেকে দেশিয় ঐতিহ্য মুছে ফেলতে। চেষ্টা করল তার মনে আত্মধিক্কার আর হীনম্মন্যতা সৃষ্টি করতে।

কিন্তু সিংহ তখন খাঁচামুক্ত। এবার সে আওয়াজ তুলল : দেশের শাসক আমরা। দেশের রাজধানী হবে আমাদের অংশে। দেশের শাসনতন্ত্রে আমাদের প্রয়োজনের প্রতিফলন ঘটবে। দেশের সেনাবাহিনী আমরা গড়ব। দেশের শিল্প আমরা তৈরি করব। পাকিস্তানি শাসক চক্র বুঝল– এবার শেষ মোকাবেলার পালা। ইতিহাসের চাকা ঘর ঘর শব্দ তুলছে। ও অগ্রসর হবেই। তবু যেমন করে পার ওকে ঠেকাও। বিভ্রান্তিতে না পারো, অস্ত্র ধরো। গুলি করো। আগুনের বুকে গুলি করো।

AMARBOI.COM

কিন্তু সে গুলিতে আগুন নিভল না। দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। এখানকার টুকরা ছড়িয়ে পড়ল ওখানে। সেখানে। সব খানে। পাকিস্তানি সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে সর্বাধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত হতে লাগল। সিয়াটোর নামে। সেন্টোর নামে। কমিউনিস্ট বিরোধিতার নামে। এক ইউনিট তৈরি করল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এককাট্টা হওয়ার জন্য।

আসলে ওরা তৈরি হচ্ছিল ২৫শে মার্চের জন্য। ওরা জানত একুশে ফেব্রুয়ারি ক্রমান্বয়ে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হবে। সে '৫৪, '৬২, '৬৬, '৬৮, ও '৬৯-এর পথ ধরে '৭০-এর ঢেউ তুলে '৭১- এ উত্তাল হয়ে উঠবে। মিত্রের চেয়ে শত্রুর কানই খাড়া বেশি। সে কানে সমুদ্রের উচ্ছ্বাস ধরা পড়ছিল। তাই ওদের কাঁপুনি। তাই ওদের ভয়ার্ত চিৎকার। তাই ওদের ২৫শে মার্চ রাত্রির অন্ধকারে অন্ধ বর্বরতায় নিরস্ত্র মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। মূর্খ ভাবল নিশ্চিহ্ন করে দেবে বাঙালী জাতিকে। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করে। আমরা মরেছি, লক্ষে লক্ষে মরেছি। কিন্তু ইতিহাসে মৃত্যুর চেয়ে জীবন বড়। তাই লক্ষ কোটির মৃত্যুর উপর দিয়েও ইতিহাস অগ্রসর হয়। ইতিহাস বর্বর পাকিস্তানকে তার মূর্খতা ও বর্বরতাসহ ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৪ বছরের প্রতি মুহূর্তে তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিতরে বাংলার শ্রমিক, কৃষক ও গরিব মধ্যবিত্ত এবং তাদেরই সন্তান-সন্ততি জন্ম দিয়েছে তিনটি আওয়াজের, তিনটি শ্লোগানের : সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এ আওয়াজ কোন ব্যক্তি বা দলের কল্পনাবিলাস নয়, বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়, দয়ার দান নয়।

এ আওয়াজ নিয়ে খেলা করার উপায় নেই। এদের পর্যায়ক্রমকে যেমন ইচ্ছা তেমন করে সাজাবার অধিকার নেই। না কোন ব্যক্তি, না দলের কিংবা রাষ্ট্রশক্তির।

কথাটা এই নয় যে, সমাজতন্ত্র আসবে ক্রমান্বয়ে এবং সব শেষ। পৃথিবী গ্রহের সেই অষ্টাদশ শতকীয় জীবন আজ মৃত। সমাজতন্ত্র আজ বাঙালীর জীবনে কোন পরিণাম নয়, এ তার অনিবার্য বর্তমান। এই বর্তমানের উপরই মাত্র অপর সব কিছুর আগমন। সমাজতন্ত্র কী? কোন রকমের সমাজতন্ত্র? ডেমোক্রাটিক, না অটোক্রাটিক? এ প্রশ্নের খেলায় কোন লাভ নেই। সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর জীবনের সমস্যার বাস্তব সমাধানের উপরই সমাজতন্ত্র। সেই সমাধানের নামই সমাজতন্ত্র। কেউ একে ঠেকাবার চেষ্টা করতে পারে। একে পাশ কাটাবার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর সাত কোটির অধিক কৃষক আর শ্রমিক। ২৪ বছরের শোষণে তারা আজ মানুষেতর পর্যায়ে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সঙ্কট মুহূর্তে। বাংলার স্বাধীনতার সংগ্রাম এই শোষিত মানুষেরই মুক্তির সংগ্রাম। রক্তের যে নদী বয়েছে তাতে উচ্ছাস এনেছে তাদেরই বুকের রক্ত। সেই মানুষের বেঁচে থাকা আর বিকাশের জন্য সমাজতন্ত্রবাদের বিকল্প কোন পথ নেই। তার কৃষির সমস্যা সমাধানের জন্য জোতদারীর সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ঘটাতে হবে। জমির পরিমাণ কৃষকের নিজস্ব শ্রেণীসংগঠনের প্রস্তাব মতো পরিবার প্রতি হ্রাস করতে হবে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যৌথ চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষিতে আধুনিক যন্ত্র প্রয়োগ করতে হবে। জাতীয় শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে।

জমির উপর থেকে মানুষের চাপ কমাতে হবে। বাংলাদেশের কৃষক শ্রমিক জানে আলাউদ্দীনের প্রদীপ হাতে নিয়ে কেউ তার ভাগ্য বদলে দেবে না। কিন্তু এ বিকাশের জন্য আপসহীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ আলাউদ্দীনের চেরাগের কারসাজী নয়। সে সিদ্ধান্তে কোন দ্বিধা কিংবা বিলম্বের অবকাশ নেই।

সমাজতান্ত্রিক বিকাশের এই সিদ্ধান্ত এবং প্রতিমুহূর্তে তার দৃঢ় বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই বিকাশ লাভ করবে রাজনৈতিক গণতন্ত্র : ক্ষেতে খামারে, মাঠে ময়দানে, বিদ্যালয়ে কলেজে এবং নির্বাচিত পরিষদে– সর্বত্র সর্বমুহূর্তে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের আলোচনায়, কর্মপন্থা নির্ধারণে, রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাসের প্রচেষ্টায়, শাসনতন্ত্র তৈরিতে সর্বজনের সর্বক্ষেত্রে আলোচনার মাধ্যমে অংশ গ্রহণের সুযোগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মনিরপেক্ষতা দৃঢ়মূল হবে সমাজতন্ত্রের বিকাশে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠায়। বিকাশের অবাধ সুযোগে ব্যক্তি আর ব্যক্তিকে শত্রু মনে করবে না। সম্প্রদায় সম্প্রদায়কে নিজের উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক বলে বিবেচনা করবে না। অতীতের মোহের মধ্যে নয়, সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের মহৎ স্বপ্নে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভেদ নয়, প্রকৃতির সঙ্গে সমগ্র জনশক্তির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে বাঙালি নতুন মানবিক মূল্যে বলিয়ান হয়ে উঠবে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে নতুন আত্মশক্তির বোধে সে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে। ধর্মীয় বিশ্বাস তখন ব্যক্তির মানসিক শান্তির উপায় হিসেবে লালিত হতে পারবে। সে আর শোষণ কিংবা ত্রাসের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবে না।

বাংলাদেশের অনেক সুবিধা। অনেক সৌভাগ্য।

বাংলাদেশে আজ ভাষার সমস্যা নেই। সে মূলত এক ভাষার দেশ। বাংলাদেশের আজ জাতি সমস্যা নেই। সে প্রধানত এক জাতির দেশ। বাংলাদেশ কয়েক লক্ষ লোকের ক্ষুদ্র দেশ নয়, যাকে মানুষ করুণা করবে। সে সাড়ে সাত কোটি লোকের দেশ। স্বাধীনতার জন্য তার ত্রিশ লক্ষাধিক লোক মৃত্যুবরণ করেছে। সমাজতন্ত্রের জন্য তার সাত কোটি লোকই ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। বাংলাদেশের সৌভাগ্য, তার সমাজদেহে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নগণ্য। শ্রমিক, কৃষক ও গরিব মধ্যবিত্তের ঐক্যের কাছে তারা নতি স্বীকার করতে বাধ্য। পুঁজিবাদ প্রায় অজাত। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি শুধু শ্রমিকের নয়, কৃষক ও গরিব মধ্যবিত্তের সৌভাগ্যের একমাত্র চাবিকাঠি। বাংলাদেশ সরকার শ্রেণী হিসাবে মধ্যবিত্তের সরকার। বাংলার কৃষকের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় নি। কৃষক আর শ্রমিকদের সন্তান মধ্যবিত্ত। আর তাই রক্তাক্ত মুক্তি সংগ্রামের মধ্যেও শ্রমিক কৃষক নিজে সরকার দখল করে নি। পরম বিশ্বাস ও স্নেহে সরকারের দায়িত্ব দিয়েছে তাদেরই সন্তান মধ্যবিত্তের হাতে। সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করার দায়িত্ব এই সরকারের। শ্রেণী হিসেবে মধ্যবিত্ত দোদুল্যচিত্ত। সহজ সমাধানের আলেয়া তাকে মোহগ্রস্ত করতে চায়। ব্যক্তিগত সম্পদের আকর্ষণ তাকে আপস আর নীতিবিচ্যুতির পিচ্ছিল পথে ঠেলে দিতে চায়। তার অহমিকার উপর প্রশংসার প্রলেপ বুলিয়ে তাকে মোহিত করতে চায় আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী দুষ্টচক্রের দল। কিন্তু শ্রমিক ও কৃষকের ঐক্যবদ্ধ শক্তির দণ্ড মধ্যবিত্তকে সংগ্রামের কাতারে জনতার বৃহত্তর স্বার্থের সড়কে অবিচল রাখতে পারে। জনতার সংগঠিত শক্তিই তার চালক। জনতার চেতনাই তার বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী।

বাংলাদেশের ন্যায় স্বাধীন কিন্তু অনুন্নত দেশের সম্মুখে সমাজতান্ত্রিক বিকাশের মহাসড়ক আজ উন্মুক্ত। এ সড়ক উন্মুক্ত হয়েছে সতের সালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সংঘটনে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তীব্রতম আঘাতের মধ্যেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার আত্মরক্ষা ও বিজয় লাভের মাধ্যমে। দুনিয়া আজ সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের দুটি শক্তিতে বিভক্ত। স্পষ্টতঃই শতাব্দীর গোড়াতে যে শক্তির উদ্বোধন ঘটেছে শতাব্দীর শেষে তার চূড়ান্ত বিজয়ের আভাস। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, যন্ত্রের কৌশলে, শিল্পকৃষির বিকাশে, শিক্ষা সংস্কৃতির সার্বজনীনতায় সমাজতান্ত্রিক শিবির আজ সাম্রাজ্যবাদের এক কালের ভীতিপ্রদ একচ্ছত্র শক্তিকে অতিক্রম করে গেছে। শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ক্ষেত্রেও সাম্রাজ্যবাদ নিজেকে আজ আর অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবেচনা করতে সাহস করে না। বাংলাদেশের মুক্তির সঙ্কটজনক পর্যায়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সপ্তম নৌ বহরের বঙ্গোপসাগরে আবির্ভাব যেমন আকস্মিকভাবে ঘটে নি, তার অন্তর্ধানও তেমনি বিনা কারণে ঘটে নি। ভারত সোভিয়েট মৈত্রীর ভিত্তিতে সোভিয়েটের রক্তচক্ষুর সামনে সাম্রাজ্যবাদকে নতি স্বীকার করতে হয়েছে। ঘটনাটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

সমাজতান্ত্রিক বিকাশের মহৎ ইচ্ছায় উদ্বুদ্ধ কোন জাতি আজ অসহায় নয়। মিত্রহীন নয়। বাংলাদেশের দুর্ভাগ্যে একদিন বিবেকবান মানুষ কেঁদে উঠেছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের সৌভাগ্যে সে নিশ্চয়ই ঈর্ষাবোধ করবে, গর্বে স্ফীত হয়ে উঠবে।

১৯৭২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেবের জীবন দর্শন

দার্শনিক কিংবা তাত্ত্বিকদের মৃত্যু আমাদের কাছে বড় নয়। তাঁরা কেমন ভাবে মরলেন, সে কথা আমরা স্মরণ করিনে। তাঁদের রচিত কিংবা প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব নিয়ে আমরা আলোচনা করি। সে তত্ত্বের তাৎপর্যের এদিন ওদিক আমরা বিশ্লেষণ করি। তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা আমাদের কাছে গৌণ। তত্ত্বই মুখ্য। তাত্ত্বিকের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ দুটি তাঁর নামের পাশে বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করাই আমরা যথেষ্ট মনে করি। এটাই প্রচলিত রীতি। এর পেছনকার দৃষ্টিভঙ্গী বা দর্শনটা এই যে, তাত্ত্বিকের চেয়ে তত্ত্ব বড়। তাত্ত্বিক যে পরিবেশেই বেঁচে থাকুন না কেন এবং যেভাবেই এ জগৎ থেকে তিরোধান করুন না কেন, তাঁর জন্ম মৃত্যু পরিবেশ নিরপেক্ষভাবে জগতে কার্যকর থাকে। আর সে কারণেই তাঁর জীবন, মৃত্যু বা পরিবেশের আলোচনা বাহুল্য।

কিন্তু প্রচলিত এ দৃষ্টিভঙ্গীর আর একটি বিচারও আছে। দার্শনিক, তাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিক বা সমাজতাত্ত্বিক কেউই স্থান-কাল নিরপেক্ষ নয়। স্থান ও কালের সীমানার মধ্যেই তাঁদের চিন্তা করতে হয়। এ কথা ঠিক যে, তাঁদের সে চিন্তা কাল ও স্থানকে অতিক্রম করে যেতে পারে। তাঁদের তত্ত্ব স্থানিক পরিবেশের সামাজিক রাজনীতিক বিন্যাসকে পরিবর্তিত করে দিতে পারে। তবু তাঁদের সে তত্ত্ব স্থান ও কাল নিরপেক্ষ নয়। স্থান ও কালের গুণাগুণ দিয়েই আমরা যথার্থভাবে কোন তাত্ত্বিক বা দার্শনিক তত্ত্বকে, তার শক্তি ও দুর্বলতাকে অনুধাবন করতে পারি।

ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেবের[১] জীবন দর্শনের আলোচনার ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। তাঁর মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা অধিকতর সত্য।

ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব 'আমার জীবন দর্শন' বলে একখানা গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। তাছাড়া তাঁর 'আইডিয়ালিজম অ্যান্ড প্রগ্রেস' এবং 'আইডিয়ালিজম : এ নিউ ডিফেন্স অ্যান্ড এ নিউ এপ্লিকেশন' নামক গ্রন্থও দার্শনিক মহলে সুপরিচিত।

---

১. মৃত্যু : পাক বাহিনীর হাতে নিহত ২৫শে মার্চ, ১৯৭১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু তাঁর জীবন দর্শনের সঙ্গে তাঁর মৃত্যুর ঘটনাটি যোগ না করলে তাঁর জীবন দর্শনের আলোচনা পরিপূর্ণ হতে পারে না। এক দিক দিয়ে বলা চলে, তাঁর মৃত্যু তাঁর জীবন দর্শনের সর্বশেষ এবং একটি মহৎ ভাষ্য।

*   *   *

ড. জলিল[২] বলেন : পঁচিশে মার্চ বিকেলেও আমি ড. দেবের সঙ্গে রমনার ময়দানে বেড়াতে গেছি। দেশের রাজনীতির পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের অল্পবিস্তর আলাপও হয়েছে।

: আসন্ন অবস্থার তিনি কি কিছু আঁচ করতে পেরেছিলেন?

: হ্যাঁ আমিও ড. দেবকে প্রশ্ন করেছিলাম–"দেশের রাজনৈতিক অবস্থা দেখে আপনার কী মনে হচ্ছে, স্যার? জবাবে মনিষী গোবিন্দ চন্দ্র দেব প্যারিপ্যাটেটিক দর্শনের জনক দার্শনিক এরিস্টটলের মতোই হাঁটতে হাঁটতে বলতে লাগলেন, তোমরা যত সহজ মনে করছ, আসলে ব্যাপারটা তত সহজ নয়। আলোচনার ভান করে তলে তলে প্রস্তুতি নিচ্ছে এহিয়া-ভুট্টো চক্র।

শেখ মুজিব নতি স্বীকার করলে, শেষ বারের মতো চরম আঘাত হানবে এবার তারা বাঙ্গালীদের উপর। আর তারই সম্ভাবনা বেশি। তোমরা নিশ্চয় স্বীকার করবে, শেখ মুজিবের অসহযোগ আন্দোলন অভূতপূর্বভাবে সাফল্য লাভ করেছে, এমন কি মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনও এমন পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করতে পারে নাই। আর সে জন্যই দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে বেশি।"[৩]

: কিন্তু সেই ২৫শে মার্চ রাতে যখন বর্বর পাকবাহিনী আক্রমণ শুরু করল তখন কেন তিনি আত্মরক্ষার চেষ্টা করলেন না? কেন তিনি নিজের বাসস্থানটার পরিবর্তন করলেন না?

: এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া খুব কঠিন। কেননা রাত ১১টার দিকে অতর্কিতে যখন পাকি সামরিক বাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়ে যায় তখন আমরা, বিশেষ করে ছাত্রাবাস এলাকার সহকর্মীরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। জগন্নাথ হলের প্রভোস্ট হিসাবে জগন্নাথ হলের মাঠের পূর্ব পাশটাতে ড. দেবের বাড়ি। তার গা ঘেঁষে পূর্বদিকে একটি মন্দির। মন্দিরের পেছনে বাংলা একাডেমীর অঙ্গন। দক্ষিণ দিকে ড. দেবের বাড়ির ঠিক বিপরীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের আবাসিক বহুতল দালান। ড. দেবের বাড়ির পেছনে ইউ. ও. টি. সি. ভবন।

: কিন্তু ড. দেবের বাসায় কি ঘটেছিল, তার কিছু কি আপনি জানেন?

২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ড. আবদুল জলিল মিয়া।
৩. ঐ, ড. দেবের সঙ্গে বিকেল : শহীদ দের স্মরণে 'স্মরণিকা', দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: সে ঘটনা সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে জানেন ড. দেবের পালিতা কন্যা রোকেয়া বেগম। রোকেয়া বেগম এবং তাঁর স্বামী দুজনেই ড. দেবের সঙ্গে তাঁর বাসায় থাকতেন। রোকেয়া বেগমের কাছ থেকে আমি শুনেছি, সারারাত ধরেই বাড়ির ওপর গোলাগুলি বর্ষিত হয়েছে। বাইরে মুখ বাড়াবার উপায় ছিল না। সারা রাত ডঃ দেব অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পদচারণা করেছেন। মাঝে মাঝে তিনি দেহের শক্তি হারিয়ে সম্বিতহারা হয়ে মেঝেতে পড়ে গেছেন। তাঁকে শুশ্রূষা করে আবার জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ভোরের দিকে ড. দেব তাঁর মেয়েকে বললেন : মা তুমি একটু চা করো। আমি ততক্ষণে একটু ভগবানের নাম করি। তাঁর মেয়ে হয়ত চা বানিয়ে শেষ করেন নি, এমন সময় দরজায় করাঘাত, বুটের লাথি। খোলার অবসরটুকুও জল্লাদের দল দেয়নি। জোর করে ধাক্কা দিয়ে দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকেছে।

: তারপর?

: ঘরে ঢুকে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করতে শুরু করেছে বর্বর পশুর দল। 'কাঁহা মালাউন কাঁহা' বলে ডঃ দেবকে খোঁজ করেছে। মেয়ে রোকেয়া বেগম বাবাকে রক্ষা করার জন্য সামনে এগিয়ে এসেছেন। এগিয়ে এসেছেন তাঁর স্বামী, জল্লাদদের মন নরম করার জন্য। কলেমা পড়েছেন। কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র নরম হয়নি বর্বর পশুর মন। হাত কয়েক ব্যবধান থেকে স্টেনগান দিয়ে গুলি করেছে অধ্যাপক দার্শনিক ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেবকে। ড. দেবের দেহ মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে। পশুর দল গুলি করে হত্যা করেছে রোকেয়া বেগমের স্বামীকেও। রোকেয়া বেগম আকস্মিক আক্রমণ ও হত্যায় তখন অচেতন হয়ে পড়ে গেছেন। হয়ত সে জন্যই তিনি বেঁচে রয়েছেন।

: তারপর?

: পাকি সামরিক বাহিনী এর পরে মৃতদেহ দুটো রেখে চলে যায়। হয়ত রাস্তার ওপারে কর্মচারীদের দালান আক্রমণ করার জন্য। কিন্তু মিনিট কুড়ি পরে আবার ফিরে আসে এবং ড. দেব এবং রোকেয়া স্বামীর লাশ টানতে টানতে নিয়ে যায় জগন্নাথ হলের মাঠের একপাশে যেখানে জড়ো করা হচ্ছিল মৃত, অর্ধমৃত অগণিত ছাত্র এবং অন্যান্য লোককে।

এভাবেই 'আমার জীবন দর্শন'-এর লেখক ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেবের জীবনাবসান হয়। এ ভাবেই তিনি '৭১ সালের ২৫শে ও ২৬শে মার্চ কালরাত আর দিনে তাঁর সতীর্থ শহীদ অধ্যাপক, ছাত্র ও কর্মচারীবৃন্দের শোভাযাত্রায় সামিল হন।

*　　　*　　　*

ডঃ দেব শহীদ হলেন। কিন্তু ডঃ দেব বিপ্লবী ছিলেন না। ডঃ দেব কোন রাজনীতিক ছিলেন না। '৭১ সালে বর্বর পাকি বাহিনী লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বিচারে হত্যা করেছে। তার মধ্যে অগণিত ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী রয়েছেন। ১৯৭১ সালের ঘটনা কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়। এ ঘটনা কোন ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালের পরিণাম নয়। এ ঘটনা ছিল একটা বন্ধ্যা আধাঔপনিবেশিক রাষ্ট্র এবং তার অর্থনীতির মধ্যকার পরস্পর বিরোধী শক্তির লড়াই এর জন্য ব্যুহবিন্যাসের চরম পরিণতি। উনুনের উপর পানি ভরতি কেটলি চাপিয়ে নিচে তাপ দিতে থাকলে তার অনিবার্য পরিণাম হচ্ছে ঠাণ্ডা পানির মধ্যে ক্রমাধিক উত্তাপের সঞ্চার। এবং সেই ক্রমাধিক উত্তাপের অন্তিম মুহূর্তে তরল পানি চারিত্রিক রূপান্তর। পানির বাষ্পে পরিবর্তিত হওয়া। এ পরিণাম কারুর জন্য বাঞ্ছিত হতে পারে। কারুর জন্য অবাঞ্ছিত। তাতে উত্তপ্ত পানির কোন ভ্রূক্ষেপ থাকে না আর পরিণাম অনিবার্যভাবেই এগিয়ে আসে।

সমাজবিজ্ঞান পদার্থবিজ্ঞানের ন্যায় সহজবোধ্য না হলেও মানুষের সমাজটাও নৈরাজ্য নয়। এখানেও নিয়মের রাজত্ব। রাজা, মহারাজা, ডিক্টেটর মনে করতে পারে, তারাই ইতিহাসের নায়ক, যেমন ইচ্ছা তেমন করেই তারা চালাতে পারে সাধারণ মানুষকে, যাদেরকে তারা মনে করে অজ্ঞ, মূর্খ, নির্বোধ। মনে করে ইতিহাসের কোন আইন নেই। তারাই আইন, তাই হিটলার একদিন ভেবেছিল, সে সমস্ত পৃথিবী জয় করবে। সর্বহারার সমাজতন্ত্রকে সে সমূলে বিনাশ করবে। কিন্তু মহাপুরুষ-নিরপেক্ষভাবে ইতিহাস এবং সমাজবিজ্ঞানের আইন কিছু আছে বলেই হিটলার ইতিহাসের আস্তাকুড়ে বিসর্জিত হয়েছে। আর সর্বহারার সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা হিটলারের সময় থেকে আজ বিপুলভাবে পরিব্যাপ্ত। অবশ্যই ইতিহাসের এই অগ্রগতি পশুশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামহীনভাবে ঘটেনি, বিনা ক্ষয়ক্ষতিতে ঘটেনি। কী বিপুল ধ্বংস, কী ভয়াবহ হত্যা আর মৃত্যু! প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরে কার আঙ্কিক খতিয়ান তার বিপুলতার ধারণা দিলেও বর্বরতার বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামের সে দিনকার সেই আবেগকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে পারে না।

একটা জনসমাজের স্বাভাবিক কামনা বাসনা, আত্মবিকাশের প্রয়াসের বিরুদ্ধে জিন্নাহ- লিয়াকত-নাজিম উদ্দীন-আইউব-ইয়াহিয়া-ভুট্টোর যে চক্রান্ত তাও আকস্মিক ছিল না। সামন্তবাদী ও উপনিবেশিক স্বার্থ জানতো জ্ঞান বিজ্ঞান এবং সংঘবদ্ধ শক্তির চেতনায় নবজাগ্রত জনমানবকে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার পাঁকে আটকে রাখতে না পারলে তারা দুর্মর হয়ে উঠবে। এবং তাদের হাতে শোষকের মৃত্যু অনিবার্য। তাই তারা রাষ্ট্রের নাম দিল পাকিস্তান। ঘোষণা করল, এ রাষ্ট্র আল্লার হুকুমেই সৃষ্ট হয়েছে।

জিন্নাহ সাহেব, লিয়াকত আলী, নাজিম উদ্দিন, আইউব, ইয়াহিয়া, ভুট্টো- এরা আল্লাহর হুকুমেই এ রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। তাঁরা যা করেন সব আল্লাহর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুকুমে আর জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য। আর বাঙ্গালীরা যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চাচ্ছে, এ হিন্দুদের কারসাজী, বিধর্মীদের প্রভাব, শয়তানের কুমন্ত্রণা। বাঙ্গালীরা কোন দিন মুসলমান ছিল না। এখন আরো বিগড়ে যাচ্ছে। এবার চাচ্ছে একেবারে স্বাধীন হতে। কাজেই বাঙ্গালীকে শেষ করতে হবে।

আল্লাহর নাম নিয়ে তাই সেই সামন্তবাদী আর সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের প্রতিভূরা ঝাঁপিয়ে পড়ল '৭১ সালের পঁচিশে মার্চ রাতে, অতর্কিতে, লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র, নিরীহ বাঙ্গালীর উপর। যার পরিণতি ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ, তার শুরু '৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট।

এই পাকিস্তান থেকে যখন প্রগতিশীল বহু অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদকে চলে যেতে হচ্ছিল, সেই অন্ধকার যুগেই ড. দেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা করতে আসেন। আর তাঁর পক্ষে যে সেই অন্ধকার যুগের নানা ঘটনা দুর্ঘটনার মধ্যেও টিকে থাকা সম্ভব হয়েছে, সেই টিকে থাকাটা একদিকে যেমন তাঁর সমন্বয়বাদী জীবনদর্শনের সাফল্যের পরিচয় বাহক, তেমনি অপরদিকে সে দর্শনের নিছক ব্যক্তিতান্ত্রিকতামূলক দুর্বলতারও কিছুটা সাক্ষ্য।

ড. দেবের জীবন দর্শনের সার্থকতা-ব্যর্থতার এ প্রশ্ন উত্থাপন করলে অবশ্যই প্রথমে দর্শনের দায়িত্ব ও কর্তব্যের আলোচনাটি সেরে নিতে হয়।

'দর্শন'কে আমরা কী বলব? আমরা চিরাচিরতভাবে বলে আসছি : দর্শন হচ্ছে সম্যকভাবে দেখা, সম্যকভাবে জানা। এক কথায়, দর্শন হচ্ছে জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা। দর্শনই জ্ঞান। জ্ঞানই দর্শন। কিন্তু এ সংজ্ঞা দ্বারা বর্তমানের জগতে দর্শন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু বলা হয় না। দর্শনের দায়দায়িত্ব কিছু নিরূপিত হয় না। 'রহিম কী করে' এমন একটি সাধারণ প্রশ্নের জবাবে অতি বুদ্ধিমান কেউ যদি বলে, রহিম পৃথিবীতে বাস করে, তাহলে সে অবশ্যই কোন মিথ্যা বলে না। কিন্তু তাতে সে আমার কোন উপকার সাধনও করে না। দর্শনের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। দর্শনই জ্ঞান– একথা বললে খুব বড় কিছু বলা হলেও সুনির্দিষ্ট কিছু বলা হয় না। প্রাচীন কালে দর্শনের যে সংজ্ঞা কার্যকর ছিল, আজকের বিবর্তিত জটিল মানবসমাজে সে সংজ্ঞা তার কার্যকারতা হারিয়েছে। সেই প্রাচীন সংজ্ঞায় অনড় হয়ে থাকলে দর্শনকে ইতিহাসের বহু প্রাচীন ভাষার ন্যায় মৃত এবং কেবল গবেষণার বিষয়তেই পরিণত করা হবে। তাকে সমস্যা জর্জরিত মানুষের জীবন যাপনের হাতিয়ারে পরিণত করা যাবে না।

মূল কথাটা সোজা সমানে এনে বলা যায়, দর্শন জ্ঞান এবং দার্শনিক জ্ঞানী বটে। কিন্তু আজকের দার্শনিক কেবল ত্রিকালজ্ঞ ঋষি নন। তিনি সংগ্রামের সৈনিক। দর্শন হচ্ছে জীবন ও জগতের ব্যাখ্যা এবং তার সমস্যা সমাধানের উপায় নির্দেশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের সমাজের মূল বুনিয়াদ তার অর্থনীতিক বিন্যাস, তার অর্থনীতিক কাঠামো। জীবিকাতেই জীবন। অর্থনীতিক বুনিয়াদের উপর গঠিত তার বহিঃকাঠামো : তার সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক ও ভাবজগৎ। ইতিহাসের একটা পরিক্রমা আছে। আদম ও হাওয়াকে আল্লাহ বেহেশত থেকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার জন্য বহিষ্কার করে মর্ত্যে পাঠিয়েছেন; আর সেই আদম-হাওয়ার বংশবৃদ্ধিতে মানবসমাজ, আর সে সমাজ আদিতে যেমন আজও তেমন। এ কাহিনীর অপর যে তাৎপর্যই থাক, দর্শনকে স্বীকার করতে হবে ইতিহাসের গবেষণার সিদ্ধান্ত। এক সময়ে মানুষ সংখ্যায় যেমন কম ছিল, ছিল পারস্পরিক সম্পর্ক তেমনি আদিম ও সহজ ছিল। বস্তু জগতের অপরাপর সত্তার ন্যায় মনুষ্য সমাজও সদা সচল। বিবর্তমান। আর তার বিবর্তনের মূল শক্তি মানুষে মানুষে বিরোধ ও সংঘাত। এই বিরোধ ও সংঘাত জৈবিক তাগিদে জীবিকাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছিল। আর জৈবিক কারণে জীবিকার উপকরণগুলো যারা অধিক তৈরি করতে পেরেছিল কিংবা করায়ত্ত করতে পেরেছিল, তারাই হয়েছিল সমাজের নিয়ন্তা, সমাজের প্রভু। জীবিকার উপায়হীন জনাংশ ছিল সেই প্রভুদের উপর নির্ভরশীল, প্রভুদের দ্বারা অত্যাচারিত, নির্যাতিত। এবং তাই স্বাভাবিকভাবে বিক্ষুব্ধ, বিদ্রোহী। আর এই বিক্ষোভ ও বিদ্রোহীকে শাসন ও দমনের জন্যই সৃষ্ট হয় রাষ্ট্রীয় কাঠামো, তার আইন ও শৃঙ্খলা, তার প্রয়োজনীয় ধর্মীয় বিশ্বাস, উপযুক্ত দার্শনিক ব্যাখ্যা। পৃথিবীটা সূর্যের চারিদিকে ঘোরে– এই সত্য কথাটার ন্যায়ই জীবিকাকে কেন্দ্র করেই মানুষের সমাজ আবর্তিত হয়ে চলেছে। পর্যায়ের পর পর্যায়ে তার নব নব শ্রেণী-বিন্যাস ঘটেছে।

দর্শনে 'অ্যাপিয়ারেন্স অ্যান্ড রিয়ালিটি' বলে একটা কথা আছে। জটিল মানব সমাজের মূল সমস্যা নির্ধারণেও 'অ্যাপিয়ারেন্স অ্যান্ড রিয়ালিটি': দৃশ্য ও মূলের পার্থক্য অনুধাবনের প্রয়োজন আছে। দৃশ্যতঃ মানুষের সমাজে কত মত, কত দর্শন, কত পথ, কত সংঘাত। কিন্তু মূলতঃ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রধান সংঘাত হচ্ছে বিত্তবানের সঙ্গে নির্বিত্তের, শোষকের সঙ্গে শোষিতের। সহস্র মত ও পথের বিশ্লেষণেও যেকোন মত ও পথ হয় শোষকের সহায়ক, নয়ত শোষিতের। জীবিকার ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে এই দ্বন্দ্ব অবশ্যই অস্বাভাবিক, অমানবিক। স্বাভাবিক ও মানবিক হবে বৈরী প্রকৃতির বিরুদ্ধে সমগ্র মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। প্রকৃতিকে বশ করার জন্য, প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভুত্ব কায়েম করার জন্য। মহৎ মানুষ স্বপ্ন দেখে : একদিন এই অসঙ্গতির অবসান ঘটবে। মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করবে। কিন্তু মানুষের মধ্যে শোষক ও শোষিতের শ্রেণীবিভাগ থাকা পর্যন্ত মানুষের অন্তর্ঘাতী বিরোধ চলতে থাকবে। কাজেই এ পর্যায়ের একমাত্র করণীয় হচ্ছে : মানুষের উপর মানুষের শোষণের অবসান ঘটানো, শোষকহীন, শ্রেণীহীন সমাজব্যস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এই সংগ্রামই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ দুনিয়া ব্যাপী চলছে। কোন দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন কিংবা কোন দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করার সংগ্রাম এই মূল সংগ্রামেরই অন্তর্ভুক্ত, এই মূল সংগ্রামের অংশ।

এই সংগ্রামে কোন ব্যক্তি বা মত, ধর্ম কিংবা দর্শন কারুরই নিরপেক্ষতার কোন উপায় নেই। আসলে কোন দার্শনিক কিংবা কোন দর্শনই নিরপেক্ষ নয়। দার্শনিক ও তার দর্শন সামগ্রিকভাব কিংবা অংশতঃ দ্বন্দ্বমান দুই পক্ষের হয় এ পক্ষকে সাহায্য করছে, নয়ত ও পক্ষকে। রাস্তায় যখন দু ব্যক্তি লড়াই করে, আমরা তখন দাঁড়িয়ে মজা দেখি, কিংবা বলি : আমরা নিরপেক্ষ। এ পক্ষেও নয়, ও পক্ষেও নয়। আসলে কথাটা যথার্থ নয়। দুই ব্যক্তির মধ্যে যার দেহে শক্তি বেশি সে কামনা করে, যেন দুর্বলতরের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে কেউ যোগদান না করে। যে দুর্বলতর সে কামনা করে যেন কেউ এসে তার পক্ষে যোগদান করে তার শক্তি বৃদ্ধি করে অধিকতর বলশালীকে পরাজয়ে সাহায্যে করে। কাজেই আমরা যারা দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছি তারা অবশ্যই নিরপেক্ষ নই। আমাদের প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ না করাটাই একজনকে সাহায্য করছে, অপরজনকে দুর্বলতর করছে।

দ্বন্দ্বমান শ্রেণীবিভক্ত মনুষ্য সমাজেও নিরপেক্ষতার কোন স্থান নাই। আমার শারীরিক ও মানসিক অবস্থান, আমার দর্শনও হয় এ পক্ষকে সমর্থন করছে, নয়ত ও পক্ষকে। নিরপেক্ষ দার্শনিক কেউ নন। কেউ হতে পারেন না। কারণ দার্শনিকও মানুষ। তিনি হয় এ শ্রেণীর, নয় ও শ্রেণীর। দার্শনিক জগৎ সংসারের সব সমস্যা অবলোকন করেন, তাদের বিশ্লেষণ করেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ সিদ্ধান্ত হয় শোষণকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সমর্থন করে। তাকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে, নয়ত শোষিতের মনে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করে, তার সংগ্রামী শক্তিকে জোরদার করে। সংগ্রামী জনতার দার্শনিকের কর্তব্য হবে ইতিহাসের বিকাশের বিধানকে অবলোকন করে, বিশ্লেষণ করে, এই পৃথিবীকে অসঙ্গতিমুক্ত সুন্দর পৃথিবীতে রূপান্তরিত করার কার্যকর ভাবগত হাতিয়ার সংগ্রামী জনতার হাতে তুলে দেওয়া : অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার ও মোহ থেকে মুক্ত করে অকম্পিত উপায়ে অগ্রসর হওয়ার আত্মবিশ্বাস তার মনে সৃষ্টি করা। এই কর্তব্যের নির্দেশ করতে যেয়েই কার্ল মার্কস বলেছেন : Philosophers have so long intereprted the world. The point is to change it: দার্শনিক ব্যাখ্যা কম হয়নি। এখন আর ব্যাখ্যা নয়, প্রয়োজন পৃথিবীকে বদলে দেবার: মানুষের সমাজের অমানবিক অসঙ্গতি দূর করার।

* * *

ব্যক্তি হিসাবে এবং জ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক হিসাবে ড. দেবের কথা স্মরণ করলে তাঁর জন্য শ্রদ্ধা ও মমতায় মন পূর্ণ হয়ে ওঠে। আজীবন কুমার, তিনি সন্তান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাৎসল্যে হিন্দু মুসলমান কত কিশোর-কিশোরীকে লালনপালন করেছেন। তাদেরকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছেন। দীর্ঘ অধ্যাপনা জীবনে অর্জিত আয় কোনরূপ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নয়, ব্যয় করেছেন তাঁর নিজের দর্শন অনুযায়ী জ্ঞান বিস্তারের প্রয়াসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গেলে সেখানে তিনি দেব ধর্ম ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকাতেও তিনি একটি দর্শন সভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জীবনে অপরের সঙ্গে বিরোধ বা সংঘাত কাকে বলে তা তিনি জানতেন না। ছোট-বড় কাউকে কাছে পেলেই তিনি বুকে জড়িয়ে ধরতেন।

সব কিছুকে গ্রহণ করার এই উদার চিন্তা থেকেই জন্ম নিয়েছে ডঃ দেবের সমন্বয়বাদী জীবন দর্শন। জন্ম সূত্রে পিতা এবং পারিবারিক পরিবেশ থেকে পেয়েছিলেন তিনি প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের সাক্ষাৎ পরিচয়। আর এই সূত্রে সংস্কৃত ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য তিনি অর্জন করেন। কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সর্বগ্রাহী। তাই শুধু সংস্কৃত নয়, ইংরেজি ভাষায়ও পারদর্শী হয়েছিলেন। বাংলা ভাষায় তিনি একজন সুরসিক শিল্পী ছিলেন। যেমন ইচ্ছা তেমন করে ডঃ দেব বাংলাতে গল্প, উপন্যাস, কৌতুক মিশিয়ে দর্শনের কঠিন তত্ত্বকে শুধু যে বলতে পারতেন তাই নয়, তাঁর বাংলা রচনা সাম্প্রতিক কালে বাংলাতে দর্শন চর্চার একটি অনন্য আদর্শ স্থাপন করে গেছে। তাঁর রচনা পাঠে ইসলাম ধর্মের দর্শন ও ধর্মীয় ঐতিহ্যেও তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ডঃ দেব হয়ত কেবল জানতেন না, তাঁর দর্শন যতই উদার ও সমন্বয়বাদী হোকনা কেন, এমন জ্ঞানের স্পৃহা সর্বঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা পাকিস্তানি শাসক কুলের দর্শনের পরিপন্থী ছিল। এবং শৃংখলিত বাঙ্গালীর যে সংগ্রাম ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট থেকে শুরু হয়েছিল তার ক্রমপরিণামে ডঃ দেব সহ বাংলাদেশের সকল দেশপ্রেমিকই পাকিস্তানি শাসক চক্রের নিকট বধ্য শত্রু হিসাবে পরিগণিত হবে। সেদিন স্পৃহ নিস্পৃহ কেউই বর্বর পশুর আক্রমণ থেকে রেহাই পাবে না। ড. দেবের প্রতি শ্রদ্ধা আরো বৃদ্ধি পায় যখন দেখি সেই পাশবিক শক্তির বুলেটকে অন্তিম মুহূর্তে তিনি বুক পেতে নিয়েছেন, অযুত সংগ্রামী বাঙ্গালীর সাথীত্বের মিছিল থেকে সরে যেতে চাননি।

*　　*　　*

জীবন ও জগতের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে দর্শনের ইতিহাসে দুটি প্রধান ধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এর একটি ভাববাদ বা আধ্যাত্মবাদ, অপরটি বস্তুবাদ। ভাববাদের প্রকারভেদ আছে। বস্তুবাদেরও প্রকারভেদ আছে। প্রাচীন গ্রীক দর্শনের পরবর্তীকালে ইউরোপে মধ্যযুগে ভাববাদের প্রভাব ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ভাববাদের মূল বৈশিষ্ট্য বস্তু ও প্রত্যক্ষকে অস্বীকার করা। কে সত্য? ভাব, না বস্তু? এই প্রশ্ন তুলে ভাববাদ বস্তুকে অনিত্য এবং ভাবকে মূল এবং নিত্য সত্য বলে যুক্তি প্রদর্শন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার চেষ্টা করেছে। ভাববাদের সামাজিক তাৎপর্য ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। ভাববাদকে শোষক শ্রেণী সর্বদা শোষিতকে দমিত ও বিভ্রান্ত করার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছে। ভাববাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ধর্মীয় বিশ্বাস। ধর্মীয় ঈশ্বর, গড বা আল্লাহ ও দার্শনিক অতিন্দ্রিয় 'ভাব'-এর মৌলিক কোন পার্থক্য নাই। শোষক ও শাসক শ্রেণীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভাববাদ এবং ভাববাদী দার্শনিক সমাজের ক্রমবিকাশকে স্তব্ধ কিংবা দমিত করার প্রয়াস পেয়েছে। তবু দ্বন্দ্বমান শ্রেণী-সমাজ বিবর্তিত হয়েছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্তার ঘটেছে। নানা যন্ত্র ও কৌশলের উদ্ভাবন ঘটেছে। নির্বিত্ত শ্রেণী নিজেদের সংঘবদ্ধ শক্তির মূল্য অনুধাবন করেছে। আর তাই মধ্যযুগের শেষে বিজ্ঞানের বিকাশে ভাববাদের স্থানে বস্তুবাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। এই নতুন ভাবধারার প্রভাবে নতুন সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। অবশ্য নতুনতর পর্যায়ে কায়েমী স্বার্থ বিজ্ঞানকেও ভাববাদী রহস্যলোকের মধ্যে আটকে রেখে বিজ্ঞানের শক্তিকে ব্যাপকতম জনসাধারণের নাগালের বাইরে রাখতে প্রয়াস পায়। এই পর্যায়ে অর্থনীতিক ও সামাজিক সংগ্রামের চরম স্তরে দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহসিক বস্তুবাদী দর্শনের বিকাশ ঘটে। সর্বহারা শ্রেণী সমাজকে অগ্রসর করে নিয়ে যাওয়ার জন্য এক নতুন হাতিয়ারের সন্ধান পায়। বিশ শতকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ শ্রেণীবিভক্ত পুঁজিবাদী সমাজের সত্যকার রূপ যখন প্রকট করে দিতে থাকে, তখন কোথাও শ্রেণী সংগ্রামের উপর প্রলেপ বুলাবার জন্য, কোথাও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কূট চিন্তার বিলাসকে প্রশ্রয় দেবার জন্য, আবার কোথাও হানাহানি, বিরোধ, সংঘাত অবাঞ্ছিত বলে শিশুসুলভ মৈত্রীর বাণী হিসাবে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ভিন্নতর ব্যাখ্যা এবং ভাববাদের নতুনতর প্রকরণের সৃষ্টি হতে থাকে।

নির্বিবাদী ড. দেব বস্তুবাদ ও ভাববাদের এই হানাহানি বাঞ্ছিত মনে করেন নি। তাঁর মতে দ্বন্দ্ব, সংঘাত মাত্রই খারাপ, সে দর্শনে দর্শনেই হোক, আর শ্রেণীতে শ্রেণীতেই হোক। কিন্তু মহৎ ব্যক্তির কামনা মাত্র তো বাস্তব জগৎকে বদলে দিতে পারে না। মাধ্যাকর্ষণের টানে উপর থেকে আমার শরীরটা নিচে পড়ে গেলে আমি ব্যথা পাই বলে আমার কামনায় তো মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সক্রিয়তা বন্ধ হয়ে যাবে না।

ড. দেব 'আমার জীবন দর্শন' গ্রন্থে বলেছেন : "একদিকে আধুনিক উগ্র জড়বাদ আর অন্যদিকে অতি পুরানো আধ্যাত্মবাদ। প্রথমটি এক নিঃশ্বাসে অসংকোচে উড়িয়ে দেয় পরকাল, আর ইহকালের সুখকেই মানুষের উন্নতির মাপকাঠি মনে করে। দ্বিতীয়টি ঠিক তার উল্টো। তার কাছে ইহকালের মূল্য অতি নগণ্য আর পরকালই প্রধান। সে এক নিঃশ্বাসে মানুষকে বলে ইহকালের সব বেচা-কেনা বন্ধ রেখে পরকালের জন্য তৈরি থাকো। অথচ প্রয়োজনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিক্তিতে এ দুটির ওজনই সমান। প্রথমটির আশ্রয় নিলে সবকিছু আধ্যাত্মিকতাকে বিসর্জন দিয়ে দুনিয়ার কামড়াকামড়ি নিয়েই মানুষকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আর দ্বিতীয়টির আশ্রয় নিলে আধ্যাত্মিকতার নামে বহুলোকের সুখভোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এই দুই পথের কোন পথই মানুষের তৃষ্ণা মিটতে পারে না। তাই যারা ভাবুক, তাঁরা বেছে নেন মধ্যপথ, এবং এই মধ্যপথেই পান সত্যের সন্ধান। এই মধ্যপথই আমার জীবন দর্শনের মধ্যমণি।"[৪]

দর্শনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি হিসাবে ড. দেব সতর্ক ছিলেন। কারণ, মধ্যপথই নিরাপদ পথ। মধ্যপন্থা কালো-সাদা সবকিছুকেই মিলিয়ে চলতে পারে। আর এ মধ্যপথের দর্শন খুব নতুন কিছু নয়, এ কথাও ড. দেব জানেন। তাই তিনি বলেছেন : "মধ্যপথ কথাটা এমন কিছু নতুন নহে।" বুদ্ধের মধ্যে তিনি দেখেছেন সেই মধ্যপথের প্রকাশ। "সত্য লাভের জন্য প্রয়োজন কৃচ্ছ্র তপঃ আর সহজ ভোগ– এই দুয়ের মধ্যপথে পদচারণা।... গীতা শাস্ত্রের বহুজনবিদিত কর্মযোগে এই মধ্যপথেরই এক বড় সংকেত। এই মধ্যপথের বাণী ঘোষিত হয়েছে ইসলামের ভিতর। দীন ও দুনিয়া, ধর্ম আচরণ ও সংসার জীবন, এ দুয়ের সামঞ্জস্য বিধান কোরানের নির্দেশ।"[৫] এই মধ্যপথের নির্দেশ ব্যক্তির জন্য, বিশেষ করে জীবিকার উপায়হীন সর্বহারার ব্যক্তিগত জীবনে সান্ত্বনার প্রলেপ বুলাতে পারে, তার মনে একটা নিরাসক্তির ভাব আনতে পারে (নাইবা পেল সুখ এ জীবনে, পরকালে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে সুখ দেবে, স্বাচ্ছন্দ্য দেবে!) কিন্তু সামগ্রিকভাবে সর্বহারার মুক্তির সংগ্রামকে ব্যাহত করা ছাড়া তাকে ত্বরান্বিত করতে পারে না। আর তাই মধ্যপথের এই সমন্বয়বাদী দর্শনকে যুগ থেকে যুগে শোষকশ্রেণী তার নিজের শোষণকে স্থায়ী করে রাখার মোহময় মাধ্যম হিসাবে প্রতিপালন করে এসেছে। শ্রদ্ধেয় ড. দেব তাঁর দর্শনকে সমাজবিজ্ঞানের সঠিক ব্যাখ্যাকারী মাধ্যমে পরিণত না করে দর্শনকে ধর্মীয় বিশ্বাসে পর্যবসিত করে তাঁর মধ্যপথকে ব্যক্তির উপায় বলে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ জ্ঞান সাধক। যেন তাঁর জীবনের মটো ছিল: কেবল জ্ঞানের জন্য জ্ঞান আহরণ। কিন্তু 'জ্ঞানের জন্য জ্ঞান আহরণ' কথাটি মহৎ হলেও সে জ্ঞান তো জীবনের ক্ষেত্রে নিস্ফল। জ্ঞান হবে মুক্তিকামী মানুষের মুক্তির হাতিয়ার। জ্ঞানসাধক নিজের জীবন উৎসর্গ করবেন সেই মুক্তির হাতিয়ারকে মুক্তিকামীদের হাতে তুলে দিতে। তাদের শিক্ষা দেবেন শোষকের বিরুদ্ধে সেই হাতিয়ারকে সার্থকভাবে ব্যবহারের কৌশল।

---

৪. ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব, আমার জীবন দর্শন, পৃ:১০

৫. ঐ পৃঃ ১১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা না হলে ব্যক্তি কেবল জ্ঞানসাধনা করল কিংবা করল না তাতে নির্যাতিত মানুষের উপকার বা মঙ্গলের দিকটা কী থাকতে পারে? বরঞ্চ তার অপকারের দিকটা এই যে, এই জ্ঞানসাধকের কাছ থেকে সর্বহারা যে সাহায্য পেতে পারত তা থেকে সে বঞ্চিত হল এবং শক্তির দ্বন্দ্বে সে প্রতিদ্বন্দ্বীর চাইতে অধিকতর দুর্বল হয়ে পড়ল।

সরল প্রাণ ড. দেব ইতিহাসের পরিক্রমাকে কেবল মাত্র জড় অ-জড়ের প্রতি মানুষের আসক্তির ওঠানামা হিসাবে দেখাবার প্রয়াসে বলেছেন : "কখনও জড়ের প্রতি আসক্তি প্রবল হয়, আর আধ্যাত্মিকের প্রতি আকর্ষণ এক রকম অন্তর্হিত হয়। আবার তার উল্টোটাও মাঝে মাঝে জীবনের তাগিদে ঘটে। তখন মানুষ ব্যবহারিককে ত্যাগ করে পারমার্থিককে আঁকড়ে ধরতে চায়। এ কথা ব্যক্তির জীবনে যেমন সত্য তেমনি তার ব্যাপকতর সামাজিক জীবনেও সত্য। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই ওঠানামার সাক্ষাৎ প্রচুর পাওয়া যায়।"[৬] ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সমগ্র মানবসমাজের মধ্যে জড় অ-জড়ের প্রতি আকর্ষণের ওঠানামার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তা ঠিক নয়। সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ইতিহাসের ভাববাদী ব্যাখাতাদের রচনার পৃষ্ঠায়। কারণ, 'জড়' হচ্ছে জঙ্গম জীবন, বৃহত্তর জনমানবের সংগ্রামী জীবন। অ-জড় বা 'আধ্যাত্ম' হচ্ছে শোষিত মানুষের দুঃখময় জীবনের মোহময় ব্যাখ্যা। জীবনেই সব শেষ নয়। জীবনের পরেও জগৎ আছে, মৃত্যুর ওপারে। এ কালের দুঃখে আফসোস কেন? পরকালে তো ছেদহীন শান্তি, বিরতিহীন বিশ্রাম, ক্ষুধাহীন অন্নপূর্তি। ডঃ দেব এ কথা যে না জানেন, তা নয়। তিনি বলেছেন : "বর্তমান যুগে যেখানে যেখানে আধ্যাত্মবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযান, সেখানেই আধ্যাত্মবাদের নামে ধর্ম ব্যবসায়ীদের চেষ্টায় জনসাধারণের শোষণ, এ কথা ঠিকই।"[৭] এ কথা যদি ঠিক হয় তাহলে দার্শনিকের কর্তব্য হবে মানুষের হাতে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অর্থনীতিক উন্নতির এমন চাবিকাঠির হাদিস দান, যার শক্তিতে জনসাধারণ আর ধর্ম ব্যবসায়ীদের শিকারে পরিণত হবে না। ধর্ম ব্যবসায়ী তো আসলে শোষকদের স্বার্থের তল্পীবাহক। কিন্তু ডঃ দেব জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরামহীন বিকাশকে স্বাগত জানাতে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। কারণ, তাঁর মতো : "বৈজ্ঞানিক জ্ঞান স্পৃহার চরম পরিণতি হয়েছে বহিঃপ্রকৃতির ওপর মানুষের শক্তি বৃদ্ধিতে। নানা নতুন যন্ত্রপাতির আবিষ্কারে মানুষের শক্তিও যেমন বেড়েছে, তেমনি তার প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টাও হয়েছে অপরিমিত ও প্রচুর। এতে পরলোকবাদী আধ্যাত্মবাদের উপর মানুষের আস্থা কমে গেছে। কিন্তু পরিতাপের

---

৬. ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, আমার জীবন দর্শন, পৃ: ১৯
৭ ঐ পৃ:২০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়, এতেও তার জীবন সমস্যার সমাধান হয়নি। এই অতি প্রাচুর্যের কোলাহলের মধ্যেও দুঃখের করুণ সুর মোটেই ক্ষীণ হয়নি। তাই মাত্র পঁচিশ বছরের ভিতর দু'দুটো ভয়াল মহাযুদ্ধের তাণ্ডবলীলা পৃথিবীর বুকে ঘটল।"[৮]

কিন্তু প্রাচুর্যের মধ্যে করুণ কান্না কার? 'মানুষ' বলে ভুক্ত ও অভুক্তকে এক সাম্যবাদী চোখে দেখে কী লাভ? প্রাচুর্যের মধ্যে করুণ কান্না অবশ্যই শোনা যায়। কিন্তু সে কান্নার উৎস দুটি। তার একটি হতে পারে অতিভুক্তের যন্ত্রণার কান্না, ব্যারামের কান্না : 'আমি সব খেয়েছি, এখন আর কী খাব! আমার পেটে যন্ত্রণা, কিন্তু মুখে ক্ষিধে, চোখে ক্ষিধে।' অসুখের দাবি : 'আমাকে আরো দাও। আমাকে এক টাকায় একশো টাকা মুনাফা দাও। আমাকে এক উপনিবেশের যায়গাতে দশ উপনিবেশ দাও। আমাকে বাজার দাও। বাজার না দাও, আমাকে গোলা দাও, গুলি দাও। আমাকে 'অ্যাটম বম' দাও। সেই 'বম' আমি নিরীহ জাপানীদের মাথায় মারব, সেই 'বম' আমি নিস্পাপ ভিয়েতনামী কৃষকের কুঁড়েঘরে মারব, ওদের শস্যের ক্ষেত ও জলের বাঁধের ওপর মারব।

অতি প্রাচুর্যের মধ্যে কাঁদে অভুক্ত সর্বহারাও। তারপর বলে : 'দেখ, কী অ-মানবিক সভ্যতা। দেখ কী অসঙ্গতি! আমরা ক্ষিধের জ্বালায় পাগল, ওরা আমাদের জোর করে দখল করা শস্যের ক্ষেত্র থেকে সোনার ফসলকে সমুদ্রে ফেলছে, জ্বালিয়ে দিচ্ছে। দেখ, কী অসঙ্গতির সভ্যতা! আমাকে সর্বস্বহারা করে দিনমজুরির হাটে কেনা-বেচা করে বলছে : সমস্ত দিন আমাকে কলে বাঁধা কলুর বলদ হয়ে খাটতে হবে। আমার খাটুনিতে ওরা পয়দা করবে ষোল আনার কাপড় চোপড় দ্রব্যসামগ্রী। কিন্তু আমাকে দেবে মাত্র এক আনা। আমার রক্তের বিনিময়ে ওরা মুনাফা করবে। তবু এর বিরুদ্ধে কিছু বললে বলবে, বিদ্রোহী, রাষ্ট্রবিরোধী, দুশমন। আর গুলি করে এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে দেবে ক্ষিধের কীটে কুরে কুরে খাওয়া আমাদের বুককে। দেখ দেখ, কী অসঙ্গতি : আমরা স্বাধীনতা চাই, স্বাতন্ত্র্য চাই। আর এই অপরাধে শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদের হাওয়াই জাহাজ থেকে নেমে আসে আমাদের মাথার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে আমাদেরকে নিষ্পিষ্টকারী বোমা।

তাই মানুষ আজ অতি প্রাচুর্যের মধ্যে কাঁদছে বলার অর্থ এই নয় যে, আজ আর মানুষের ওপর কোন শোষণ নেই। সবাই আজ বিত্তবান হয়ে গেছে, সবাই বিত্তবান হয়ে দেখছে, বিত্তেও সুখ নেই। হতে পারে এ বিত্তবানদের অতিভোজের কাতর বিলাপ। যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হয়েছে প্রচুর, এ কথা সত্য। কিন্তু সে যন্ত্রপাতির শক্তি এখনও কবলিত হয়নি নির্বিত্ত সংগ্রামী মানুষের হাতে সার্বজনীনভাবে। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া প্রসারিত হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক মানুষ

---

৮ ঐ পৃ: ২০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখিয়েছে, বিজ্ঞানের উন্নতি মানুষের জন্য অতি প্রাচুর্যের কোন সংকট আনে না। শ্রেণীহিন সঙ্গতিপূর্ণ সমাজের মানুষের জন্য প্রয়োজন আরো বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির, আরো খাদ্যের, আরো বস্ত্রের। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির কৌশলে যতবেশি খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান তৈরি হবে তত সমাজবাদী মানুষ নতুনতর এক সভ্যতা তৈরি করতে পারবে, যেখানে আজকের দুনিয়ার কৃত্রিম অ-মানবিক সমস্যার জন্ম হতে পারবে না। কিন্তু শহীদ ড. দেবকে আজ আর এ নিয়ে সমালোচনা করা যায় না। আমি একটি ভিন্ন দৃষ্টি থেকে কথা বলছি বলেই তাঁর জীবন দর্শনকে পৃথিবীর সমস্যার অতি সরলীকরণ ও সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিক কামনা বলে বোধ হচ্ছে। বস্তুত দর্শন যখন দৃষ্টির ব্যাপার, দেখার ব্যাপার, তখন দ্রষ্টায় দ্রষ্টায় তাদের স্বার্থ, চেতনা ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার ভিত্তিতে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে পার্থক্য ঘটবেই। ড. দেব এত আত্মচিন্তায় সমাহিত ছিলেন যে, তাঁর পক্ষে বলতে অসুবিধা হয়নি : "জড়বাদ ও আধ্যাত্মবাদকে আমি পরস্পর বিরোধী বলে মনে করি না।"[৯] এবং অসুবিধা হয়নি এই উক্তিকে প্রমাণ করার জন্য যুক্তি উপস্থিত করতে।

'আমার জীবন দর্শন' গ্রন্থে ড. দেব 'মধ্যপথ' 'আত্মপক্ষ' 'ইতিহাস, দর্শন ও জীবন', 'বিপর্যস্ত বিজ্ঞান' 'বিপর্যস্ত বুদ্ধি' 'আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও মানবসমাজের ভবিষ্যৎ' এবং 'শেষ কথা' শীর্ষক কয়েকটি নিবন্ধ রচনা করেছেন। সব কয়টিতেই তিনি পরিহাস মধুর দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁর জীবন দর্শনকে পাঠকের সামনে পেশ করার চেষ্টা করেছেন। কথায় কথায় গল্প বলা, বাক্যে বাক্যে সরস দৃষ্টান্ত পেশ করা ড. দেবের এক অতুলনীয় গুণ ছিল। তাঁর মতে দ্বন্দ্বমান বিক্ষুব্ধ সমাজে আজ সমন্বয়ের প্রয়োজন হলেও, সমন্বয়বাদ যে আজ গ্রাহ্য নয়, প্রশংসাই নয় এ কথা ডঃ দেব জানতেন। আর সেই চেতনাকেই তিনি বারংবার পরিহাসের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। "জড়জগতের আলোকে আমার দর্শনের নাম 'আলু দর্শন'। বঙ্কিমচন্দ্রের উদর দর্শনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে কিনা জানি না। তবে আলু দর্শনের অর্থ আমার কাছে অত্যন্ত পরিষ্কার। গোল আলু যেমন তরকারির সঙ্গে— আমিষই হোক আর নিরামিষই হোক, স্থলজ হোক আর জলজ হোক, অথবা উভয়ই হোক না কেন অক্লেশে মিলেমিশে তাদের স্বাদ বাড়িয়ে তোলে, তেমনি আমার এই অতিপ্রিয় আলুদর্শন যাঁরা মনেপ্রাণে অনুসরণ করবেন, তারাও সকলের সঙ্গে মিশে, সব ভাবের রসিক হয়ে মানুষের জীবনে সমৃদ্ধি, শান্তি, সমঝোতা নিয়ে আসবেন। আলু দর্শনের এমনি মহিমা।"[১০] আবার পরিহাস করে বলেছেন : "অর্থাগমের পন্থা আমার যাই হোক না কেন, পিতৃভক্তির আতিশয্যে আমি

৯ ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেবের 'আমার জীবন দর্শন' পৃ. ২১
১০. ডাঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেবের 'আমার জীবন দর্শন' পৃ. ২৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিরাজী বিদ্যা একেবারে ছেড়ে দেই নি। পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্রের বনে যাওয়ার গল্প বাবার মুখে বারবার শুনেছি। তাই বাবার অভিলাষ পূরণের জন্য, তাঁর পরলোক প্রাপ্তির বহু পরে এবং সম্ভবত আমার পরলোক প্রাপ্তির সন্নিকট মুহূর্তে দর্শনের প্রসারিত ক্ষেত্রে কবিরাজী ঔষধালয় খুলে দিয়ে জড়বাদের অনুপানে আধ্যাত্মবাদের জোরালো ওষুধ বিক্রি আরম্ভ করেছি। ক্রেতা জুটলে পশার ভালোই জমবে। নইলে দেউলিয়া হওয়া ছাড়া উপায় নেই।"[১১] ড. দেবের ব্যক্তিগত কথোপকথন কিংবা ছাত্রদের নিকট বক্তৃতাদান থেকে গ্রন্থ রচনায় সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল ডঃ দেবের এরূপ সরস উক্তির টুকরো।

ড. দেবের দৃষ্টিতে মনুষ্য জগতের সমস্যার সমাধানে বিজ্ঞান বল, বুদ্ধি বল– সবই আজ বিপর্যস্ত। তিনি বলেছেন : "মানুষের বৃহত্তর পরিবেশের চাহিদা এবং তাগিদ এত জরুরি যে, দুশ বছরের বেশি সময় ধরে জড়বাদের দিকে একটু একটু করে এগুবার পর বিজ্ঞানও যেন আজ থমকে দাঁড়িয়েছে। নিজের অজ্ঞাতেই যেন বিজ্ঞান আজ জড়বাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চাইছে।"[১২] কেবল বিজ্ঞান নয়। বুদ্ধি বা দর্শনও বিপর্যস্ত। "পরিবেশের চাপে মানুষের দার্শনিক চিন্তায় এক এক যুগে মনের এক এক দৃষ্টিভঙ্গী প্রাধান্য লাভ করেছে। ফলে দর্শন প্রায়ই এক চোখো ও এক রঙে রঙিন্ হয়ে গেছে। মানুষের আত্মিক প্রয়োজনের সামগ্রিক প্রতিফলন সেখানে দেখা যায় নি।"[১৩] ড. দেব ধারণা করতেন যেন শ্রেণী নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের একটা সাধারণ আত্মিক প্রয়োজন থাকতে পারে। অবশ্য এটা আধ্যাত্মবাদী দর্শনের পুরানো ধারণা। ড. দেব দুঃখ করেছেন– এমন একটা দর্শন পাওয়া গেল না, যে নিরপেক্ষভাবে ভুক্ত ও অভুক্ত উভয়ের আত্মিক সমস্যার সমাধান দিতে পারে। আর এই অভাব পূরণের জন্য তিনি সমন্বয়বাদী দর্শন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন : "যে সমন্বয় দর্শন আমি সারা জীবন খুঁজে বেড়াচ্ছি, মানুষের সঠিক কল্যাণের জন্য যার প্রয়োজন অপরিসীম, তাকে পেতে হলে সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে তাকে গ্রহণ করার জন্য উন্মুক্ত হতে হবে।"[১৪] এখানে দার্শনিক ড. দেব একেবারে মরমিয়া সুফি কিংবা বৈষ্ণব সন্ন্যাসীতে পরিণত হয়েছেন। এবং দার্শনিক বলেই আবার তাঁর এই পরিণামকে তিনি উপলব্ধিও করছেন। কিন্তু তাকে অগ্রাহ্য করেননি। "ইহুদিদের ঈশ্বর তার অনুসারীদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, তারা যেন শুধু তাকেই ভালোবাসে, কারণ

---

১১. ঐ পৃ. ২৩
১২. ঐ পৃ. ৫৮
১৩. ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেবের 'আমার জীবন দর্শন' পৃ. ৬৮
১৪. ঐ পৃ. ৭১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্য কারো প্রতি আসক্তি ভগবান বরদাস্ত করেন না। সমন্বয় দর্শনের সম্বন্ধেও এ উক্তি হয়ত প্রযোজ্য।"[১৫] আর এক জায়গায় বলেছেন, "একমাত্র ইউরোপীয় চার্চের আলোচনা জানা যায়, হাজার বছরেরও অনেক বেশি এ বিশ্বাসবাদ ইউরোপীয় জীবনে বিপ্লব সাধন করেছে। এ থেকেই বুঝা যায় নিজ বুদ্ধির বাণী, তা যতই নিরপেক্ষ হোক না, হৃদয়ের আবেদনের কাছে দাঁড়াতে পারে না।"[১৬] আবেগের আধার শ্রী চৈতন্য দেবের পরপুরুষ শ্রী গোবিন্দ দেবের মুখে এর পরে শোনা যায় : "হৃদয়ের উৎফুল্ল আবেগ যখন বন্ধনহারা স্রোতস্বতীর মতো উচ্ছ্বল বেগে গন্তব্য পথে অগ্রসর হয় তখন যুক্তির ছোট বাঁধ তার গতিপথ সংযত করতে পারে না। ভাবরাজ্যে বুদ্ধি হৃদয়ের কাছে সূর্যের সামনে জোনাকি পোকার মতোই নিস্প্রভ।"[১৭] শ্রী চৈতন্য দেবের কথা স্মরণ করে আমাদের যেমন হৃদয়ে শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়, তেমনি শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র দেবের উদারতা ও আবেগের কথা স্মরণ করলে আমাদের হৃদয় অভিভূত হয়। কিন্তু তবু এ কথা সত্য যে, শ্রী চৈতন্য দেবের ভাবের বন্যা সমাজে কোন প্রগতিশীল সামাজিক বিপ্লব সাধন করতে পারেনি। তাঁর অকৃপণ 'প্রেমদান' অত্যাচারী শোষক শ্রেণীর মনকে স্পর্শ করে অর্থনীতিক ও সামাজিক অত্যাচারের নিরসন ঘটাতে পারেনি। ডঃ দেবের হৃদয়াবেগও তাঁর পরিপার্শ্বের অবস্থাতে কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিক মহত্ত্ব অনস্বীকার্য। যুক্তি নয়, ভক্তি; তর্ক নয়, বিশ্বাস– এই ছিল ডঃ দেবের জীবন দর্শনের মূল। আসলে দার্শনিক দেব ভক্ত দেবে পরিণত হয়েছিলেন। ভক্তির সঙ্গে যুক্তির দ্বন্দ্ব চলে না। ভক্তি যুক্তির বাইরে। তাই দর্শনের কূট তর্ক দিয়ে ডঃ দেবের বিশ্বাস ও ভক্তিকে বিশ্লেষণ করা চলে না। "আধ্যাত্মবাদের মূলকথা, বিচার বিশ্লেষণ নয়– প্রেম। সে প্রেমের বাঁধন নেই, গণ্ডি নেই। তাতে শত্রুমিত্রের তফাৎ নেই।"[১৮] 'শেষ কথা' নিবন্ধে ডঃ দেব বলেছেন : "আমার নিজের জীবনে এ বিশ্বাসের মূল্য অজস্র ও অপরিমিত। কল্পনার তুলিকায় ভাবের যে রঙিন ছবি আঁকলে মানুষের জীবন আনন্দে তখনকার মতো ভরপুর হয়ে ওঠে ও সে নিজের দুঃখ-দৈন্য, অসামর্থ্য, অসাফল্য ও অকৃতকার্যতার কথা ভুলে যায়, প্রাত্যহিক জীবনে সে বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে। তাই কল্পতরু, তাই তার কাম্য। তার আশার স্বর্গ, কল্পনার বেহেশত। সে তাকে ছেড়ে থাকতে পারে না, থাকতে চায়ও না। আমার অবস্থা হয়ত তাই। শুধু বাস্তব জ্ঞান আমার চাহিদা মেটাতে

১৫. ঐ পৃ. ৭১
১৬. ঐ পৃ. ৭৫
১৭. ঐ পৃ. ৭৫
১৮. ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেবের 'আমার জীবন দর্শন' পৃ. ১৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে না, কঠোর বাস্তবকে আঁকড়ে থাকলে অনেক আগেই জীবন যুদ্ধে আমার মৃত্যু হয়ে যেত। আমার স্বপ্নই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে ও রাখবে। আমি স্বাপ্নিক, আমি ভাব বিলাসী।"[১৯]

*　　　*　　　*

ড. দেব স্বাপ্নিক ছিলেন, 'ভাব বিলাসী' ছিলেন। একজন মহৎ মানুষ ছিলেন। ডঃ দেবের মৃত্যু তাঁর জীবনদর্শনের শেষ ভাষ্য। এ ভাষ্যের তাৎপর্য অস্পষ্ট নয়। এ ভাষ্য আমাদের সুনিশ্চিতভাবে বলে দেয় : পৃথিবীময় সংগ্রামী জনতা এমন এক শ্রেণীহীন মহৎ সমাজ তৈরি করার সংগ্রামে নিরত, যে সমাজে ড. দেবের ন্যায় মহৎ ভাববিলাসী নিজের হৃদয়ের আবেগ ভরে স্বপ্ন দেখতে পারবেন, নিজের ভাবের বিলাসে ডুবে যেতে পারবেন, যেখানে ব্যক্তির আপন সত্তা বিকাশের ক্ষেত্রে, তার পরিবেশ ও জীবিকা প্রতিকূল হয়ে দাঁড়াবে না। সেই সংগ্রামেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের আসন্ন সাফল্যে পাশবিক শক্তি কেঁপে উঠেছিল। তাই মানুষ মাত্রেরই মহৎ সব স্বপ্নকে বোমা, রকেট ও মেশিনগানের গুলিতে নিহত করার বর্বর অভিযান শুরু করেছিল সেই পাশব শক্তি। কিন্তু পৃথিবীর সংগ্রামী জনতার মহৎ স্বপ্ন মৃত্যুঞ্জয়ী। সে দুর্নিবার। একদিন পৃথিবীর বুক থেকে মানবসমাজের অসঙ্গতির বিলোপ ঘটবে। বিলোপ ঘটবে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই, জনতার শক্তিতে। সেই মহৎ মানব সমাজে আজকের মতো নিশ্চয়ই ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব ১৯৭১ সালের অযুত শহীদের সঙ্গে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মৃত হবেন।

॥ ১৯৭৩ ॥

---

১৯. ঐ পৃ. ৯৯-১০০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্ধুর স্মৃতি

টেলিভিশনের সামনে বসে থাকিনে। তবু গত রাত্রে (২৩শে জানুয়ারি '৮১) শুতে যাবার আগে পাশের ঘর থেকে টেলিভিশনের শেষবারের খবরের একটি শব্দ হঠাৎ কানে খট করে বাজল "সৈয়দ নুরুদ্দিন, প্রখ্যাত সাংবাদিক ....।" খবরের বাকি অংশ আমি শুনিনি। বুঝলাম, যে আশঙ্কা মনে ছিল, তাই শেষ পর্যন্ত সত্যে পরিণত হয়েছে। এত শীঘ্র!

সৈয়দ নুরুদ্দিনের কি ৫৮ বছর বয়স হয়েছিল? আমি জানতাম না। আমাদের পরস্পরের বয়সের খবর আমরা রাখতাম না। আমরা কেউ একে অপরকে বলতাম না : তুমি বুড়িয়ে গেছ, তোমার চুল পেকেছে। কারণ আমাদের যখন দেখা হত, (এবার দেখা হল 'সংবাদ' অফিসে, অনেক বছর পরে) তখন আমরা বর্তমানে থাকতাম না। ফিরে যেতাম আমাদের কৈশোরে, আমাদের তারুণ্যে। বর্তমান তো কঠিন, বর্তমান তো জটিল। বর্তমানে তো আমি সাংসারিক। যার সংসার তার সমস্যা। এ সমস্যার আলোচনার শেষ কোথায়? আর এতে কাকে আমরা কতটুকু সাহায্য করতে পারি? তাই দেখা হলে সৈয়দ নুরুদ্দিন বলত : আরে সরদার! মনে আছে তোমার সেই ফজলুল হক হলের পূর্ব দিকের ২৬ নম্বর ঘরের কথা? যেখানে তুমি থাকতে আর সেই যে আমরা হলের কাছের পুকুরঘাটে যুদ্ধের সময়ে পাওয়া আমাদের ইংরেজ-আমেরিকান প্রগতিপন্থি সৈনিক বন্ধুদের নিয়ে বসে কত গল্প করতাম। মনে আছে সে কথা? সেই স্মৃতিতে অবগাহন করে বর্তমানের সঙ্কটের মধ্যেও আমরা পরস্পর বাঁচতে চাইতাম। কিন্তু পরস্পরের সেই সম্বোধন যে এত শীঘ্র শেষ হয়ে যাবে, একজন আর স্মৃতির উল্লেখ করবে না, কেবল স্মৃতি হিসেবে উল্লেখিত হবে, এত শীঘ্র, মাত্র আটান্ন বছর বয়সে, তা সেদিনও এত গুরুতরভাবে আশংকা করিনি যেদিন 'সংবাদ'-এর সাহিত্য সম্পাদক আবুল হাসনাত এসে খবর দিলেন, সৈয়দ নুরুদ্দিনের 'হার্ট স্ট্রোক' হয়েছে আর তিনি সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মনে একান্ত ইচ্ছা হয়েছিল, হাসপাতালে দেখতে যাব। কিন্তু আবুল হাসনাত বলেছিলেন, এখন একেবারে রেস্ট দরকার। হাসপাতালে ভিড় না করাই ভালো। আমি তাই কেবল অপেক্ষা করছিলাম, কবে নুরুদ্দিন ভালো হয়ে অফিস করতে আরম্ভ করবে এবং আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সংবাদ'-এ যেয়ে তাকে বলব, দেখ, 'মুজাফফর আহমদ চৌধুরী স্মারক গ্রন্থখানা প্রকাশিত হয়েছে। বল, কেমন হয়েছে? এবার তোমাকে এর একটি আলোচনা লিখে দিতে হবে। 'না' বললে চলবে না। মুজাফফর সাহেবকে তুমিও তো ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছিল। আসলে নুরুদ্দিন নিজে আজকাল স্বেচ্ছায় সাহিত্য চর্চা না করলেও এই গ্রন্থের কথা শুনে আগেই বলেছিল : 'আমি নিশ্চয়ই এ বইয়ের আলোচনা লিখব।' সৈয়দ নুরুদ্দিনকে এ বই আর উপহার দেওয়া হবে না। জীবনের অমোঘ নিয়মে, আকস্মিকভাবে সৈয়দ নুরুদ্দিন, সেই সদাহাস্য, আমুদে, উদার-হৃদয়, অপরকে উৎসাহদানকারী, অপরের মধ্যে গুণের অন্বেষণকারী সুহৃদ একেবারেই বিনা নোটিশে নীরব হয়ে গেল। মৃত্যুর পরের দিন বায়তুল মোকাররমে শুভ্র কাপড়ে আচ্ছাদিত সুহৃদের সেই নীরব নিথর দেহটির কথা চিন্তা করতে করতে এই আফসোসই আমার মনে জাগছিল।

সৈয়দ নুরুদ্দিনের সঙ্গে সত্যই বহুদিন দেখা হয়নি। আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল সেই ১৯৪২ কি '৪৩ সালে। তখন আমরা বি. এ. ক্লাসের ছাত্র। ফজলুল হক হলের বাসিন্দা।

নুরুদ্দিনকে ঢাকা কলেজে পেয়েছিলাম বলে মনে করতে পারছিনে। বোধ হয় সে সানাউলের সঙ্গে (কবি সানাউল হক) আই. এ. পাস করেছিল। বি. এ. তে নুরুদ্দিনের ছিল ইতিহাস। আমার দর্শন। সানাউল হকের অর্থনীতি। সঙ্গী আরো ছিল। আবদুল মতিন ছিল বিজ্ঞানের। (পরবর্তীকালের সাংবাদিক, বর্তমানের ইংল্যান্ডবাসী)। কামাল ছিল অর্থনীতির। (কামাল উদ্দিন বর্তমানে শিল্প ব্যাঙ্কের অধিকর্তা)। বয়সের ও পাঠের শ্রেণীগত তফাৎ ছিল আমাদের, কেবল বিষয়ের নয়। কিন্তু তাঁর খোঁজ আমরা রাখতাম না। আমাদের সবার বয়স ছিল এক এবং সকলের বিষয়ও এক। সে ইতিহাস বা দর্শন বা অর্থনীতি নয়। সে বিষয় ছিল জীবনকে সুন্দরভাবে দেখা, মন ও চোখ খুলে দেখা এবং দেখা ও জানার প্রচেষ্টায় পরস্পরকে সাহায্য করা।

জীবনকে দেখার এই আগ্রহেই আমরা উল্লিখিত নামের তরুণ শিক্ষার্থীরা এবং এই ধরনের আরো কিছু মুসলিম তরুণ একদিন সমাজতান্ত্রিক জীবনবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম। আর এ প্রসঙ্গেই স্মৃতিতে ভেসে উঠে ইংরেজের হাত থেকে স্বাধীনতার লাভেরও পূর্বেকার সেই চল্লিশের দশকের ঢাকার সাহিত্য সংস্কৃতিগত জীবনের কথা।

১৯৪২ সনে সোমেন চন্দ নিহত হন। সোমেন চন্দ ছিলেন এক তরুণ শ্রমিক আন্দোলনের সচেতন কর্মী। তিনি মিটফোর্ড মেডিক্যালে পড়তেন। রেলশ্রমিকদের তিনি নেতৃত্ব দিতেন। তাদের জীবনের সাথে তিনি একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৪০ থেকে '৪২-এর কথা। যুদ্ধ চলছে। দেশে কংগ্রেসের আন্দোলন চলছে। স্বাধীনতাকামী, এমন কি তার বামপন্থী অংশেও যুদ্ধের চরিত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে ব্যাখ্যার ভিন্নতা চলছে। এসব আমরা মুসিলম ছাত্ররা তেমন কিছু জানতাম না। কিন্তু বামপন্থীদের ব্যাখ্যার ভিন্নতা ও আত্মকলহে এক উগ্র উপদলের হাতে সেদিনকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দ নিহত হলেন। তাঁর নিহত হওয়ার ঘটনাও তক্ষণিকভাবে আমরা জানিনি। তবু সোমেনের জীবনের আদর্শ ও তাঁর আত্মত্যাগের কাহিনী কালক্রমে আমাদেরকে, মানে আমাকে, সৈয়দ নুরুদ্দিনকে, সানাউল হককে, মুনীর চৌধুরীকে, আবদুল মতিনকে টেনেছিল ঢাকার প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের সংস্পর্শে ও তার সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে। এই সংঘেরই সংগঠক ছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত, কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত, অচ্যুৎ গোস্বামী, সরলানন্দ সেন, অমৃত দত্ত ও সত্যেন সেন। সত্যেন সেন ছিলেন কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু গ্রাম থেকে ঢাকায় এলে এই সাহিত্য সংঘকেও তিনি সক্রিয় করার চেষ্টা করতেন। এই প্রগতি লেখক সংঘের সাপ্তাহিক কি পাক্ষিক বৈঠিক সেই কোর্ট হাউজ স্ট্রিটে বা ঢাকা কোর্টের পূর্বদিকে এখন যেখানে একটি ওভার ব্রিজ উঠছে তার কাছে পাতলাখান গলির মুখের তিনতলা দালানটির বৈঠকে যোগ দিতে আমরা, এই দলটি যেতাম ঢাকার উত্তর মাথা ফজলুল হক আর সলিমুল্লাহ হল থেকে পায় হেঁটে, রাস্তা জুড়ে গল্প করতে করতে করতে। ফজলুল হক থেকে কোর্ট হাউজ স্ট্রিট– কোনদিন আমরা যে কোন গাড়িতে চড়ে গেছি (সেকালে নিকশা ছিল না, ছিল কেবল ঘোড়ার গাড়ি) এখন একেবারেই মনে করতে পারিনে। আমাদের খোসগল্পে সমস্ত পৃথিবীর গণআন্দোলনের পর্যালোচনায় কখন যে এই পথ শেষ হয়ে যেত তা আমরা টেরই পেতাম না। প্রগতি লেখক সংঘের বৈঠকের স্মৃতিও মধুর। সেখানের সৈয়দ নুরুদ্দিন অবশ্যই কবিতা পাঠ করেছেন। কিন্তু তার নমুনা আজ বিনষ্ট বা বিলুপ্ত।

ফজলুল হক হলের পাশে পুকুর ঘাটের আড্ডার স্মৃতিও কম ছিল না। সে স্মৃতিতেও সৈয়দ নুরুদ্দিনের হাসি-ঠাট্টা, কবিতা-পাঠ, গল্প শোনা ও পড়া ভেসে উঠছে। মোট কথা একটি ভিন্ন জগৎ, সুহৃদদের জগৎ। এর স্মৃতিতে আজ আনন্দ বই দুঃখের কোন রেশই খুঁজে পাচ্ছিনে। বস্তুতঃ সেদিনকার সে জীবনে জগৎকে দেখা ও জানার ক্রমাগত চেষ্টায় আনন্দ বই দুঃখের কিছু ছিল না। আর এই বন্ধু-সংঘের নিত্যসঙ্গী ছিল সৈয়দ নুরুদ্দিন। ফজলুল হক হলের পুকুর পাড়ের আড্ডা ছিল একেবারে আন্তর্জাতিক। পাশে ছিল আশারাফের রেস্তোরাঁ। সেখান থেকে আসত চা কিংবা মাখন টোস্ট। আর সাহিত্যের আলোচনা চক্রে কেবল হলের আমরা ও শহর থেকে আসা রণেশ বাবু বা অচ্যুৎ গোস্বামী বা তৎকালীন ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী রবি গুহ, মদন বসাক, অনিল বসাক এবং দেব প্রসাদ মুখার্জী নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈনিক অধ্যাপক রাপাপোর্ট ও স্প্রিঙ্গার কিংবা ইংরেজ অপর কোন সৈনিক বন্ধুও থাকতেন। আর তাতে যেমন বাংলা সাহিত্য আলোচিত হত, তেমনি আলোচিত হত ইংরেজি ও রুশ সাহিত্য। চল্লিশের দশকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রগতিপন্থি সেই ধারাটির স্মৃতি আজ আমার মনেও আবছায়ার মতো হয়ে আসছে। এটাই স্বাভাবিক। বছরের দিক দিয়ে এই কালাতিপাতের বয়সও তো কম হল না। প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বের কথা। সে যুগের কাগজপত্র আজ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ সেই প্রগতিপন্থী উদার চিন্তার ধারাটি পূর্ববঙ্গের প্রধান সমাজ, মুসলিম সমাজের মানস জগতের গণতান্ত্রিক বিকাশের ভিত্তিভূমি হিসেবেই কাজ করেছিল। তার ঘটনাদি, তার ব্যক্তিবর্গকে বিস্মৃত হতে দেওয়া উচিত নয়। তাতে আমাদের মহৎ ঐতিহ্য ও ইতিহাসে ছেদ বা শূন্যতারই সৃষ্টি হবে। আর সেই ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে স্মরণ করলে তার মধ্যে সদাহাস্য উদার হৃদয় সাহিত্যিক ও সাহিত্য রসিক সৈয়দ নুরুদ্দিনকে স্মরণ না করে কারুর উপায় থাকবে না।

বহু বছর পরে, মাত্র কয়েক মাস আগে আবার যখন নুরুদ্দিনের সাথে দেখা হল তখন আমরা আমাদের সুখের স্মৃতির সাগরে অবগাহন করতে করতে পরস্পর পরস্পরকে বলেছিলাম : সেদিনের আমাদের সে জীবন অর্থহীন নয়, অর্থহীন নয় পরবর্তী বিকাশের জন্য। আর তাই তাকে আমাদের উদ্ধার করতে হবে বিস্মৃত প্রায় ও বিলুপ্ত প্রায়ের ভাগ্য হতে। এ ব্যাপারে আমরা আগ্রহের কথা প্রকাশ করে আমি বলেছিলাম : নুরুদ্দিন, আমি লিখব! কিন্তু শুরু করতে হবে তোমাকে। তোমার লেখা দিয়েই আমরা শুরু করব, আর আমাদের এই লেখার নাম দিব : চল্লিশ দশকের ঢাকা। আমার দাবি শুনে নুরুদ্দিন উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে বলেছিল, আরে আমি কী লিখব? কিন্তু আমার আস্থা ছিল, নুরুদ্দিনকে দিয়ে আমি লেখাতে পারব। একেবারেই যদি না লিখে তো আমি তার কাছে যেয়ে বলব, 'তুমি তোমার স্মৃতিকথা বল, আমি লিখে নিচ্ছি, নয়ত টেপে টেপ করে নিচ্ছি।' কিন্তু এর কোনটিই আর সম্ভব হবে না। একথা মনে করতেই বড় অসহায় বোধ হল নিজেকে নুরুদ্দিনের আচ্ছাদিত দেহের সামনে দাঁড়িয়ে প্রেসক্লাবের অসমাপ্ত ভবনের পশ্চিম দিকের কক্ষে।

*　　　*　　　*

উঁচুমানের সাহিত্যিক ছিলেন সৈয়দ নুরুদ্দিন। তাঁর অনুপম হস্তাক্ষরের মতোই ছিল তাঁর ভাষা ও রচনার শৈলী : কবিতা ও প্রবন্ধের। অথচ নিজের রচনাকে সংগ্রহ করে কখনো বই-এর আকার দিলেন না। তাঁর পক্ষে পুস্তকের আকারে তাঁর রচনা প্রকাশ করা আদৌ কোন সমস্যার ব্যাপার ছিল না। অন্যকে প্রশংসা করতে, উৎসাহিত করতেই ভালোবাসতেন নুরুদ্দিন। নিজের রচনার ব্যাপারে যেন ছিল একটা নিষ্করুণ সমালোচনা আর পরিহাসের ভাব আর তাই এবার ওয়াশিংটন থেকে ফিরে এসে যখন সংবাদে যোগ দিলেন তখন সে খবর পেয়ে দেখা করতেই বললেন : আরে সরদার, দেখ কী আশ্চর্য ব্যাপার। আমিও নাকি সাহিত্যিক আর কবি! আর তাই বাংলাদেশের লেখক জ্যোতি প্রকাশ দত্ত ওয়াশিংটনে আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকারি অফিসে সেই পরিচয়ে যখন খোঁজ করলেন সৈয়দ নুরুদ্দিনকে তখন কেবল অফিসের আমার সহকর্মীরাই নয়, আমিও আশ্চর্য হয়ে গেলাম। নুরুদ্দিন বেঁচে থাকতে তাঁর তাচ্ছিল্যকে তাঁর সহকর্মীরা হয়ত অতিক্রম করতে পারেননি। কিন্তু আজ বাংলা সাহিত্যের স্বার্থেই অনুসন্ধান আবশ্যক সৈয়দ নুরুদ্দিনের রচনা প্রকাশিত অপ্রকশিত অবস্থায় কোথায় ছড়ানো ছিটানো আছে। তা একত্রিত করে একটি সংকলনের রূপ দিতে পারলে সে সংকলন অবশ্যই একটি রুচিবান শিল্পীমনের উন্নত শিল্পরীতিতে প্রকাশিত সাহিত্য কর্ম বলে পরিগণিত হবে।

নুরুদ্দিনের বিরল রচনার নমুনার কথা চিন্তা করতে আবার মনে পড়ল সেই পুরোন দিনের কথা। প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। অধ্যাপক আহমদ শরীফ পুরোন জিনিস যত্ন করে রাখেন। তাঁর কাছেই পেয়েছিলাম সৈয়দ নুরুদ্দিন আর আমার ছাত্রজীবনের যে বাসস্থল সেই ফজলুল হক হলের বাংলা ১৩৫১ বা ইংরেজি ১৯৪৪ সনের বার্ষিক সাহিত্যপত্র 'কলাপী'র একটি সংখ্যা। আসলে কলাপী একবার মাত্র বেরিয়েছিল। সকালে ছাত্রদের দলের সাহিত্যপত্রকে হল বার্ষিকীই বলা হত। এর ব্যতিক্রম ছিল ঢাকার হল। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী ঢাকা হলের (বর্তমানে এ হলের নাম রাখা হয়েছে শহীদুল্লাহ্ হল) ছাত্ররা তাদের হল বার্ষিকীর নাম রেখেছিল : শতদল। আর তাদের অনুসরণে মুসলিম ছাত্রদের অন্যতম হল, ফজলুল হক হলের ছাত্র আমরা ১৯৪৪ সনে হল বার্ষিকীকে বার্ষিকী না বলে বলেছিলাম 'কলাপী' এবং ইংরেজি বাংলার বদলে কেবল বাংলা রচনাই এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তখনকার মুসলিম ছাত্রদের সাহিত্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্যে এ ছিল একেবারে নতুন সড়কের উদ্বোধন, একেবারে ব্যতিক্রম। আর এ কারণেই সেদিন আর এর অনুসরণ বা বৃদ্ধি ঘটেনি। কিন্তু ব্যতিক্রম ও সঙ্গীহীন বলেই 'কলাপী' আজ উল্লেখযোগ্য। কলাপীর নামকরণ, তার একেবারে বেশি খদ্দরপ্রায় কাগজ এবং রচনার চরিত্রে বোজা যায় কলাপী মুসলিম তরুণদের সাহিত্য প্রচেষ্টায় একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করতে চাচ্ছে। এ সাহিত্যপত্রের সম্পাদনায় ছিলেন সেরাজুন নূর এবং নুরুল ইসলাম চৌধুরী। এঁরা দুজনেই পরবর্তীকালে সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। নুরুল ইসলাম চৌধুরী বাংলাদেশের বৈদেশিক সারভিসের অন্যতম প্রবীণ সদস্য। ফজলুল হক হলের পরিচালনা পরিষদে প্রচার সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন সৈয়দ নুরুদ্দীন এবং কলাপী পত্রিকার প্রকাশকও ছিলেন সৈয়দ নুরুদ্দিন। এই কলাপী পত্রিকাতে ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষের রেখাচিত্র হিসেবে আমরা একটি রচনা সৈয়দ নুরুদ্দিনের উৎসাহ এবং তাগিদের কারণেই প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া সৈয়দ নুরুদ্দিনের নিজেরও দুটি রচনা ছিল : একটি তাঁর কবিতা নাম একটি রোমান্টিক কবিতা এবং অপরটি ছিল কাজী মোতাহার হোসের সাহেবের প্রবন্ধগ্রন্থ 'সঞ্চরণ'-এর পরিচিতিমূলক আলোচনা। সৈয়দ নুরুদ্দিন তখন ২২ কিংবা ২৪ বছরের যুবক। তবু এ দুটি রচনাকে তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যিক প্রকাশ ক্ষমতার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বলেই আমি মনে করি। (পত্রিকার প্রকাশক হিসেবে সৈয়দ নুরুদ্দিনের নিবেদনটিও ভাষা মাধুর্যের জন্য এবং তৎকালীন আর্থিক-সাংস্কৃতিক সংকটের স্মরণী হিসেবে উল্লেখযোগ্য)। এ দুটি রচনার কথাই আমি সেদিন, মানে, মাত্র এক মাস পূর্বে ১৬ই ডিসেম্বরের সংবাদের সংখ্যার জন্য একটি লেখা দিতে গিয়ে তখনকার সাক্ষাতে নুরুদ্দিনকে বলেছিলাম। বলেছিলাম কাজী মোতাহার হোসেন সম্পর্কে তোমার আলোচনাটি সুন্দর হয়েছিল। সে লেখাটি আমি যত্ন করে কপি করে রেখেছি। আমার সে কথা শুনেও নুরুদ্দিন অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিলেন : হা! হা! ছেলেবেলোর ছেলেমানুষির কথা তুমি কি মনে করিয়ে দিচ্ছ?' কিন্তু আজ সেই লেখা দুটি এই সঙ্গে পুনঃপ্রকাশ করতে যেয়ে নুরুদ্দিনের অট্টহাসি যত কানে বেজে উঠছে তত আমার চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসছে। কবি সানাউল হকের 'চতুর্দশপদী' নামে দুটি সুন্দর সনেটও প্রকাশিত হয়েছিল সেই 'কলাপী'তে।

১৯৪৪ সনে প্রকাশিত ফজলুল হক হল সাহিত্যপত্র কলাপীতে সৈয়দ নুরুদ্দিনের লেখা একটি পুস্তক সমালোচনা। সৈয়দ নুরুদ্দিন তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ক্লাসের ছাত্র।

সঞ্চরণ– কাজী মোতাহার হোসেন : জাতীয় জীবন যখন স্বাস্থ্যহীনতায় ধুঁকতে থাকে, তখন স্বভাবত তার রসনাও বিকল হয়; সুপথ্যের স্বাদ-গন্ধ কিছুই সে সহ্য করতে পারে না, অমৃতেও তার অরুচি হয়। এ সথ্যের সাক্ষী-প্রমাণ মিলবে মুসলমান সমাজের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। বাঙ্গালী মুসলমানগণ দীর্ঘদিন ধরে এমনকি এক অদ্ভুত 'নিওরটিক' ভবতন্দ্রায় আবিষ্ট হয়েছিল এবং তাদের দুর্বল চিত্ত থেকে এমনি ঘন আবিল বাষ্প বিনির্গত হচ্ছিল যে, তাদের চিদাকাশে আলোক সঞ্চার করা নিতান্তই কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অথচ শক্তিমান জ্যোতিষ্কের যে একেবারে অপ্রতুলতা ঘটেছিল তাও নয়। ডাঃ লুৎফর রহমান, ইমদাদুল হক, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসের এবং কাজী মোতাহার হোসেনের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন এবং অনুসন্ধিৎসু মনে কখনও সন্দেহ জাগে না। বলা বাহুল্য মাত্র যে, এঁদের মধ্যে কেউ স্বীয় সাজে বিশেষ সমাদর লাভ করেননি। এবং একমাত্র কাজী আবদুল ওদুদই নিজ সমাজের বাইরে প্রতিপত্তি বিস্তার করতে পেরেছেন। অন্যান্য যাঁদের নাম করা হল তাঁদের প্রয়োজনীয় শক্তি থাকা সত্ত্বেও নিজ সমাজে কিংবা তার বাইরে যোগ্যভাবে আদৃত হননি। সাহিত্যে প্রাগ্রসর হিন্দু সমাজের সহজ গুণগ্রাহিতার অভাব নিতান্ত নিন্দার্হ : এরূপ অবহেলার ফলেই তাঁরা আজ লজ্জাহীনের মতো বলতে পারেন, মুসলমানদের তো জানি না বা চিনি না। খুব প্রশংসনীয় ব্যাপার নয় নিশ্চয়। সে যা হোক, আমাদের সমাজে অধুনা নবজীবনের সঞ্চার দেখা যাচ্ছে। পূর্ববর্তীদের সঙ্গে পরিচয় লাভ করা এবং তাঁদের থেকে নির্দেশ লাভ করার এই উপযুক্ত সময়। নিজেদের আধুনিকত্বের নিরর্থক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অহমিকায় যদি আমরা পূর্ববর্তীদের অবহেলা করি তবে আমাদের নব যৌবন অচিরকালেই অন্ধতামসিকতায় আচ্ছন্ন হবে, এ এক প্রকার নিশ্চয় করে বলা যায়। কারণ উল্লিখিত লেখকগণ প্রত্যেকেই মননধর্মী, চিন্তাশীল, সর্বপ্রকার সংস্কারমুক্ত এবং শুধু বর্তমানেই তারা দৃষ্টি আবদ্ধ রাখেন নি; ভবিষ্যতের দিকে, পরবর্তীদের দিকে যাত্রারম্ভে তাঁদের নির্দেশ অপরিহার্য, তাঁদের সকল চিন্তাধারার যোগাযোগের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

উপরোক্ত প্রতিভাবান ব্যক্তিদের মধ্যে কাজী মোতাহার হোসেনের নাম আমাদের নিকট অধিক পরিচিত। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের খ্যাতিমান অধ্যাপক ছাড়াও যে তাঁর অন্য পরিচয় আছে এবং সেই পরিচয়ই যে মহত্তর ও অধিকতর মর্যাদালাভযোগ্য তা আমাদের অনেকেরই অজানা। পরিতাপের কথা সন্দেহ নেই; কিন্তু পরিতাপ ছেড়ে যত শীঘ্র তাঁর সেই মহৎ পরিচয় লাভ করবো ততই মঙ্গল। উনিশ শ সাইত্রিশ সালে মোতাহার হোসেনের 'সঞ্চরণ' নামে পুস্তক প্রকাশিত হয়। নানা ধরনের প্রবন্ধের সংকলন এটি। সমসাময়িক দুচারজনের সপ্রশংস দৃষ্টি বইটি লাভ করলেও সাধারণের কাছে এটি অখ্যাতই থেকে যায়। শোনা যায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নাকি বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের পরে সঞ্চরণ লেখকের মতো প্রবন্ধকার বাংলা সাহিত্যে বেশি নেই। যা হোক, হয়ত সাধারণের নিকট যোগ্য সমাদর লাভ না করায় কাজী সাহেব এরপর আর কোন পুস্তক প্রকাশ করতে ভরসা পান নি; তাঁর চিন্তার ও সাহিত্যনুশীলনের পরিচয় সঞ্চরণ-এ ইতস্তত দু একটি প্রবন্ধে মাত্রও সীমাবদ্ধ। আপাতত আমরা-সঞ্চরণ-এর পরিচয় লাভেই সচেষ্ট হচ্ছি।

AMARBOI.COM

'সঞ্চরণ' পাঠ করতে আরম্ভ করলে প্রথমে যা নজরে পড়ে, সে হোল লেখকের শান্ত সমাহিত পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি। কোনো সদম্ভ উক্তি নেই, সহনশীলতার অভাব নেই। মননশীল হয়েও তিনি মনোজ্ঞ; ভাষা স্নিগ্ধ সুন্দর, কোথাও অযথা অলঙ্কারের বাহুল্য হয়নি। নানা ধরনের রচনা পুস্তকটিতে আছে, কোথাও লেখক তাঁর সমসাময়িকদের নিয়ে কৌতুকরত, কোথাও বিজ্ঞান ও ধর্মের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিচ্ছেন; কোথাও স্বসমাজের বর্তমানে ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করছেন, আবার বাংলার বিশেষ সঙ্গীত সম্বন্ধে তথ্যবহুল বর্ণনা দিচ্ছেন— কুত্রাপি বিন্দুমাত্র অধৈর্য, কুটিলতা বা বাগাড়ম্বর বা অন্য কোন দুর্গুণের পরিচয় নেই। ভাবতে হয় এরূপ সহজ সাবলীর পরিপূর্ণ দৃষ্টি তাঁর লাভ হোল কী করে। তাঁর মানসিক ঔদার্য, পরিচ্ছন্নতা এবং সংস্কার মুক্ত বুদ্ধি এবং সমন্বয়ী জ্ঞানই এর কারণ বলে মনে হয়।

মুসলিম ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের লেখক শ্রদ্ধাশীল। আমাদের ঐতিহ্য আমাদের আত্মসম্মান জাগাবে; কিন্তু তাতে আমদের দৃষ্টিবোধ ও বিচারশক্তি অস্বচ্ছ হয়ে না যায় সে দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। বর্তমানের সঙ্গে যোগ না থাকলে, শুধু অতীতের স্মৃতি জাগিয়ে রাখলেই যে আমাদের মনে আত্মপ্রত্যয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাগবে এ কথা অবিশ্বাস্য। এক কথায়, অতীতের বর্তমান মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। আজকে ঘোলাটে অবস্থায় এরূপ সত্য বারবার আবৃত্তি করার অনেক সুফলতা। মানসিক উত্তেজনার বসে আপাতত তাকে কঠিন মনে হতে পারে। কিন্তু যিনি সত্যসন্ধ তাঁর কাছে ভাবালুতা প্রশ্রয় পায় না; বৈজ্ঞানিকের ও চিন্তাশীলের নিকট অনাবিল সত্য একমাত্র গ্রহণযোগ্য।

মুসলমানদের অনেক কঠিন কথা মোতাহার হোসেন শুনিয়েছেন। আপাতত মোহের বশে তা অপ্রীতিকর মনে হওয়া আশ্চর্য নয়, কিন্তু নবযাত্রারম্ভে এরূপ কঠিন কথা শোনার প্রয়োজনও ছিল। এ কথা এখানে বলা প্রয়োজন তিনি শুধু রূঢ় সত্যভাষী অননুকম্পায়ী বুদ্ধিবিৎই নন, তিনি হৃদয়বান। স্বসমজের দীনতায় ও দুর্বলতায় তাঁর অন্তরে গভীর আবেগের সঞ্চার হয় এবং এই দীনতা দুর্বলতা নিরসনের জন্য সমাজ হিতৈষণায় তাঁর চৈতন্য স্বতঃই উদ্বুদ্ধ। কবিসুলভ এই হৃদয়াবেগের ভারসাম্য ঘটিয়েছে তাঁর জ্ঞান, তাঁর প্রজ্ঞা, তাঁর বিশ্লেষণী বুদ্ধি। এবং এই অদ্ভুত সংযোগ যা অনেকের মধ্যেই নেই, তার ফলেই তাঁর রচনা একাধারে মর্মস্পর্শী ও লোকহিতৈষী। মুসলমানদের পারিবারিক জীবনে কী করে আনন্দ বর্ধন হবে এমন সব চিন্তাও তিনি করেছেন। আবার অন্যদিকে আর্ট-এর সংজ্ঞা সম্বন্ধীয় বিতর্কেও তিনি অবতরণ করেছেন। একমাত্র তরুণরা বয়োপ্রভাবেই কাজী সাহেবকে শ্রদ্ধার আসনে বসাতে পারেন। ছাত্রজীবনে বুদ্ধি ও জ্ঞানচর্চা আমাদের অবশ্য করণীয় এবং বয়োধর্মে প্রাণবস্তুটিও আমাদের নির্মল থাকারই কথা। তাই কাজী সাহেবের মানবতার বাণী একযোগে আমাদের মর্মস্পর্শী হবে এবং জ্ঞানের সঙ্গেও পরিচয় ঘটাবে। অর্থাৎ সঞ্চরণ-এর আবেদন অন্তরে যেমন ব্যাকুলতা জাগায়, চিন্তাবৃত্তিকেও তেমনি সুতীক্ষ্ণ করে তোলে। নবযুগের স্রষ্টা তরুণদের কাছে এর চাইতে আদরণীয় বস্তুর আর কী হতে পারে?

গ্রন্থের সুসম্বন্ধ ও সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে গেলে আমাদের কুলোবে না– কাজেই দীর্ঘ পরিচয় দেয়ার লোভ সম্বরণ করে পাঠকদের এইটুকু শুধু নিবেদন করছি যে, তাঁরা যদি গ্রন্থটির সাক্ষাৎ পরিচয় নিতে চেষ্টা করেন তবে কোন ক্রমেই নিজকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করবেন না এবং উল্টো আশ্চর্য হবেন যে, বিরূপ ও বিনাশী আবহাওয়ায় এরূপ প্রশান্ত প্রতিভার জন্ম কী করে সম্ভব হয়েছিল।

॥১৯৮১॥

–সৈয়দ নুরুদ্দিন (ফজলুল হক হলের বার্ষিকী কলাপী– ১৩৫১ থেকে গৃহীত)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যেন সেন প্রসঙ্গে

আমি সত্যেন সেনের মাত্র কয়েকখানি বই সামনে রেখে তাঁর সম্পর্কে কিছু কথা বলার চেষ্টা করছি; মহাবিদ্রোহের কাহিনী (১৯৫৮), আলবেরুণী (১৯৬৯), বাংলাদেশের কৃষকের সংগ্রাম (?) গ্রাম বাংলার পথে পথে (৩য় সংস্করণ; ১৯৭৪), মসলার যুদ্ধ (বাংলা ১৩৭৫), মানব সভ্যতার উষালগ্নে (১৯৭১), সীমান্ত সূর্য আবদুল গফফার খান (১৯৭৬), জীব বিজ্ঞানের নানা কথা (১৯৭৩), ইতিহাস ও বিজ্ঞান (১ম খণ্ড : ১৯৭৭), ইতিহাস ও বিজ্ঞান (২য় খণ্ড : ১৯৭৯), মনোরমা মাসিমা (১৯৭৩), প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ (১৯৭১)।

সত্যেন সেন প্রচলিত অর্থের সাহিত্যিক নন। তাঁকে একজন সাধারণ সাহিত্যিক হিসেবে যেমন আলোচনা করা যায় না, তেমনি তাঁর সকল গ্রন্থের হদিস কিংবা নির্ণয় করেও কোন একজন আলোচকের পক্ষে আলোচনা করা সহজ নয়।

সত্যেন সেনের জন্ম বাংলাদেশের বিক্রমপুরের সোনারং গ্রামে ১৯০৭ সালে। সত্যেন সেনের বয়স আজ ১৯৮০-তে ৭৩ বছর। সত্যেন সেন দৃষ্টিশক্তি প্রায় হারিয়েছেন। অন্ধের মতো তিনি দৈহিকভাবে অসহায়। ৭৩ বছরের বৃদ্ধ। তবু সত্যেন সেন এখনো সত্যেন সেন। এখনো প্রাণশক্তিতে উদ্যোগী কর্মী। তাই ১৯৭৭ সনে 'ইতিহাস ও বিজ্ঞান : ১ম খণ্ড' নামক যে পুস্তক তাঁর প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ভূমিকাকে সত্তর বছর বয়সে তিনি লেখেন : "ইতিহাস ও বিজ্ঞান চার খণ্ডে প্রকাশিত হবে। আমার মতো লেখকের পক্ষে এটা দুঃসাহসের কাজ। এ বিষয়ে সচেতন থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের বই-এর একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা মনে করে আমি এই কাজে হাত দিয়েছিলাম।...আমি প্রায়ন্ধ। অপরের সাহায্য ছাড়া লেখাপড়ার শক্তি আমি হারিয়েছি।"

সত্যেন সেন বিভাগ ভিত্তি করে গ্রন্থ রচনা করেননি। তবু তাঁর প্রকাশিত রচনাসমূহকে প্রকাশকগণ যখন বিভাগ করে তালিকাবদ্ধ করেন তখন দেখা যায় তাঁর উপন্যাস হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে ১৪ খানা গ্রন্থ যাঁর মধ্যে রয়েছে : অভিশপ্ত নগরী, পাপের সন্তান, আলবেরুণী, পুরুষ মেধ, কুমার জীব, বিদ্রোহী কৈবর্ত প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস। ছোটদের গ্রন্থে আছে পাতাবাহার, আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবী, এটমের কথা নামক তিনখানি গ্রন্থ। বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের ও আন্দোলনের স্মৃতিচারণ বা আলেখ্য হিসেবে রয়েছে আরো পাঁচখানা গ্রন্থ। সত্যেন সেনের গ্রন্থাবলি কোন একজন এবং কোন প্রখ্যাত প্রকাশক প্রকাশ করেননি। তাই একসঙ্গে তাঁর বই এর তালিকা পাওয়া দুষ্কর। আমি ব্যক্তিগতভাবে যে তালিকা প্রণয়ের চেষ্টা করেছিলাম তাতে অন্তত ২৮ খানা পুস্তকের নাম লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। পৃষ্ঠা সংখ্যায় আলবেরুণী ৩০৩, পাপের সন্তান ৩১২। ২৮ খানি বই-এর প্রত্যেক খানিকে গড়ে ২০০ পৃষ্ঠা হিসাবে ধরলেও তার মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়াবে ৫৬০০ পৃষ্ঠা। এ এক বিপুল সৃষ্টি সম্ভার।

সত্যেন সেনের জন্ম ১৯০৭ সালে। ছাত্রজীবন শেষ হতে না হতেই তাঁর জেল জীবনের শুরু। ১৯৩১ সালে তিনি রাজনৈতিক মামলায় গ্রেপ্তার হন। মুক্তির পর ১৯৩৩ সালে আর একটি রাজনৈতিক মামলায় জেলে যান। ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি রাজবন্দী হিসেবে আটক থাকেন এবং মুক্তির পরে বগুড়ায় গ্রামাঞ্চলে অন্তরীণ থাকেন। জেলে বসেই তিনি এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং মার্কসবাদকে জীবন দর্শন হিসাবে গ্রহণ করেন। ১৯৩৯ সাল থেকে '৪৯ সাল পর্যন্ত তিনি কৃষক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালে পুনরায় গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত কারাগারে আটক থাকেন। ১৯৫৪ সালে 'পুনরায় কারাবরণ করেন এবং '৫৫ সালে মুক্তি পান। ১৯৫৭ সালে তিনি 'মহাবিদ্রোহের কাহিনী' রচনা করেন। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর হতে '৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি কারাগারে ছিলেন।"

AMARBOI.COM

সত্যেন সেনের এই পরিচয়টি তাঁর 'মহাবিদ্রোহের কাহিনী'র ১৯৭১ সালের কোলকাতা সংস্করণের শেষ প্রচ্ছদে প্রকাশক কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণ থেকে তুলে দেওয়া হল এই কারণে যে, সত্যেন সেন নিজে কখনো কোন পুস্তকের ভূমিকায় বা কোন ভাষণে কি বক্তৃতায় নিজের জীবন কাহিনী বিস্তারিতভাবে বলেননি। সত্যেন সেনের নিজের জীবন কাহিনী একেবারেই অপ্রাপ্য।

সত্যেন সেন সম্পর্কে আমার কয়েকটি ব্যক্তিগত অনুভূতি আছে। তাঁর নিজের জীবন, আচরণ, শ্রম ও সৃষ্টি সম্পর্কে ভাবতে গেলে কয়েকটি ভাব আমাকে আলোড়িত করে।

লেখক ও পাঠকের একটি সাধারণ সম্পর্কে এই যে, পাঠক লেখককে তাঁর রচনার মাধ্যমেই জানেন। অনেক সময়ে লেখকের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে পাঠক থাকেন অপরিচিত। এবং এটাই স্বাভাবিক। লেখকের লেখার মাধ্যমেই লেখক সম্পর্কে একটি ভাবমূর্তি পাঠকের সৃষ্টি হয় সে, লেখক কবি হোন, কিংবা হোন প্রবন্ধকার বা গল্প অথবা উপন্যাসকার। সত্যেন সেনকে যে পাঠক আদৌ দেখেননি এবং ভবিষ্যতে যে পাঠক আদৌ দেখবেন না তিনি তাঁর বিচিত্র রচনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্য দিয়ে লেখক সত্যেন সেনকে কিভাবে অনুভব করেন কিংবা করবেন, তা আমি জানি না। ব্যক্তিগতভাবে আমি সত্যেন সেনকে সাহিত্যের মাধ্যমে পাইনি। বরঞ্চ বলা চলে : সত্যেন সেনের মাধ্যমে আমি তার সাহিত্যকে পেয়েছি। এ কথার দাবি এই নয় যে, আমি সত্যেন সেনকে জানি। সত্যেন সেনকে জানেন তাঁর নিকটতম আত্মীয় স্বজন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠতম রাজনৈতিক সহকর্মীবৃন্দ। আমি দীর্ঘকালের তেমন ঘনিষ্ঠতায় আসিনি সত্যেন সেনের, সে সুযোগ আমার ঘটেনি। তথাপি সত্যেন সেনকে আমি যখন দেখি ১৯৪০- এর দশকে, তখন তিনি একজন কমিউনিস্ট কর্মী এবং সাহিত্য সংগঠক। ঢাকা জিলা প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের তিনি অন্যতম সংগঠক ছিলেন। এ সংগঠনের নিয়মিত সভা আহ্বান, এর মুখপত্র প্রকাশ কিংবা প্রগতি লেখকদের সম্মেলনের আয়োজন এবং এর কোন সাহিত্য সংকলন প্রকাশ প্রচেষ্টার অনলস কর্মী ছিলেন সত্যেন সেন। কখনো নিজে আগ্রহ করে কোন গল্প কবিতা বা প্রবন্ধ এই সংঘে তিনি পাঠ করেছেন এমন কথা আমি স্মরণ করতে পারিনে। কিন্তু তাঁর একান্ত অনুরোধে এই সংঘের অনেক নূতন পুরাতন সংকোচ সম্পন্ন সাহিত্যানুরাগীকে যে তাঁদের নিজ নিজ সংকোচ কাটিয়ে গল্প, কবিতা বা প্রবন্ধ রচনা করতে হয়েছে, এ স্মৃতি আমার মতো সেই যুগের অপর যে কোন সাহিত্যিক বন্ধুরই রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু এ সাহিত্য সংঘও তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার কেন্দ্র ছিল না। জীবনবৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে, ১৯৩৯ থেকে '৪৯ সাল পর্যন্ত সত্যেন সেন যুক্ত ছিলেন ঢাকা জেলা এবং পূর্ব বঙ্গের কৃষক সংগঠন এবং কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে।

একজন মার্কসবাদী কর্মী ও সংগঠকের জীবনবোধই সত্যেন সেনের অন্তর্নিহিত জীবনবোধ। এক প্রখ্যাত শিক্ষিত ও সাহিত্যিক পরিবারের তিনি সন্তান। শান্তিনিকেতনের আচার্য এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম সহযোগী ক্ষিতিমোহন সেনের তিনি ভ্রাতুস্পুত্র। শিক্ষা ও পরিবেশগতভাবে সত্যেন সেনের ভাষা ও সাহিত্য ক্ষমতা প্রায় সহজাত। সে হিসাবে জীবনের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে যৌবনকালেই সত্যেন সেন সাহিত্যের যে কোন দিকে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করতে পারতেন। সেটা করাই স্বাভাবিক হত। কিন্তু পাকিস্তান পর্যায়ে জেলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সত্যেন সেন গ্রন্থাকারে কিছু রচনা করেছেন বলে আমার জানা নেই। কৃষক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার কালে তিনি কৃষকের জীবনের সমস্যা ও বেদনা নিয়ে অনুপ্রেরণা-দায়ক সঙ্গীত রচনা করেছেন। সে সঙ্গীতে নিজে সুর আরোপ করেছেন। কোন যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে নিজের ভগ্ন কিন্তু উদাত্ত কণ্ঠে কোন সম্মেলনের শুরুতে বা শেষ প্রয়োজনের তাগিদে নিজে সে গান গেয়ে শুনিয়েছেন। কিন্তু নিজের নামে কোন গান কিংবা কবিতার বই তিনি প্রকাশ করেননি। রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যেও এরূপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃষ্টান্ত বিরল নয় যে, যিনি সাহিত্য-ক্ষমতা সম্পন্ন। তিনি একদিকে যেমন নিজেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত রাখছেন, অপরদিকে সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমেও নিজেকে প্রকাশ করছেন। কিন্তু সত্যেন সেনের ক্ষেত্রে সেই দৃষ্টান্তটি পাওয়া যায় না। সত্যেন সেনের প্রধান জীবনবোধ : 'সংগ্রামী শ্রমজীবী মানুষের অগ্রগমনের জন্য যা প্রয়োজন আমার সাধ্যমতো তা আমি করার চেষ্টা করব।'— এই দর্শনই যেন সত্যেন জীবন ও সাহিত্য কর্মের প্রধান নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে।

এই জীবনবোধের মধ্যেই কেবল এই ঘটনার ব্যাখ্যা যে, সত্যেন সেন ১৯৫৭ সালের পূর্বে নিজের রচনার কোন পাণ্ডুলিপি তৈরি করেননি। এ জীবনবোধে এই ঘটনারও ব্যাখ্যা যে, পাকিস্তান পর্যায়ের পূর্ব পর্যন্ত সত্যেন সেন কোন গ্রন্থ রচনার চেষ্টা করেননি।

সমগ্র বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে অঞ্চল ও সমাজগত একাধিক বিভাগ ঐতিহাসিকভাবে বিরাজ করে আসছে। সমাজতান্ত্রিক কর্মীর প্রয়োজন এই বিভাগগুলিকে শ্রমজীবী মানুষের চেতনার বিকাশের স্বার্থে আত্যন্তিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও স্বীকার করা, তাকে উপেক্ষা করা নয়। এই সমস্ত আঞ্চলিক, সাম্প্রদায়িক ও ঐতিহাসিক বিভাগের কারণেই বাংলার শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে চেতনার ক্ষেত্রেও নানা তারতম্য বিরাজ করছে। শ্রমজীবী মানুষের চেতনার বিকাশকে সাহায্য করার জন্যই সমাজতান্ত্রিক কর্মীর এই বিভাগের এই পরিচয় ও স্বীকৃতি আবশ্যক। এই বিভাগের অন্যতম বিভাগ হচ্ছে হিন্দু ও মুসলমান হিসাবে সমাজের বিভাগ। এই বিভাগকে মূলধন করে সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বাংলাকে বিভক্ত করেছে; ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয়তার আবেগ সৃষ্টি করেছে এবং পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই বিভাগের আন্দোলন ও অস্তিত্বের কারণে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে; নিজের জমি ও ভিটা থেকে অসংখ্য হিন্দু ও মুসলমানের বাস্তুত্যাগ সংঘটিত হয়েছে। এ আলোড়ন মধ্যবিত্ত সমাজকেও আলোড়িত করেছে। ঢাকা ও পূর্ববঙ্গের হিন্দু মধ্যবিত্ত কেরানি, কর্মচারী, শিক্ষক, অধ্যাপক, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক কর্মীকে পূর্ববঙ্গ পরিত্যাগ করতে হয়েছে। নানা আর্থিক ও মানসিক কষ্টের মধ্য দিয়ে প্রত্যেক বাস্তুত্যাগীকে তার বস্তুভিটা ও কর্মক্ষেত্রকে ত্যাগ করতে হয়েছে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট কর্মী পরিবার ও সমাজ বহির্ভূত কোন প্রাণী নয়। পূর্ববঙ্গের অনেক হিন্দু মধ্যবিত্ত মার্কসবাদী রাজনৈতিক কর্মীকে জেলে আটক থাকা অবস্থায় কিম্বা জেলের বাইরে থেকেও দেশত্যাগ করতে হয়েছে। যাঁরা এরূপে দেশত্যাগ করেছেন তাঁরা এটা অবস্থার চাপে বাধ্য হয়েই করেছেন। এটা আদর্শচ্যুতি বা রাজনীতিক কোন অপরাধের ব্যাপার ছিল না। তবু এই কর্মীদের মধ্যে যাঁরা তাঁদের সমগ্র আত্মীয় স্বজন পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করা সত্ত্বেও নিজেরা পূর্ববঙ্গ ত্যাগ না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার আপ্রাণ এবং অনেকে আ-মৃত্যু চেষ্টা করেছেন তাঁরা তাঁদের আদর্শ ও কর্মক্ষেত্রকে ভালোবাসার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

সত্যেন সেনের মধ্যেও তাঁর প্রত্যক্ষ কর্মক্ষেত্রকে, সেই কর্মক্ষেত্রের কৃষক মজুর মধ্যবিত্তকে আত্মীয়ের অধিক ভালোবাসার এক আবেগের প্রকাশ দেখা যায়। সত্যেন সেন আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তাঁর নিজ কর্মক্ষেত্র ঢাকা এবং পূর্ববঙ্গকে শক্তির শেষ অবধি পরিত্যাগ না করতে। চোখের দৃষ্টি হারিয়েছেন। অপরের সাহায্য ব্যতীত এক স্থান থেকে অপর স্থানে যাতায়াত করতে পারেননি। তবু নিজের আত্মীয় স্বজন যাঁরা ইতিপূর্বে পশ্চিমবঙ্গে চলে গেছেন এবং যাঁদের কাছে গেলে যত্ন ও তত্ত্বাবধানের অধিকতর নিশ্চয়তা সম্ভব ছিল তাঁদের কাছে তিনি যাননি। কেবলমাত্র ১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চের পরে পাকিস্তান বাহিনীর চরম ও ব্যাপক আক্রমণের পর্যায়েই সত্যেন সেনকে তাঁর সতীর্থরা বাধ্য করতে পেরেছেন তাঁর প্রিয় পরিচিত কর্মস্থল ঢাকাকে পরিত্যাগ করতে।

পাকিস্তান পর্যায়ের পূর্ব পর্যন্ত সত্যেন সেন যে সাহিত্যের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করতে চাননি সে হয়ত তাঁর সঙ্কোচ ও বিনয়-মণ্ডিত এই বোধের কারণে যে, বৃহত্তর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে কতো উপযুক্ত সাহিত্যকর্মী রয়েছেন। তাঁরাই সাহিত্য ক্ষেত্রের প্রয়োজন পূরণ করবেন। কিন্তু পাকিস্তান পর্যায়ে শোষিত শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে জ্ঞান ও চেতনা বিকাশে নিবেদিতপ্রাণ সত্যেন সেন নিজের সঙ্কোচ ও বিনয়সত্ত্বেও একথা আর অস্বীকার করতে পারলেন না যে, যে দায়িত্ব তিনি বৃহত্তর বাংলা এবং তার বৃহত্তর সাংস্কৃতিক শিক্ষাগত সমাজে পালন না করে পেরেছেন সে দায়িত্ব পূর্ববঙ্গে তাঁকে পালন করতে হবে। পাকিস্তান পর্যায়ে পূর্ববঙ্গের প্রধান সমাজ মুসলিম সমাজ। এই মুসলমান সমাজের কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের সন্তানদের মধ্যে মানব সমাজের অগ্রগতির স্বপ্ন ও বিশ্বাসের বীজ বপন করতে হবে। তাদের মধ্যে মানুষের সমাজ, ইতিহাস ও সংগ্রামের সকল জ্ঞানকে বিস্তারিত করতে হবে। তুলনামূলকভাবে পূর্ববঙ্গের এই মুসলমান সমাজ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐতিহ্যে ও সম্ভারে পশ্চাৎপদ। এ সমাজের এই প্রয়োজন এই সমাজকে যে সবচেয়ে ভালোবাসে সে ব্যতীত অপর আর কে পূরণ করবে। ভালোবাসার পরীক্ষার এই দাবি পূরণের প্রকাশ হিসাবে এসেছে সত্যেন সেনের মধ্যে এই প্রতিজ্ঞা : 'পূর্ববঙ্গের শ্রমজীবী মানুষের মানসিক যে কোন চাহিদা পূরণের চেষ্টা আমার সাধ্যমতো আমাকে করতে হবে। তাই কারাগারে বসেই তিনি ১৮৫৭-র বিদ্রোহের কাহিনীর মালমশলা যথাসাধ্য অধ্যায়ন ও সংগ্রহ করে রচনা করলেন 'মহাবিদ্রোহের কাহিনী'। এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে। এ রচনা সত্যেন সেনের জীবনবোধের ধারণা ব্যতিরেকে আকস্মিক বলে বোধ হতে পারে। অপরদিকে তাঁর জীবনদর্শনের এই পটভূমিতে সত্যেন সেনের এ প্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনিবার্য ছিল। এ কারণেই কেবল যে সত্যেন সেনের সকল গ্রন্থ পাকিস্তান ও বাংলাদেশ পর্যায়ে রচিত হয়েছে, তাই নয়। সত্যেন সেনের সাহিত্যের বৈচিত্র্যও এই দর্শন দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। 'মহাবিদ্রোহের কাহিনী' রচনা করেছেন এই প্রতীতি থেকে যে, মানুষের মহৎ বিদ্রোহের কাহিনী দিয়ে অগ্নিগর্ভ পূর্ববঙ্গের নবজাত মধ্যবিত্তকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, এই মধ্যবিত্তের মধ্যে জ্ঞানের অপরাজেয় প্রেমকে জাগরিত করতে হবে। এই বোধ থেকেই সত্যেন সেন 'আলবেরুণী'র মতো ঐতিহাসিক উপন্যাস তৈরি করেছেন। প্রেম ভালোবাসার চিরায়ত অনুভব যা সময় সম্প্রদায় জাতি ধর্ম ও কালকে অতিক্রম করে যায় তাকে আমাদের চেতনার অঙ্গ করার জন্য তিনি রচনা করেছেন 'অভিশপ্ত নগরী', 'পাপের সন্তান', 'পুরুষমেধ'-এর ন্যায় চিরায়ত চরিত্রের উপন্যাস। নির্যাতিত মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ও সংঘবদ্ধ সংগ্রাম ও বিদ্রোহের কাহিনী আমাদের সামনে তুলে ধরার জন্য তৈরি করেছেন 'বিদ্রোহী কৈবর্ত', 'বাংলাদেশের কৃষকের সংগ্রাম', 'গ্রামবাংলার পথে পথে'। নিবেদিতপ্রাণ কর্মীর জীবনকে আদর্শ হিসাবে তুলে ধরার জন্য রচনা করেছেন 'মনোরমা মাসিমা' এবং 'সীমান্ত সূর্য আবদুল গফফার খান'।

সত্যেন সেন কখনো দাবি করেননি, তিনি বিজ্ঞানী। জীবন বৃত্তান্তে আমরা জানি যে, কারাগার থেকে তিনি মানবিক কোন শাখাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ডিগ্রি গ্রহণ করেছেন। শিক্ষার কোন পর্যায়ে বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় ছিল কেবল এ কারণেই নয়, বিজ্ঞানের জ্ঞানবাদে আজকের মানুষ অগ্রসর হবে কী প্রকারে? নতুন সমাজ তৈরির অন্যতম হাতিয়ার মানুষেরই আবিষ্কৃত নানা জ্ঞান-সূত্র : বিজ্ঞান। 'সেই বিজ্ঞানের সঙ্গে শুধু শিক্ষাগারের মধ্যে নয়, শিক্ষাগারের বাইরে বৃহত্তর শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানুষকে : ছোট বড় সকলকে পরিচিত করিয়ে দিতে হবে। তার দায়িত্ব আমি যতটুকু পারি ততটুকু পালন না করে নিষ্কৃতি পাব কেমন করে?' এই প্রশ্নের আমোঘ জবাব হিসাবে তিনি রচনা করেছেন কিশোর এবং বয়স্কদের জন্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন বই : আমাদের এই পৃথিবী, জীব বিজ্ঞানের নানা কথা, এটমের কথা, আইসোটোপের কথা এবং মানব সভ্যতার উষালগ্নে দৃষ্টিশক্তি যখন হারিয়ে ফেলেছেন, শারীরিক দুর্বলতা ও রোগ যখন আরো বৃদ্ধি পেয়েছে সেই সত্তর উর্দ্ধকালেও সত্যেন সেন তাই পরিকল্পনা করেন ইতিহাসকে বিজ্ঞান কিভাবে অগ্রসর করে নিয়ে চলেছে তাকে তুলে ধরার জন্য ইংলন্ডের নিবেদিতপ্রাণ সমাজ ও বিজ্ঞান কর্মী জে. ডি. বারনাল-এর 'সায়েন্স ইন হিস্টরি'র আদর্শে 'ইতিহাস ও বিজ্ঞান'কে খণ্ডক্রমে রচনা ও প্রকাশ করার।

সত্যেন সেন বই-এর বৃহত্তর বাজার কোলকাতায় অপরিচিত নন। সে বাজারের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রকাশকদের পক্ষ থেকে তাঁর রচনাবলি প্রকাশের আগ্রহই স্বাভাবিক। কিন্তু সত্যেন সেনের কোন গ্রন্থ ঢাকা ও পূর্ববঙ্গ ব্যতীত অপর কোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থানের কোন প্রকাশক দ্বারা প্রকাশিত হয়নি। সত্যেন দর্শনের এও এক পরিচয়। পূর্ববঙ্গকে ছেড়ে যেতে বিভিন্ন কারণে তিনি বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গের জন্যই তাঁর মানসলোকের সকল সৃষ্টি। সে সৃষ্টি পূর্ববঙ্গের প্রকাশক দ্বারা প্রকাশিত হলেই মাত্র ঢাকা ও পূর্ববঙ্গের পাঠক সাধারণের দরবারে সহজভাবে পৌঁছতে পারবে, কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হলে নয়। এ কারণে কোলকাতা বা শান্তিনিকেতনে এই বৃদ্ধ বয়সে থাকতে বাধ্য হলেও সত্যেন সেন গ্রন্থ রচনা করেন পূর্ববঙ্গের জন্য আর সে গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য দেন ঢাকার 'কালি কলম', 'প্রকাশ ভবন' বা 'খান ব্রাদার্স' প্রকাশনীকে। এ যেন নির্বাসিত দেশপ্রেমিকের তার প্রিয় স্বদেশবাসীর জন্য দূর থেকে প্রেরিত ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য। পূর্ববঙ্গের প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকরা সত্যেন সেনের গ্রন্থ প্রকাশের জন্য যত না পেয়েছেন তার অধিক পেয়েছেন তুলনামূলকভাবে অপরিচিত এবং আর্থিকভাবে দুর্বল কিংবা নূতন প্রকাশক। এখানেও দুর্বলের প্রতি, নূতনের প্রতি তাঁর দুর্বলতা।

সংখ্যাগতভাবে সত্যেন সেন যত গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং সত্যেন সেনের গ্রন্থের ভাষা ও প্রকাশের প্রাঞ্জলতা, মাধুর্য এবং পাঠকের মনে তার যে অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ তাতে সত্যেন সেনের কোন গ্রন্থ অবিক্রিত থাকেনি। একাধিক গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এমন জনপ্রিয় গ্রন্থকারের গ্রন্থ বিক্রি থেকে অর্থ লাভের হিসাব করেননি। তাঁর গ্রন্থ জ্ঞানের আকর। সে জ্ঞান তিনি পরিবেশন করেছেন তার প্রিয় মাতৃভূমি মুক্তিকামী মানুষের মুক্তির জন্য। জ্ঞান বিক্রয়ের জন্য নয়। বিতরণের জন্য। 'অর্থময়' পরিবেশে এমন অর্থহীনতার আদর্শ প্রচারেও সত্যেন সেন অনন্য। সত্যেন সেনের গ্রন্থের প্রকাশকদের কাছে সত্যেন সেনের একমাত্র দাবি, তাঁর প্রকাশিত রচনার বিক্রয়মূল্য যেন যেন যথাসম্ভব কম ধার্য করা হয়, যেন তা যথাসম্ভব অধিক সংখ্যক ক্রেতার হাতে পৌঁছতে পারে, যেন তাঁদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকে। তাই সত্যেন সেনের গ্রন্থের মূল্য এরূপ গুরুত্বপূর্ণ যে, কোন গ্রন্থের চেয়েই আজকের বাজার ও পরিবেশে অবিশ্বাস্য রকমে কম।

সত্যেন সেন যে তাঁর সব গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করেছেন তা নয়। প্রায় গ্রন্থেই তার নিজের কোন ভূমিকা নেই। কেবল আলবেরুণী, মনোরমা মাসিমা এবং 'ইতিহাস ও বিজ্ঞান'-এর প্রকাশের ক্ষেত্রে কিছু নিবেদন আছে। এর মাধ্যমে সত্যেন সেন হয় এ গ্রন্থ লেখার উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন কিংবা বিনয়ের সঙ্গে নিজের অক্ষমতার উল্লেখ করেছেন। মা উপন্যাসের প্রথমে কিছু না লিখে তিনি উপন্যাস শেষে, ১৯৭০ সনে যখন তাঁর বয়স ৬৩ অতিক্রম করছে এবং দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হয়েছে, তখন লিখেছিলেন : দৃষ্টিহীনের এই প্রথম নিবেদন নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। লেখা আমার পেশা, আমার জীবিকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্জনের একমাত্র পথ। কিন্তু সেটাই একমাত্র কথা নয়। তার চেয়েও বড় কথা, লেখার মধ্য দিয়ে আমি জনসাধারণের জীবনচিত্র সবার সামনে তুলে ধরতে এবং তাদের সংগ্রামে-সঙ্কুল অগ্রগতির পথে শরীক হতে চেষ্টা করি। দৃষ্টিশক্তি হারাবার ফলে সেই পথে এক দুর্লংঘ বাধার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তা হলেও সেই বাধাকে ঠেলে ঠেলে পথ করে নিয়ে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে। থামবার কথা আমি ভাবতে পারি না। আমি আপনাদের কাছ থেকে আমার জন্য সহৃদয় সহানুভূতি আর শুভেচ্ছা কামনা করি।

এমন বিনয়ী আর দৃপ্ত ঘোষণা পুস্তকের সামনের পৃষ্ঠাতেই শোভা পেত। কিন্তু বিনয়ী সত্যেন সেন যেন অনেক সঙ্কোচের সঙ্গে তাকে কাহিনীর শেষে শেষ পৃষ্ঠাতে লিখে দিয়েছেন। মনে হচ্ছে, তিনি ভাবতে পারছেন না যে, তাঁর দৃষ্টিশক্তির অক্ষমতা বা সীমাবদ্ধতার কৈফিয়ৎ সামনে রেখে কেউ তাঁর রচনাকে পাঠ করবে এবং সে কৈফিয়ৎ দ্বারা প্রভাবিত হবে।

সত্যেন সেন তাঁর অনেক বইতেই ভূমিকা লেখেননি। কিন্তু তাঁর কোন গ্রন্থই তিনি উৎসর্গবিহীন রাখেন নি। এটি তাঁর সাহিত্যকর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

গ্রন্থাকার সাধারণত তাঁর গ্রন্থকে কারুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। এমন আচরণের মানসিক ভাবটিকে আমরা বুঝতে পারি। সে ভাবটি এই যে, লেখক যাকে শ্রদ্ধা করেন, সম্মান করেন, যাকে ভালোবাসেন বা স্নেহ করেন তার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান বা ভালোবাসা প্রকাশের স্মারক হিসাবে তাঁর সাহিত্যকর্মকে কোন বিশেষ লোকের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। অনেক সময়ে কোন লেখক লোকান্তরিত কারুর উদ্দেশ্যেও তাঁর গ্রন্থ নিবেদন করেন। এবং সাধারণত লেখক তাঁর নিকট ও আত্মীয়স্বজনের উদ্দেশ্যেই তাঁর গ্রন্থ উৎসর্গ করবেন, এটাই স্বাভাবিক। সত্যেন সেন তাঁর গ্রন্থের অধিকাংশ উৎসর্গ করেছেন হয় সমাজবিকাশের আন্দোলনে উৎসর্গীত কোন কর্মীর নামে, নয়ত পরিচিত কোন কর্মীর কোন কিশোর সন্তানের নামে। কয়েকখানি গ্রন্থের উৎসর্গকে এখানে উল্লেখ করা গেল : আল-বেরুণী গ্রন্থকে উৎসর্গ করেছেন সেজদা ও প্রতিমা বৌদিকে, মহাবিদ্রোহের কাহিনীকে সুধীর ও কাঞ্চন বৌদিকে, মনোরমা মাসিমাকে আমাদের ইদু ভাইকে, রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণকে আমার চারুদিকে, পাপের সন্তানকে ওয়াহিদুল আর সানজিদাকে, মাকে উৎসর্গ করেছেন 'বেগম সুফিয়া কামালকে', তালুকদার'কে 'স্নেহের মনিলা'কে', 'বাংলাদেশের কৃষকের সংগ্রামকে 'কৃষক নেতা' গুরুদাস তালুকদারকে', প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশকে উৎসর্গ করেছেন। অনুজপ্রতিম অজয় রায়কে'; 'আমাদের এই পৃথিবী'কে উৎসর্গ করেছেন পার্থ ও রুচিরাকে', ইতিহাস ও বিজ্ঞান-এর ১ম খণ্ডকে জহুর ভাই ও মনি বোনকে এবং গ্রন্থের ২য় খণ্ডকে উৎসর্গ করেছেন পান্না কায়সারকে; গ্রামবাংলার পথে পথে'কে কৃষক নেতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতেম আলী খানকে। যার নামে উৎসর্গ করেন গ্রন্থকার তাঁর কাছে গ্রন্থকারের কৃতজ্ঞতার একটা দিক থাকে। সত্যেন সেন উদ্দিষ্ট চরিত্রতা হচ্ছেন জীবন ও সংগ্রামের মানুষ, তার কর্মী ও সৈনিক এবং আগামী দিনের আশার বাহক কিশোর কিশোরী। এদের প্রতি তাঁর আসীম ভালোবাসার ও কৃতজ্ঞতা। কিন্তু তাঁর উৎসর্গের অপর যে দিকটি আমাকে চমকিত করেছে সে হচ্ছে এই যে, সত্যেন সেন যাঁদের নামে তাঁর সৃষ্টিকে উৎসর্গ করেন তাঁদেরকে এক সামাজিক দায়িত্বে আবদ্ধ করারও যেন তিনি প্রয়াস পান। যে কর্মী সত্যেন সেনের পুস্তকে উৎসর্গের পৃষ্ঠায় উদ্দিষ্ট হন তিনি এই আবেগে উদ্বুদ্ধ না হয়ে পারেন না যে, সত্যেন সেন তাঁকে তাঁর উৎসর্গ দ্বারা জীবনের দায়িত্ব পালনে অধিকতর উৎসর্গপ্রাণ হতেই আহ্বান জানাচ্ছেন। আর তাই তাঁর উৎসর্গের দুটি কিংবা একটি শব্দের পৃষ্ঠাটিও সত্যেন দর্শনেরই এক বিশিষ্ট স্মারক বলে আমার নিকট বোধ হয়।

সত্যেন সেন সাহিত্যকর্মের জন্য সাহিত্য করেন নি। সংগ্রামী জীবনের দায়িত্ব পালনের জন্য সাহিত্যে নিয়োজিত হয়েছেন। আর সেই দায়িত্ব পালনে তাঁর যে প্রয়াস ও সাফল্য তা আমাদের জন্য একটি অনন্য ও বহুমাত্রিক সাহিত্য-সংস্কৃতির মণ্ডলকে সৃষ্টি করেছে। সত্যেন সাহিত্যের এ মণ্ডলের আলোচনা ও বিশ্লেষণ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা এবং সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ যেকোনো কর্মী, লেখক ও পাঠকদের জন্য অপরিহার্য।

॥১৯৮১॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন প্রাক্তন রাজবন্দীর ডায়রী

কয়েকদিন যাবতই খাতাটি নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। বুঝতে পারছিনে খাতাটি নিয়ে কী করব। এর শেষে পৃষ্ঠাগুলো প্রায় ছিঁড়ে গেছে। প্রথম পৃষ্ঠাতে কয়েকটি সিলমোহর আছে। একটি সিলমোহর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সুপারিনন্টেডেন্টের; আর একটি সিলেট জেলের। এবং তৃতীয়টি কুমিল্লা জেলের। সিলমোহরের প্রথম তারিখটি হচ্ছে ২৮-৫-৫০। তার মানে আজকের এই ১৯৮১ সন থেকে ত্রিশ বছরেরও আগের তারিখ। খাতাটি সেদিনকার একটি তরুণ রাজবন্দীর নামে জেল কর্তৃপক্ষ পাস করেছিলেন। জেলের অভ্যন্তরে কর্তৃপক্ষের নিয়ম কানুন মেনে রাজবন্দী যদি কিছু টুকিটাকি লিখতে চায় তার জন্য রাজবন্দীর নিজের পকেট খরচে লেখার কিছু সাজসরঞ্জাম কেনার অনুমতির চিহ্ন এটি। রাজবন্দীটির নাম ছিল সরদার ফজলুল করিম।

আমার বিস্ময় আমার বর্তমান নামের সঙ্গে এই নামটির মিলের কারণে যেমন তেমনি খাতাটির এত বছর বয়স হওয়া, এত বছর পর্যন্ত রক্ষিত হওয়া এবং পরিশেষে আমার হাতে এসে এর পৌঁছার কারণেও বটে।

নামের মিলে কী এসে যায়। আমি তো মনে করি বর্তমানের ব্যক্তিই মাত্র ব্যক্তি। একটি ব্যক্তি তার বর্তমান মুহূর্তটিতেই মাত্র আমি বা সেই মুহূর্তটিকেই মাত্র আমার বলে দাবি করতে পারে। অর্থাৎ বর্তমানের আমিই আমি। অতীতের আমি তো সে। বর্তমানের আমি এ কাজ না করে সে কাজ করতে পারি। আজ অফিসে না যেয়ে ঘরে বসে থাকতে পারি। স্ত্রী পুত্র কন্যাদের কোন কাজ করা, না করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারি। এমনকি সামাজিক রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে ডানের কিংবা বামের উপাদান হিসাবে যুক্ত হতে পারি। মোটকথা বর্তমানেই আমি কিছুটা ব্যক্তিত্বময়, আপেক্ষিকভাবে কিছুটা স্বাধীন। কিন্তু গতকালের আমির উপর তো আমার কোন কৃর্তত্ব নেই, কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। গতকালের আমি যদি কাপুরুষ হয়ে থাকি তাহলে বর্তমানের বীরপুরুষ আমি গতকালের আমিকে পরিবর্তিত করে দিতে পারিনে। আর গতকালের আমি যদি বীরপুরুষ থেকে থাকি তবে বর্তমানের কাপুরুষও তাকে নিয়ে গর্ব করতে পারে না। তেমন দাবিতে কোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাভ নেই। কিন্তু ত্রিশ বছর আগের এই খাতাটির উপর যার নাম লেখা আছে তার সঙ্গে বর্তমানের আমার নামের যে মিল তার কাপুরুষতা, বীরপুরুষতা নিয়ে আমি কথা তুলছিনে। আমার কথা হল, অতীত বর্তমানের আওতার বাইরে। কিন্তু এমন করে কথা বললে একটা চরম সিদ্ধান্ত এসে যায় যে, তাহলে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের কোন সম্পর্ক নেই। বর্তমান যেমন ইচ্ছা তেমন করতে পারে। অতীত যাই হোক না কেন, বর্তমান স্বাধীনভাবে ডাইনে কিংবা বাঁয়ে ঘুরতে পারে। কিন্তু জীবন প্রবাহের দ্বান্দ্বিকতা এমনটি হতে দেয় না। বর্তমানও একেবারে স্বাধীন নয়। অতীত বর্তমানের আওতার বাইরে বটে, কিন্তু বর্তমান অতীতের আওতায় বাইরে নয়। অতীতের মধ্য দিয়েই বর্তমানের আগমন। সে দিক থেকে বর্তমানের সঙ্গে তার বাঁধন, বন্ধন। সে কারণেই ত্রিশ বছর আগের এই খাতাকে বর্তমানের জন্য, এবং সে কেবল বর্তমানের একই নামধারী আমার জন্য নয়,– সকলকে নিয়ে যে বর্তমান তার জন্যও তাৎপর্যহীন নয়। এবং এ কারণেই, খাতাটি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় বলেই, তাকে একেবারে বাতিল করে দিতে পারিনে।

কিন্তু এর রক্ষিত হওয়ার কথাই আগে বলে নিই। রক্ষিত হওয়ার ব্যাপারটিও আমাকে চমৎকৃত করেছে। এ খাতা আমার স্মৃতির মধ্যে আদৌ ছিল না। প্রথম দফায় প্রায় ছ বছর বন্দী থাকার পরে কখন আমি মুক্তি পেয়েছিলাম এবং তখন আমার সঙ্গে বন্দী নিবাসের লিখিত খাতাপত্র কি ছিল তা প্রায় ত্রিশ বছর পরে আমার কিছুই স্মরণে নেই। কিন্তু চমকে উঠলাম হঠাৎ কয়েকদিন আগে যখন স্নেহভাজন ভাগ্নে আলমগীর বলল, 'মামা, আপনার জেলখানার একটি খাতা আছে আমার কাছে।' কথাটি শুনে দুর্বোধ্যতার জিজ্ঞাসা নিয়ে তার দিকে তাকাতে ভাগ্নেটি বলল, 'আব্বা মারা যাবার কিছুদিন আগে আমাকে দিয়েছিলেন আপনার কথা বলে যে, এ খাতাটি আপনাকে যেন পৌঁছে দিই।' কথা কয়টি শুনে আমার চোখের পলক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পলকহীন দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠেছিল আমার ভগ্নিপতি জনাব ওফাজ উদ্দীন সাহেবের ছবিটি। রাশভারী মানুষ। আমার তো মুরুব্বী বটেই। সারাজীবন একাগ্রভাবে শিক্ষকতা করেছেন। বরিশালের এ. কে. স্কুলের শিক্ষক। কোন অহংকার করেন নি তা নিয়ে। কোন আফসোসও করেন নি। তাঁর আফসোস ছিল আমাকে নিয়ে।

ত্রিশ বছর আগের কথা। মুরুব্বীজনরা দৈনন্দিন জীবনযাপন করেন। নিয়মের জীবন। রাষ্ট্রানুগত্যের জীবন। তাঁদের স্নেহভাজন আমার সম্পর্কে তাঁদের আর কিছু বেশি আশার না থাকলেও এ আশা ছিল যে, দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারের টাকা পয়সা খরচ করে লেখাপড়া শিখে স্বাভাবিক সাংসারিক জীবন আমি যাপন করব। আজকের কথা বলে লাভ নেই। কিন্তু সেদিন সেই আশাটি মুরুব্বীদের পূরণ হয়নি। তাতেই তাঁদের আফসোস। তাঁদের দুঃখ, তাঁদের সংসারেরই একজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেলাইনে চলে গেল। জীবনটা নষ্ট করে দিল পুলিশের হুলিয়ার নিচে আর জেলের বন্দীত্বে। কিন্তু বেলাইনে চলার জন্য আফসোসের পেছনেও এমন মুরুব্বীদের যে স্নেহও ছিল বেলাইনের কেবল বিরোধিতা নয় কিছুটা গৌরব বোধও যে ছিল 'যাকনা বেলাইনে! ডাকাত তো নয়। দেশের জন্য, দশের জন্যইতো বেলইন'–সে বোধের প্রকাশ বেলাইনের সেদিনকার যাত্রী আমার জেলখানার এই খাতাটির এমন সযত্ন রক্ষণের মধ্যে যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমন তাঁদের জীবনযাপনের কোন আচার আচরণে প্রকাশ পায়নি।

অল্প বয়স্ক তরুণ ইনজিনিয়ার ভাগ্নের সঙ্গে আমার বয়সের ব্যবধার অনেক, যেমন বয়সের ব্যবধান ছিল তার পিতার সঙ্গে আমার। বয়সের ব্যবধান মানে যুগের ব্যবধান। আর এই ব্যবধানকে অতিক্রম করে যুগ যুগের সঙ্গে কথা বলতে পারে না। একটা অপরিচয়ের সঙ্কোচ তাদের উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। তরুণ ভাগ্নেকেও নিজের মনের ভাবটি সেদিন প্রকাশ করে বুঝাতে পারিনি। তার কাছ থেকে খাতাটি নিয়ে আসার পর থেকে কেবল তাকে নাড়াচাড়া করছি আর ভাবছি, একে নিয়ে কী করি?

করার সত্যি কিছু নেই। ত্রিশ বছর এটিকে রক্ষা করা হয়েছে। যিনি রক্ষা করেছিলেন তাঁর আর কিছু না থাক তাঁর বয়সের অপর তীরবাসী এই রাজবন্দীর জন্য স্নেহ-সহানুভূতি ছিল। কিন্তু এ কালের বর্তমানের সেকালের বন্দীর জন্য অনুরূপ কোন মমতা বা সম্পর্ক বোধ আছে কিনা তা নিশ্চয় করে আজ বলা যায় না। আর তাই পুরোন দিনের এমন ছেঁড়াখাতা শুধু আমার নয়, দ্রুত বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে, লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বর্তমানের জীবন থেকে।

এ খাতা বিনষ্ট হয়ে যাক তাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি কিছু নেই। কিন্তু খাতাটি নাড়তে নাড়তে ত্রিশ বছর আগেকার এই খাতাটির মধ্যে আভাসিত জীবনের জন্য আমার আবার কৌতূহল জেগে উঠছে, একটা মমতা বোধ হচ্ছে, এমন কি একটা ইচ্ছা আহা যদি ফিরে যেতে পারতাম সে দিনগুলোতে!

দিনগুলো খুব আরামের ছিল না। কিন্তু স্বপ্নের ছিল। রোমান্টিক স্বপ্নের। বলা চলে অবাস্তব স্বপ্নের। কিন্তু এটা তো সত্য যে, অবাস্তব স্বপ্ন বাদে নিরেট বাস্তব পরিবর্তিত হতে পারে না।

এত ক্ষুদ্র আণবিক অক্ষরে কাগজের পৃষ্ঠায় কেউ লিখতে পারে? বিস্ময়ের ব্যাপার। রুলটানা খাতা। কিন্তু একটি লাইনের মধ্যে অন্তত তিন লাইনের লেখা। কাজেই এক খাতায় তিন খাতার বিষয়বস্তু। কেবল তিন খাতা নয়। কোথায়ও প্রথমে পেনসিলের লেখা। তারপরে পেনসিলের উপর আবার কালির লেখা। বুঝা যায় আতঙ্ক আছে মনে, পাছে আর একটি খাতাও কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করতে না দেয় জেলের ভেতরে। তাই সম্ভব মতো সব রকম চেষ্টা, যেন এক খাতাতেই তিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাতার প্রয়োজন মেটানো যায়। যা কিছু লেখা তার বেশির ভাগ সেই সময়কার জাতীয় আন্তর্জাতিক ঘটনার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ। বন্দীশালার কর্তৃপক্ষ চাচ্ছে যেন রাজবন্দী বন্দীশালার বাইরের জীবনের গতিটা উপলব্ধি করতে না পারে। যেন তার জীবনটা একেবারে গতিহীন হয়ে যায়। কিন্তু গতিহীন জীবনই তো ভবিষ্যৎহীন। কিন্তু রাজবন্দী তো দেশের ও দশের মহত্তর ভবিষ্যতের জন্যই বন্দীত্বের এই জীবনকে বরণ করেছে। আর তাই তার প্রাণান্তকর চেষ্টা, দেয়ালবদ্ধ গতিহীন বন্দী জীবনে বসেও বাইরের অনিরুদ্ধ গতির জীবনকে আঁচ করার। তারই স্মারক হিসাবে জাতীয় আন্তর্জাতিক ঘটনার, সংক্ষিপ্তাকারে হলেও, লিপিবদ্ধ বিবরণী। একটি ছত্রে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে : রিভিউ অব দি ইন্টারন্যাশনাল সিটুয়েশন অব এ ফোরর্টনাইট আপুট টুয়েনটিসিকথ ফেব্রুয়ারি, নাইনটি ফিফ্‌টি; ১৯৫০-এর ২৬শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পূর্ব পক্ষের আন্তর্জাতিক অবস্থান পর্যালোচনা।

এ কেবল ব্যক্তিক ইচ্ছার ব্যাপার নয়। সেদিন মানে ত্রিশ বছর আগে পূর্ব বাংলার জেলে সরকারের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে গিয়েছিল বামপন্থি বা কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন রাজনৈতিক কর্মীরাই। তাদের সংখ্যাও কম ছিল না। সমগ্র পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলে কয়েক সহস্র। পূর্ব বাংলার এমন কোন জেল ছিল না যে জেলে রাজবন্দী ছিল না। পাকিস্তানের মুসলিম লীগ সরকার ১৯৪৭-এর পরবর্তী কালেই বুঝতে পেরেছিল, সামাজিক পরিবর্তনের কথা সেদিন বলার নেতৃত্ব দেবে কারা। এবং আইন বে-আইনের পরোয়া না করে স্কুল-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়, কারখানা, কৃষকের ক্ষেত– সবখান থেকে সেই প্রগতিশীল কর্মীদেরই তারা গ্রেপ্তার করতে শুরু করেছিল। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলনের জোয়ারের পূর্ব পর্যন্ত যে সমস্ত রাজনৈতিক কর্মীরা গ্রেপ্তার হয়ে পূর্ববঙ্গের জেলে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং সেদিন তারা জেলের অভ্যন্তরে অনুপায় হয়ে রাজবন্দীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য মরণপণ যেসব সংগ্রাম করেছিল তার বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আজ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হয় নি। বর্তমানের উপলব্ধির অভাবে হয়তো তা কোন দিন লিপিবদ্ধ হবে না। কিন্তু পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিকাশ, অগ্রগতি ও রূপান্তরের ক্ষেত্রে সে পর্যায় যে একটি তাৎপর্যময় এবং বর্তমানের জন্য মহৎ ঐতিহ্যময় পর্যায়, এটি অনস্বীকার্য।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বর্ণনায় বন্দীর রোজনামচায় দেখা যায় পয়েন্টের ভিত্তিতে লেখা আছে এমন কয়েকটি ছত্র : "The Soviet camp of peace has gone on to the offensive, on direct action against the imperialist camp, the camp of war mongers'. লেখা আছে : "The entire Bourgeois world is in the mire of crisis. The imperialist policy in China and South East Asia has failed abysmally'. এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়া সমগ্র খাতাটিতে সেদিনকার সেই নিশ্চিদ্র অন্ধকার রাজনৈতিক পরিবেশে অন্ধকারতর বন্দীশালায় রাজবন্দীরা কেমন করে একে অপরের মনোবলকে উদ্দীপ্ত করে রাখার চেষ্টা করত আভাস আছে তার। তারই জন্য শত বাধা নিষেধের মধ্যেও জেলের ছোট সেল বা খুপরীতে কিংবা ওয়ার্ড বা ঘরে নিজেদের মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপনের চেষ্টা, কারুর দায়িত্ব নেওয়া অধিকতর দুর্বল বন্ধুদের পরিচর্যার, কারুর দায়িত্ব দৈনন্দিন সামান্য খাবারটুকুর সুষ্ঠ বিলি বণ্টনের, কারুর দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের পাস করা কাটাছেঁড়া খবরের কাগজের টুকরা থেকে খবর সংগ্রহ করে সাজিয়ে গুছিয়ে সহবন্দীদের বুঝাবার চেষ্টা করা : 'হতাশার কোন কারণ নেই। আমাদের স্বপ্ন মৃত্যু মানে না। জীবনকে মৃত্যু কখনো পরাজিত করতে পারে না'। আর তারই জন্য বন্দীশালার মধ্যেও সোমেন আর সুকান্তর জন্মদিবস পালনের সীমাবদ্ধ হলেও ঐকান্তিক প্রয়াস। হয়ত তিন কি চারজন সহবন্দীর গায়ের সঙ্গে গা মিশিয়ে বসে গুরুতরভাবে সোমেনের সেই বাণীকে আবৃত্তি করা যেখানে সোমেনের গল্পের নায়ক উচ্চারণ করেছিল : 'ইতিহাস যেমন আমাদের দিক নেয়, আমিও ইতিহাসের দিক নিলুম। আমি হাত প্রসারিত করে দিলুম জনতার দিকে। তাদের উষ্ণ অভিনন্দনে আমি ধন্য হলুম।' লিখে রাখে খাতার পাতার ভাগ্যক্রমে পেয়ে যাওয়া সুকান্তর 'প্রস্তুত' কবিতার একটি টুকরাকে যেখানে কবি আত্মচরিতের ভাষায় বলছে :

AMARBOI.COM

কালোমৃত্যুরা ডেকেছে আজকে স্বয়ম্বরায়
নানা দিকে নানা হাতছানি দেখি বিপুল ধরায়
ভীতমন খোঁজে সহজ পন্থা, নিষ্ঠুর চোখ,
তাই বিষাক্ত আস্বাদময় এ মর্তলোক
কেবলই এখানে মনের দ্বন্দ্ব আগুন ছড়ায়
অবশেষে ভুল ভেঙেছে, জোয়ার মনের কোণে
তীব্র ভ্রুকুটি হেনেছে কুটিল ফুলের বনে
অভিশাপময় যে সব আত্মা আজো অধীর
তাদের সকাশে রেখেছি প্রাণের দৃঢ় শিবির
নিজেকে মুক্ত করেছি আত্মসমর্পণে।

খাতার কয়েকটি পৃষ্ঠায় রয়েছে তারিখসহ বন্দীর রোজনামচার টুকরা। আর তাতে ফুটে বেরিয়েছে পঁচিশ কি ছাব্বিশ বছর বয়সের একটি বন্দীর সেদিনকার জীবনবোধ। ত্রিশ বছর দূর থেকে তার দিকে তাকাতে গিয়ে আজ তার জন্য কেমন যেন একটা মমতা বোধে মন ভরে ওঠে। এ রোজনামচার ব্যাখ্যা দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে উপস্থিত করা মুশকিল। সেদিনকার এই বন্দীটির সঙ্গে আজকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমির কিছুটা পরিচয় ছিল বলেই হয়ত ব্যাখ্যাহীনভাবেও আমি তার সঙ্গে সহমর্মিতা বোধ করি। আর সেই বোধ থেকেই আজো ইচ্ছা হয় সেই বন্দীটির রোজনামচার কথা কটি হুবহু ধরে রাখার চেষ্টা করি। এ একটা নিছক ব্যক্তিগত আবেগের ব্যাপার। হয়ত বিগতের জন্য মায়াবোধ, যাকে বলে 'নসটালজিয়া'।

*　　　*　　　*

॥ ঢাকা সেন্ট্রাল জেল : ১৪-৩-১৯৫০ ॥ অল্প কয়েকজন কমরেড নিয়ে ছোট একটি সাহিত্য আসর। [আমরা সকলে পরস্পরকে কমরেড অর্থাৎ সাথী বলে সম্বোধন করতাম।] কিন্তু কোথায়? কতগুলো দেয়ালের মধ্যখানে? আর কত উঁচু সে দেয়ালগুলি? অনেকগুলি দেয়াল, আর অনেক তার উচ্চতা। শক্ত শিক দিয়ে তৈরি ছোট ছোট খুপরিগুলোর সামনের গরাদ। কটা শিক? এক কমরেড একদিন কৌতুকভরে হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিলেন, বলো তো কটা শিক, কটা সিঁড়ি, কটা কড়িকাঠ, কটা ছাদের কাছের ঘুলঘুলির কাঠি? এক মিনিটে বলতে হবে। আমরা কেউই সঠিক বলতে পারিনি। কমরেড বলেছিলেন নটা শিক, নটা সিঁড়ি, নটা কড়িকাঠ আর নটা কাঠি! আরে জেলের নিয়মই এই। নয়ের নিয়ম।' আসলে জেলের নিয়ম কিনা জানিনে। কিন্তু ৫৮ দিনের সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক অনশন ধর্মঘটে [১৯৪৯-৫০ সনে ঢাকা জেলর রাজবন্দীরা রাজবন্দীদের জন্য রাজবন্দীসুলভ মর্যাদার দাবিতে অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। ৫৮ দিন অনশন ধর্মঘটের পরে কর্তৃপক্ষ রাজবন্দীদের বেশ কিছু দাবি স্বীকার করে এবং অনশন ধর্মঘটের অবসান হয়। কারাগারে অনশন ধর্মঘটের ইতিহাসে এ অনশন দীর্ঘ অনশনের মধ্যে অন্যতম ছিল। এই ধর্মঘটে কুষ্টিয়ার শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা শিবেন রায় নিহত হন।] দিনের পর দিন কমরেডরা চব্বিশ ঘন্টা ও নয়টি শিকে আটকা ৪ হাত পাশে আর ৮ হাত লম্বা খুপরিতে বসে গুনছিল আর হিসাব করছিল— কটা শিক, খড়খড়ি আর কটা কড়িকাঠ। অনমনীয় লড়াই। আর এই সরকারের দেওয়া যন্ত্রণাও বিংশ শতাব্দীর বর্বরতম।

এমনি একটা খুপরিতে বসেছিলাম আমরা কয়েকজন গায়ের সঙ্গে গা মিশিয়ে। আলোচনার বিষয়বস্তু করেছিলাম সাহিত্যকে, আর সংগ্রাম ও কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তার সম্পর্ককে। ৯টা শিক এ চেষ্টাকে পরিহাস করতে পারত, পরিহাস করতে পারত আমাদের এই সাহসকে। ওরা আমাদের মুখ বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল, অযুত জনতা যেন শুনতে না পায় আমাদের মুখ দিয়ে তাদের সত্যকার জীবন কাহিনী। চারদিকের দাবানল থেকে আমাদের মতো স্ফুলিঙ্গকে ছুটিয়ে এনে আবদ্ধ করে সে দাবানল থেকে ওরা রক্ষা পেতে চেয়েছে। কিন্তু আগুনের ফুলকি আগুনই জ্বালে। ওরা তাই এখানেও আমাদের ভয় করে। ভয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে ওদের নটা শিক। আর তাই প্রতি দুপুরে নটা শিককেই বাড়ি দিয়ে দিয়ে দেখে সেগুলো শক্ত আছে কিনা।

* * *

কমরেড. এম. ডি. বলতে শুরু করলেন। {যত দূর স্মরণ হয় সাংকেতিক এম. ডি. মানে খুলনার যুবক, সাহিত্যিক রাজবন্দী মানিক দাস।] কিন্তু অকৃত্রিম সঙ্কোচে ভেঙ্গে পড়লেন। জীবনে হয়ত এই প্রথম তিনি নিজের ভাবকে আর একজন কমরেডের সামনে গুছিয়ে ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করছেন। কিছু পরে সামলে নিয়ে আবার তিনি বলতে শুরু করলেন। উৎসাহের ঐকান্তিকতার ছাপ মুখের উপরে এসে পড়ল। কথার অকৃত্রিমতায় বেরিয়ে এল : আমার সংকোচকে আমি কাটাব। আমি আরো উৎসাহ নিয়ে আমদের এমনি আত্মশিক্ষামূলক আলোচনাতে যোগ দেব এবং একে সংগঠিত করে তুলব। এম. ডি. কথা বলছিল আর আমি ভাবছিলাম, আর একটা ফ্যাসিস্ট জেলে ১৯৪৩ সনে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কমরেড ফুচিকের [চেকোস্লাভাকিয়ার প্রখ্যাত সাহিত্যিক এবং কমিউনিস্ট নেতা, জুলিয়াস ফুচিক। নাজি বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হয়ে বন্দী শিবিরে নিহত হন।] কথা। ফ্যাসিস্টরা ভেবেছিল, কমিউনিস্ট পার্টিকে শেষ করে দিবে। কিন্তু ওরা তো জানে না, দুজন কমিউনিস্ট একত্র হলে কমিউনিস্ট পার্টি আবার তৈরি হয়ে যায়।

সুন্দর এই কমরেড। সরল তার মন। মনের কথাকে হয়ত ভাষা দিতে পারে না সবখানে। হয়ত সে ভরসাও পায় না। তবু কত শক্ত। কত দৃঢ়। ফুচিকের মতোই ওর দৃঢ়তা। তেমনি বিশ্বাস। সেদিন যখন বলছিল তার কাহিনী আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম ওর দৃঢ়তার কথা ভেবে। এত অসহ্য অত্যাচার ও নির্যাতন ও সয়েছে। এমন আমরা আর কজন সয়েছি? তবু ভাঙ্গেনি, তবু নড়েনি। সেদিন ওর সে কাহিনী সহজ ভাষায় ফুটে বেরিয়েছিলে অপরূপ হয়ে। ভেসে উঠেছিল একটি ছবি। কিন্তু ছবি নয়, সত্য। বাগেরহাট থানার টিনের ঘরের হাজতে সে কী নিদারুণ অত্যাচার। বন্দুকের কুদোর আঘাতে লম্বা বারান্দার এদিকে হতে ওদিকে নির্দয় তাড়না। চুলের মুঠি ধরে হেঁচকা টান। জামাটা পর্যন্ত খুলে নিয়ে লোহার শিক দিয়ে শরীরের প্রত্যেকটি গিড়োতে কায়দা করে বাড়ি। প্রথমে আস্তে, তারপরে আর একটু জোরে, তারপরে আরো জোরে। আরো জেরে, আরো। আর সাথে সাথে দুনিয়াব্যাপী ফ্যাসিস্টদের সেই এক প্রশ্ন, এক জিজ্ঞাসা : টেল টেল টেল্! বল, বল, বল! কিন্তু বলাতে কি ওরা পেরেছে? পারেনি। কিছু বলাতে পারেনি। বরঞ্চ আরো তিক্ত করেছে ওর অভিজ্ঞতাকে। তীব্র করেছে ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রতি ওর ঘৃণাকে, আর শক্ত করেছে শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শের প্রতি ওর বিশ্বাসকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যি বড় ভালো এই কমরেডটি। আমরা বড় বড় কথার ফাঁকে আমাদের দুর্বলতাকে আড়ালে করি। ফাঁকি দিই নিজেকে, ফাঁকি দিই আমাদের আদর্শকে। আর ও সরল মনের অকৃত্রিম সংকোচে আপনার শক্তিকে রেখেছে যেন আবৃত করে। সত্যিকার কমরেডের সহৃদয়তায় সে আবরণের উন্মোচনে সুন্দর মনের কী অপূর্ব দৃঢ়তার সাক্ষাৎই না পেলাম।...

মাথাটা বড্ড রিরি করছে। সন্ধ্যা না হতে বদ্ধ খাঁচায় ঢুকে কেবল ভাবছিলাম, কিছু লিখব। লিখব আমার মনের কথা। নিজের মনের কথা লিখতে গিয়ে কিন্তু নিজেই যেন ভয় পাচ্ছিলাম। লিখতে পারলাম না কিছু। শুধু একটা কথাই থেকে থেকে মনে হচ্ছিল : আমি কী? আমি কী? দুর্বলতার অসংখ্য প্রকাশে আমি অপদার্থ। চিন্তায় অগভীর। ব্যবহারে চঞ্চল, অস্থির, মর্যাদাহীন। সংগ্রামে ভঙ্গুর। কিন্তু এ আত্মসমালোচনাতেই বা কী লাভ, যদি না হয় কোন উন্নতি? আর কত ভালো এই কমরেড এ. বি. আর কমরেড এম. ডি. [এ. বি. সংকেতের রাজবন্দী নিশ্চয়ই আবদুল বারি। একজন রেলওয়ে শ্রমিক, কর্মী ও নেতা। বোধ হয় ঢাকার নিকটবর্তী কোন এলাকায় তাঁর বাড়ি ছিল। আদর্শের প্রতি বিশ্বাসে অনড় ছিলেন। এখন তিনি কোথায়, বেঁচে আছেন কিনা, আমি জানিনে।] অমনি আরো অনেক কমরেড। তবু সত্য যা সে এই যে, আমি দাঁড়াতে চাই। শ্রমিক শ্রেণীর মহান আদর্শকে আরো গভীর করে বুঝতে চাই। তার জন্য সংগ্রামে আমি দৃঢ় হতে চাই। কিন্তু চিরদিনকার ধিককারময় জীবনের ইতিহাসটাই যে সামনে এসে ভড়কে দেয়। হতাশ করে দেয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের খোলসে সে পরিণত হয়ে যায়। জেলে এসে অবধি নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির উপর নজর পড়ছে। পড়ছে সহযাত্রীদের সমালোচনা ও ব্যঙ্গ– উভয়ের ফলে। বাইরে যেটা আত্মীয় বান্ধব আর পাঁতি বুর্জোয়া পরিবেশের প্রশ্রয়ে উৎরে গিয়েছে গুণ বলে, যা নিয়ে লজ্জা পাইনি, উল্টো গুণ মনে করে তাকে অর্জন করেছি, আজ দেখছি সেটা জঘন্য অসংযম এবং দুর্বলতায় পরিণত হয়ে গেছে।...

এসব কথা ভাবতে গেলে বড় দমে যাই। কিন্তু সত্যি যা সে হচ্ছে কমরেড এ. বি.'র কথা, যে কথা অন্য কথাস্থলে তিনি বললেন এইমাত্র আমার পাশের সেলের [একমুখো খুপরী] মধ্য থেকে। শ্রমিক-সুলভ স্পষ্টতা নিয়ে তিনি বললেন : "অন্য সবকিছুর চেয়ে বড় হল নিজের মনের সাথে সংগ্রাম। তার দুর্বলতাকে জয় করা। এ কাজ না করতে পারলে অনেক শক্ত মানুষও হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ে। লোক চক্ষুর অন্তরালে যার ভিতর যায় ক্ষয়ে সে শক্ত জিনিস কিন্তু আসলে শক্ত নয়। তার দুর্বলতা ধরা পড়ে যাবেই একদিন। আর সে যাবে হঠাৎ। আর তারই জন্য সে হয় সবচেয়ে বেশি আশ্চর্যজন, ক্ষতিজনক।" এর চেয়ে সত্য কথা আর কী হতে পারে? আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ কমরেড এ. বি.'র কাছে। শুধু আজই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়। অতীতের অনেক দুর্বল মুহূর্তে সত্যই তিনি আমায় বল দিয়েছেন। আর তাঁর নিজের জীবনটাই আগাগোড়া কী অদ্ভুত আত্মবিশ্বাসে ভরা। দুপুরে যখন তাঁর সহজ অনাড়ম্বর তবু আকর্ষণীয় ভাষায় জীবন্ত করে বলছিলেন তাঁর জীবনের কাহিনী তখন আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনলাম সে কাহিনী। বিচিত্র তাঁর অভিজ্ঞতা। আর সেই সব অভিজ্ঞতা মহত্তম পরিণতি পেল তাঁর কমিউনিস্ট চরিত্রে।

সংগ্রামময় সে জীবন। একটার পর একটা সংগ্রাম। পরাজয় মানেনি কোনদিন। আত্মবিশ্বাসে ঢিলে পড়েনি একদিনও। আর আজও ফ্যাসিস্ট কারাগারের মধ্যে আমাদের সবার চেয়ে ভবিষ্যতের বিশ্বাসে ও আনন্দে উৎসাহিত। বিকেল বেলা হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলুম, আমাদের উপন্যাসের নায়ক ও। নায়কই সত্যি। এ ওর দাবিও। বিনয় নয়। তাই দুপুরে বলছিলেন, "আমি জোর করে বলছি আপনাদের কাছে, পার্টির কাছে, আমার জীবনের কাহিনী আপনারা, সাহিত্যিকরা জানান শ্রমিক শ্রেণীকে। জানান প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীকে। এ আমার ব্যক্তিগত জীবন নয়। কমিউনিস্ট পার্টির সৃষ্টি। আর তাই সে আমাদের আদর্শেরই জয় ঘোষণা।"

এত বড় অকৃত্রিম দাবি এবং শক্তিশালী দাবি আমি আর কখনো পাইনি। সূক্ষ্ম তাঁর দৃষ্টি। মমতাময় মন। সাহিত্যিক তাঁর চিন্তা। আমি একদিন আদর করে বলেছিলাম, "আমাদের লেনিন।" কিন্তু মিথ্যে নয় কথাটা। দায়িত্ব বোধ করি এমনিতর জীবনের ছবি আঁকবার। অনেক সময় আত্মধিক্কার দিয়ে ভাবি, ফ্যাসিস্টরা যেন আমাদের স্মৃতিকে বিকৃত করে দিতে অনেকখানি সফলকাম হচ্ছে। দেয়ালে দেয়ালে ঘিরে ও আমাদের অনুভূতিকে ভোঁতা করে দিতে চায়। লেখনিকে পঙ্গু করে দিতে চায় আর স্মৃতিকে চায় ঘুলিয়ে দিতে। না হলে, এরই মধ্যে কী করে আমি ভুলে গেলাম আমার জীবনের সেই সমস্ত লক্ষ অনুপ্রেরণার কাহিনীকে, বাইরের জগতের প্রতিটি গ্রামে, স্কুলে, কারখানায় আমার স্বপ্নের বাস্তব অঙ্গীকারের জ্বলন্ত সব চিহ্নকে?

সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী রূপায়নের নির্ভুল সংকেতকে, মনুকে, মোক্তারকে, সেই বুড়ো ক্ষেতমজুর কমরেডকে, কিংবা যুবক টুকুকে, সামসুকে, হরনাথকে? আর শুধুই কি তাদেরকে? সেই জীবন্ত চিত্রকে যেখানে গ্রামের পর গ্রামের উপর দিয়ে শ্রেণীসংগ্রামের নূতন বন্যা বয়ে চলেছে আর বদলে দিচ্ছে তার প্রত্যেকটি মানুষের জীবনকে, ঘরের কোণের বউটি হতে, মসজিদের ইমাম সাহেবের জীবন পর্যন্ত। তার স্মৃতিকে ঘুলিয়ে দেওয়া কিংবা শ্রেণীসংগ্রামের সেই স্রোতকে রোধ করার ষড়যন্ত্রের চেয়ে হীন ষড়যন্ত্র আর কী হতে পারে? আর তাতেই যদি স্মৃতি আমার আসে আঁধার হয়ে কিংবা সে যদি যদি পারে শ্রেণীসংগ্রামের পরিণতির প্রতি আমার বিশ্বাসকে টলাতে তাহলে তার চেয়ে হীন অধঃপতনই বা আর কী হতে পারে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

॥ ঢাকা সেন্ট্রাল জেল: ২২-৩-৫০ ॥ এই আমার জেল-পৃথিবী। চার দিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা। কিন্তু তবু এখানে কি অভিজ্ঞতার কমতি আছে, আবিষ্কার আর নতুন রহস্য উদঘাটনের শেষ আছে? ওদের দেওয়া সীমার মধ্যে যদি আমি আমার অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য, জ্ঞান ও শিক্ষায় আমার আদর্শে পৌঁছার ক্রমগতিকে লক্ষ্য করতে না পারি তাহলে তো ওদের দেওয়া আষ্টেপৃষ্ঠের বাঁধনই আমার কণ্ঠরোধ করে ফেলবে, আমাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিবে। অথচ কী অদ্ভুত অভিজ্ঞতাই না হল আমার এই জেলে এসে এবং হচ্ছে প্রতিদিন।...

একজন শ্রমিক কমরেড এ. আর.। [কী দুঃখ! আজ ত্রিশ বছর পরে কিছুতেই আর এই সংকেতকে ভেঙ্গে বার করতে পারছিনে কে ছিলেন সেদিন এ. আর.? সেদিন যদি এই রাজবন্দী এমন সংকেত ব্যবহার না করত করত তাহলে এমনভাবে হয়ত 'এ. আর.' হারিয়ে যেত না আমার স্মৃতি থেকে। কিন্তু রাজবন্দীদের নিরাপত্তার জন্য কোনকিছুই লেখার ক্ষেত্রে, কোনো নাম পরিচয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংকেত ব্যবহার ছিল সেই বন্দীশালায় অপরিহার্য।] যতই চোখকে ঠেরে বলিনে কেন, শ্রমিক কমরেডকে আমি সম্মান করি, তার শক্তি ও সম্ভাবনায় আমি বিশ্বাস করি, তবু পাঁতি বুর্জোয়ার অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা আমাকে নিশ্চয়ই আচ্ছন্ন করেছিল।...

এ. আর. অতি সঙ্কোচে আমার ঘরের সামনে এসে বললেন, কাজ আছে কমরেড? বললুম, না তো। দুপুর বেলার ঘুম-কাতর চোখে মন চাচ্ছিল শুয়ে পড়তে। কিন্তু এ. আর.-এর চাহনী আর ডাকের নম্রতা আমায় বুঝিয়ে দিল, ও আমায় ডেকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে ওর সেলে, ওর নিজস্ব কোন একটা লেখা পড়ে শোনাবার জন্য। আমি এলুম ওর সঙ্গে। কিন্তু আমার মনের অবস্থা কি ওর সহজ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পেরেছিল? ওর সেলে এসে বললুম, পড়ুন না, কী লিখেছেন। কিন্তু কিছুতেই যেন পড়ার সাহস আসছিল না। আর তারপর সঙ্কোচে নুয়ে পড়ে পেনসিল দিয়ে লেখা একটি খাতার রচনা পড়ে শোনালেন। নিজের জীবনের কাহিনী গল্পের আকারে বলতে গিয়ে বলেছেন : 'রাস্তার পাশে ছোটখাট একটা গ্যারেজে সোলেমান কাজ করত।... এখনো এগোয়নি বেশি দূর। কয়েকটি লাইনে শুধু সেই গ্যারেজের বর্ণনা। কল্পনার রং লাগাতে হয়নি। তাঁর নিজের জীবনেরই অভিজ্ঞতা। একজন অত্যন্ত গরিব মুসলিম যুবকের জীবনের কাহিনী। অনাড়ম্বর ভাষা। ছোট্ট ছোট্ট বাক্যে একটি বর্ণনা। অনবদ্য লাগল আমার কাছে। বিস্মিত হয়ে বললুম, 'চমৎকার।' কমরেড এ. আর. যেন আরো সংকুচিত হয়ে পড়লেন। পরে সাহিত্য বাসরেও অন্যান্য কমরেডরা লেখার লাইন কটিকে দেখে আশ্চর্য হল। এ. বি. ঠিকই বললেন তাঁর সহজ সুন্দর উদাহরণ দিয়ে 'এ যেন গ্রামের বউ ভালো ধানের বীজ রেখেছে ভাঙ্গা কলসীটারই মাঝে।' আর বললেন, 'পার্টি এই প্রতিভাকে আবিষ্কার করেনি আর কদরও করেনি।' এ অভিযোগও সত্য।...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েকদিন ধরে ৪র্থ সংগ্রামের পর্যালোচনা হচ্ছে। [খুব সম্ভব ১৯৪৯-৫০ সনের ৬৮ দিনের অনশন ধর্মঘটকে এখানে ৪র্থ সংগ্রাম বলা হচ্ছে। ১৯৪৯ সনে এর পূর্বে আরো তিনটি ছোট-বড় অনশন ধর্মঘট রাজবন্দীরা ঢাকা জেলে করেছিলেন।] আত্মসমালোচনার তীক্ষ্ণ অস্ত্রে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি নিজেকে পরিশুদ্ধ করে নেয়। এ কথা তো কতবার বলেছি। এ নিয়ে তো কত প্রবন্ধ লিখেছি। কিন্তু আজ কি আমার আত্মসমালোচনাই আমি করতে পেরেছি? আমি বললাম : "গত সংগ্রামে নানান দিকে আমার দুর্বলতা ফুটে বেরিয়েছিল" কিন্তু তাই কি যথেষ্ট? জীবনে এমন স্বীকৃতির কথা উঠলেই আমার মনে হয় যেন এটাকে আমি একটা আর্টে পরিণত করে ফেলেছি। যে আত্মসমালোচনা দিয়ে আমার দুর্বলতার শেষ করতে না পারলাম সে আত্মসমালোচনা নিজকে এবং অপরকে ফাঁকি দেওয়ার কৌশল ছাড়া আর কী? অথচ আমার মূল দুর্বলতা তো থেকেই যাচ্ছে। আমার সেই পরনির্ভরশীলতা, পার্টির মধ্যেও শ্রেণীসংগ্রামের বদলে একটা স্থায়ী শান্ত অবস্থার প্রতি মোহ, রাজনৈতিক দৃষ্টির একান্ত অভাব, সেই চিরকেলে অল্প বয়সী ছেলেমানুষী, হ্যাংলাপনা চরিত্র আর ভলান্টিয়ারী করেই তৃপ্ত থাকার চেষ্টা। ফলে একটু আঘাতে কিংবা নতুন কোন অবস্থাতেই আমি হাস্যস্পদভাবেই মুষড়ে পড়ি। কিন্তু শ্রেণীসংগ্রাম তো এত সহজ নয়। বুর্জোয়া রাষ্ট্র, সমাজ, তার জেল, আইন, ফাঁসীর বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণী ও তার পার্টির লড়াই তো আমার পাঁতি বুর্জোয়ার মনের দ্রুত উত্থান ও পতনের উচ্ছ্বাস নয়। আর এ মন, চিন্তা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অভাব যে পতনের ঢালু পথ, পিচ্ছিল পথ, এ কথা যদি আমি আজো বুঝতে না পারি তো আমার সম্বন্ধে সেই কমরেডের কথা রূঢ় হলেও সত্য হবে, 'অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ'।

ভাবতে যেয়ে অনেক সময়ে খেই হারিয়ে ফেলি। লিখতে ইচ্ছা করে মনের কথা। কিন্তু কী এ মন! বাইরে যদিবা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত ও টানা পড়েনে আমি বাধ্য হয়ে এগুতে পারতাম, আজ ভিতরে বসে যদি নিজের দুর্বলতাকে কাটাতে না পারি তবে মিথ্যাই আমার এতদিনকার এত স্বীকৃতি ও এত ঘোষণা।...

॥ ঢাকা সেন্ট্রাল জেল: ৩০-৩-৫০ ॥ আবার বসেছিল সেই ছোট্ট সাহিত্য আসরটি। প্রচেষ্টার সীমাবদ্ধতায় যেন সবার মন সংকুচিত হয়ে ছিল। আলোচনা এগুচ্ছিল না। কেবল ঠেকছিল। কিন্তু অপরাপর দিনের মতো আজো এ. বি. সব সীমাকে কাটিয়ে দিলেন। অনবদ্য দৃষ্টান্তে অদ্ভুতভাবে জীবন্ত হয়ে উঠল তাঁর প্রতিটি কথা। চিন্তার তীক্ষ্ণতা ও ভাবের গভীরতা আসরের সবাইকে উৎসাহিত করে তুলল। প্রশ্ন উঠেছিল কয়েকটা বিষয় নিয়ে : সাহিত্য কী? গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সাহিত্যিকের কর্তব্য কী হবে আর ফ্যাসিস্ট কারাগারেই বা তার বিশেষ দায়িত্ব কী? উত্তরগুলো যে খুব শক্ত তা নয়। মুখস্ত আমাদের কারুরই যে খুব কম আছে, তাও নয়। কিন্তু এ. বি. যখন সে কথাই বললেন, বললেন নিজের জীবনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিত্তিতে তখনি যেন অবাক বিস্ময়ে বুঝতে পারলাম, কথা ও জীবনে ঐক্য কাকে বলে এবং সে ঐক্য কী শক্তি তৈরি করতে পারে।

বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে এ কথাই ভাবছিলাম। সাথে এসে যোগ দিল এম. ডি.। আমার মনের কথার সুর দিয়েই ও বলল : 'আমি দেখছি আর কেবল আশ্চর্য হচ্ছি এবং আমার অতীতের সব কুয়াশা কেটে গিয়ে অদ্ভুত আলোর রেখা এসে মনের উপর পড়ছে। শ্রমিক শ্রেণীর শক্তি সব চেয়ে বিপ্লবী। তার আদর্শ মহত্তম। তার দৃষ্টি সব চেয়ে মুক্ত। তার সৃজন ক্ষমতা সীমাহীন। এ সমস্ত সত্যের বাস্তব প্রকাশই যেন দেখতে পেলাম কমরেড এ.বি.র চরিত্রে।

আমার বড় ভাই এসেছিলেন সেদিন দেখা করতে। আমার মনের উপর অদ্ভুত একটা ছাপ রেখে তিনি চলে গেলেন। সমস্ত সাক্ষাৎটাই একটা রাজনৈতিক তর্কবিতর্কের যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ নিয়ে অসমাপ্তভাবে শেষ হল। বড় ভাই আমাকে রাজনীতির পথ থেকে ফিরিয়ে নিতে এসেছিলেন। আর পাকিস্তানের আদর্শের ব্যাখ্যা করে বললেন : স্নেহের ভাইটি আমার, তুই ফিরে আয়। বড় অকৃত্রিম ও করুণ লাগল আমার বড় ভাই এর সেই আবেদনকে। আরো করুণ লাগল তখন যখন জবাবে আমার নিঃশব্দ নীরবতায় রেগে গিয়ে তিনি বললেন, 'তোমার নীরব অবজ্ঞাই আমার জীবনের চরম শাস্তি।' আমি এক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। শরীরটা কয়েক বছর আগে যা দেখেছি তার চেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে। চশমা জোড়া হাতে ধরে কথা বলছিলেন। দেখলাম সেই পুরোন নিকেল ফ্রেমের চশমা জোড়া আজো আছে। তার একটা ডানা আবার ভেঙ্গে গেছে। ভাঙ্গা টুকরো সূতো দিয়ে জড়ানো। কিন্তু কালো আচকান গায়ে। মাথায় জিন্নাহ ক্যাপ। আমি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। তিনি বলছিলেন : 'তোমার আদর্শ আমার আদর্শের বিরোধী। ভুলে যেও না তুমি আমাকে। ফিরে এস তুমি! আর ভেবোনা তোমার বিচারই একমাত্র সঠিক বিচার।' কথা বলতে বলতে গরম হয়ে উঠলেন। 'আমাদের পাকিস্তানকে তোমরা কিছুই করতে পারবে না, তোমরা কমিউনিস্টরা। পাকিস্তান আমাদের থাকবেই। রাষ্ট্রশক্তির ধূরন্ধর গুপ্তচর সাক্ষাৎকারকে কড়াভাবে পাহারা দিচ্ছিল যে অফিসারটি তার দিকে তিনি বললেন : 'দেখবেন জনাব, পাকিস্তান হ্যাজ কাম দু স্টে।...' আরো করুণ লাগল আমার বড় ভাইকে এই মুহূর্তটিতে। আমার ভাই এর বিদ্যা ও বুদ্ধি এই লোকটার চেয়ে কত বেশি। অথচ আজ তারই সামনে আমার ভাই, যিনি আমার আদর্শ ছিলেন, তাঁকে কাঙালপনা দেখাতে হচ্ছে। আমার দুপাশে দুজন আই. বি. পুলিশ। চারদিকে জাল আর গেট আর তালা দিয়ে নির্বিঘ্নভাবে ঘেরা ঢাকা সেন্ট্রাল জেল। আমি তার মধ্যে। আমার সামনে আমার বড় ভাই, যাঁর মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি, মাথায় টুপি কিন্তু চোখে ভাঙ্গা চশমা। আমরা সেই পরিবারের লোক জেলখানা যাদের কাছে অচিন্তনীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপার। আমার মনে হচ্ছিল, জেলশুদ্ধ বাইরের পৃথিবীটা ঘুরছে। সে ঘূর্ণাবর্তের বেগ এত যে, সেই পরিবারের আমি পর্যন্ত জেলে, সেই আমি যে... । আর আমার সেই ভাই আমার সামনে, আমার সঙ্গে জেলের ভেতরে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। রাজনৈতিক বক্তৃতায় গরম হয়ে উঠছেন। আবার সংসারের দুঃখ কষ্টের কথায় ভেঙ্গে পড়ছেন এবং কমিউনিজমের পথ হতে আমাকে ফিরিয়ে নেওয়ার আবেদনে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে, চোখে জল আসছে।...

আমার ভয়নাক ভালো লাগল সমস্ত অবস্থাটা ভাবতে। আমি কেবল ভাবছিলাম, সত্যি জগৎটা বদলাচ্ছে। ভাই কথা বলছিলেন আর আমি নিজেই যেন নিজেকে বলছিলাম ঃ তাহলে আমাদের গ্রামটাও ঘুরছে। ঘুরছে আমাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সব। ঘুরছে আর এগুচ্ছে বিপ্লবের দুর্দমনীয় আকর্ষণে, যে আর্কষণ পশ্চিম হতে পূর্বে সমস্ত পৃথিবীটাকে ঘোরাচ্ছে। সেদিন সেই মুহূর্তটিতে এ কথা ভাবতে বড় ভালো লাগল যে, আমি এ গতিকে যেন বুঝতে পেরেছি, শুধু বুঝেছি নয়, আমিও এই পৃথিবীটাকে ঘোরাচ্ছি, বদলাচ্ছি বদলে দিচ্ছি।...অন্য সব কথা ভাই-এর আর আমার কানে যায়নি। কিন্তু কানে গেল তাঁর সেই একটি কাহিনী। রাগ করে তিনি বলছিলেন : তোরই মতো আমাদের দেশের আর একটা ভালো ছেলে এমনি করে নষ্ট হয়ে গেল। তার ভাই তাকে কষ্ট করে লেখাল, পড়াল আর শেষে কিনা সে জেলে গেল কমিউনিজম করে। আর শুধু কি তাই? ভাই যদিবা হাজার টানা জামিন দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে আনলো তো পরের দিনই সে আবার নিরুদ্দেশ হল একথা বলে : এ রাষ্ট্রের শোষণে লক্ষ পরিবারের মৃত্যুর কাছে আমার একটা পরিবারের মৃত্যু কিছু নয়।....

মুহূর্তে আমার ভাই-এর উপর থেকে আমার সমস্ত রাগ যেন ধুয়ে মুছে গেল। এতক্ষণে মনে হল, এ সাক্ষাৎ আমার সার্থক হল। ইতিহাসের গতিপথকে যে চিনেছে আর গ্রহণ করেছে তার খবর পৌঁছে দিয়ে গেলেন আমার ভাই এই জেলের গরাদের মধ্যে, দিয়ে গেলেন রাগের মাথায় আর জানালেন না কমিউজিনমের পথ থেকে তিনি তাঁর ভাইকে সরিয়ে নিয়ে যাবার বদলে সেই পথকেই করে দিয়ে গেলেন আরো শক্ত, আমার বিশ্বাসকে করে দিয়ে গেলেন আরো দৃঢ়।.....

আমি খুশি মনেই আমার ভাই-এর পায়ে হাত রেখে সালাম করলাম এবং ফিরে এলাম আমার চার হাত-আট হাতের ছোট্ট সেলটিতে।....

* * *

॥ ঢাকা সেন্ট্রাল জেল : ১০ই এপ্রিল, ১৯৫০ ॥ ১২ নম্বর সেলের কমরেডটি। আমার সেলের নম্বর সতর। সতের নম্বরের আগে ষোল নম্বর। তার আগে পনের, চৌদ্দ, তের। তারও আগে বারো নম্বর সেল আর তার কমরেডটি। আদর করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে গেলে কমরেড নয়, ছেলেটি। স্কুল ছেড়ে মাত্র কলেজে পা দিয়েছিল। কিন্তু ফ্যাসিস্ট সরকার আরো হাজার ছেলের মতো ওর কলেজে পদার্পণও সহ্য করতে পারে নি। বন্য কুকুর ওরা। ওরা ওকে দিনের আলো থেকে রাতের আঁধারে ঠেলে দিয়েছিল। আর তারপরে ওদের হিংস্র জ্বলজ্বলে চোখ দিয়ে সেই অন্ধকারের মধ্য থেকেও ছোবল মেরে ওকে ওদের শাসনের একমাত্র সত্য পরিচয় কারাগারের মধ্যে আটকে রেখেছে। ওর অপরাধ? এর উত্তর নিষ্প্রয়োজন। এবং এ প্রশ্নও আজ বাহুল্য। কানে কলব মেরে দাও, কান যেন কোন দীর্ঘশ্বাস শুনতে না পায়। চোখ অন্ধ করের দাও, চোখ যেন কোন অত্যাচার দেখতে না পায়। হাত পঙ্গু করে দাও, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে হাত যেন উত্তোলিত না হয়।....ও নাকি পৃথিবীর বাতাসে কান দিয়ে মর্মন্তুদ অত্যাচারের দিকে তীব্র চাহনী চেয়ে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে হাত তুলে চলেছিল আর বলেছিল সহপাঠীদের চোখ চেয়ে চলতে। এর চেয়ে বড় অপরাধ আর কী হতে পারে?....

কিন্তু আমার কাছে বিস্ময়।

জেলের হাসপাতালের কথা মনে পড়ছে। দীর্ঘ আটান্ন দিন অনশনের পর অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হল। আমাদের মনে বিজয়োল্লাস। দুর্বল ক্লান্ত শরীর। কিন্তু ৫৮ দিন রাতে ঘুম এল না একটুও। ৩ নম্বর আর ৪ নম্বর ওয়ার্ড [বড় হলঘর মিলিয়ে আমরা ঐদিনই ছিলাম ২২/২৩ জন। সারা জেলে ছড়িয়ে আছে অনশনকারী আরো ১০০ জন। রাত তিনটা পর্যন্ত মিটিং করলাম হাসপাতালের ঘরে। আগামী কাল থেকে আবার খাবার গ্রহণ করা হবে। বিজয়ী লড়াই-এর পরে উৎসবের অনুষ্ঠান হবে। আমরা কমিটির পর কমিটি তৈরি করলাম। সেন্ট্রাল কিচেন 'হসপিটাল' হাউজ কমিটি, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ডেলিগেশন, মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট, নিউজব্যুরো।...

তখনো আমি ওকে ভালো করে চিনিনি। নির্বাক একটি ছেলে। কিন্তু লড়াই-এর ময়দানে দৃঢ় কমরেড। তবু নির্বাক। হসপিট্যাল হাউজের চার্জ কাকে দেওয়া যায়? প্রশ্ন উঠল। নাম এল ওর। এ.ডি.র। [সিলেট জেলার তৎকালীন তরুণ ছাত্র কর্মী অপরেশ ধর।] আমি ভাবলাম, সবাইকেই তো কিছু না কিছু কাজ দেওয়া প্রয়োজন, তাই। কিন্তু নির্বাক ছেলেটি ঠাণ্ডা মাথায় অদ্ভুত কাজ করল। অসম্ভবভাবে খাটল। আমরা অনেকে কিম্বা বলা চলে সকলে উৎসবের সে বাড়তি বন্যায় মাথা ঘোরালাম। চটে উঠলাম। বকাবকি করলাম। নিজের হাতে মগ নিয়ে সারা হাসপাতালে চিৎকার তুললাম, 'আমার মগ কে নিয়েছে বলতে হবে।' একটুমাত্র সমালোচনায় ক্ষিপ্ত হলাম। সামান্যমাত্র কথা নিয়ে ঘন্টা খানেক তর্কের তুফান তুললাম। মোটকথা বড় চরিত্রে ছোট দুর্বলতার দাগ ছিটিয়ে আমরা আত্মমর্যাদার হানি করলাম। নিজেদের কাছেই যেন কেমন অস্বাভাবিক বোধ হতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাগলাম। কিন্তু ১২ নম্বরের ১৮ বছরের ছেলেটি তিন নম্বর ওয়ার্ডের সেই অস্বাভাবিক অবস্থা ও চরিত্রের মধ্যে আপন দায়িত্ব পালনের ধৈর্য্য ও হাসিমুখ ব্যবহারে মর্যাদাবান হয়ে উঠল। এ জিনিসটা সেদিনও তত বুঝিনি যতটা বুঝছি আজ এবং প্রতিদিন।....

দুপুরে খাবার এলে ডাক পড়ে ওর। আমরা লাইন করে থালা নিয়ে বসি। ও ভাত ভাগ করে দিয়ে যায়। বিকালেও তাই। দুপুরে কিংবা বিকালে তাসের আড্ডা বসে। ব্রে কিংবা ফিস। ও আর কমরেডদের সঙ্গে তাস খেলে। দুষ্টামীভরা কৌতুকে ও ঘাড় কাত করে অপর কমরেডদের তাস দেখে আর হাসে। কিন্তু কথা বলে না।

কথা বলে না, কিন্তু চাপা উৎসাহে পূর্ণ। আমরা সাহিত্য বাসরে বসি। দুপুরের ঘুম ফেলে ও এসে বসে। বলতে বললে বলতে চায় না। আমার ইচ্ছা হল, ওকে দিয়ে বলাতে হবে। কেননা ওর সংগ্রামী জীবনকে ও শক্তিকে কথা বলার সে ক্ষমতা পূর্ণতা এনে দেবে, আমাদেরকে আরো সাহায্য করবে। দ্বিতীয় দিনের সাহিত্য বাসরে বললাম, বলতে হবে। সঙ্কোচ বোধ করল প্রথমা কিন্তু নিজের দায়িত্বকে গ্রহণ করতে কসুর করল না। আমাদের মতো বাকসর্বস্ব ভণিতা দিয়ে আবহাওয়াকে কৃত্রিম করল না। ওর প্রকাশের অক্ষমতা ও ত্রুটি সত্ত্বেও বাধো বাধো প্রকাশ ঐকান্তিক হয়ে বেরুল। সাপ্তাহিক সংবাদ পর্যালোনচায় একদিন অংশ নিল। ছেলেমানুষ সুলভ শব্দের পুনরুক্তি আমাদের ঠোঁটে হাসি আনল, কিন্তু ওর ঐকান্তিকতাকে স্পর্শ করতে পারল না। তৃতীয় দিনে দেখলাম বিষয়বস্তুর শৃঙ্খলায় এবং প্রকাশের ক্ষমতায় ও অনেক উন্নতিও করে ফেলেছে।

পুরোন বিশ ডিগ্রি। [একনাগারে লাইন বাঁধা বিশটি খুপরীর বন্দীশালা। জেলের ভেতরে জেল। ডিগ্রি বা সেল। জেলের অধিবাসীদের ভাষায় এর সুপরিচিত সংজ্ঞা : জেলের ভেতরে জেল, তার নাম সেল।] সামনে হাত চারেক প্রশস্ত একটু ইটের চত্বর। তার সাথে আর একটা দেয়াল। চত্বর থেকে ছয় সাতটা সিঁড়ির উপরে সেলগুলি। বারোটায় ভাত আসে। আকাশের মাঝখানাতে চৈত্রের সূর্য আগুন ছোড়ে। সেলের দেয়ালগুলো সিঁড়ি আর চত্বর সে আগুনে তেতে ওঠে। ঝড়ো হাওয়া বয়। মন অস্বস্তিতে ভরে ওঠে। একটু আড্ডা দেওয়া যায় কোন ঘরে? কোন সেলে? এগার নম্বরে খাবার পরে আড্ডা বসে। কিন্তু শব্দের পরে শব্দের গাঁথুনী কতক্ষণ আর চালানো যায়? এক সময়ে যেন অস্বাভাবিকভাবে সবার কথা ফুরিয়ে যায়। এ ওর মুখের পানে চাই। তারপর আর কোন কথা না পেয়ে যে যার সেলের দিকে পা বাড়াই। আমি ভাবি, আমার ১৭ নম্বর সেলে গিয়ে কী হবে? কী করব এই আতপ্ত দুপুরে সেলের মধ্যে একা বসে? যে কথাটি কয়েকদিন ধরে মনে উঠেছিল সে কথাটা আবার উঠল। ১২ নম্বরের সহাস্য নির্বাক

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমরেডটির কাছে এসে ইচ্ছা করে বসলুম। কথা তুললুম আমিই : 'সকালে কার চিঠি এল তোমার? ও বলল 'বাবা' লিখেছেন, ছোট ভাই নেপাল লিখেছে আর লিখেছে এ দিদি।' বলে চিঠিগুলো আমার হাতে দিয়ে দিল। বাবা চিঠির সম্বোধনে বলেছেন রাখাল। ওর নতুন আর এক নাম পাওয়া গেল রাখাল। জিজ্ঞেস করলুম, কবে গ্রেপ্তার হলে? প্রশ্নটা তুললুম ইচ্ছা করেই। ওর নির্বাক জীবনের সংগ্রামী ইতিহাসকে জানবার ইচ্ছা করে। পুরোন বিশের [ঢাকার সেন্ট্রাল জেলের অভ্যন্তরে বন্দীদের বিভিন্ন স্থানে আবদ্ধ করে রাখার মধ্যে একটি স্থান।] সামাজিক বাসরে আর পাঁচজন কমরেডের উপস্থিতিতে যে সঙ্কোচ এসে ওকে আড়ষ্ট করে তা আর এল না। নিঃসঙ্কোচে টুকরা টুকরা চিত্রে ও বলল ওর জীবনের কাহিনী : লাউতা বাহাদুরপুর ও দাসের বাজারের অবিস্মরণীয় সংগ্রামের কাহিনী। নানকার দাস প্রথার [সিলেটে প্রচলিত সামন্তবাদী ভূমিদাস প্রথার অনুরূপ প্রথা।] বিরুদ্ধে গরিব ও নানকার কৃষকদের অভূতপূর্ব বিদ্রোহের কাহিনী। দাসের বাজারে '৪৯ সনের ১৪ই আগস্ট গোলামীর বিরুদ্ধে কৃষকদের সেই অজেয় নতুন স্বাধীনতা ঘোষণার কাহিনী। কমরেড অপর্ণা পাল ও আরো অনেক মহিলা কমরেড ও কৃষক কমরেড যেখানে নতুন বিপ্লবী পথের দ্বারোদঘাটন করেছেন, সেই কাহিনী কমরেড অপর্ণা পাল ওর দিদি।...

ওর নির্বাক জীবন সবাক লাগল। অপর্ণা পালের ভাই ও। কমরেডও। "দাসের বাজারে থানা নিচে ১৪ই আগস্ট দশ হাজারের উপর কৃষক মিটিং করে জমায়েত হল। লাল নিশান উড়িয়ে আর অস্ত্র হাতে নরখাদক ফ্যাসিস্টদের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর আক্রমণকে প্রতিরোধ করল। থানার পুলিশ প্রথম দিনের জমায়েতের ব্যাপকতায় ভীত হয়ে ফিরে গেল। দ্বিতীয় দিনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নোমানী আরো বাড়তি সৈন্য নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দাসের বাজার এলাকার গ্রামগুলোর নরনারী শিশু বৃদ্ধার উপরে। দিদি এবং আরো কয়েকজন মহিলা কমরেড সামনে এগিয়ে এল। পুলিশের প্রথম কাতারে ছিল বাঙ্গালী। দিদি বক্তৃতা দিল পুলিশকে উদ্দেশ করে। বাঙ্গালী পুলিশ অস্ত্র নামাল। ওরা পাঠান ফৌজ মোতায়েন করল, আর ৫০ গজ মাত্র দূর থেকে গুলি চালাল। সামনের কাতারে যারা ছিল তারা শুয়ে পড়ল। তবু ওখানেই চারজন মেয়ে-কমরেড শহীদ হল। আহত হল অসংখ্য। হাসপাতালে মারা গেল আরো চারজন। পুলিশ দিদিকেসহ গ্রেপ্তার করল আরো কয়েকজন মেয়ে কমরেড এবং অনেক পুরুষ কমরেডকে। পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে ফ্যাসিস্ট পশুরা দিদিকে বেয়নেট চার্জ করল, পেটে বুকে বুটের লাথি মারল বেআব্রু করে অত্যাচার করল দিদিকে এবং অপর সমস্ত মেয়ে কমরেডকে। আমি তখন সিলেট জেলে। দিদির অবস্থা শুনেছিলাম আশঙ্কাজনক। দরখাস্ত করেছিলুম দেখবার জন্য। কিন্তু এতেও ওরা ভয় পেল। আর তাই বদলি করে নিয়ে এল আমাকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর এক টুকরা ওর আপন জীবনের কাহিনী। "আমি তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি। অনেক ছোট। কিন্তু হাইলাকান্দি স্কুলে আমি ধর্মঘট করালুম। সে হচ্ছে '৪২ সালের কথা। বুঝতাম না তেমন কিছু। কেউ বুঝাতও না।" তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি দিল্লী ছাত্র কনফারেন্সে গিয়েছিলেন? [১৯৪৬ কিংবা ১৯৪৭ সালে দিল্লীতের অনুষ্ঠিত তখনকার অন্যতম ছাত্র প্রতিষ্ঠান ছাত্র ফেডারেশনের নিখিল ভারত সম্মেলন] আমি বললুম, হাঁ গিয়েছিলুম।

"আমিও গিয়েছিলুম। সে এক কাহিনী। সে বার আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা। বাবা যেতে দিতে চায়না। বাড়ির কেউ চায় না। হেডমাস্টার চান না, এমন কি পার্টি পর্যন্ত চায় না। হেডমাস্টারকে বললুম, আমি দিল্লী যাবোই আর স্কুলের পরীক্ষাতে আমাকে পাস করিয়ে দিতে হবে। পাছে কোন স্ট্রাইক হয় সে ভয়ে হেডমাস্টার রাজি হলেন। একথা বলে সহাস্যে যোগ করল : "পড়াশুনা তেমন করতে না পারলেও একেবারে খারাপ ছেলে তো ছিলুম না।" বড় ভালো লাগল ওর ঐ কথাটি। বাবা বাড়ি থেকে কোথায় বেরিয়ে ছিলেন। ঐ ফাঁকে বাড়ির সবাইকে দস্তরমত টেরোরাইজ করে, সন্ত্রস্ত করে অনুমতি আদায় করলুম। আর পার্টির পারমিশন? আমার আঠার বৎসর বয়স হয়েছিল না বলে পার্টি আমাকে পুরো মেম্বার করতে চায়নি। আমি এতে ফাইট করেছিলুম। কেন আমি পুরো মেম্বার হব না?" তারপর পার্টি ওকে পুরো মেম্বারশিপ দিয়েছিল আর দিল্লী কনফারেন্সেও যেতে দিয়েছিল।

বাড়ির কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করছিলুম। পাঁচ ভাই-বোন। ও আবার পরিবারের মধ্যে বয়সে তেমন বড় নয়। কিন্তু আজ আর বয়স বড় কথা নয়। নতুন সমাজ সৃষ্টিতে ওর লড়াই পরিবারের মধ্যে মর্যাদায় ওর বয়স বাড়িয়ে দিয়েছিল। 'যেদিন থেকে বাড়ির সবাই বুঝল এ পথ থেকে ফিরিয়ে নেওয়া আর সম্ভব নয়, সব আশা যেদিন বাবা ওরা ছেড়ে দিল, সেদিন থেকেই ওরা যেন বয়সের বেশি আমাকে সমীহ করে চলতে লাগল। আমার বয়সের গুরুত্ব দিতে লাগল। আমার ব্যাখ্যার তাৎপর্য মেনে নিতে শুরু করল। এ পরিবর্তনটা আমি সচেতনভাবেই টের পেলুম।' নির্বাক ছেলেটি সচেতনভাবেই জানে তার শক্তি কোথায় নতুন সমাজের আদর্শ নতুন জীবনে সৃষ্টি করল।...

"তিন মাস ইউ. জি. [আন্ডার গ্রাউন্ড অর্থাৎ আত্মগোপনের অবস্থা।] ছিলাম। হোটেলে কোনদিন খেয়ে, কোনদিন না খেয়ে, ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের শ্বাপদ চক্ষুর সামনে দিয়ে কাজ করে যাচ্ছিলুম। দেশভাগের পর অনেকেই এ দেশ ছেড়ে গেছে। বাবা আমায় আলটিমেটাম দিয়েছিলেন, হয় তুই পাকিস্তান ছেড়ে চলে আসবি, না হয় তোকে পড়াশুনার খরচ আমি কিছুই দেব না। আমিও আমার মন স্থির করে ফেলেছিলুম। আমার কাজের যায়গাতে আমি থাকবোই। তোমার টাকার প্রশ্ন আমার সে সিদ্ধান্ত থেকে আমায় নাড়াতে পারবে না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারেওনি। তারপর চলল এই জীবনের অসংখ্য ছোট-বড় অভিজ্ঞতার কথা। ওর গ্রেপ্তার হওয়ার কাহিনী। গতবার মে মাসে (মে ১৯৪৯) ও গ্রেপ্তার হয়েছে। এবার মে মাস আবার ফিরে আসছে। দুপুরে রাগের মাথায় ও ওর বড় বোন মেজদির কাছ থেকে যে চিঠিখানি পেয়েছিল তাকে টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলেছে। আমি তাকে জোর দিয়ে পড়ার চেষ্টা করলুম। বড়লোক বোন মেজদি লিখেছে, এতদিনেও তোমার মনের পরিবর্তন হইলো না দেখিয়া আমরা দুঃখিত।

আমিও লিখে দেব এ রকম দালালী চিঠি লিখলে তোমার কাছ থেকে আমার কোন চিঠি পাওয়ার প্রয়োজন নাই।

মনের পরিবর্তন ওর হয়েছে বৈকি। এক বছরে ফ্যাসিস্ট জেলের মধ্যে বসেও সংগ্রামে সংগ্রামে মত ওর আরো পরিষ্কার হয়েছে। বিশ্বাস হয়েছে আরো দৃঢ়। আমি ওর সাথে আলাপ করে ভাবছিলুম ১১ নম্বর ডিগ্রির নির্বাক ছেলেটির জীবন কত সবাক কাহিনীতেই না পূর্ণ!

*　　　*　　　*

সেই রাজবন্দীটির এই কয়েকটি তারিখের রোজনামচার কয়েকটি টুকরা। আর নেই। থাকলে গভীর মনোনিবেশ সহকারে আমি তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করতাম। এখানে একটা কথা আবার স্পষ্ট করে বলা ভালো। এই রোজনামচার লেখকের নামের সঙ্গে আমার নামের মিল থাকলেও এই রোজনামচার সবলতা, দুর্বলতা, এর আবেগ– কোন কিছুর উপরই আমার কোন এক্তিয়ার নেই। এর কোন কিছুকে পরিবর্তন, বর্জন বা বর্ধনের আমার কোন অধিকার নেই। এমন কি একে অস্বীকার করারও আমার কোন উপায় নেই। রোজনামচার লেখক, আজ থেকে ত্রিশ বছর পূর্বেকার পঁচিশ বছরের তরুণ এই রাজবন্দীটিকে আমি কিছুটা চিনি বলেই এই রোজনামচার বিশ্বস্ততার সাক্ষী হিসাবেই মাত্র আমি থাকতে পারি। আর কিছু নয়। সেটি একটি দায়িত্ব পালনও বটে। সেই দায়িত্ব পালন হিসাবেই রোজনামচার এই পাতা কয়টি পাঠকদের সামনে উদ্ধার করে দিলাম।

রাজবন্দীর রোজনামচার যে বড় ভাই-এর কথা লেখা হয়েছে তিনি আজ বৃদ্ধ। তরুণ রাজবন্দীর যে বিশ্বাস ছিল, পৃথিবী বদলাচ্ছে— সে কথা যথার্থ। পাকিস্তান টিকে থাকেনি এবং এই বড় ভাই-এরই একটি সুঠাম কর্মঠ যুবকপুত্র ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করার পরে আজো ঘরে ফিরে আসেনি।

॥১৯৮১॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩৫০

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হল-এর ১৩৫১ (১৯৪৪) সালের বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা 'কলাপী' থেকে সংগৃহীত। বর্তমান রচনাটি লেখকের তরুণ বয়সের একটি 'রচনা', বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অবস্থায় আজ থেকে ত্রিশ বছরেরও পূর্বের রচনা। তের শত পঞ্চাশ বা ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে এটি রচিত। দুর্ভিক্ষের খুব যে কোন বর্ণনা আছে এতে তা নয়। কিন্তু চারদিকের মৃত্যু একটি আবেগপ্রবণ তরুণের মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তার আভাস আছে। তাতে কালের কিছু স্বাক্ষর থাকা সম্ভব, এই মনে করে রচনাটি বর্তমান সংকলনে পুনঃমুদ্রিত হল। দুষ্প্রাপ্য এ রচনাটি সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও তরুণ অধ্যাপক সাইয়েদুর রহমান সবিশেষ অন্বেষণ করে কলাপীর একটি সংখ্যা উদ্ধার করে রচনাটি সংগ্রহ করে দিয়েছেন। কলাপীর সংখ্যাটি তিনি পেয়েছিলেন অধ্যাপক আহমদ শরীফ সাহেবের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে।]

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র : বাইরে বার হতে পারিনে— কেবল ভিখিরির আর্ত কান্না "ওগো, খাইনি কিছু, একটা পয়সা দাও", শুনতে হয়। মনের কোন কোন তন্ত্রীগুলো বড় বেসুরো হয়ে বেজে ওঠে। প্রশ্ন জাগে : একি বিচিত্র জগত! একদল কেবল চিৎকার করবে চিরদিন 'খাই নাই' বলে আর একদল চিরদিন 'খাই খাই' করেই যাবে? কিন্তু চিরদিন তো চিরদিনের কথা। পঞ্চাশ সনে কী যে হল? এত লোক কেন গ্রাম ছেড়ে চলে আসছে? ওরা যে মরবে। কে ওদের খাবার দেবে এখানে....?

কিন্তু ভালো ছাত্র আমি, ভালো করে পড়াশুনা করলে, দেশের গৌরব হয়ে আমি পাস করব। আমারই বা কেন এ চিন্তা?...'বাবাগো একটা পয়সা দিবে, তিনদিন খাইনি' ঘরের পাশে আবার সেই কান্না। সত্যিই ও তিনদিন খায়নি? মিথ্যা বলছে না তো? মিথ্যা বললে শরীর অমনি ভেঙ্গে যাবে কেন? মনুষ্যত্বের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়াবে কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রামকে গ্রাম ভেঙ্গে পড়ছে শহরে। ফুলবাড়িয়ার রাস্তা, নাজিমউদ্দিন রোড যে কোন রাস্তা দিয়ে যাইনে কেন, রাস্তার পাশে অসংখ্য আস্তানা। চাল নাই, চুলো নাই একটা ভাঙ্গা মাটির বাসন, হয়ত একটা আধভাঙ্গা পাতিল; মাটি খুঁড়ছে, চুলো করছে। ঘেরাও করে বসছে। ঘর করছে—। আচ্ছা ইতিহাসে এমনতরো কাহিনী কোনদিন লেখা হয়েছে? ইতিহাসে, যে ইতিহাস পড়ে আমরা জানি কারা তৈরি করেছে এই মহান সভ্যতা, ভারতের সভ্যতা, গ্রিসের সভ্যতা আর মিশরের সভ্যতা। কারা তৈরি করেছে? রাজা মহারাজ বাদশাহ, শাহানশাহ। সত্যিই কি? আজকের রাস্তার পাশে যাদের দেখছি ওরা কি তাহলে সেই সভ্যতারই জীব? সভ্যতার অগ্রগতিই কি তাহলে ওদেরকে মহাজন জমিদারদের মতো উৎখাত করে দিল মানুষের জীবনের সামান্যতম অধিকারটুকু হতে। বাঁচার অধিকার।— একটি মেয়ে মার কোলে বড্ড নেতিয়ে পড়েছে। ছোট্ট শিশু। দুধটুকু পায়নি হয়ত কতদিন।— দেখে এসেছি নওয়াবপুরের রাস্তায়। নওয়াবপুরের রাস্তার পাশে অসংখ্য দোকানপাট। শত শত টাকা ওদের লাভ হয়। কোলকাতার কোন একটা রাস্তার মতো মনে হয়—। মেয়েটি মরে যাবে, বাঁচাবে না কেউ? আমি? করতে পারিনি কিছু। মনভার করে চলে এসেছি। শুধুই মনভার।

আশ্বিন-কার্তিক : চক সার্কুলার ঘুরে মিটফোর্ড হসপিটালের দিকে এগুতে পথের পাশে একটা মরা লোককে দেখতে পেলুম। মরে পড়ে আছে। লাশটাকে সরিয়ে নেবার তাগিদ পর্যন্ত নাই কারুর।—

ওরা মরতে আরম্ভ করেছে। মৃত্যুর পথ এবার পরিষ্কার হয়েছে। শ্রাবণের সামনে ছিল ভাদ্র : আউস ধান কিছু কি আর পাবে না? সে সম্ভাবনারও এবার শেষ হয়েছে। মজুত বিরোধী আন্দোলনে কৃষকের ঘরে ধান যাওবা ছিল তাও পরিষ্কার হয়ে গেছে। জলকাদা শুকিয়ে গেছে, শহরের পথ পরিষ্কার হয়েছে। ওরা তাই পরিষ্কারভাবে মরতে আরম্ভ করেছে।

রাতে ঘরে এসেও শান্তি নাই। কেবল মনে পড়ে। চারপাশের বন্ধুরা ঠিকভাবে বসে আছে। আমোদ স্ফূর্তি সব চলছে। তারা বলছে খোদার গজবকে ঠেকিয়ে রাখার সাধ্য কার? অনেকেই এ কথা বলে? আমরা বলি, যাদের পেটে ভাত আছে, দেহে বস্ত্র আছে, মগজে কথা বলার শক্তি আছে।... খবরের কাগজে মৃত্যুর সংবাদ হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। যাক, যারা মরল, জীবন এবার তাদের সার্থক হল। খবরের কাগজে নামধাম না উঠুক, ওদের মৃত্যুর সংখ্যাটা তো উঠবে।

গ্রাম থেকে এক বন্ধু এসেছে। সে বলে নদীর পানিতে মৃতদেহ ভাসছে। মানুষ শুধু মরছে না, একে অপরকে মারছেও। মা শিশুকে বস্তাবন্দী করে নদীর পানিতে ফেলে দিচ্ছে যেন ভেসে পর্যন্ত না উঠতে পারে। স্বামী নিরুদ্দেশ হচ্ছে। স্ত্রী দেহ বিক্রয় করছে...। জীবনের জন্য এত আকুল আকাঙ্ক্ষা ওদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজকাল আর প্রায়ই ওরা ভিক্ষা চায় না। পথের পাশে পড়ে থেকে গোঙায়, আস্তে অতি আস্তে, যেন কারুর বাহির ভ্রমণে ব্যাঘাত না ঘটে– তারপরে মরে যায়। কখন কোন প্রহরে, কোন দিনে? শুক্রবার না শনিবার? মঙ্গলবার দিনে, না অশুভ কোন ক্ষণে? ক্ষণ মূহূর্তের ফাঁক নাই। চব্বিশ ঘণ্টা শুধুই মরছে।

কিন্তু তাতে কী? দেশের ও সমাজের গৌরভের আধার আমি। বন্ধু বলেন, একটা টেস্ট স্কলারশিপ নিয়ে বিলেত যেও তুমি। জীবনে নাম করতে পারবে। ঠিকই তো।...তাই ঝেড়ে ফেলে দিই ওসব চিন্তা। আর আমার প্রায় বন্ধুদেরই মতো তারপরে পড়তে বসি : Philosophy is the quest after truth... economics is the science of wealth...। স্কুলের ছেলেদের মতো বারবার শেষের শব্দ দুটো চোখ বুঁজে কেবল আওড়াতে থাকি। Truth wealth, wealth truth, truth...। কঙ্কালের রাজ্যে সত্য ও অর্থের সাধনা করছি আমি। সমাজের গৌরবের আধার আমি। বিলাত যাব। দেশের মুখ উজ্জ্বল করব। কোন দেশ? কার সমাজ? না, ও প্রশ্ন থাক। ওতে সব গোলমাল হয়ে যায়। না থাকুক সমাজ, না থাকুক দেশ, আমি তো গৌরবের আধার। কাজেই আমি পড়ব : সত্যিই অর্থ, অর্থই সত্য, সত্যই অর্থ.....।

কিন্তু এই ছেলেগুলোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? এই ওরা, যারা কেবল পথে ঘাটে চিৎকার করছে : বন্ধুগণ, আপনাদেরই মা বোন, ভাই ভগ্নি পথের ধারে আত্ম অবমাননার চরমে যেয়ে মরছে। মনুষ্যত্ব হারাচ্ছে। আপনাদের হৃদয়ে কি এ বাজে না, আঘাত করে না? বন্ধুগণ, এগিয়ে আসুন। হাত মিলান। যা পারি, আমরা করব যা আছে, আমরা ভাগ করে খাব, তবু মনুষ্যত্বের অবমাননা আমরা হতে দেব না...।

না। মাথা যে সব গোলমাল করে দেয়। এগিয়ে কোথায় যাব? কারো কি সাধ্য আছে..এই মহামৃত্যুকে রোধ করে? বন্ধুরাও তাই বলেন। আমরা প্রায়ই তাই একমত...।

কিন্তু ওরা পাগল হয়েছে? পৃথিবীতে মহাপ্রলয় আরম্ভ হয়েছে। রোধ করার সাধ্য কারুর নাই। ওদের ঐ ক্ষুদ্র শক্তির কী সাধ্য? আর তাই বলি, শক্তিই বা ওদের কোথায়?

না! মনটা বড় বিব্রত হয়ে যাচ্ছে। পড়াশুনো কিছুই হচ্ছে না।...The study of philosophy requires a cool brain and a critical mind... cool brain. আমরা কোথায়? কেবল বাজে চিন্তা। এই তো সেদিন পড়তে বসব, পড়ার বই খুলে আরম্ভ করেছিলুম : Goverment is the organ of the state that protects evey one : অর্থাৎ it keeps every one to ones own position : The poor and the rich to their own এবং prevent

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

violation of any one's right by any other— যেমন চুরি ডাকাতি ইত্যাদি অপরের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ.. । ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলুম না । এমনি সময়ে ধাক্কা পড়ল দুয়ারের উপর । আবার এসেছে সেই ওরা । বারবার ওদের বলছি, আমার পরীক্ষা সামনে । আমি এসব পারব না । তবু, তবু ওরা আসবে । ওদের কি মাথা খারাপ? বলে : তোমার এই শিক্ষার মূল্য কি, যদি না তোমার প্রতিবেশীকে তুমি বাঁচাতে পার, যদি না তার সংকটের মুহূর্তে তুমি এগিয়ে আসো? তাহলে তোমার সাথে লোভী মহাজনের তফাত কোথায়? সে লুকিয়েছে মানুষের প্রাপ্য অর্থ ও সম্পদকে । তুমি লুকিয়েছ তোমার শক্তিকে, যে শক্তি দ্বারা তুমি ব্যর্থ করে দিতে পারবে মানুষেরই বিরুদ্ধে বিশিষ্ট অংশের ষড়যন্ত্রকে, চক্রান্তকে... ।

সেদিন তাড়িয়ে দিয়েছি ওদেরকে । অপমান করেছি ওদেরকে । কিন্তু এরা এই বলে চলে গেল যে, আবার ওরা আসবে । ওরা কি আমার মাথা খারাপ করে ছাড়বে? বই খুলে বসতেই আবার ভেসে উঠেছিল চোখের সামনে ঢাকার প্রত্যেকটি– রাস্তা আর তাই দুই পার্শ্ব যেখানে জমা হয়েছে অদ্ভুত সব মুখশ্রী । মানুষ বলে যদি ওদেরকে চিনতে পারা যায়! মনে হয় যেন প্রেতমূর্তি... ।

..আবার এসেছিল । বলেছিল, তোমার এগিয়ে আসা আমাদের কতখানি শক্তির জয়, এ তুমি বুঝতে পার না কেন? যতগুলো লঙ্গরখানা আমরা খুলতে পেরেছি, ভালো লোকের অভাবে সেখানে অত্যাচার হয় নিদারুণ । তুমি যদি শুধু দাঁড়িয়ে থাক, তাহলেও অত্যাচার হবে কম । শুধু একটা ঘণ্টা । এও কি তুমি পার না ব্যয় করতে? উত্তর দিতে পারিনি । কিন্তু সত্যই সেদিন বিকালে বেরিয়ে এসেছিলুম সিরাজদ্দৌলা পার্কের লঙ্গরখানায় দাঁড়িয়ে থাকতে । ঘর থেকে বার হতে মনে পড়ে গিয়েছিল, আমি ভালো ছাত্র । তাই হাতে করে বই একখানা নিয়ে এসেছিলুম এই ভেবে যে, দাঁড়িয়ে থাকব আর পড়ব ।... অদ্ভুত মন আমার । কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে কি সেদিন পেরেছিলুম? যেয়ে দেখি হাজার জনতা, ক্ষুধিত জনতা ভিড় করছে এক মুঠো খিচুড়ি পাওয়ার আশায় । তাও কি ব্যগ্রতা! কবল সামনের দিকে ভেঙ্গে পড়ছে । সবাই চাচ্ছে আগে পেতে । ভয় পাচ্ছে, যদি না পায়! তাই নাকি রোজ হয় । বহু লোক পায় না । একটা উঁচু জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালুম । সবার মুখ ও মাথা দেখা যায় । হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল এক কোণে । চেনা যায় কি? মুখের চেহারা মলিন, চুল রুক্ষ । তবু ওকে দেখলে মনে হয় এ সেই আমারই নিকট আত্মীয় এক বোন । ঠিক তারই মতো । চক্ষু স্থির করে রাখা দায় হয়ে উঠল । নামিয়ে নিলুম আমার দৃষ্টি । নমিত সে দৃষ্টি এসে পড়ল আমার বগলচাপা বইখানির উপর । মনে পড়ল, সত্যের সাধনা, quest after truh । কিন্তু সে কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু বইয়ের মধ্যে, বগল চাপা দিয়ে? আর আমার সম্মুখের এ দৃশ্য মিথ্যা? এর দিকে দৃষ্টি দেওয়ার আমার প্রয়োজন নাই?

...এই, এই, ওকি করছ?... না, যা করার করে ফেলেছে। বেশি খাবার চেয়েছিল। দাতা এক ঘুষি দিয়েছে। ঠিক মুখের উপর। এরপরে আর চাইবে না। অঝোরে রক্ত পড়ছে। কালো রক্ত। না খেলে বোধ হয় রক্ত এমনি কালো হয়, না? আমি দাঁড়িয়ে থাকলে অত্যাচার কম হবে। কিন্তু সে কি এই ভদ্রতার আসনে?... এই থামো, থামো... দৌড়ে গেলুম। এক ভিখিরী অপর একজনার রুটি কেড়ে নিয়েছে। তার জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী দোষীকে বেত লাগাচ্ছে। কিন্তু বেত লাগাবে কোথায়? শরীরবিহীন আত্মার গায়ে? তাই বুঝি ও কাঁদলো না। কেড়ে নেওয়া রুটিখানা কঙ্কালসার দেহের শেষ শক্তি দিয়ে চেপে ধরল। আমি বেত থামিয়ে দিলুম। মনে হল, এই আহার্য এ কি আমরা দান করছি? কোন সাধনায়? কোন পুণ্যের ফলে মানুষকে দান করার, অপমান করার এ অধিকার আমরা পেলাম?...

কাজ শেষে পথের পাশে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার সমস্ত জীবন যেন চোখের সুমুখ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল। এ কোন রাজ্যে এলাম আমি? মৃত্যুর রাজ্য, কঙ্কালের মিছিল। কোথায় চলোছে? কেন চলেছ? কার অর্জিত পুণ্যের ফলে মানুষের জীবনের এই অবমাননা?...

আমার বইখানা কি পড়ে গেল কোথাও? সত্যের সন্ধান কি আমার শেষ হল? ওদের একজন এসে আমার বইখানা ফেরত দিল। বইখানা সত্যই পড়ে গিয়েছিল। সহাস্যে আমার করমর্দন করল। আমার বড় লজ্জা লাগল। ও বলল : কাল আবার আসবে। বই আসবে না। আর পাহারা দিবে যেন অত্যাচার না হয়।...

সেদিন যখন ফিরে এসে ঘরে টেবিলের পাশে বসলুম রাত তখন অনেক। টেবিলের তাকে সারি সারি বই আমার সাজানো : কান্ট, হেগেল, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ। একদৃষ্টে ওদের দিকে চেয়ে রইলুম।– কী ভাবছিলুম? কাল আর বই নেব না, আর খুব করে পাহারা দেব।–

মৃত্যুর অভিযান ওদেরকে হতাশ করতে পারে নি। আমাদের গালি ওদের ব্যথিত করতে পারেনি। অপমান ওদের গায়ে লাগেনি। রিলিফের কাজ এগিয়ে চলছে। রাস্তায় রাস্তায় শিশুদের জন্য দুধ বিলি হচ্ছে। জায়গায় জায়গায় লঙ্গরখানা চলছে। আমি তাই নেমে এলুম। এবার আর সন্দেহ নয়। আত্ম অবিশ্বাস নয়। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় আমার মনে বাসা বেঁধেছে এটা টের পেলুম সেদিন যেদিন দেখলুম বন্ধুদের ভ্রুকুটি, অপমান আর আমার গায়ে বেঁধে না। মৃত্যুকে পরাস্ত করতে হবে। হতাশ হলে চলবে না। জীবনকে জয় করাই সত্যকে জয় করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই মন দৃঢ় করলুম। আমি নেমে এলুম। নেমে এলো আরো অনেকে। তবু অনেকে এলো না। যারা এলো না তারা আমাদের এই সাহায্যে প্রচেষ্টা দেখে হাসে। বক্র ইঙ্গিত করে। অবিশ্বাস করে। এদেরকেও নামিয়ে আনব। কথায় নয়, কাজে।

অগ্রহায়ণ-পৌষ : আমাদের প্রচেষ্টা বিফল হয়নি। সারা ভারতব্যাপী আন্দোলন চলছে। বাংলাকে বাঁচাতে হবে। আমাদের শক্তিও তাই বাড়ছে। অনেক জীবনের লোকসান হয়েছে। সে কথা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু সবার সাহায্য প্রচেষ্টা তেমনি অনেক জীবনকে রক্ষাও করেছে। শুধু অনেক নয়। আমরা এগিয়ে যাব। শুধু খাবার যোগাড় করলে চলবে না। বস্ত্রহীনের জন্য বস্ত্র চাই। ওরা হাসে। সেই ওরা, যারা মা বোনের অসহায় মৃত্যুতে হাসে নয় তো মুখ বিকৃত করে। সেই ওরা যারা খাবার ঢেকুর তুলে বাইরের দুয়ার বন্ধ করে নিরন্ন ফ্যানটুকুর মাত্র প্রার্থী ভিখিরীকে তাড়িয়ে দেয়। ওরা হাসবে। ওদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে। আমাদের দেশের হিন্দু- মুসলসান ভাই-বোন বেঁচে উঠবে। ওরা প্রমাণ চায়? আজ শহরে আমরা পনেরটা লঙ্গরখানা চালাচ্ছি : সরকারি, বেসরকারি, উভয়ই। তিরিশটা জায়গার উপর দুধ বিলি করছি। আরো প্রমাণ! রাস্তায় জনগণের জন্য ভিক্ষার পাত্র নিয়ে বেরিয়েছি তো, সবাই তাকে ভরে দিয়েছে। বলেছে, এ তো ভিক্ষা নয়, এ তোমাদের দাবি। প্রতিদিন আমরা দেব। মৃত্যুকে আমরা রুখব।

স্বীকার করছি, মৃত্যু নানান ভঙ্গীতে এসে দেখা দিচ্ছে। দুর্ভিক্ষ যেমন তার এক রূপ মজুতদারদের মণপ্রতি চাউল এক শ' টাকা হাঁকা, আর শীতের উত্তুরে হাওয়া তেমনি অন্যরূপ। মজুতদার হতে শীতের হাওয়া, কারুকে আমরা রেহাই দেব না। আত্মতৃপ্তিতে মন আমাদের ভরে যায়। লঙ্গরখানায়, কি দুধ বিলির ব্যাপারে যেমন এসেছে শৃঙ্খলা, তেমনি এসে জড়ো হয়েছে কত নতুন শক্তি। দেশকে বাঁচাবার শক্তি আমাদের বাড়ছে।

মাঘ-ফালগুন : মৃত্যু পরাস্ত হতে চলেছে। তাই বোধ হয় শেষ আক্রমণ ও চালাতে চায়। দেশে মহামারী ম্যালেরিয়া এসে হানা দিয়েছে। কিন্তু এবার আর সে আমাদের উপর আকস্মিক আক্রমণ চালাতে পারেনি। মানিকগঞ্জ থেকে খবর এসেছে, শতকরা আশিজন চাষী ভাই ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত। অমনি আমাদের দৃঢ় প্রত্যুত্তরের রূপ নিয়ে অন্ধ্র, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ হতে তরুণ শক্তি এসে বলেছে : মানিকগঞ্জকে রক্ষা করব। হিন্দু মুসলমান যুব শক্তি ওষুধ দিয়ে, পথ্য দিয়ে ডাক্তার ও ছাত্রদের পাঠিয়ে দিচ্ছে মানিকগঞ্জের জন্য।

এই তো সেদিন মানিকগঞ্জ গেলুম। ক্ষেতের আইল ধরে চলছি আমাদের ক্যাম্পে। যে কৃষকই আমাদের দেখছে, তারাই বলছে, তোমরা বুঝি ডাক্তার,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওষুধ নিয়ে এসেছ! আল্লা তোমাদের বাঁচিয়ে রাখবে। আমাদের মধ্যে অনেকে হয়ত ডাক্তার ছিলুম না। কিন্তু তাতে কী? দেশের জন্য সবাই আমরা ডাক্তার হয়ে গেছি।

মানিকগঞ্জের অবস্থা একটু ভালোর দিকে চলছে। গ্রামে হাঁটতে গেলে তাই আজ বাড়ি বাড়ি বসতে হয়। হয়ত এদেরকে পরিচয় সূত্রে কোনদিন জানতুম না, এদের কথা শুনতুম না। আজ যেন প্রত্যেকের সাথে কত বড় নিগূঢ় আত্মীয়তাই না জমে উঠেছে। যাচ্ছিলুম এক বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে। ক্যাম্পে যাব। 'ভাইপো', বসে যাও তো একটু।' তারপর, তামাক না খাও তো, পান খেতে হবে। পান না খাও তো, একবেলা ভাত খেতে হবে। চাউল নাইবা থাকল বেশি। মরে গেলে, তোমরা না এলে কে খেত এ চাউল?"

কাদের চক্রান্তে আমরা দূরে সরেছিলুম আমাদের দেশের এই স্নেহ মায়া মমতায় ভরা এই জীবনের মূল হতে? মনে হচ্ছে, বিগত দিনের সব চক্রান্ত যেন ধরা পড়েছে। সব চক্রান্ত যেন বিফল হয়েছে। আমাদের এই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত সম্বন্ধকে যেন কেউ আর করতে পারবে না ছিন্ন। তাই ফিরে আসার সময়ে সবাই বলল : "চৈত্রমাসে আমরা কৃষক সভা করব। তোমরা সবাই এসো। আগামী বছরের জীবন রক্ষার প্রতিজ্ঞা নেব আমরা।"

চৈত্র : তাই আজ আর সাহায্যের আর্তনাদ নয়। করুণার ভিক্ষা নয়। জীবনের কাজে, জীবনের যুদ্ধে সহায়তা করার আহ্বান "তোমরা সবাই এসো।"

কৃষক সম্মেলন ওদের হয়ে গেছে। বক্তৃতার সম্মেলন নয়। কাজের সম্মেলন। "...হ্যাঁ, আর মায়নুদ্দিন মহাজন একশ মণ চাউল রাখি করেছে। তাকে চাপ দিয়ে বলতে হবে যে, সে যদি এ চাউল বাজারদরে না বেচে তাহলে আমরা একত্র হয়ে জোর করে এ চাউল বিক্রি করব। গত খন্দে এই মায়নুদ্দিন আশি টাকা দরে চাউল বেচেছে, আর আমাদের গ্রামের লোক না খেয়ে মরেছে। দ্বিতীয়বার আমরা এ হতে দেব না।...বীজধান নাই আমাদের। সরকারের কাছে আমাদের দাবি যেন উপযুক্ত পরিমাণ বীজধান অল্পমূল্যে সরবরাহ করে।...আড়িয়াল বিলে অনেক জমি চাষ হয় না। আমাদের কাজ হবে একে চাষ করা।...

কৃষকরা কৃষক সম্মেলনে কাজের দৃঢ় সংকল্প এমনি করে গ্রহণ করে : পঞ্চাশ সন যেন আবার প্রত্যাবর্তন করতে না পারে।...

পঞ্চাশ সন চলে যাচ্ছে। ওর দিকে ফিরে চেয়ে ব্যঙ্গ করে তাই বলতে চাই : ক্ষতি তুমি আমাদের অনেক করেছ। কিন্তু পরাস্ত আমাদের করতে পারনি। আর পারবেও না। পারবে না তার প্রথম প্রমাণ, কৃষকরা আজ তোমায় চিনেছে। তুমি কোন পথ ধরে মানুষের জীবনে ঢোকো, সে পথের খোঁজ তারা পেয়েছে। তাই তো তাদের এই দৃঢ় সংকল্প।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো প্রমাণ চাও ? দিচ্ছি : ঢাকা শহরে খাদ্য সম্মেলন হয়ে গেছে। সরকারি কর্মচারী সেলামীভাগের সম্মেলন নয়। প্রত্যেক মহল্লা কমিটির প্রতিনিধিদের সংকল্প সম্মেলন : মহল্লা কমিটিতে সমস্ত শহরবাসীকে আনতে হবে এক করে। এর গলদ দূর করতে হবে...পূর্ণ রেশন আমরা চাই।...

আরো প্রমাণ? রাস্তায় হাঁটি। পাশ দিয়ে যারা যায় তারাই বলে : সত্যি, এ কথাটা এতদিন বুঝতে পারিনি যে, হাতে হাত মিলালে অনেক কাজ করা যায়। হিন্দু-মুসলমান মিললে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। এবার আমরা সে কথা বুঝেছি। মনে প্রাণে বুঝেছি...।

১৩৫০ চলে যাচ্ছে। মৃত্যুর অভিযান শেষ হয়েছে। জীবনের জয়যাত্রা আরম্ভ হয়েছে : সব হারার, সব দুঃখীর, সব দেশপ্রেমিকের, সব তরুণের সম্মিলিত জয় যাত্রা। রোধ করবে কে?

আজ আর আমার মনে সংশয় নাই। দ্বন্দ্ব নাই। ১৩৫০-এর শিক্ষা আমার জীবনেই কি কম বড়? ভালো ছাত্র আজ আমি ভাল ছেলে হয়েছি : দেশের ছেলে, সমাজের ছেলে। জীবনের জয়যাত্রায় আমিও তাই যোগ দিয়েছি।

॥১৯৪৪॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রসঙ্গে

দর্শন মানেই জ্ঞান। তবু জ্ঞানের একাধিক বিশেষ শাখার ন্যায় আজকাল দর্শনকেও একটি বিশেষ শাখা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এর লাভ-ক্ষতির দুটি দিক আছে। বিশেষ হিসাবে এর বিশিষ্ট চর্চার দিক আছে। এর পরাবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি দিকের বিশেষ চর্চার সম্ভাবনার দিক। অপরদিকে বিশেষ হিসাবে এর সাধারণ চরিত্রের লোপ। আজ যুক্তিবিদ্যা আছে, পরাবিদ্যা আছে, নীতিবিদ্যা আছে, মনোবিদ্যা আছে। যেমন আছে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ইত্যাদি। কিন্তু দর্শন বলে আজ আর কিছু নেই। আজ দর্শন যেন অঙ্ক বা ভূগোল বা অর্থনীতি বা ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাকার বিশেষ জ্ঞানের ন্যায় একটি বিশেষ জ্ঞান। যেন দর্শন জীবনের একটি দিক মাত্র : যেমন অর্থনীতি জীবনের একটি দিক, রাজনীতিক জীবন জীবনের একটি দিক। কিন্তু এককালে দর্শনের সাধারণ চরিত্রই প্রধান বলে বিবেচিত হত। সাধারণ চরিত্রই ছিল তার মূল চরিত্র। দর্শনকে বলা হত জ্ঞান-বিজ্ঞানের জননী; বা মাদার অব আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস। কিন্তু আজ যেন জননী থেকে জাত সন্তানগণ : গণিত, যুক্তি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব, সব বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়। এদেরও সন্তান-সন্ততি জন্ম নিয়েছে। অর্থাৎ এককালের জননী বর্তমানের মাতামহীতে পরিণত হয়েছে এবং বৃদ্ধা মাতামহী জীবিত আছে কিনা তা যেমন সন্দেহের বিষয়, তেমনি যদিবা সে জীবিত থেকে থাকে তবু সে মৃতের মতোই কেবল ইতিহাসের বিষয়, বিশ্লেষণের বিষয়, তার এককালের সর্বধারণী চরিত্রের জন্য স্মরণীয় এবং বর্তমানের করুণার বিষয়। দর্শন আজ আর পরাযুক্তি, মন, দেহ, সমাজ, রাষ্ট্র সবকিছুর সম্যক ও সামগ্রিক দৃষ্টি নয়। দর্শন আর জীবনের অনিবার্য সহায়ক নয়। যেন দর্শন বাদেই ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের জীবন সম্ভব যেন ব্যক্তি ও রাষ্ট্র দর্শন বাদেই চলতে পারে। অবশ্য এটাও একটা দর্শন। কিন্তু এ দর্শনেরই যে আজ প্রাধান্য, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। আমার ধারণা দর্শনের এই দর্শন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী বা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর জন্য লোকসানজনক না হলেও এ দৃষ্টিভঙ্গী সঠিকভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের সকলের জন্য, অপামর সকল মানুষের জন্য লোকসানজনক। তাদের জন্য ক্ষতিকর। কারণ দর্শন বাদে মানুষ হয় না। দর্শন, মানুষ মাত্রেরই সচেতন ও অগ্রসরমান জীবন যাপনের জন্য অপরিহার্য। সমাজের প্রাগ্রসর চিন্তাবিদ অর্থাৎ দার্শনিকদের দায়িত্ব হবে মানুষ, সমাজ এবং রাষ্ট্রের সঠিক বিকাশ ও অগ্রগতির জন্য প্রকৃষ্ট ও সামগ্রিক দর্শনের কথা চিন্তা করা; সেই দর্শনকে পরিচিত করা, প্রতিষ্ঠা করা।

দর্শনের ক্ষেত্রে এই লোকসানজনক দৃষ্টিভঙ্গি যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি হয়েছে, এমন মনে করলে ভুল হবে। এরও কার্যকরণ আছে। এরও দায়দায়িত্ব আছে। এ কার্যকারণ অনুসন্ধানের বিষয়।

মোট কথা, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের জীবনে অর্থাৎ সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনে দর্শনের মূল ভূমিকা কী হবে সেটি নির্দিষ্ট করার আজ প্রয়োজন আছে।

আর এই প্রয়োজনবোধের হয়ত স্বাক্ষর আছে বর্তমান দর্শন সম্মেলনের সংগঠকদের দর্শনের পরিধিকে নীতি ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও বিস্তারিত করে দেবার প্রয়াসে।

কিন্তু নীতি ও রাষ্ট্র দর্শনের সংজ্ঞা, তার ভূত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের করণ কারণ নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে তাঁদের মুখপাত্র নির্বাচন যথোপযুক্ত হয়নি। এক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত অযোগ্যতা সম্পর্কে আপনাদের সকলের চেয়ে আমি অধিক সচেতন। আর সেই অতিচেতনা আমাকে অধিকতর সংকুচিত করে দিচ্ছে। তাঁদের এমন নির্বাচনের কারণটি কি হতে পারে– এ প্রশ্ন, এই মুহূর্তে এখানে দাঁড়ানো পর্যন্ত আমি মীমাংসা করতে পারিনি। হতে পারে, দর্শন সম্মেলনের একটি শাখায় সভাপতির পদটি স্থায়ী নয়, অস্থায়ী। এমন কি দুদিনকারও নয়। একদিনকার এবং এর সম্মান, সুযোগ এবং জাগতিক সুবিধা যথার্থ গুণীজনের জন্য মোটেই আকর্ষণীয় নয়। সংগঠকদের সংকটকে আমি বুঝতে পারি। তাঁরা বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন। গুনীকে পাওয়া যায়নি বলে গুরুতর বিষয়টিকে তাঁরা বর্জন করতে চাননি। তাই নির্গুণের উপর দায়িত্ব বর্তেছে। নির্গুণের আর কোন গুণ না থাক 'হুকুম পালনের' একটা গুণ বোধ হয় থাকে।°

*　　　*　　　*

রাষ্ট্রের উৎপত্তি কী করে হয় কিংবা হয়েছে– এ দুটোই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কঠিন প্রশ্ন। মানুষ মানুষের জন্ম দেখেনি। সে অনুমান করে কেমন করে সে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হল। সে সম্পর্কে নানা তত্ত্ব নানা অনুমান। মানুষ রাষ্ট্রবদ্ধরূপে বাস

বাংলাদেশ দর্শন সমিতির বার্ষিক সম্মেলন' ১৯৭৩-এর নীতি ও রাষ্ট্র দর্শন শাখার সভাপতির ভাষণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে। মানুষই রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সে তার আদি রাষ্ট্রীয় সংগঠনটি প্রত্যক্ষ করেনি। তাই রাষ্ট্রের উদ্ভবের প্রশ্নেও নানা তত্ত্ব। নানা অনুমান। কেউ বলেন: ঈশ্বর, আল্লা, গড– এঁরা মানুষের জন্য রাষ্ট্রকে তৈরি করে দিয়েছেন। কেউ বলেন: মানুষ পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করে রাষ্ট্রকে তৈরি করেছে। কেউ বলেন : রাষ্ট্র মানুষেরই ন্যায় ক্রমবিবর্তনের ফল। কিন্তু এই আদি সৃষ্টির তত্ত্ব এবং অনুমানের কথা বাদ দিলে আধুনিক কালেও রাষ্ট্র কাকে বলে, রাষ্ট্র কিসের ভিত্তিতে তৈরি হয়, রাষ্ট্রের মূল উপাদান কী : ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র, না ভাষার ভিত্তিতে রাষ্ট্র–ইত্যাকার প্রশ্ন আজো অমীমাংসিত, বিতর্কিত। এ বিতর্কের মীমাংসায় বড় অবদান তাত্ত্বিকের নয়, জীবনের; অনুমানের নয়, অভিজ্ঞতার। আর সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় আমাদের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা। আদিকালের কথা বাদ দিয়ে আধুনিক কালের কথা ভাবলেও রাষ্ট্রের অভ্যুদয় নিলয় সাধারণ ঘটনা নয়। দিনাদিন রাষ্ট্রের উত্থান কিংবা পতন ঘটে না। নানা কার্যকারণে দীর্ঘ সময়ের পটভূমিতে তা সংঘটিত হয়। সেদিক থেকে বাংলাদেশের আপামর মানুষের অপর কোন গর্বের বিষয় যদি নাও থাকে তবু তার এই গর্ববোধ আছে যে, সে একটি রাষ্ট্রের পতন এবং আর একটি রাষ্ট্রের পত্তন ঘটিয়েছে: একটি রাষ্ট্রের পতন এবং আর একটি রাষ্ট্রের উত্থানকে সে প্রত্যক্ষ করেছে। লক্ষ লক্ষ জীবনের বিনিময়ে তারা তা করেছে। চব্বিশ বছরের দীর্ঘ সংগ্রামের ভিত্তিতে তারা তা করেছে। কিন্তু কালের ইতিহাসে চব্বিশ বছর বিন্দুবৎও নয়। তাই পৃথিবী ব্যাপী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদদের মনকে বাংলাদেশের ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই আলোড়িত করেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রদর্শনের মৌল প্রশ্নে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতার অবদান তাই তাৎপর্যপূর্ণ। এ অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য বিচার বিশ্লেষণের দাবি রাখে। ঘরে বাইরে এ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।

একদিক থেকে দেখতে গেলে একটি রাষ্ট্রের বিভাগ কিংবা একটি নূতন রাষ্ট্রের উদ্ভব আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় ভূগোলে হয়ত কোন অসাধারণ বা বিপ্লবাত্মক ঘটনা নয়। কিন্তু পূর্ববাংলা তথা বর্তমান বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর চিন্তার বিবর্তনে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব একটি বিপ্লবাত্মক ঘটনা।

এই ঘটনা বিপ্লবাত্মক, এর রক্তাক্ত সংগ্রামের জন্যই নয়। এজন্যও নয় যে, এই ঘটনা সৃষ্টির পেছনে রয়েছে লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষের জীবন দান। আধুনিক ইতিহাসের এক তুলনাহীন হত্যাযজ্ঞের পটভূমিতে জন্মলাভ করেছে বাংলাদেশ। শুধু এ কারণেই নয়। কিংবা এ কারণেও নয় যে, বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এখানকার জনসাধারণের শ্রেণী বিন্যাসে আমূল কোন পরিবর্তন ঘটে গেছে কিংবা এর অর্থনীতিতে মৌলিক কোন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তবু এ ঘটনা বাংলাদেশের জনসাধারণের জন্য বিপ্লবের তাৎপর্য বহন করে। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী এবং আরো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুনির্দিষ্টভাবে বললে এই এলাকার মুসলিম জনগোষ্ঠীর চেতনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয় অবশ্যই একটি বিপ্লবাত্মক রূপান্তরের সূচক।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ যেমন কৃষক তেমনি মুসলমান। রাজনীতিকভাবে তার এই ধর্মীয়, সম্প্রদায়গত পরিচয় ভারতীয় উপমহাদেশের সাম্রাজ্যবাদের পরাধীনতার পর্যায়ে প্রধান নিয়ামকের কাজ করেছে। এ কথা ভারতীয় উপমহাদেশের অপর বৃহৎ ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু সমাজের ক্ষেত্রেও সত্য। তার ঐতিহাসিক বিভিন্ন কারণ আছে। সে কারণের বিশ্লেষণে এই উপলক্ষ্যে আমাদের না গেলেও চলবে। কিন্তু বাংলাদেশের জনসাধারণের চেতনার বিকাশে যে কথা গুরুত্বপূর্ণ সে হচ্ছে এই যে, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের পরাধীনতা থেকে ঘোষিত মুক্তির পরবর্তী পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও ধর্মীয় রাষ্ট্রদর্শনই তার চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করেছে। তার ভাষা, সংস্কৃতি, জীবন-জীবিকা, রাজনীতিক অধিকার ভোগ– সর্বক্ষেত্রেরই শেষ নিয়ন্তা ছিল রাষ্ট্রীয় শাসকদের তরফ থেকে ধর্মের দোহাই।

বাঙ্গালী বাংলা বলতে পারবে না, কেননা সে মুসলমান। বাঙ্গালী অর্থনীতিক স্বাধিকার ভোগ করতে পারবে না, কেননা সে মুসলমান। বাঙ্গালী রাজনীতিক অধিকার পাবে না, কেননা সে মুসলমান। আধুনিক কালে শুধু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নয়, রাষ্ট্র পরিচালনের ক্ষেত্রেও ধর্মকে এরূপ সচেতনভাবে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত কেবল সাধারণভাবে নয়, মুসলিম রাষ্ট্র বলে পরিচিত মণ্ডলেও দেখা যায় না। বাংলাদেশের উদ্ভবের ক্রান্তি মুহূর্তে বিভিন্ন জাতীয়-আন্তর্জাতীয় কার্যকারণের সম্মেলন অবশ্যই ঘটেছিল। কিন্তু বাংলাদেশের বিকাশের ক্ষেত্রে যে সত্য অনস্বীকার্য সে হচ্ছে : এই অঞ্চলের জনসাধারণ পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় শাসকদের আরোপিত ধর্মীয় নিগরকে ধারাবাহিকভাবে সেই ১৯৪৭ সাল থেকে তার জীবন ও জীবিকার সংগ্রামের মাধ্যমে ছিন্ন করার প্রাণান্ত লড়াই করেছে। এই সংগ্রামের পরিণামেই বাংলাদেশের সৃষ্টি।

পাকিস্তার সৃষ্টির জন্য পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ যে ইসলামকে ব্যবহার করেছিল তা মূলত বাংলাদেশকে সামিল করার জন্য। পাকিস্তান সৃষ্টির পরেও যে শাসকশ্রেণী ধর্মকে অধিকতর চতুর ও নির্মমভাবে ব্যবহার করেছে সেও বাংলাদেশকে পাকিস্তানের মধ্যে জবরদস্তীর মাধ্যমে রাখার জন্য। ধর্মের ভূমিকা মানুষের জীবনে এক কালে যাই থাকুক না কেন, বাংলাদেশের ঘটনা আবার প্রমাণ করেছে যে, আধুনিককালে ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র রক্ষা সম্ভব নয়। যারা যথার্থভাবে ধার্মিক তারা জানে ধর্মের প্রধান ভূমিকা ব্যক্তির মনে শান্তি দানের। এ ব্যক্তির বিশ্বাসের ব্যাপার। কিন্তু যারা যথার্থরূপে ধার্মিক নয়, যারা শোষক ও মানুষের স্বাভাবিক শান্তি ও বিকাশে অবিশ্বাসী তারা ধর্মকে তাদের শোষণ বজায় রাখার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। শোষিত সাধারণ মানুষের মনে তারা ধর্মের মোহ দৃঢ়মূল করে রাখতে চায়। জনসাধারণকে তারা ধর্মের নামে সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে, অন্ধকার, অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির বিবরে আটকে রাখার চেষ্টা করে। বাংলাদেশ বাস্তবভাবে ধর্মের সেই অপব্যবহারের ষড়যন্ত্রজালকে ছিন্ন করেছে। রাষ্ট্রীয় জীবনে কোন্ উপাদানের কী মূল্য– রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রীয় দর্শনের সে প্রশ্নের একটি দ্ব্যর্থহীন জবাব বাংলাদেশ দিয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে এ নিশ্চয়ই তার এক বিশিষ্ট অবদান। ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র– বাংলাদেশের আজ সার্বজনীন ধ্বনি। সেই 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'-এর ন্যায় এ ধ্বনি আজ ব্যাপক ও সার্বিক।

ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র– এ ধ্বনিকে বলতে পারি আমরা : 'শ্লোগানর অব দি ডে'। এ শ্লোগান দিয়ে রাস্তার দিক নির্দেশক সাইনবার্ড তৈরি হচ্ছে। এ শ্লোগানের ব্যাখ্যা নিয়ে আমাদের সোচ্চার ছাত্র ও যুব সমাজ এবং রাজনীতিক দলসমূহ পরস্পরের রক্তপাত ঘটাচ্ছে : প্রত্যেকে নিজেকে ধ্বনির একমাত্র রক্ষক বলে দাবি করছে এবং অপরকে তার বিরোধী ও ভক্ষক বলে অভিযুক্ত করছে। বাংলাদেশের সংবিধানে এ ধ্বনি মূলনীতি হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এখন আমরা কেবল রোজার মাসেই কাজের সময় অর্ধেক করার দাবি করিনে এবং দুই ঈদে সাতদিন করে চৌদ্দ দিন কাজের বিরাম দিইনে। এখন আমরা পুজো ও বড়দিনের অনুষ্ঠানকেও মান্য করি। বেতার-টেলিভিশন এখন কেবল কোরান তেলাওয়াৎ দিয়ে শুরু করিনে। গীতা এবং বাইবেল পাঠকেও আমরা তার অঙ্গীভূত করেছি। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে তাই দাঁড়িয়েছে, ধর্মে ধর্মে নিরপেক্ষতা। এবং মোটকথা : ধর্মময়তা। ধর্মনিরপেক্ষতার এও এক ব্যাখ্যা। এর অর্থ এই যে, আমরা এখানে দ্বিধাহীনভাবে উপলব্ধি করতে পারিনি যে, ধর্ম হচ্ছে ব্যক্তির বিশ্বাসের ব্যাপার। এবং যেহেতু সে বিশ্বাসের ব্যাপার তাই ধর্ম কেবল একটি, দুটি, তিনটি নয়– তিনশ'টি হতে পারে। তার চেয়েও অধিক হতে পারে।

রাষ্ট্র হচ্ছে সমষ্টিগত ব্যাপার। ব্যক্তির পারলৌকিক বিশ্বাস ও সমষ্টির জাগতিক কর্মকাণ্ড একাকার করে দিলে পরিণামে মঙ্গল না ব্যক্তির, না সমষ্টির। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই উপলব্ধি হয়তো আমাদের বাকি আছে। কিন্তু যেটা জোর দেবার ব্যাপার সে হচ্ছে এই যে, জনতার চিন্তার অর্গল মুক্ত হয়েছে। নতুন অভিজ্ঞতায় নতুনতর সত্য সে উপলব্ধি করবে। কিন্তু পুরোন গুহায় তাকে ফিরিয়ে নেওয়া যে কারুর পক্ষেই দুঃসাধ্য হবে।

যে কথা 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র ক্ষেত্রেও সত্য, সেকথা জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রেও সত্য। বাংলাদেশের মানুষ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক গণ্ডিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতিক্রম করে জাতীয়তাবাদের ধ্বনি তুলেছে। তার অর্থ এই নয় যে, আমরা এমন জাতীয়তাবাদকে আমাদের জীবন ও চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করছি যাতে আমরা সকলে নিজের স্বার্থ না দেখে জাতির স্বার্থই অগ্রে বিবেচনা করি। কিংবা গণতন্ত্র বলতে আমরা নিজের অধিকার ব্যতীত অপরের অধিকারকে স্বীকার করি। এবং সমাজতন্ত্র বলতে সকল অর্থনীতিক অসঙ্গতিমুক্ত ব্যবস্থা আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি কিংবা সে আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য আদর্শ আচরণ আমরা পালন করছি। বিবেচনা করলে এ কথা সত্য যে, এই নীতিসমূহ এখনো ধ্বনি মাত্র, এখনও আওয়াজ। এরা এখনো ভাব। এখনো যথার্থ বস্তু বা বাস্তব নয়। কিন্তু ভাব যেমন বাস্তব অবস্থা থেকেই তৈরি হয়, তেমনি বাস্তব অবস্থাকে সে তৈরিও করে। বস্তুবাদে যেমন ভাব তৈরি হতে পারে না, তেমনি ভাববাদেও বস্তু ও বাস্তব অবস্থা পরিবর্তিত হতে পারে না। বিশেষ করে মানুষের রাষ্ট্রীয় বস্তু, মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সত্তা। তাই একদিক থেকে দেখতে গেলে বস্তুর পরিবর্তনের প্রাথমিক প্রয়োজন ভাবের। কারণ মানুষই বস্তু ও সমাজকে পরিবর্তিত করে। এবং মানুষ ভাব দ্বারা পরিচালিত হয়। তাই ভাবের যেখানে উদ্ভব ঘটেছে বস্তুর পরিবর্তন সেখানে অনিবার্য।

ভাবের ক্ষেত্রে অবশ্য পর্যায়ক্রম আছে। উত্তম-অধম আছে। উত্তম ভাব অধমের চেয়ে, সংকীর্ণতরের চেয়ে, ক্রমবিকাশমান মানুষের সমাজের জন্য শ্রেয় : আমি হরিণ বংশীয় কিংবা সিংহ বংশীয়। এর চেয়ে উত্তম চেতনা হচ্ছে, আমি মুসলমান বা হিন্দু বা বৌদ্ধ বা খ্রিস্টান। কিন্তু তার চেয়েও উত্তম হচ্ছে আমি বাঙ্গালী বা ইংরেজ বা ফরাসি : কিংবা আমি এশিয়, আফ্রিকীয় বা ইউরোপীয়। এবং তার চেয়ে উত্তম হচ্ছে আমি শ্রমিক বা কৃষক বা শ্রমজীবী : আমি সাম্যবাদী। রাষ্ট্র হিসাবে হোক, ক্ষতি নেই। কিন্তু রাষ্ট্র-নির্বিশেষে আমি একদিন সাম্যবাদী এবং মানুষের পর্যায়ে উন্নীত হব। এই পরিচয়গুলোর কোনটিকে উত্তম বা অধম বলা কাউকে বিকাশের পর্যায় নির্বিশেষে নাকচ করা বা গ্রহণ করা নয়। এদের উত্তমতা মানবসমাজ বিকাশের ধারাবাহিক পর্যায়ের সূচক। মানুষ পরিপূর্ণরূপে মানুষে উন্নীত হওয়ার জন্যই অবিকশিত হচ্ছে। তার পথের বাধা, সব অসঙ্গতি, অন্তরায়কে অতিক্রম করে করে সে অগ্রসর হচ্ছে। গোষ্ঠী থেকে সম্প্রদায় ও ধর্মে, ধর্ম থেকে জাতিতে ও রাষ্ট্রে, রাষ্ট্র থেকে মহারাষ্ট্রে এবং শ্রমের ভিত্তিতে সংগঠিত হওয়া, সাম্যবাদী সমাজ তৈরি করা, মানুষের ক্রমবিকাশের, পূর্ণ মানুষের লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার স্মারক। সে দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ধ্বনির সর্বজনীনতা প্রাপ্তি অবশ্যই তার চিন্তার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উত্তরণের সূচক। এর পেছনে ফিরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাওয়া যে কারুর পক্ষেই দুঃসাধ্য। ইতিহাসকে পেছনে নেওয়া যায় না। চেতনালব্ধ মানুষকেও অ-চেতনের গুহায় নিক্ষেপ করা চলে না।

*　　　*　　　*

এই উত্তরণের ধারাটি কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে? কে তাকে সৃষ্টি করেছে? সাধারণ মানুষ তথা জনতা, না বীরপুরুষ তথা নেতা? এ প্রশ্ন বর্তমানে বাংলাদেশের বুদ্ধির জগতে একটি বিশেষ আলোচিত প্রশ্ন। প্রশ্নটি হচ্ছে জনতা ও জননেতার পারস্পরিক ভূমিকার প্রশ্ন। ইতিহাসকে কে সৃষ্টি করে? কে অগ্রসর করে নিয়ে চলে সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রকে? জনতা, না নেতা?

কে জনতা? কে নেতা? ব্যক্তি হচ্ছে নেতা। সমষ্টি হচ্ছে জনতা। দুটি সত্তাই সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সত্য। জনতার আবশ্যক নেতার, পরিচালকের, সংগঠকের। নেতার আবশ্যক জনতার— যাকে সে নেতৃত্ব দিবে, যে তার শক্তির উৎস। জনতা এবং নেতা উভয়ই যেমন সত্য— তেমনি সত্য এদের উভয়ের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। একটিকে বাদ দিয়ে অপরিটির কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এদিক থেকে দেখলে জনতা ও নেতার ভূমিকার প্রশ্নটি কোন সমস্যা বলে বিবেচিত হতে পারে না। কিন্তু উভয়ের মধ্যে বোধ ও সম্পর্কের যে ভারসাম্য সমাজ ও রাষ্ট্রের চালক শক্তি হিসাবে কাজ করে সেই সঠিক বোধ ও ভারসাম্য সমাজ জীবনে দুর্লভ ব্যাপার।

এই উভয় সত্তার সম্পর্কের ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার একটি বড় কারণ, ব্যক্তিনেতা জনতাকে নেতৃত্বদানের দক্ষতাকে ক্রমান্বয়ে বিবেচনা করতে থাকে জনতাকে নিয়ে যেমন ইচ্ছা খেলা করার শক্তি হিসাবে। এই বোধ থেকে ক্রমান্বয়ে জন্ম নেয় জনতার উপর ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ একচেটিয়া ও স্থায়ী করে রাখার প্রবণতা। এবং নেতৃত্বকে স্থায়ী করে রাখার জন্য শুরু হয় নেতার ইমেজ তৈরি থেকে আরম্ভ করে নানা কৃত্রিম মোহ সৃষ্টির প্রচেষ্টা। এবং তখন থেকে শুরু হয় ঘটনা ও ইতিহাসের বিকৃতি। নেতা যেরূপ প্রয়োজন মনে করেন তাঁর স্তাবক, অনুগত ও বাধ্যদের তেমন ইতিহাস রচনার হুকুম দেন। এই বিচ্যুতি প্রধানত ঘটে সফল জননেতার রাষ্ট্রীয় শাসনাধিকার লাভ করার পর। এই বিকার অতীতকালে একনায়কত্ব বা স্বৈরতন্ত্রের রূপ ধারণ করত। আধুনিক কালেও এ বিকার যেকোন রাষ্ট্রেই কম-বেশি প্রত্যক্ষ করা যায়।

জনতার মধ্যে ব্যক্তি যেমন চরিত্রগতভাবে রূপান্তরিত হয়ে যায়, যে ব্যক্তি সেই জনতাকে পরিচালিত করে তার চরিত্রও রূপান্তর লাভ করে। একটা জন সমষ্টি আমার কথায় উঠছে, বসছে : জীবন দিচ্ছে, ডাইনে যাচ্ছে, বাঁয়ে যাচ্ছে। এ যখন আমি দেখি তখন আমার নিজের শক্তি সম্পর্কে অতি আত্মবিশ্বাসের একটা ভাব আমার মধ্যে জন্ম নিতে থাকে। তখন থেকে আমি বিস্মৃত হতে থাকি : আমি জনতার নেতা, আমি জনতার সৃষ্টি। তখন থেকে আমি মনে করি, আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাসকে গড়তে পারি, ভাঙতে পারি, রুখতে পারি। তাকে ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরাতে পারি। নেতার চরিত্রে আত্মবিশ্বাসের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু আত্মবিশ্বাসের আধিক্য আত্মম্ভরিতায় পরিণত হয়ে তাকে সমগ্র সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের জন্য ক্ষতিকর করে তোলে। এর আধিক্য নেতাকে রাজা ক্যানুটে, ষোড়শ লুইতে ও হিটলারে কিংবা পাকিস্তানের জিন্নাহতে কিংবা আইউব খানে পরিণত করে। কেবল সমাজের শোষক শ্রেণীর শাসকদের মধ্যেই যে এই বিকার দেখা যায়, তা নয়। এমন কি সমাজতান্ত্রিক দেশের নেতার মধ্যেও যে ধীরে ধীরে এই আত্মবিশ্বাসের আধিক্য ও অভ্রান্তির বিকার ক্ষতিকর আকার ধারণ করতে পারে স্টালিন চরিত্রের পরিণাম তাকে দৃষ্টান্ত হিসাবে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে। কাজেই জনতা ও নেতার সম্পর্ক ও ভারসাম্যের প্রশ্ন সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

বিপ্লব বা আন্দোলনের সফলতার পরে রাষ্ট্রযন্ত্র যখল দল বা নেতার হস্তগত হয় তখন নেতা যে কেবল একটি আধুনিক রাষ্ট্রযন্ত্রের শাসনের, প্রচারের, দমনের সর্বপ্রকার বিস্ময়কর কৌশলের অধিকারী হন এবং এই ক্ষমতা থেকে যে তাঁর মনে এক অমিত শক্তি বোধের সৃষ্টি হয় তাই নয়। এর অপর একটি দিক আছে, যে দিকটি নেতার নিজের জন্যও ক্ষতিকর। নেতা একদিকে নিজেকে যত শক্তিধর ও স্বাধীন বলে মনে করতে থাকেন অপর দিকে তিনি তত পরাধীন, বন্দী এবং জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করেন। বিষয়টি পরস্পর বিরোধী বলে বোধ হলেও বাস্তবে সত্য শক্তি স্তাবকের জন্ম দেয়। যে শক্তিধর, যে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা কিংবা যে বিস্ময়কর বাগ্মীতা, সাংগঠনী প্রজ্ঞা এবং সাহসের অধিকারী তেমন চরিত্র, তেমন নেতার উপর বিশেষ করে রাষ্ট্রযন্ত্র তার করায়ত্ত হওয়ার পর থেকে, প্রশংসা ও তোষামদের বারি ধারা বর্ষিত হতে থাকে। তখন স্বর্গে মর্ত্যে যা কিছু ঘটে তা নেতার কারণে ঘটে। রাষ্ট্রে যা কিছু মহৎ যা কিছু বৃহৎ– সবকিছুর মূল নেতা : এই স্তুতি শত শহস্র লক্ষ মুখে ঘোষিত হতে থাকে। প্রশংসার উত্তেজক যেকোন মাদকদ্রব্যের চেয়ে তেজী, অদম্য, প্রতিবাদহীন এবং দিনের পর দিন বিরামহীনভাবে বর্ষিত স্তুতি ও প্রশংসার মাদকে মত্ত না হওয়ার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে একান্তই বিরল। বস্তুত নেতার চারিদিকে ক্রমে স্তাবক ও বিভ্রান্তিকারীদের এক দুর্ভেদ্য সুউচ্চ প্রাচীর সৃষ্টি হয়ে যায়। এই প্রাচীরের মধ্যে নেতা বন্দী হয়ে পড়েন। বাস্তব সত্য থেকে তিনি ক্রমাধিক পরিমাণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। দূরের দৃষ্টিতে তাঁকে এই প্রাচীরের মধ্যে অসহায় বলে বিবেচনা করাই সঙ্গত। তাঁর বন্দীত্বের একমাত্র বৈশিষ্ট্য এই যে, নেতা নিজেকে বন্দী মনে না করে নিজেকে রাজা বলে বিবেচনা করেন। এই রাজার মনস্তুষ্টির জন্য স্তাবক, অনুগত ও বাধ্যের দল সদা প্রস্তুত। নেতর নামে তারা সকল পথ ঘাট, বাজার বন্দর গ্রামগঞ্জ নদী সাগর পাহাড়কে অভিহিত করতে থাকে। নেতা যদি বলেন : আজ আকাশটা সুন্দর,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমনি স্তাবক ও অনুগতের দেয়ালে তার সজোর প্রতিধ্বনি জাগে : আহা! কি সুন্দর, কি সুন্দর, কি সুন্দর!!! নেতা যদি জিজ্ঞেস করেন, আমার শাসন কেমন চলছে? অমনি সহস্র মুখে জবাব আসে : এমন হয় না! এমন হয় না, এমন হয় না! নেতা আদেশ দেন, সবাইকে কাজ করতে হবে সারাদিন এবং সারা রাত। সবাইকে ত্যাগ করতে হবে। তখন সমস্বরে জবাব আসে, তা আর বলতে! তা আর বলতে! যদি তিনি খোঁজ করেন, সবাই ঠিক মতো কাজ করছ তো? অমিন দুর্ভেদ্য সে দেয়াল জবাব দেয় : অবশ্য! অবশ্য! এবং নিজেদের জান বাঁচিয়ে অপরের জানের বিনিময়ে তারা নথিপত্র তৈরি করে নেতার সামনে হাজির করে : এই দেখুর যারা অবিশ্বাসী, যারা বিরোধী, যারা রাষ্ট্রের শত্রু, যারা সাবভারসিভ তাদের শূলে চড়ানো হয়েছে, কারাগারে বন্দী করা হয়েছে, কাজ থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ার অধিক বর্ণনাদান নিষ্প্রয়োজন। আধুনিক রাষ্ট্রযন্ত্রের পর্যবেক্ষক মাত্রের নিকটই এ প্রক্রিয়া পরিচিত। খলিফা হারুনর রশীদের কালটা অনেক আগের কাল। তাতে এত জটিলতা ছিল না। তবু তাঁর নাম প্রচারিত উপাখ্যান থেকে মনে হয় হারুনর রশীদ বাদশাহ এই বন্দীত্বের বিষয়ে কিছুটা যেন সচেতন ছিলেন। তাই তিনি রাত্রির অন্ধকারে ছদ্মবেশে সেই বন্দীত্বের প্রাচীর টপকে তার নগর রাজধানীর জনতার অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়িয়ে আর কিছু না হোক নিজের স্বাধীনতা কিছু বোধ করতে চাইতেন। কিন্তু আজকের রাজার নিরাপত্তার প্রশ্ন আছে। আজ যে রাজা যত বড়, তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা তত অধিক। তাই কারাগার থেকে পলায়ন আজ তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। এ বন্দীত্ব তার আমৃত্যু বন্দীত্ব। যথার্থই সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর। বিশেষ করে একটি সমাজতান্ত্রিক কিংবা একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য, যে রাষ্ট্রের বিকাশের জন্য প্রয়োজন শাসক ও শাসিতের মধ্যে সঙ্গতিপূর্ণ ও বাস্তব ভিত্তিক সম্পর্কের। মিথ্যা ও বিরোধের সম্পর্কের নয়।

এই বিকার পরিহারের অভ্রান্ত কোন উপায় এখনো আবিষ্কৃত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এর একমাত্র পথ হচ্ছে জনতার চেতনার বৃদ্ধি। আর এই চেতনাবৃদ্ধির উপায় হচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্র ও সমাজ জীবনের সর্বত্র গণতান্ত্রিক অধিকারের যথার্থ প্রসার ও প্রয়োগ। শিক্ষাকে সার্বজনীন করে দেওয়া। জনতার মনে ক্রমাধিক পরিমাণে ও সার্বিকভাবে কারিগরী ও মানবিক জ্ঞানের মাধ্যমে এমন চেতনার সৃষ্টি করা যেন জনতা অর্থাৎ জনসমষ্টির প্রতিটি ব্যক্তি একদিকে দায়িত্ববোধ সম্পন্ন এবং অপর দিকে আত্মশক্তির বিশ্বাস সম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে; যেন জনতা মনে করতে পারে, নেতা কিংবা নেতৃত্ব, এবং সরকার বা সংগঠন যেমন তার প্রয়োজন তেমনি নেতা, নেতৃত্ব ও সরকারের স্রষ্টা সে নিজে। এবং কোন নেতাই জনতার চেয়ে বড় নয়; কোন নেতাই অপরিহার্য কিংবা অপূরণীয় নয়। নেতার বদলে নেতাকে সে সৃষ্টি করতে পারে। নেতার সে জনক। ব্যক্তি নেতা কিংবা কতিপয় ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকার ক্ষণস্থায়ী। তার ভ্রান্তি আছে। তার বার্ধক্য আছে। তার মৃত্যু আছে। কিন্তু জনতা তথা জনসমষ্টির মৃত্যু নেই।

মোটকথা মানুষ তথা জনতাই ইতিহাস তৈরি করে। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের ন্যায় আমরা ইচ্ছামতো রাষ্ট্র তৈরি করতে না পরালেও মানুষই রাষ্ট্র তৈরি করে। কিন্তু রাষ্ট্র একটি জটিল সংস্থা। নেতা ও নীতি উভয়েরই একটা চেতনা থাকা দরকার যে রাষ্ট্রের বিকাশেরও নিয়ম কানুন আছে। সে নিয়ম ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছাকে অতিক্রম করে যায়, সে ব্যক্তি যতো বৃহৎই হোক না কেন। তা না হলে বৃহৎ ব্যক্তি বা বীর যদি ইতিহাসের একমাত্র নিয়ন্তা হতো তাহলে বীরদের ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকে অতিক্রম করে মানুষ, তার সমাজ ও রাষ্ট্র অগ্রসর হয়ে বর্তমান মুহূর্তটিতে এসে উপস্থিত হতে পারত না। তাহলে জিন্নাহ সাহেবের হুকুমই আমাদের জীবনের শেষ নিয়ামক হত। আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের মোহমুদগরই আমাদের সকল চিন্তা ও চেতনাকে রুদ্ধ করে দিত এবং ইয়াহিয়া খানের মদালস রক্তচক্ষু ও মারণাস্ত্র আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দিত।

ইতিহাসকে আমরা সাধারণ মানুষেরা কেবল সৃষ্টিই করি না। আমাদের এ চেতনাও থাকা আবশ্যক যে সৃষ্ট ইতিহাস আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জও বটে। ইতিহাসের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে মানুষের জন্য ক্রমাধিক পরিমাণে সঙ্গতিপূর্ণ স্বাভাবিক ও মানবিক জীবন : মানবিক সমাজ রাষ্ট্র, অর্থনীতিক ব্যবস্থা এবং সভ্যতাকে সৃষ্টি করার। অতীত থেকে যে নেতা, যে শ্রেণী, দে দল যত অধিক শিক্ষা গ্রহণ করে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে সেই শ্রেণী এবং সেই দল তত ইতিহাসের বিকাশের সহায়ক শক্তি বলে পরিগণিত হবে। আর যে শ্রেণী, যে দল, যে নেতা, এ শিক্ষা গ্রহণে যত ব্যর্থ হবে, সে তত সেই বিকাশের প্রতিবন্ধক হিসাবে পরিগণিত হবে। কিন্তু কারুর প্রতিরোধ ও প্রতিবন্ধকতাই মানুষের বিকাশকে রুদ্ধ করে রাখতে পারবে না।

* * *

বাঙ্গালী ইতিহাস তৈরি করেছে। কিন্তু ইতিহাস বাংলাদেশে উপনীত হয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়নি। তার দাবি অতীতের চেয়ে বৃহত্তর ও জটিলতর। এ দাবি পূরণের দায়িত্ব কেবল একজন নেতার নয় : সকল বাঙ্গালী : বাংলার শ্রমজীবী জনতার। অতীতের জন্য গর্ব ও গৌরববোধ যদি আমাদের থাকবে, বর্তমানের এ দায়িত্ববোধও যেন আমাদের সকলের মধ্যে জাগ্রত হয় : বর্তমানের সংকটকালে সাধারণ ব্যক্তি হিসাবে এটুকুই মাত্র আমার কামনা।

॥১৯৭৪॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি আন্দোলনের শক্তি এবং সীমাবদ্ধতা

[ভাষা আন্দোলন]

আধুনিক মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে আন্দোলন, মুভমেন্ট ইত্যাদি শব্দ খুব পরিচিত। মানুষের সামাজিক যৌথ জীবনে আন্দোলনই শক্তি। আন্দোলন ব্যতীত বাস্তব পরিস্থিতির কাম্য পরিবর্তন সাধারণত সংঘটিত হয় না। এটি বিশেষভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে সত্য। রাষ্ট্রীয় জীবনে শাসন বা আইনগত কোন পরিবর্তন সাধনের জন্য আমরা আন্দোলনের আশ্রয় গ্রহণ করি। আমরা আন্দোলন তৈরি বা সৃষ্টি করি। কিংবা আন্দোলন তৈরি হয়। এরূপ আন্দোলনের বিষয়টি সামনে রেখেই কয়েকটি কথা বলা যায়।

আন্দোলন আমরা কাকে বলব? একথা ঠিক যে আমাদের সাম্প্রতিক জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখি, কোন অন্যায় কার্য কারু দ্বারা সাধিত হলে ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষক কেউ নিহত হলে আন্দোলনের সূচনা ঘটে। কিংবা এরূপ ঘটনা থেকে আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এ কথাও আবার সত্য যে, কেবল সামাজিক জীবনে নয়, রাজনৈতিক জীবনেও যে কোন হত্যাকাণ্ড বা কারু চোখে অন্যায় বলে অনুভূত কার্য সংঘটিত হলেই তাৎক্ষণিকভাবেই আন্দোলন সংঘটিত হয় না। আন্দোলন কোন এক দিকের ব্যাপার নয়। আন্দোলন সাধারণত একটি প্রক্রিয়ার ব্যাপার। সূচনাতে এর প্রকৃত অবয়বটি প্রকাশিতও হয় না। অনেক সময়ে আন্দাজও করা যায় না, কালক্রমে এ কী অবয়ব বা রূপ গ্রহণ করবে। একটি আন্দোলন রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক জীবনের দীর্ঘ সময়গত ব্যাপার।

মোটকথা, বলা চলে যে, ঘটনা মাত্রই আন্দোলন নয়। একটি হত্যাকাণ্ড, একটি প্রতিবাদ, একটি মিটিং বা মিছিলই আন্দোলন নয়। এরা অবশ্যই আন্দোলনের উপাদান বা উপকরণ। কিন্তু একটি লক্ষ্য সাধনের জন্য, কোন অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য কোন হত্যাকাণ্ডের হত্যাকারীর বিচারের জন্য, কোন প্রচলিত আইন বা নিয়মের পরিবর্তনের বা রাষ্ট্রীয়ভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য [বাংলার ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি], কোন সংবিধান তৈরি বা রচনার জন্য যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন জনসমষ্টি পৌনঃপুনিক ও ধারাবাহিকভাবে প্রতিবাদ, মিটিং, মিছিল প্রভৃতি যৌথ বা যূথবদ্ধ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকে এবং তার ফলশ্রুতিতে যদি সমাজ জীবনে একটা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াগত আবেগ তৈরি হতে থাকে তবে তা একটা আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে। এরূপ আন্দোলনের দৃষ্টান্ত আমাদের অভিজ্ঞতাতেও বিরল নয়। স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতি দানের দাবি, পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা প্রভৃতিকে আমরা আন্দোলন বলে অভিহিত করি।

আন্দোলন একটি সামাজিক ঘটনা। ব্যক্তি দ্বারাই ঘটনা সংঘটিত হয়। কিন্তু আন্দোলন ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, এটা সামাজিক ব্যাপার। ব্যক্তি আন্দোলনের মধ্যে বেশ কিছুটা রূপান্তরিত হয়ে যায়। বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হিসাবে যা সে করে না বা করতে পারে না, জনদল বা মোর্চা বা জমায়েতের মধ্যে সে কাজে সে ভীত বা চিন্তিত হয় না। এর ভালো-মন্দ দুইই আছে।

হিন্দু-মুসলমান দুটি সম্প্রদায়ের সাম্প্রতিক দ্বন্দ্বকেও আমরা আন্দোলন হিসাবে দেখেছি। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে অখণ্ড ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা এবং হিন্দুর হাতে মুসলমান দলন এবং মুসলমানদের হাতে হিন্দু আক্রমণ একটা পৌণঃপুণিক, ধারাবাহিক ঘটনা ছিল। ব্যক্তি হিসাবে যারাই এরূপ ঘটনার মূলে থাকুক না কেন, এসব ঘটনা সম্প্রদায়গতভাবে একটা আবেগের সৃষ্টি করত, যে আবেগের মধ্যে ভালো-মন্দ নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান উভয়ই যৌথভাবে আলোড়িত, উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হয়ে উঠত।

একটি আন্দোলনের মূল্যায়ন কোন বিশেষ সমাজে বা সময়ে সাধারণত সকলের দ্বারা একইরূপে অর্থাৎ ঐক্যমতের ভিত্তিতে হয় না। কারণ, কোন আন্দোলন সামাজিক জীবনে একটি লক্ষ্য অর্জনের উপায়। এবং লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত বিষয়টিকে কাম্য অ-কাম্য বিচেনার ভিত্তিতে আন্দোলনটির মূল্য নিরূপিত হয়। আমাদের মতো শ্রেণীবিভক্ত সমাজে একটি আন্দোলন কদাচিৎ একইভাবে মূল্যায়িত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলন অর্থাৎ সকলের আন্দোলন বলে অভিহিত করা হলেও তার মূল্যায়নও সমাজ বা দেশের সকল শ্রেণীর সকল প্রতিভূর হাতে একইরূপে সাধিত হয় না।

কথাটি বলা হল এজন্য যে, স্বাধীনতার আন্দোলন বা ভাষা আন্দোলন জাতীয় আন্দোলন অর্থাৎ দেশ বা জাতির বিভিন্ন শ্রেণী এতে জড়িত হলেও এই আন্দোলনের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মূল্যায়নকারীর শ্রেণীগত ভাবটিই অধিক প্রতিফলিত হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি আন্দোলনে শক্তি ও সীমাবদ্ধতা তাৎপর্যের মূল্যায়ন স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় যে শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহ সর্বাধিক লাভবান হল তার থেকে যে শ্রেণীর সাক্ষাৎলাভ তত প্রত্যক্ষ নয় তার মূল্যায়ন পৃথক হতে বাধ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি আন্দোলনকে সমাজের কোন একটি শ্রেণী বা তার কোন অংশ প্রগতিশীল বলে বিবেচনা করতে পারে। একুশের ভাষা আন্দোলনকে পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ, বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী, বিশেষ করে তার সমাজতন্ত্রী মনোভাবাপন্ন অংশ প্রগতিশীল আন্দোলন বলে বিচেনা করে এবং সেরূপেই তাকে অভিহিত করে।

কিন্তু এই আন্দোলনকে পূর্ববাংলার মুসলিম লীগ সরকার এবং এই সরকার সমাজের যে অংশের [প্রধানত সামন্তবাদী] তখন প্রতিনিধিত্ব করত তারা প্রগতিশীল বা বাঞ্ছনীয় বলে স্বীকার করেনি। সে কারণেই তারা সচেতনভাবে এই আন্দোলনকে জোরের মাধ্যমে দমন করার এবং অপপ্রচারের মাধ্যমে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে।

'৫২-এর ভাষা আন্দোলনকে কেন পূর্ববাংলার রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আন্দোলন বলা হয়? পূর্ববাংলার সমাজজীবনে '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনই একমাত্র আন্দোলন ছিল না। ইংরেজদের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভের পরও [পূর্বে তো বটেই] ময়মনসিংহে, শ্রীহট্টে, চট্টগ্রামে কৃষকদের সংগ্রামমূলক ঘটনা বা আন্দোলন এবং বাংলা ভাষার বিশেষ মর্যাদার দাবিতে '৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনও ছিল।

AMARBOI.COM

২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা বিশিষ্ট বলে বিবেচিত হওয়ার কারণ কোন ছাত্র হত্যা নয়। '৪৭ থেকে '৫২ পর্যন্ত সময়কালের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শাসনগত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় এর অন্যতম কারণ। এগুলো বিভিন্ন আলোচনাতে পটভূমি হিসাবে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে।

বদরুদ্দীন উমর তাঁর প্রখ্যাত 'ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি'তে '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিটি বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।

বাস্তব জীবনে বৃহৎভাবে কারণ পুঞ্জীভূত না হলে দৃশ্যত বড় ঘটনা এবং বৃহৎ আন্দোলনের সৃষ্টি হয় না। প্রাচীন পণ্ডিত এ্যারিস্টটল যথার্থই বলেছিলেন, গভীরে কারণ না থাকলে যেমন রাষ্ট্রীয় জীবনের পরিবর্তনকারী ঘটনা সংঘটিত হয় না, তেমনি আপাত দৃষ্টিতে সামান্য উপলক্ষ্যেও যদি বৃহৎ ঘটনা সংঘটিত হয় তাহলে বুঝতে হবে, গভীরে অবশ্যই কারণ রয়েছে।

একুশের ঘটনা ও আন্দোলন ইতিপূর্বকার কোন ঘটনার চেয়ে ব্যাপকতর গভীরতরভাবে পূর্ববাংলার সমাজের সকল অংশ : কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত এবং উদীয়মান ধনিক শ্রেণী– সকলকে আলোড়িত করেছিল। তবে তা এ জন্য যে, এরা সকলে ছাত্রদের খুব আবেগাপলুতভাবে ভালোবাসত। একুশের ঘটনা সকল শ্রেণী সকল অভিযোগের প্রতীকী বিস্ফোরণ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ইতিহাসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ রকম দৃষ্টান্ত আরো আছে যেখানে কোন বিশেষ ঘটনা তার নিজস্ব শক্তির কারণে তত নয়, যত তার সঞ্চিত পটভূমির কারণে বিশিষ্ট বলে চিহ্নিত হয়েছে।

ফরাসি বিপ্লবের গোড়াতে বাস্তিলের উপর জনতার সশস্ত্র আক্রমণ রাশিয়ার ১৯০৫ সারে রক্তাক্ত রবিবারের হত্যাকাণ্ড, চীনের ১৯১৯ সালের ৪ মে, ভারতবর্ষে ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগ, ১৯৪৬ সালের নৌ বিদ্রোহ প্রভৃতিকে আমরা এ দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করতে পারি।

এরূপ সময়ে একটি ঘটনা কেবলমাত্র ঘটনা বলে অনুভূত না হয়ে বিপুল আবেগের আধার হিসাবে প্রতিভাত হয়। একটি আন্দোলনে প্রজ্ঞা ও শক্তির অধিকারী ব্যক্তিকে নেতার যেমন প্রয়োজন হয়, অনেক সময় এরূপ ঘটনাই সেরূপ শক্তির উৎস বলে বিবেচিত হয়। আন্দোলন বা ঘটনাই নেতৃত্বের রূপ ধারণ করে এবং পরবর্তিতে তার স্মৃতিচারণে বা তার পুনরাবৃত্তিতে তাকে লক্ষ্য করেই সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে।

কিন্তু ব্যক্তির আবেগ যেমন, কোন ঘটনা বা আন্দোলনের আবেগও তেমনি একই স্তরে চিরস্থায়ী হয় না। তার উঠতি-পড়তি আছে। বিশেষ করে যে মুহূর্তটিকে এই আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষ চরম বলে বিবেচনা করে সেই মুহূর্তটি অতিক্রান্ত হলে আন্দোলনটির ভাটার পর্যায় শুরু হয়। এবং যতক্ষণ না অর্থাৎ যতদিন না পূর্বের আন্দোলনের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী অপর কোন ঘটনা বা আন্দোলন সংঘটিত হয়, ততক্ষণ ভূতপূর্ব আন্দোলনকেই এর সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষ, বিশেষ করে আন্দোলনের কর্মীদল তার শক্তি, সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতার দিক থেকে আলোচনা করতে থাকে।

১৯০৫-এর বিপ্লবী আন্দোলন পর্যুদস্ত হওয়ার পরবর্তীকালে রাশিয়ার আন্দোনলকারী সংগঠনগুলির ক্ষেত্রে এমনটি হয়েছিল।

বাস্তব কারণে বাস্তব জীবনে নতুনতর আন্দোলন যখন অনুপস্থিত থাকে তখন কর্মীদল বা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন সংগঠনের এমন আলোচনা চরমভাবে বিমূর্তরূপ ধারণ করতে পারে এবং এমন একটি আন্দোলনের শক্তি ও সীমাবদ্ধতা বিমূর্ত আলোচনা কর্মীদলের মধ্যে নানা অস্পষ্টতা, কুয়াশা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে।

এখানেও ১৯০৫-এর পরবর্তীকালের রাশিয়ার রাজনৈতিক দলসমূহের আভ্যন্তরীণ অবস্থা স্মরণ করা যায়।

সমাজ পরিবর্তনকারী বাস্তববাদী কর্মীদলের জন্য এমন অবস্থায় যা লাভজনক তা হচ্ছে এই ভাটার কালে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন বা ঘটনার জন্য অস্থিরতা পরিহার করে শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে যত অধিক সম্ভব ঘনিষ্ঠতা তৈরি করা, তার প্রতিদিনকার কর্মকাণ্ডে, জীবনে বেঁচে থাকার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রচেষ্টা বা সংগ্রামে যুক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকার চেষ্টা করা। এবং কোন একটি আন্দোলনকেই সমস্ত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম বলে বিবেচনা না করা।

যেকোন আন্দোলনের যেমন কারণ থাকে, তেমনি জনসমাজের মধ্যে সেই কারণে উপলব্ধির গভীরতার মধ্যেই তার সম্ভাবনা ও শক্তি নিহিত থাকে। একটি আন্দোলনের একাধিক কারণ থাকতে পারে। [যেমন ভাষা আন্দোলন] এবং সেই একাধিক কারণকে সমাজের একাধিক অংশ একাধিক মূল্যায়নে বা পরিমাপে বিচার করতে পারে।

'৫২-এর ভাষা আন্দোলন সেরূপ একটি আন্দোলন। এর কারণ যেরূপ একাধিক, তেমনি এর মূল্যায়নও একাধিক। মধ্যবিত্তের উপর অংশের এক মূল্যায়ন, উদীয়মান ধনিকশ্রেণী এবং সংগ্রাম শেষে সেই উদীয়মান শ্রেণীর ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় এক মূল্যায়ন; শ্রমজীবী মানুষের বিশেষ করে শ্রমিক ও কৃষকের সংগঠনসমূহ এবং তার কর্মীদলের আর এক মূল্যায়ন।

'৪৭ সালের পরবর্তী '৪৮ সালের আন্দোলনের কথা বাদ দিয়ে '৫২ সালের আন্দালনের এরূপ মূল্যায়নের কথা ধরলে ['৪৭ থেকে '৫২ পর্যন্ত অভিজ্ঞতা যার পটভূমি] আমরা বলতে পারি, শাসক শ্রেণী [সমাজের উঠতি ধনিক ও সামন্তবাদী শ্রেণীসমূহ] যে অংশ সরকারে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তারা চেয়েছিল [অত্যাচারের মাধ্যমে আন্দোলন দমন করতে ব্যর্থ হয়ে] ভাষার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়ে ভাষা আন্দোলনে সৃষ্ট আবেগের পরিসমাপ্তি ঘটাতে। অপরদিকে যেহেতু ভাষা আন্দোলন ছিল প্রতীক বিশেষ, বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন লক্ষ্যের প্রতিভূ, তাই শাসনের বাইরে ছিল যে উঠতি ধনিক ও মধ্যবিত্ত তারা ভাষা আন্দোলনের আবেগকে ব্যবহার করেছে নিজেদের লক্ষ্য সাধনের চেষ্টায়। তাদের শাসক-ক্ষমতার যাওয়ার লক্ষ্য বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধীনতার লক্ষ্যের সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছিল। কারণ বাংলাদেশকে স্বাধীন করা ব্যতীত পূর্ববঙ্গের এই শ্রেণীর পক্ষে শাসনের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়া অধিকতর অনিশ্চিত ও কষ্টকর ছিল। এ শ্রেণীগুলো এবং তাদের সচেতন সবাক মুখপাত্রদের কাছে তাই ভাষা আন্দোলনের সম্ভাবনা বা শক্তি ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষার অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে আনুষ্ঠানিক সাংবিধানিক স্বীকৃতিতে শেষ হয়ে যায় নি। সেরূপে শেষ হতে দেওয়া তাদের স্বার্থবহ ছিল না। আর সে কারণেই ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা পর্যায় পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি ধনিক শ্রেণী থেকে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী পর্যন্ত সকলের জন্য [এদের মধ্যকার কোন ক্ষুদ্রতর দল বা অংশের ভিন্নতর কোন ভূমিকার কথা বড় নয়] ছিল সংগ্রামী তাৎপর্যপূর্ণ। এরা ভাষার স্বীকৃতিকে অতিক্রম করে দেশের স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধীনতার দাবিকে এর অন্তর্গত তাৎপর্য হিসাবে গ্রহণ করে ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি দিবসকে নতুন সংগ্রামের উদ্বোধন হিসাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলে ধরার চেষ্টা করছে। ৭১ সাল পর্যন্ত একুশের স্মৃতি উদযাপন যে যথার্থই সংগ্রামী আবেগের সৃষ্টি করতে সক্ষম ছিল তার কারণ পূর্ব বাংলার কোন শ্রেণীর মূল স্বার্থগত দাবি তখন পর্যন্ত পূরিত হয়নি। শ্রমিক কৃষকের সচেতন সংগঠনগুলি জাতীয় এই আন্দোলনে শরীক হয়েছিল এ কারণে নয় যে, তারা মনে করত স্বাধীনতা অর্জন মাত্রই তাদের শ্রেণীগত দাবি পূরণ হয়ে যাবে। তারা যোগদান করেছিল এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে যে, স্বাধীনতা একটি পর্যায় বা স্তরবিশেষ, যা অর্জনের মধ্য দিয়ে তাদের শ্রেণীগত মুক্তির দাবি নিয়ে অগ্রসর হওয়ার পথ অধিকতর প্রশস্ত হতে পারবে।

'৭১ সালে একুশে ফেব্রুয়ারী তথা তার স্মৃতি দিবসের তাৎপর্যের একটি নির্দিষ্ট পর্যায় অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পর্যায় অতিক্রান্ত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা প্রত্যক্ষভাবে যাদের স্বার্থ কমবেশী পূর্ণ করে [উঠতি ধনিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী] তাদের বেশ একটা সংখ্যা এবং অংশ শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবার যে মধ্যবিত্ত প্রত্যক্ষভাবে শাসক না হয়েছে তাদেরও জীবিকার ক্ষেত্রে পাকিস্তান পর্যায়ের চেয়ে সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত হয়েছে অধিকতর পরিমাণে। সেদিক থেকে শাসকশ্রেণী হিসাবে সরকার এবং সরকারের বাইরের মধ্যবিত্ত দলগুলির লক্ষ্য বেশ পরিমাণে ১৯৭১ সালে অর্জিত হয়ে গেছে একথা বলা যায় এবং সে পরিমাণে এই সমস্ত শ্রেণী ও তাদের মুখপাত্র রাজনৈতিক দলগুলির কাছে [এ সমস্ত দল যতই বিপ্লবী রাজনৈতিক শ্লোগান উচ্চারণ করুক না কেন] একুশ তার তাৎপর্য হারিয়েছে। এখন এ সমস্ত শ্রেণীর স্বার্থ হচ্ছে নিজেদের স্বাধীনতা লব্ধ ফলসমূহকে মজবুত করা। নতুনতর শ্রেণী সংগ্রাম বা আঘাতে তাদেরকে বিনষ্ট হতে দেয়া নয়। এ কারণে ১৯৭১ এর পর এই মধ্যবিত্ত দলগুলির পক্ষে একুশে ফেব্রুয়ারির স্মৃতি দিবস খুব গুরুত্বের সঙ্গে এবং সংগ্রামী কোন লক্ষ্য সামনে রেখে পালন করা সম্ভব নয়। এদের কেউ কেউ এ দিবসে জাতীয় সংহতির কথা বলতে পারে, কেউ বাংলা ভাষার সার্বজনীন ব্যবহারের কথা বলতে পারে [তাও তত গুরুত্বের সঙ্গে নয়। কারণ, ভাষার সার্বজনীন ব্যবহার শিক্ষা ও চেতনার বিস্তার ও সার্বজনীনতার সঙ্গে যুক্ত]। কেউ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধির কথাও বলতে পারে। কিন্তু এদের কারুর পক্ষে শ্রমিক কৃষকের মুক্তি তথা ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপের মাধ্যমে নিজেদের মালিকানাগত স্বার্থ [সে মালিকানা যতই ক্ষুদ্র হোক] বিপন্ন করে যৌথ মালিকানা অর্জনের আওয়াজ জীবনপণ সংগ্রামী তেজের সঙ্গে উত্থাপন এবং তেমন আন্দোলন পরিচালনা করা অসম্ভব। শ্রেণী হিসাবে ধনিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিকট ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য অর্থাৎ একে নতুনতর সংগ্রামের প্রতীক হিসাবে ব্যবহারের শক্তি অতিক্রান্ত হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এই সত্যটি বিভিন্ন মধ্যবিত্ত সংগঠনের কিংবা শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যবিত্ত কর্মীও উপলব্ধি করতে পারেন না বলে তাঁরা ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিতে শহরে বন্দরে নতুন আবেগে কেন জাগরিত হয় না, তা নিয়ে আফসোস করেন এবং অনেকে ভাষা আন্দোলন তার লক্ষ্য সাধনে ব্যর্থ হয়েছে মনে করে মর্মাহত হন। এই অবাস্তব বোধ থেকে অনেক কর্মীর মনে জনতা তথা জনতার সংগ্রামী আন্দোলনের সার্থকতার ব্যাপারে সন্দেহের উদ্রেক হয়। তাঁরা আন্দোলন বা সংগঠন— সব কিছু নিরর্থক, এমন সিদ্ধান্তে আসার প্রবণতা দেখান।

একটি ব্যক্তির শক্তির বা সম্ভাবনার সীমাবদ্ধতা থাকে এবং সে সীমাবদ্ধতা প্রধানত তার শ্রেণীগত অবস্থান দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। [কোন ব্যক্তি সে শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারে তার সচেতন চেষ্টা দ্বারা। কিন্তু সেটা ব্যতিক্রম। সাধারণ নিয়ম বা সার্বজনীন ও স্বাভাবিক সত্য নয়] তেমনি একটি আন্দোলনের শক্তি বা তার সম্ভাবনাও সীমাবদ্ধ হয় সেই আন্দোলনের শ্রেণীগত চরিত্র, সম্পর্ক ও অবস্থান দ্বারা।

কৃষকের জমি বা ফসলের দাবি একান্তই তার শ্রেণীগত দাবি। শ্রমিকের শ্রমের সময়, মজুরী নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং চরমে সমাজের সকল সম্পদের উপর তার সামাজিক মালিকানার দাবি একান্তই তার শ্রেণীগত। এ জন্য শ্রমিকের শ্রমিকরাজ কায়েমের দাবি বা আন্দোলন একটা শ্রেণীবিভক্ত সমাজ বা দেশের জাতীয় বা সার্বজনীন আন্দোলন হিসাবে বিকাশ লাভ সাধারণত করে না যতক্ষণ না শ্রমিক শ্রেণী তার সংখ্যায় সাংগঠনিক শক্তিতে চেতনায় ও গুরুত্বে দেশের প্রধান শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের মতো একটি আন্দোলন [স্বাধীনতা আন্দোলনও] এক এক সময়ে জাতীয় অর্থাৎ সর্বশ্রেণীর আন্দোলন বলে প্রতিভাত হতে পারে বা হয় যখন সেই আন্দোলনকে দেশ বা সমাজের প্রত্যেকটি শ্রেণী [বা অধিকাংশ শ্রেণী] কোন একটি বিশেষ সময়ে তার নিজ নিজ স্বার্থ বা লক্ষ্য সাধনের কমবেশী উপায় বলে বিবেচনা করে। আবার এই আন্দোলন পর্যায়ক্রমে তার জাতীয় চরিত্র হারাতে থাকে। পর্যায় থেকে পর্যায়ন্তরে যত এক একটি শ্রেণী নিজের লক্ষ্য বা স্বার্থ মোটামুটি সাধিত হয়েছে মনে করে এই আন্দোলন থেকে তত আন্দোলনটির জাতীয় চরিত্র হ্রাস পেতে থাকে।

এর অর্থ, ৭১-এর পরে একুশে ফেব্রুয়ারি আর সর্বশ্রেণীর মিলিত কোন সংগ্রামের সূচক হিসাবে কাজ করতে পারে না। এর অর্থ একুশে ফেব্রুয়ারি ব্যর্থতা নয়। এর অর্থ একটি আন্দোলন হিসাবে একুশে ফেব্রুয়ারির সীমাবদ্ধতা। কোন জনগোষ্ঠীর জীবনে একটি আন্দোলনই একমাত্র আন্দোলন হতে পারে না। একটি আন্দোলনের মধ্যেই সকল শ্রেণীর সকল লক্ষ্য সাধিত হতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার অর্থ এই নয়, সংগ্রামী আবেগের দিক থেকে সকল শ্রেণীর জন্য একুশে ফেব্রুয়ারী তার সব আবেদন হারিয়ে ফেলেছে। একুশে ফেব্রুয়ারির স্মৃতি প্রতিষ্ঠিত শাসক এবং তাদের সহযোগী শ্রেণীসমূহের জন্য গুরুত্বের সঙ্গে কোন আবেদন আর বহন করতে পারে না। তাই তারা একুশে উদযাপন উপলক্ষে যে সব আবেগবহুল বাক্য উচ্চারণ করে বা যেসব আচরণ প্রদর্শন করে তা বাধ্যতামূলকভাবে কৃত্রিম বলে প্রমাণিত হয়।

কিন্তু নির্যাতিত শ্রমিক ও কৃষকের জন্য একুশে ফেব্রুয়ারির স্মৃতি আজো যথার্থভাবেই আবেগবহ। একুশে ফেব্রুয়ারি তার সংগ্রাম, সংগঠন ও কর্মীর কাছে অন্তঃসারশূন্য কোন প্রদর্শনীমূলক দিবস নয়, ফুল প্রদান, লাইনবদ্ধ পদযাত্রা বা স্যালুট প্রদান যার অঙ্গ। সংগ্রামী শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী, তথা তার সংগঠন ও কর্মীদের কাছে একুশে ফেব্রুয়ারি এই স্মারক যে, তাদের সংগ্রামের লক্ষ্য এখনো অনার্জিত। একুশে ফেব্রুয়ারি তাদের কাছে এখনো উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার উৎস। কারণ ভাষা আন্দোলনে '৪৮ সাল থেকে কিংবা ভাষা আন্দোলনের পথকেও যে সমস্ত আন্দোলন রচনা করেছে তাতে আত্মাহুতি দিয়েছে তাদেরই সন্তানেরা, শ্রমজীবী মানুষের সন্তানেরা। কাজেই ভাষা আন্দোলন প্রধানত তাদেরই সংগ্রামী শক্তি ও সম্ভাবনার সূচক।

সংগ্রামী শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের সংগঠন ও কর্মীদের তাই ভাষা আন্দোলনের ব্যর্থতা নিয়ে হতাশাব্যঞ্জক উক্তি উচ্চারণের কারণ নেই। কারণ, শ্রমজীবী জনতার সংগ্রামী ঐতিহ্যের ভাণ্ডারে ভাষা আন্দোলনই একমাত্র আন্দোলন নয়। এবং তার সংগ্রামের লক্ষ্যও কেবল ভাষায় স্বীকৃতি বা স্বাধীনতা লাভ নয়। তার লক্ষ্য যেমন শ্রমজবীবী মানুষের মুক্তির লক্ষ্য, শ্রমজীবী মানুষের সমাজ তৈরির লক্ষ্য, তেমনি সে সংগ্রামের সূচনাও '৪৮ বা '৫২ সালে নয়। তার সূচনা তার অনেক পূর্ব হতে। এবং সে সংগ্রামের ঐতিহ্যের ভাণ্ডারে রয়েছে আমাদের স্মরণকালের মধ্যকার '৪৬-এর নৌ বিদ্রোহ, রশিদ আলী দিবস, ট্রাম শ্রমিকের ৮১ দিনের ধর্মঘট, পাটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট, বাংলার কৃষকদের তেভাগা সংগ্রাম, ময়মনসিংহের হাজং কৃষকদের টঙ্ক আন্দোলন, নাচোলের সাঁওতালদের মানুষ বলে স্বীকৃত হওয়ার সংগ্রাম, চা বাগানের শ্রমিকদের মানুষের মতো জীবনযাপনের সংগ্রাম। এ রকম নাম জানা এবং না জানা সব সংগ্রাম [এই ঐতিহ্যের আভাস পাওয়ার জন্য অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে সত্যেন সেনের 'গ্রামবাংলার পথে পথে' বইখানা কর্মীরা পাঠ করবেন]।

সংগ্রামী মানুষের ইতিহাসে '৪৮ ও '৫২-এর ভাষা আন্দোলন অবশ্যই একটি মহৎ ও শক্তিশালী সংযোজন। কিন্তু ভাষা আন্দোলই একমাত্র কিংবা শ্রমজীবী মানুষের শেষ আন্দোলন নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি আন্দোলনের শক্তি এবং সীমাবদ্ধতা

ভাষা আন্দোলনের অবদান এখানে যে, সংগ্রামী মানুষের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে সে সমৃদ্ধতর করে বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন যে পর্যায় থেকে পর্যায়ন্তরে অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করে অগ্রসর হতে সক্ষম এবং জীবনের সকল পড়তি বা ভাটাকে অতিক্রম করে শেষ বিচারে যে সে অপরাজেয়, সেই সত্যকেই এই ভাষা আন্দোলন পুনরায় আমাদের চেতনার মধ্যে জাগরিত করেছে।

সংগ্রামী সংগঠনসমূহ কর্মীদের, দল-মত নির্বিশেষে, ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্যকে এরূপ একটি বৃহত্তর ও দূরগামী দৃষ্টি থেকেই অনুধাবনের চেষ্টা করা আবশ্যক। এমন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখলে কোন মহৎ আন্দোলনকে ব্যর্থ বলে বিবেচনা করার বা তেমন বিবেচনা থেকে উৎসারিত হতাশায় ভেঙে পড়ার কোন অবকাশ থাকে না।

॥১৯৮১॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই ডিসেম্বর এবং এই ডিসেম্বরের ভাবনা

সংবাদের সাহিত্য সম্পাদক ১৬ই ডিসেম্বরের জন্য একটি লেখার অনুরোধ করেছিলেন। তাঁর অনুরোধ পূরণের চেষ্টাতে উপরের শিরোনামটি দিয়ে কিছু লেখার চেষ্টা শুরু করেছিলাম। শিরোনামটি আমি গ্রহণ করেছি এর আকর্ষণীয়তার কারণে নয়। বস্তুত ১৬ই ডিসেম্বরের রচনার এ ব্যতীত অপর কী শিরোনাম হতে পারে? কিন্তু এই শিরোনামকে ব্যক্ত করে নিজের চিন্তাকে প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই।

১৬ই ডিসেম্বর অবশ্যই ১৬ই ডিসেম্বর। ১৬ই ডিসেম্বর যদি ১৬ই ডিসেম্বরকে স্মরণ করাতে না পারে তবে এই নাম অর্থহীন। আমি তাই ১৬ই ডিসেম্বরের আগমনে বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক আবহাওয়ায় ১৬ই ডিসেম্বরকে খোঁজ করছিলাম। এমন কিছু কি পাওয়া যায় যা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় এই ১৬ই ডিসেম্বর সেই ১৬ই ডিসেম্বরকে?

এই প্রয়োজনের সময়েই সৌভাগ্যবশত হাতে এসে পৌঁছল বঙ্গভবনের একখানি সুমুদ্রিত সফেদ ভারী কার্ডের দাওয়াতপত্র : 'বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনায়' যোগদানের আমন্ত্রণ। এটা অবশ্যই সৌভাগ্যের বিষয়। নিশ্চয়ই বিপুল সংখ্যক নাগরিককে এই 'বিজয় সংবর্ধনায়' আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তাই স্বাভাবিক। ভেবেছিলাম এই দাওয়াতপত্র নিশ্চয়ই আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে সেই ১৬ই ডিসেম্বরকে, বলে দিবে সেই ১৬ই ডিসেম্বর থেকে পুরো নটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, এবার এটি হচ্ছে দশম ১৬ই ডিসেম্বর, দশম বিজয় দিবস এবং আমাকে কিছু হদিস দিবে কিসের বিজয়, কার ওপর বিজয়/ কিন্তু তার কোন হদিস বিজয় দিবসের এমন মনোহর কার্ডটিতে পাওয়া গেল না। বঙ্গভবনই অবশ্য বাংলাদেশের সব নয়। তবু বঙ্গভবনের একটি প্রতীকী অর্থ ও মর্যাদা আছে। বঙ্গভবন হচ্ছে বাংলাদেশের পরিচালন কেন্দ্র। সেখানে যেই যান, তিনি শেখ মুজিবই হোন আর জিয়াউর রহমানই হোন, তাঁর দায়িত্ব দেশকে দিগদর্শন করাবার। তাই দেশবাসী চেয়ে থাকে বঙ্গভবনের দিকে। কোন দিকের নির্দেশ দিচ্ছেন বঙ্গভবনের পরিচালকবৃন্দ এবারের ১৬ই ডিসেম্বর?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অব্যাখ্যাত বস্তুর সুবিধা এই যে, তাকে আপনি নিজের মনোমতো যে কোন ব্যাখ্যা মণ্ডিত করতে পারেন। সেদিক থেকে একেবারে ব্যাখ্যাহীন, পরিচয়হীন, 'বিজয় দিবস' শব্দটি দিয়ে তৈরি শুভ্র কার্ডটির এই গুণ যে, এর মধ্যে অলিখিত ব্যাখ্যাকে আপনি নিজের ব্যাখ্যায় পূর্ণ করে দিতে পারেন। ১৯৮১ সালের উন্মেষের পূর্ব মুহূর্তে তৈরি এমন নির্বাক লিপি ১৯৮০ সালে শত দল ও মতে বিভক্ত বাংলাদেশের সামাজিক রাজনৈতিক জীবনেরই হয়ত বা উপযুক্ত পরিচয়।

কিন্তু আমার মতো দুর্বল কল্পনার ব্যক্তির পক্ষে এমন বিমূর্ত লিপি খুব সাহায্যকারী নয়। আমি নিরেট বাস্তব। একজন ছাপোষা মধ্যবিত্ত শিক্ষক। আজকের ১৬ই ডিসেম্বরকে এমন বিমূর্তভাবে আমি কল্পনা করতে পারিনে।

সেই ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র ঢাকা শহর কী দৃশ্য ধারণ করেছিল তা আমি নিজের চোখে দেখিনি। কেননা সেদিনও আমি ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে নতুন বিশ ডিগ্রির একটি সেলে আবদ্ধ। আমার পাশে সেলে প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা এবং সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ের লেখক জনাব কামরুদ্দীন আহম্মদ। ১৬ই ডিসেম্বরের ঢাকার রাস্তা দেখিনি। কিন্তু আমরা দুজন সেই কারাগারের মধ্যে বসেও বাংলার আকাশে পরিবর্তনের আঁচ পাচ্ছিলাম। প্রতিমুহূর্তে কী ঘটে, কী ঘটতে পারে তার জন্য ব্যাকুলভাবে সেই বন্ধ সেলের দরজার কাছে এসে আমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। দিনের বেলা যখন একটু পায়চারি করতে পারতাম তখন সেলের বাইরে আঙ্গিনাতে এসেও আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। সে আকাশে তখন পাকিস্তানের জেটের সঙ্গে মুক্তি বাহিনীর পক্ষে সংগ্রামরত প্রতিবেশী ভারতের জঙ্গী জেটের অগ্নিযুদ্ধ। সে যুদ্ধে নিক্ষিপ্ত গোলার টুকরা সংগ্রহ করেও বন্দীশালার শত শত বন্দী আনন্দে অধীর হয়ে উঠত মুক্তির আশায়। পাকিস্তানি ফৌজের কাছে বিমান থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া মুক্তিবাহিনী ও যৌথ বাহিনীর চরমপত্রের নমুনাও এসে পৌছেছিল কারাগারে আবদ্ধ বন্দীদের কাছে। প্রতিমুহূর্তে আমরা সবাই, আশা করছিলাম, এ কারাগারের বন্ধ দরজা মুক্তিবাহিনীর তরুণেরা এসে মুক্ত করে দেবে। এবং সত্যিই তাই তারা দিয়েছিল। ১৭ই ডিসেম্বর সকাল না হতেই রাইফেল কাঁধে ১৪ আর ১৬ বছরের তরুণরা জোর করে কারাগারের বন্ধ দরজা খুলে দিয়েছিল আর সেই মুক্ত দরজা দিয়ে বাঁধভাঙ্গা স্রোতের ন্যায় সকল বন্দী বেরিয়ে এসেছিল।

*   *   *

১৬ই ডিসেম্ব ১৯৭১ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮০ পুরো নটি বছর। প্রায় এক দশক। কালের বুকে এ হয়ত মুহূর্ত মাত্র। তবু এই নয় বছরের কত অভিজ্ঞতাই না আমাদের হল। ঘনিভূত আর্থিক, সাংসারিক নানা কষ্ট ও দুর্দশার মধ্যে একমাত্র সম্পদ হচ্ছে এই অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কামরুদ্দীন সাহেব আমার চাইতে বয়সে প্রবীণ। সুতরাং আমার চেয়ে অধিক দেখেছেন জীবনকে। রাষ্ট্রদূত হিসাবে নানা দেশ পরিভ্রমণ করেছেন। ১৯৪৭-এর পূর্বে মুসলিম লীগ আন্দোলনের অগ্রগামী প্রগতিশীল ধারার অন্যতম মুখপাত্র ছিলেন জনাব কামরুদ্দীন। ১৯৪৭-এর পরবর্তী পূর্ব-বাংলার জীবনের যে সামাজিক বিকাশ ও রাজনৈতিক বঞ্চনা, তার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আছে তাঁর একাধিক গ্রন্থে। ১৯৭১ সালে তিনি আর কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন না। নিজের পারিবারিক বিষয়াদিতেই ব্যাপৃত ছিলেন। আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎও ছিল না বহুদিন। সাক্ষাৎ ঘটল সেই '৭১-এর সেপ্টেম্বর মাসের ৭ কিংবা ৮ তারিখে।

তখন অবরুদ্ধ পূর্ববাংলা : বাংলাদেশ। দিনে রাতে রাস্তায় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর আতঙ্ক বিস্তারী চলাচল। রাতে স্টেনগান, ব্রেনগান ও গ্রেনেড বিস্ফোরণের আকস্মিক চমক, ওয়াকিটকি হাতে পাকিস্তানি চরদের বাড়িতে বাড়িতে হামলা ও নাগরিকদের ধরে নিয়ে যাওয়া।

তখন যে কোন একটি সৎ অসহায় গৃহী, কর্মচারী বা গ্রামবাসীর মনের কথাই সব মানুষের মনের কথা, মনের অবস্থা। '৭১-এর ২৫শে মার্চের পরে আবরুদ্ধ বাংলাদেশের কোন মানুষের মনে আর মৃত্যুর আতঙ্ক বলে কিছু ছিল এমন আমি মনে করতে পারিনে। কারণ দৈহিকভাবে মানুষের মৃত্যুর পরে আর মৃত্যুর আতঙ্ক থাকে না। কিংবা জীবিত হিসাবেও যদি বলি তাহলেও বলতে পারি, যার পিঠ যেয়ে দেয়ালে ঠেকে, মৃত্যু বাদে যার আর কোন উপায় থাকে না, সে মুখ হিয়ে হ বলুক কিংবা না বলুক তখন তেমন মানুষের মনে আর যে ভয়ই থাকুক, মৃত্যুর ভয় আর থাকে না।

এমনি মনোভাব নিয়েই আমাদের সেই অবরুদ্ধ জীবনের দিনযাপন। ব্যক্তিগতভাবে আমরাও। তাই ৭ই সেপ্টেম্বর সকল ১০টায় বাংলা একাডেমীতে নিজের কাজের টেবিলের দুপাশে যখন কয়েকটি পাকিস্তানি চর এসে আমার নাম ধরে ডেকে 'ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট' বলে অপেক্ষমান সশস্ত্র জীপে নিয়ে উঠাল, তখন আর অপ্রত্যাশিতের কোন চমকে আমি চমকিত হইনি কিংবা মৃত্যুর ভয়তেও নয়। যা কিছু চমক সে এই ভেবে যে, এরা কখন হত্যা করবে এবং এই বিলম্বের কারণটাই বা কী?

কিন্তু যেটি আমাকে চমকে দিয়েছিল সে আমার সেই জীপেই প্রবীণ কামরুদ্দীন সাহেবের আরোহণ। আমাকে তুলে নিয়ে পাকিস্তান বাহিনীর জীপটি সমস্ত শহরে টহল দিয়ে মতিঝিল ব্যবসায় কেন্দ্রের একটি অফিস থেকে যে ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার করে আমায় জীপে ওঠাল— দেখলাম তিনি কামরুদ্দীন আহমদ। এটা আমমদের পরস্পরের জন্য যেমন আকস্মিকতা ও চমকের ব্যাপার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল তেমনি নিশ্চয় ছিল আনন্দের। বধ্যভূমিতে একজন বন্ধুকে কাছে পাওয়া, নীরবে নিঃশব্দে বাক্যহীন ভাষায় একে অপরকে বলা 'ভয় কী, আমি তো পাশে রয়েছি' এ এক অপার পাওয়া।

কিন্তু এ কাহিনীর সবিস্তার বর্ণনা আজ নয়। হয়ত তার প্রয়োজনও নেই। এর চেয়েও মর্মান্তিক কাহিনী সেদিন হাজার লক্ষ বাঙ্গালীর জীবনে সংঘটিত হয়েছে।

কিন্তু আজ কামরুদ্দীন সাহেবের কথা মনে পড়ছে। বন্দীশালার সেই বিশ নম্বর ডিগ্রির সেলে বসে তাঁর একটি প্রশ্নের কথা স্মরণ করে। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন : আপনার কী মনে হয়? বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে?

এ প্রশ্নেও পরস্পরকে ভরসা দেওয়ার আবেদন ছিল। আমি যেদিন বলেছিলাম : অবশ্যই পারবে। আমার সে জবাব শুধু অস্তিত্ব রক্ষার সাধারণ অর্থের দিক থেকে ছিল না। ১৯৭১-এর বাংলাদেশ আমার মতো একজন সাধারণ মানুষকেও নানা বিস্ময়কর জ্ঞানে জ্ঞানী করে তুলেছিল। এমন জ্ঞান কারও পক্ষে বই পুস্তক থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। অবশ্যই মানুষের জীবনের সংগ্রামের ইতিহাসের শিক্ষা এই। তবু ইতিহাস থেকে সংগ্রামের শিক্ষা মুখস্ত করে মানুষ বাস্তব সংগ্রামের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে না। একটা সংগ্রাম কেমন করে আস্তে আস্তে শক্তি সংগ্রহ করে, কেমন করে ঘটনার পর ঘটনায় সে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে, গ্রাম থেকে গ্রামে, গঞ্জ থেকে গঞ্জে পরিব্যাপ্ত হয় এবং পরিশেষে একটি জনগোষ্ঠীর প্রত্যেকটি মানুষকে হয় এ পক্ষের, নয় ও পক্ষের অঙ্গীভূত করে জড়িয়ে ফেলে তার এমন সাক্ষাৎ দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতা আমার ব্যক্তিগত জীবনে আর কোনদিন ঘটেনি, যেমন ঘটেছিল ১৯৭১-এ। বাংলাদেশ পারবে, এ জবাব ছিল আমার এই বোধ থেকে যে, বাংলাদেশের মানুষ ১৯৭১-এর এই মহা আলোড়নে যেভাবে আশিকড় নড়ে উঠেছে তাতে সে একটি সুখী, সঙ্গতিপূর্ণ জীবনকে অবশ্যই বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হবে। আজো কামরুদ্দীন সাহেব বেঁচে আছেন। পূর্বের মতোই আমাদের সাক্ষাৎ বিরল। কিন্তু আজ মনে একটা আশঙ্কা জাগে, যদি তিনি আমার সেদিনকার সেই জবাবটি পালটে দিয়ে বলেন : কী, বলেছিলেন তো পারবে। কিন্তু—?

হ্যাঁ, এ নয় বছরের জীবনে অবশ্যই নানা কিন্তুর উদয় হয়েছে আমাদের জীবনে। আমি রাজনীতি করিনে এবং আমরা কেউ অমর হব না। তবু আজো বিশ্বাস করবো, সমস্ত কিন্তুরই জবাব আছে। সংগ্রামরত মানুষ বিচিত্র অভিজ্ঞতা, উত্থান-পতন আগুপিছুর মধ্য দিয়ে সে জবাব দিতে দিতে অগ্রসর হয়। সেজন্যই বলব, বিজয় দিবস শব্দটিকে যে কেউ যতোই পরিচয়হীনভাবে মুদ্রিত করুন না কেন, আমূল আন্দোলিত বাংলাদেশের সংকটদীর্ণ মানুষকে ১৯৭১-এর পূর্বে ফিরিয়ে নেওয়া কোন মহাবীরের পক্ষেই সম্ভব হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকার রাস্তায় সেই ১৬ই ডিসেম্বর মানে ডিসেম্বরের বা মার্চের সাক্ষাৎ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা বৃথা। এমন কি যে বাংলা একাডেমীতে আমি সেদিন কাজ করতাম, আমার টেবিলের পাশে যে লোহার আলমারিটি পাকিস্তান বাহিনীর কামানের গোলায় ঝাঁজরা হয়ে গিয়েছিল এবং একাডেমীর পরিচালক অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর ঘরে কামানের যে গোলাটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং যার ভারী অবশিষ্টাংশকে আমরা ২৭শে মার্চ বিধ্বস্ত ভবনের মধ্য থেকে উদ্ধার করেছিলাম, যা কোন যাদঘুরে রক্ষিত হয়নি, তাও আজ চারদিককার সংঘবদ্ধভাবে সবকিছু ভুলে যাবার এবং ভুলিয়ে দেবার চেষ্টায় বিলুপ্ত।

তবু ১৬ই ডিসেম্বরের স্মৃতিবাদে ১৬ই ডিসেম্বর পালন একেবারেই অর্থহীন। একেবারেই অবাস্তব। ইংরেজিতে বললে, একেবারে অ্যাবসার্ড।

বাস্তব জীবনের এই অবাস্তবতা বা অ্যাবসার্ডিটি থেকে মুক্তির জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুরোন পত্রিকার রক্ষক সহকারীকে কয়েকদিন আগে অনুরোধ জানিয়েছিলাম, আপনি '৭১ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের কোন একটি পত্রিকা, বিশেষ করে বাংলা পত্রিকা, কী আমাকে দেখাতে পারেন? দৈনিক ইত্তেফাক বা সংবাদ-এর কথা আমি উল্লেখ করিনি। কারণ দৈনিক ইত্তেফাককে পাকিস্তান বাহিনী জ্বালিয়ে দিয়েছিল ২৬শে মার্চ, দিনের বেলাতেই। বন্ধুবর রোকনুজ্জামান খান পরে বলেছিলেন, দৈনিক ইত্তেফাকের পোড়া বিধ্বস্ত মেশিনঘর থেকে পাওয়া গেছে কর্মরত শ্রমিকদের মাথার খুলি। সংবাদকেও সেই একই সময়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর সেই জ্বলন্ত সংবাদ-এর আশ্রয়ে দগ্ধ হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যের শক্তিশালী অন্যতম কিশোর সাহিত্যিক শহীদ সাবের।

কাজেই ১৯৭১ সালের অবরুদ্ধ বিপর্যস্ত বাংলাদেশের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের দৈনিক ইত্তেফাক বা সংবাদ-এর খোঁজ নিরর্থক। আমার ভরসা ছিল দৈনিক পাকিস্তান-এর উপর। এতো বিধ্বস্ত হয়নি। হোক না সরকারি মুখপত্র সেদিনকার। তবু তো সেখানে কর্মরত ছিলেন বাঙ্গালী। দেখা যাক না সেই পত্রিকারই নভেম্বব-ডিসেম্বর দুটি মাসের কয়েকটি সংখ্যা। গ্রন্থাগারের সহকারী বন্ধুকে ধন্যবাদ। তিনি বিনা বিলম্বে বার করেছিলেন সেদিনকার দৈনিক পকিস্তান-এর নভেম্বর মাসের কয়েকটি সংখ্যাকে। সেদিনকার দৈনিক পাকিস্তান-এর কয়েকটি সংখ্যা নাড়তে নাড়তে যেমন আমি শিহিরত হয়ে উঠছিলাম নানা ঘটনার বিবরণে আর ছবিতে তেমনি নিজে ফিরে পেয়েছিলাম বাস্তবভাবে ১৯৭১-এর নভেম্বর-ডিসেম্বরের জীবনকে।

একটু আবেগের সঙ্গে সংবাদ-এর সাহিত্য সম্পাদককেও জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হয়, আপনারা যখন ২৬শে মার্চ কিংবা ১৬ই ডিসেম্বর প্রতিবছর পালনই করেন এবং যখন তার উপর লেখার অভাব বোধ করেন তখন পারেন না কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৬শে মার্চ সেই ২৬ শে মার্চের পত্রিকাকেই একেবারে হুবহু মুদ্রিত করে দিতে, ১৬ই কিংবা ১৮ই ডিসেম্বর সেই ১৬ই কিংবা ১৮ই ডিসেম্বরকে হুবহু মুদ্রিত করে দিতে? কী অসুবিধা আপনাদের? কারণ আমরা পাঠকরা ১৬ই ডিসেম্বর তো ১৬ই ডিসেম্বরকেই পাঠ করতে চাই।

* * *

দৈনিক পাকিস্তান-এর নভেম্বর মাস। তখনো নিয়াজীর সদম্ভ হুঙ্কার। ছড়ি হাতে তার ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ময়মনসিংহ কি সিলেট, কি রাজশাহী রংপুরের সেনা ছাউনিতে গমন, তারই ছবি। শুধু তার ছবি নয়। ছবি গভর্নর ডাক্তার মালেকের। এবং পাকিস্তান রক্ষায় জান কবুল এককারের গণতান্ত্রিক দলের নেতা মাহমুদ আলী থেকে হক সাহেবের কৃষক শ্রমিক দলের নেতা, জনাব সোলায়মান সাহেদবদের বাণী, বিবৃতি, নসিহত। এরও পুনর্মুদ্রণ আবশ্যক। আমাদের যাদঘুরের সুউচ্চ দালান তৈরি হচ্ছে। কিন্তু তাতে এই জীবনের অনপনেয় কোন স্বাক্ষর নেই। শুনেছি নিজেদের সংগ্রামের ঐতিহ্যে গঠিত জাতি তার জীবনের ইতিহাসের প্রতি পর্যায়কে দেয়াল চিত্রে শিল্প ও কারিগরির নানা মাধ্যমে ঘর-বাড়ি, বাজার-বন্দর হুবহু রক্ষায় এমন যত্নবান হয় যে, প্রতিযুগের শিশু-কিশোর এই সকল প্রচেষ্টার মধ্যে তার নিজের পূর্বপুরুষদের সকল মহৎ সংগ্রাম ও ঐতিহ্যের পরিচয় লাভ করে জীবনের পথে অধিকতর অগ্রসর হওয়ার অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়। আর আমাদের এখানে জাতীয় অতীত মহৎ ঐতিহ্যকে রক্ষা নয়, কেবল মুছে ফেলার, কেবল ভুলে যাবারই সুকৌশল প্রচেষ্টা চলছে।

দৈনিক পাকিস্তান-এর নভেম্বর মাসের সংখ্যাগুলি ওলটাতে ওলটাতে নিচের খবরটিতে আমার দৃষ্টি আটকে গেল :

দৈনিক পাকিস্তান : ১০ই নভেম্বর, ১৯৭১

চারজন প্রফেসর দণ্ডিত।

ঢাকার বিশেষ সামরিক আদালতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ জন প্রফেসরকে দণ্ডিত করা হয়েছে এবং তাদের প্রত্যেককে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে বলে গতকাল মঙ্গলবার এক প্রেস রিলিজে উল্লেখ করা হয়েছে।

এপিপি পরিবেশিত খবরে বলা হয়েছে যে, তাদের সম্পত্তির শতকরা ৫০ ভাগ বাজেয়াফত করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই চারজন অধ্যাপকের বিচার তাদের অনুপস্থিতিতেই করা হয়েছে। ৫নং সামরিক বিধির অধীনে আনীত অভিযোগসমূহের জবাব দানের জন্য তাদেরকে গত ৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকার ৬ নম্বর সেক্টরে এম. এস. এল-এর আদালতে হাজিরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। দণ্ডিত প্রফেসরগণ হচ্ছেন :

১. প্রফেসর মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩. প্রফেসর সারোয়ার মুরশেদ, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪. প্রফেসর মযহারুল ইসলাম, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

এ খবরটির কথা আজকের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক ক জন জানে কিম্বা মনে রেখেছে? কত টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ হচ্ছে। এ খবরটিকেই তো বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত তার কোন একটি মূল শিক্ষা ভবনের প্রবেশপথের দেয়ালগাত্রে উৎকীর্ণ করে রাখা। তবেই না বর্তমানের তরুণ ছাত্র-ছাত্রী সেই ১৯৭১-এর সংগ্রামে তাদের শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা সেদিন জীবনযাপন করে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের জীবনের পরিচয় লাভ করতে পারবে, যে পরিচয় তাদেরকেও সমাজকে অগ্রসর করে নেওয়ার সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ হতে উৎসাহিত করবে। অবশ্য আজকের দিনে এ প্রশ্ন তোলা নিরর্থক। কারণ শহীদ শিক্ষকদের যে নামের তালিকা বিশ্বদ্যিালয়ের একটি শিক্ষা ভবনের সম্মুখের চত্বরে স্বাধীনতা-উত্তরকালে অন্তত কাগজের বুকে লিখিত হয়েছিল তাদের নামের সে তালিকাও আজ বিলুপ্ত।

দৈনিক পাকিস্তান-এর সংখ্যা ওলটাতে ওলটাতে দৃষ্টি পড়ল নিচের সংবাদটিতেও :

দৈনিক পাকিস্তান : ২রা ডিসেম্বর, ১৯৭১

শেখ মুজিবের বিচার এখনও শেষ হয়নি

রাওয়ালপিণ্ডি : এপিপি, ১লা ডিসেম্বর : বেআইনী ঘোষিত আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবর রহমানের বিচার এখনও শেষ হয়নি। একজন সরকারী মুখপাত্র আজ এখানে সাংবাদিকদের একথা জানিয়েছেন।

দৈনিক পাকিস্তান, ১১ই ডিসেম্বর সংখ্যায় কয়েকটি সংবাদের শিরোনাম ছিল নিম্নরূপ :

* ভারতীয় বাহিনীর বিপুল ক্ষয়ক্ষতি।

* পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব মেনে নিয়েছে।

* জেনারেল নিয়াজীর উক্ত : আমি এখনো পূর্ব পাকিস্তান থেকে আমার সেনাবাহিনীকে পরিচালন করছি .....।

তারপর ১২ থেকে ১৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর সংখ্যা ক'টি আর পেলাম না। এটাই স্বাভাবিক। ১২ থেকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত ঢাকা শহরের জীবন যে কেমন চলছিল তা একমাত্র সেদিনকার ঢাকাবাসীই বর্ণনা করতে পারেন। ৪ঠা ডিসেম্বর থেকেই ঢাকা শহরে জারি করা হয়েছিল রাত-দিন ২৪ ঘণ্টার সান্ধ্য আইন। আর এই সান্ধ্য আইনের আড়ালে পাকি বাহিনী আর তার বাঙ্গালী দোসর রাজাকার, আলবদর, আল শামস চালিয়েছিল ইতিহাসের বর্বরতম বুদ্ধিজীবী হত্যাযজ্ঞ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনীর পতন ও আত্মসমর্পণ ঘটে। ১৬ তারিখে ঢাকাসহ বাংলাদেশ মুক্ত হয় পাকিস্তান বাহিনীর হাত থেকে।

১৮ই ডিসেম্বর তারিখের 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর সংখ্যাটি সেদিনকার পত্রিকার কর্মীদের আবেগ, কল্পনা ও দক্ষতার অপূর্ব স্বাক্ষর নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ দিনের অপর কোন পত্রিকার কথা জানিনে। কিন্তু 'দৈনিক পাকিস্তান'-এর সেই সংখ্যাটির একটি হুবহু মুদ্রণ কিংবা বাংলাদেশের যাদুঘরে কোন ভাস্কর যদি তাকে উৎকীর্ণ করে রাখেন পাথরের বুকে তবে তা বাঙ্গালীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য এক অপার অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে।

১৮ই ডিসেম্বর '৭১-এর 'দৈনিক পাকিস্তান'–এর নামফলকটি ছিল 'পাকিস্তান' শব্দটিকে কেটে দিয়ে 'দৈনিক বাংলাদেশ' রূপে।

তার প্রথম পৃষ্ঠায় বিরাট হরফে খোদিত ছিল :

সোনার বাংলা আজ মুক্ত স্বাধীন : জয় সংগ্রামী জনতার জয়

জয় বাংলার জয়

সেই বড় হরফের শিরোনাম 'জয়, বাংলার জয়' দিয়ে 'দৈনিক বাংলাদেশ'-এর রিপোর্টার যে লেখাটি লিখেছিলেন নামহীন লেখকের সেই লেখাটি আবেগ, আনন্দে এবং অনুপ্রেরণায় ছিল পরিপূর্ণ। সে লেখাটিও স্মরণীয়।

* * *

সেই ডিসেম্বরের এই চিত্র আজ গবেষণা করে, অন্বেষণণ করে বার করতে হচ্ছে। কিন্তু কাগজের পৃষ্ঠা পোড়া ইট নয় যে, অন্ততঃ পঞ্চাশ কি একশ' বছর পরও সে অক্ষত থাকবে। এ চিত্র আজ যত কষ্টকরভাবে প্রাপ্য, আগামী বছর তা আরো দুস্প্রাপ্য এবং কালক্রমে অপ্রাপ্য হবে। এই আশঙ্কটাই এই ডিসেম্বরের আশঙ্কা। সেই ডিসেম্বরের পরিচয় তাহলে আমার কিশোরপুত্র তিতুকে কেমন করে দেয়া সম্ভব হবে? প্রশ্নটা কাল্পনিক নয়।

আমার অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত কিশোরপুত্র তিতু তার সমাজ পাঠের ইতিহাস অংশ থেকে '৭১ সালের ঘটনার একেবারে নিস্প্রাণ বর্ণনার যে অংশটি দেখিয়ে প্রশ্ন করল, 'আব্বা, ৭ই মার্চের ঘোষণাটি তাহলে কে দিয়েছিল?' সে অংশটি বাংলাদেশের শিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে ইতিহাসকে কিশোরদের কাছে বিকৃত করে তাদের বিভ্রান্ত করার একটি সচেতন সুকৌশল চেষ্টার দৃষ্টান্ত বলেই বিবেচিত হবে। আমার পুত্র যে অংশটিতে প্রশ্ন তুলেছিল সেটি হুবহু নিচে তুলে দেয়া হল। গ্রন্থের নাম 'সমাজ বিজ্ঞান', অষ্টম শ্রেণীর জন্য, বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি, ১৯৮০ :

সংঘর্ষের কারণ

"জেনারেল ইয়াহিয়ার ঘোষণা মতে ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ নবনির্বাচিত সদস্যগণকে লইয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ঢাকায় বসার কথা ছিল। কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর পরামর্শে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থের খাতিরে তিনি তাহা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখেন। কারণ ভুট্টো এবং ইয়াহিয়া খান পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে পূর্ব বাংলার আওয়ামী লীগ দল পশ্চিম পাকিস্তানের সাহায্য ব্যতিরেকেই ভোটাধিক্যে ইহার ছয়দফা দাবি আদায় করিয়া লইতে সমর্থন [শব্দটি বইতে এভাবেই মুদ্রিত] হইবে।

পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ জেনারেল ইয়াহিয়ার এই কাজকে উদ্দেশ্যমূলক ষড়যন্ত্র বলিয়া বুঝিতে পারিল এবং ৭ই মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ঐতিহাসিক জনসভায় সারা দেশব্যাপী ধর্মঘট ও অহিংস আইন অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করিলেন। অতঃপর দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন শুরু হইল।"

-পৃঃ. ১৯০ : সমাজ পাঠ, অষ্টমশ্রেণী, ১৯৮০।

আমার পুত্রকে আমি জবাব দিতে পারিনি। বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের কাছে আমারও তাই প্রশ্ন: ৭ই মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ঐতিহাসিক জনসভার কে আহ্বায়ক ছিল? 'ঐতিহাসিক জনসভায় সারা দেশব্যাপী ধর্মঘট ও অহিংস আইন অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করিলেন' এ বাক্যের কর্তা কে? ঘোষণার তো একজন ঘোষক আবশ্যক, সে ব্যক্তিই হোক, সংগঠনই হোক। পাশের পৃষ্ঠায় শেখ মুজিবুর রহমান বলে একজন ব্যক্তির ছবি যদি ১৯৮০ সালে মুদ্রিত করা যায় তাহলে '৭ই মার্চের ঐতিহাসিক জনসভায় আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান সারা দেশব্যাপী ধর্মঘট ও অহিংস আইন অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করিলেন'– এ কথাটিও ব্যাকরণ এবং সত্য– উভয়ের খাতিরে লিখতে হয়। আজকের ঐতিহাসিক অবশ্যই ব্যাখ্যামূলকভাবে লিখতে পারেন, আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের সে ঘোষণা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী সকল দল ও মতের মানুষের কামনারই প্রতিধ্বনি। তাই অতঃপর দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন শুরু হইল। কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করে এবং বিকৃত করে জাতির শিশু কিশোরকে বিভ্রান্ত করার অধিকার কোন বর্তমান সময়েরই কোন বর্তমান সরকার এবং তার বিভাগ উপবিভাগের থাকে না, এ সত্যটি আমরা উপলব্ধি করতে পারব কবে?

॥ ১৯৮০ ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মধ্যরাতের অশ্বারোহী'র সঙ্গে আলাপ

আমাদের কবি ফয়েজ আহমদ এখন একজন প্রবীণ সাংবাদিক। এখনো কুমার। (বয়স আমার চেয়ে খুব বেশি কি কম?) খুব সামাজিক, আমুদে, হাস্যরসিক এবং গাল্পিক। শিশুদের জন্য ছড়াকার এবং কবি। গল্প বলার শুধু নয়, গল্প লেখার রীতিটিও ঝরঝরে, মনোমুগ্ধকর। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সংবাদপত্র জগতে চমৎকার ঘটনা ও সমস্যার হেডলাইন সৃষ্টিকারী রিপোর্ট তৈরি করে এসেছেন। আজ সাক্ষাৎ রিপোর্টিং-এ জড়িত না থাকলেও বিগত দিনের সেই সব রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ঘটনাবহুল জীবনের স্মৃতিচারণে আনন্দ পান এবং তাঁর সে স্মৃতিচারণে যে এই সকল ঘটনার সমসাময়িক বা এদের সঙ্গে কমবেশী জড়িত আমার মত পাঠককে আনন্দিতও করে, তার পরিচয় রয়েছে সম্প্রতি 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত 'মধ্যরাতের অশ্বারোহী' নামের স্মৃতিচারণমূলক তাঁর লেখা কয়টিতে। এর মধ্যে সেই '৫৪ সালের বন্যার সময়ে ঢাকা শহরের যে ডুবন্ত গলিতে ফয়েজ থাকতেন সে গলিতে রাত দুটো কি তিনটের সময়ে সংবাদপত্রের কাজ সেরে কেমন করে তিনি একেবারে শুকনো ধোপদুরস্ত প্যান্ট-শার্টে গলির খাল পেরিয়ে বাসায় যেতেন সাহেবদের গোরস্তানে বিচরণগত অশ্বকুলের কাউকে বশ করে তার উপরে আরোহণ করে, সে কাহিনী একেবারে অনবদ্য।

ফয়েজের এখন ঝোঁক সেই পুরনো দিনের ঘটনার টুকিটাকি স্মৃতি আলাপে-আলোচনায়, রচনায় মজবুত করে তোলার দিকে। আর সে প্রয়োজনেই আমাকে তিনি ধরলেন দিন-দুই আগে : 'সরদার ভাই, আপনার সেই বিমানে গ্রেপ্তার হওয়ার কাহিনীটি বলুন, আর সেই জেলের কাহিনী যেখানে আপনি নাকি জেল থেকে 'পালিয়েছিলেন'। সে বড় মজার কাহিনী!

ফয়েজের আগ্রহ এবং জবরদস্তীতে তাঁর বাসায় গিয়ে সে কাহিনী আমাকে বলতে হল। এ বলার একটা আনন্দ এই যে, বন্ধুজনের সঙ্গে এমন আলাপে সেই অতীতে আবার একেবারে সাক্ষাৎভাবে ফিরে যাওয়া যায় এবং ফিরে গিয়ে সেই সময়ে আবার বাস করার একটা অনুভূতি পাওয়া যায়। আর তার মাধ্যমে দুর্বল স্মৃতির ভাণ্ডারে বিলুপ্তপ্রায় ঘটনা আর অভিজ্ঞতার মরচে-পড়া টুকরোগুলো ক্ষণিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোর দ্যুতিতে আবার জ্বলজ্বল করে ওঠে। ফয়েজের আগ্রহ বেশ সিরিয়াস। ফয়েজ নিজের মিনি রেকরডারটি বার করে কাহিনীটির বেশ কিছু অংশ রেকর্ড করে রাখলেন।

অথচ আমার নিজের কোন খাতায় বা লেখাতেও এ কাহিনী এখনো তুলে রাখা হয়নি। কিন্তু এসব কাহিনী লিখে রাখার কিছুটা বাধ্যবাধকতা ও যুক্তি আছে। যে-কোন ব্যক্তির স্মৃতিচারণের ঐতিহাসিক একটা মূল্য আছে। ব্যক্তি, সে যতো ছোটই হোক না কেন, তার জীবনকালের নানা ঘটনার সঙ্গে সে যুক্ত। কোন ঘটনার সে কারণ, কোন ঘটনার সে কার্য বা ফল। সেই ঘটনার সঙ্গে সে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সূত্রে জড়িত। আর তার এবং এমনি অপরাপর ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের ছোট-বড় সব ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই জীবন, কাল, সমাজ, রাষ্ট্র তথা ইতিহাস বিবর্তিত হয়।

এদিক থেকে দেখলে প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত নিজের অতীতকে ব্যক্তিগত বিষয় বিবেচনা না করে ইতিহাসের অনস্বীকার্য উপাদান বলে বিবেচনা করা এবং তাকে ইতিহাসে অপরের গ্রাহ্য, পাঠ্য বিবেচ্য হিসাবে ধরে রাখার চেষ্টা করা। এর একটা উপায় অবশ্যই আত্মকথা, আত্মকাহিনী বিবৃত করা বা স্মৃতিচারণ। তাই ফয়েজের লেখাগুলির এ মূল্যও আমাকে বেশ আনন্দ দেয়।

AMARBOI.COM

আমার নিজের স্মৃতির টুকিটাকি দু-একটি ব্যক্তিগত রচনার মধ্যে এলেও আমাদের দেশের একটি মধ্যবিত্ত কিশোর-তরুণ যুবক এবং প্রৌঢ় ব্যক্তির জীবনযাপন, তার শিক্ষালাভ, সামাজিক, রাজনৈতিক নানা ঘটনার সাক্ষাতে আসা, তার দীর্ঘ কারাবাস– এ কাহিনীর ধারাবাহিকভাবে কোথাও আমি লিপিবদ্ধ করিনি। নৈতিকভাবে এর প্রয়োজনবোধ করলেও একে তুলে ধরার কষ্টকর পরিশ্রমের কারণেও কাজটি করা হয়নি। এবং এখন গোড়া থেকে আর করা যাবেও না। কারণ দুর্বলস্মৃতির মানুষ আমি। আমার অনেক ঘটনার স্মৃতিই আজ তার সন তারিখ আর ব্যক্তিবর্গের নাম-ধামের ক্ষেত্রে প্রায় ধোঁয়াটে।

কিন্তু কবি ফয়েজকে যে কাহিনী বলেছি সেটি বেশ কৌতুকজনক। তাই বিস্তারিতভাবে সব মনে না থাকলেও মোট ঘটনাগুলি আজো আমার স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি।

সে সেই '৫৪-'৫৫ সনের কথা। '৪৯ সনের ডিসেম্বর সেই যে আমি ঢাকা শহরের তাঁতীবাজারে আজকের সাংবাদিক সাহিত্যিক সন্তোষ গুপ্তের বাসায় সন্তোষ এবং আরো কয়েকজন সাথীসহ গ্রেপ্তার হলাম তারপর থেকে বন্দী দশা আমার পাঁচ বছর অতিক্রম করে গেছে। আজকে যখন লিখছি, এই একাশী সনের মার্চ থেকে সময়ের হিসাবে প্রায় সাতাশ বছর আগের কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'৫৪ সনে নির্বাচন হল। যুক্তফ্রন্ট জয়ী হল। অনেক রাজবন্দী মুক্তি পেলেন। কিন্তু আরো অনেকের সঙ্গে আমি তখনো বন্দী।

কিন্তু '৫৪ সনের পর '৫৫ সনের মধ্যভাগে, হয়ত জুন-জুলাই মাসে আমারও একদিন জেলের ভেতর জেল, 'সেল' থেকে জেলের গেটে ডাক পড়ল।

নাজির জমাদার। আমরা বলতাম, সিকিউরিটি জমাদার। জাদরেল জমাদার, মানে জেলের সিপাহীদের উপরওয়ালা। সিকিউরিটি প্রিজনার মানে রাজবন্দীদের তদারকী করে। তাদের মন মেজাজ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করে। কাউকে কখনো ২০ ডিগ্রি থেকে ৬ ডিগ্রিতে (ডিগ্রি মানে ছোট খুপরী), কাউকে বা ২ নম্বর খাতা (খাতা মানে হল জাতীয় বন্দী বাস) থেকে পুরোন বিশে, এমন কি জেল থেকে জেলান্তর চালান দেয়। বস্তুত তার রিপোর্টে সবকিছু হয়। এমন জাদরেল ছিল সে। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের সেই নাজির জমাদার এসে হাঁক দিল : 'কাঁহা সরদার ফজলুল করিম, চলিয়ে জি!' এ রকম ডাক অতীতেও সে বহুবার দিয়েছে। কখনো এমনি রহস্যময় আওয়াজে আতঙ্ক সৃষ্টি করে অসহায় বন্দী আমাকে কিংবা অপর কোন সাথীকে নাজির জমাদার তার বন্ধুদের কাছ থেকে ছিন্ন করে নিয়ে গিয়ে আর তার বন্ধুদের কাছে ফিরতে দেয়নি। দিয়েছে অপর কোথাও সরিয়ে। একই জেলের অপর কোন স্থানে কিংবা অপর কোন জেলে। কাজেই নাজির জমাদারের এমন ডাকে ভয় ছাড়া ভরসার কিছু ছিল না। তবে দিনকাল বদলেছে। আজকাল কোন কোন রাজবন্দী বা কয়েকজন করে রাজবন্দী প্রায় প্রত্যেকে রোজ মুক্তি পাচ্ছেন।

AMARBOI.COM

আমাকেও জেল গেটের অফিসে নিয়ে এসে জেলের অফিসাররা সুখবর দিলেন যে, আমার রিলিজ অরডার এসে গেছে।

আমার নামের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এই নাম বহনকারী আমার অবয়বটি যতো ক্ষুদ্র তার তুলনাতে নামটি বেশ ভারী। কিন্তু সেই বৈশিষ্ট্য ছাড়া আর একটি ব্যাপার সম্প্রতি যেমন আমাকে তেমনি জেল কর্তৃপক্ষকেও কিছুটা চমকিত করেছিল।

সে ব্যাপারটি একটু খুলে বলতে হয়।

'৫৪ সনের শেষের দিকে বোধ হয় (অক্টোবর, ১৯৫৪) পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ সেই '৪৭ সন থেকে বহালকৃত গণপরিষদ তথা কেন্দ্রীয় পাকিস্তান আইন পরিষদকে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। কারণ ছিল, মন্ত্রীরা নাকি তাঁর ক্ষমতা হ্রাস করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তাঁর অজ্ঞাতে পেছন দরজা দিয়ে। সেই রাগে তিনি গভর্নর জেনালের ক্ষমতাবলে গণপরিষদ ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। সেই গণপরিষদের স্পীকার ছিলেন মুসলিম লীগ নেতা তমিজ উদ্দীন খান। তাঁর মারফতে মুসলিম লীগ গভর্নর জেনারেলের এই কাজের বৈধতার প্রশ্ন তুলে কোর্টে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামলা করেছিল। তখনো পাকিস্তানের আইন আদালত এবং তাদের বিচারকদের কিছুটা ব্যক্তিত্ব ছিল। তমিজ উদ্দীন সাহেবের সেই মামলা পাকিস্তানের রাজনৈতিক বিবর্তনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গোড়াতে সিন্ধু চিফ কোর্টে বোধ হয় তমিজ উদ্দীন সাহেবের আপত্তির পুরো পক্ষে রায় চলে যায়। গভর্নর জেনারেলের পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টে তার বিরুদ্ধে আপিল করা হয়। সে আপিলের রায়ে বিচারপতি মুনীর 'সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে'র খেলা দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি রায় দিয়েছিলেন : গণপরিষদ চিরস্থায়ী। তাকে ভাঙ্গার ক্ষমতা কারুর নাই। তবে গভর্নর জেনারেল যখন রাষ্ট্রের সর্বাধিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি এবং তিনি যখন তাকে ভেঙ্গে ফেলেছেনই তখন সেটা স্বীকার্য ঘটনা বটে। তবে গভর্নর জেনারেলকে অচিরে আর একটি গণপরিষদ গঠন করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

আর এই নির্দেশের ভিত্তিতেই পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদের নির্বাচন। এ নির্বাচনের বিধি ছিল পাকিস্তানের তৎকালীন প্রত্যেক প্রদেশের প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের ভোটে নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যকে গণপরিষদে প্রেরণের বিধি।

পূর্ব পাকিস্তানের তখন রাজনৈতিক শক্তির পালাবদল ঘটে গেছে। এখন এখানে প্রধান শক্তি যুক্তফ্রন্ট। যুক্তফ্রন্ট আবার অত যুক্ত নয়। তার মধ্যে রয়েছে আওয়ামী লীগ, এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টি, গণতান্ত্রিক দল, এমনকি নিজামে ইসলাম। তবে যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন প্রগতিশীল দলের মধ্যে সমাজতন্ত্রী-বামপন্থী বলে তরুণ সদস্যদের একটি গ্রুপও নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন। গণপরিষদের তখনকার নির্বাচনের পদ্ধতিটিকে রাজনৈতিক পরিভাষার বলা হয়, 'প্রত্যেক নির্বাচকের হস্তান্তরযোগ্য একক ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন' বা সিঙ্গল ট্রান্সফারেবল ভোটের পদ্ধতি। এর রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল এই যে, কোন একক দলই কেবলমাত্র সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের কারণে পরিষদের সমগ্র সদ্যসপদকে করায়ত্ত করতে পারতোনা। গণপরিষদের একজন সদস্যের নির্বাচনে, পদের সংখ্যা দ্বারা নির্বাচক বা ভোটারদের সংখ্যাকে ভাগ করার ভিত্তিতে, যে কয়টি ন্যূনতম ভোটের আবশ্যক সে কয়টি ভোট যে দল বা গ্রুপের হাতে আছে সে অবশ্যই একটি সদ্যসপদ দখল করতে পারতো।

যে কারণে 'সিঙ্গল ট্রান্সফারেবল ভোট' এর এই পদ্ধতির উল্লেখ সেটি বলছি। যুক্তফ্রন্টের বামপন্থী সদস্যগণ একদিকে যেমন তাঁদের সমর্থন প্রধানত আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থীদের দিবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তেমনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেই তালিকার বাইরে তাঁদের নিজস্ব কোন মনোনীত ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে গণপরিষদে প্রেরণের। আর এমন ব্যক্তির অন্বেষণে তাঁরা শেষ পর্যন্ত আমাকে মনোনীত করেছিলেন গণপরিষদে যাওয়ার জন্য। তাঁদের শক্তি এবং এরূপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিদ্ধান্তের কথা আমি বন্দী অবস্থাতে কিছুই জানতাম না। কেবল এর আভাস পেলাম সেদিন যেদিন মনোনীত ব্যক্তির সম্মতি হিসাবে আমার দস্তখত তাঁরা সংগ্রহ করলেন ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে। এ সমস্ত ঘটনার কারণে আমি ঢাকা জেলের কর্তৃপক্ষের নিকট নিশ্চয়ই কিছুটা পরিচিত এবং বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলাম।

সে যা হোক, বোধ হয় ১৯৫৫ সনের জুলাই মাসে আমি সেই '৪৯ সনের পর থেকে দীর্ঘ পাঁচ বছর বন্দী জীবনের পরে মুক্তি পেলাম। মুক্তি পাওয়ার পরের দিনই সম্ভবত প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের ভোটে গণপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এবং পূর্ব-বঙ্গ থেকে অন্যান্য প্রতিনিধির সঙ্গে আমিও গণপরিষদের একজন সদস্য নির্বাচিত হই। এই নির্বাচনের মাধ্যমেই জনাব সরওয়ারদী, এ. কে. ফজলুল হক, আবু হোসেন সরকার, হামিদুর হক চৌধুরী, শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, মাহমুদ আলী— এঁরা সবাই গণপরিষদে নির্বাচিত হন। এঁদের বেশিরভাগ পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক পরিষদেরও সদস্য ছিলেন। প্রাদেশিক পরিষদের বাইরে থেকে মনোনীতদের মধ্যে যেমন জনাব সরওয়ারদী ছিলেন, তেমনি আমি ছিলাম।

পাকিস্তানের গণপরিষদে আমার নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারটা আমার নিজের নিকট যতোটা অপরিচিত ও তাৎপর্যহীন বলে বোধ হোক না কেন, বাইরের জগতে বিভিন্ন মহলে এটি বেশ তাৎপর্যময় বলে চিহ্নিত হতে লাগল। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন-বিজয়টাকেই সেদিন মার্কিন মহল আতঙ্কের চোখে দেখেছিল। পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত সমগ্র পূর্ববঙ্গ কমিউনিস্ট কবলিত বলে আর্তরব তুলেছিল এবং এ. কে. ফজলুল হক সাহেবকে তাঁর কোলকাতায় প্রদত্ত কিছু আবেগমিশ্রিত উক্তির ভিত্তিতে 'রাষ্ট্রবিরোধী' বলে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করেছিল এবং সে অজুহাতেই এসকান্দার মীর্জা হক সাহেবকে গৃহবন্দী পর্যন্ত করেছিল। এই ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেই জেল থেকে একজন বামপন্থী প্রার্থীর গণপরিষদে নির্বাচনে জয়লাভ এই মহলের মনের আতঙ্ক বৃদ্ধি করেছিল। তারা একে কমিউনিস্ট বিজয় বলে চিহ্নিত করে পাকিস্তান সরকারকে জবাবদিহী করেছিল। কিন্তু উচ্চতর রাজনীতির এসব কথা আমার মতো গোবেচারীর পক্ষে অনুধাবন করা সহজ ছিল না। আমার সঙ্গে এসব ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার যোগাযোগটি পরবর্তীকালে বুঝা গিয়েছিল।

দ্বিতীয় গণপরিষদ নির্বাচিত হওয়ার পরে তার প্রথম অধিবেশন আহ্বান করা হয় করাচীতে নয়, আহ্বান করা হয় পাঞ্জাবের রাওয়ালপিন্ডি ছাড়িয়ে মারী পাহাড়ের চূড়ায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটা ছাউনীতে। গণপরিষদের এমন স্থানে অধিবেশন অবশ্যই অস্বাভাবিক ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের সেই সময়কার রাজনীতি, পূর্ব-বঙ্গের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্বে এ অধিবেশন অর্থবহ ছিল। পাকিস্তান সরকারের মূল নায়ক তখন গোলাম মোহাম্মদ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইয়ুব খা, ইসকান্দার মীর্জা, মিয়া মমতাজ দৌলতানা, মোশতাক আহমদ গুরমানী—এঁরা। তাঁদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী পূর্ব-বঙ্গ। পূর্ববঙ্গে মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটেছে। পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছে নূতন শক্তির প্রতিনিধি শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান খান এবং তাঁদের অপর সঙ্গীরা। রাজনীতিক আবহাওয়ার ভাষাটা ছিল এরূপ : পূর্ব-বঙ্গ যদি পশ্চিম পাকিস্তানের হুকুম না মানে, পাকিস্তানের নেতাদের কথামতো 'এক ইউনিট' আর 'প্যারেটি'কে যদি স্বীকার না করে তাহলে পূর্ববঙ্গের উপর সামরিক আইন জারি করা হবে। এই সামরিক আইনের হুমকিকে বাস্তবে প্রকাশের উপায় হিসাবে পাকিস্তান সরকার গণপরিষদকে আহ্বান করেছিল করাচি কিংবা লাহোরে নয়, আহ্বান করেছিল মোগল আমলে রাজবন্দীদের নির্বাসনস্থল অগম্য মারী পাহাড়ের চূড়ায়।

কিন্তু মারী পাহাড়ে গণপরিষদের অধিবেশনের কাহিনী বলার জন্য এ কথার অবতারণা নয়। আমি গণপরিষদের নির্বাচিত একজন সদস্য হিসাবে মারী পাহাড়ের অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলাম। কয়েকদিন অধিবেশন চলার পরে অধিবেশন মুলতবি করা হয় এবং পরবর্তী অধিবেশন করাচিতে আহ্বান করা হয়।

আমি মারী অধিবেশন শেষ করে ঢাকাতে ফিরে আসি এবং কিছুদিন পরে করাচি অধিবেশনে যোগদানের জন্য তৈরি হতে থাকি। পূর্বপাকিস্তান মানে পূর্ববঙ্গে তখন আবু হোসেন সরকার মুখ্যমন্ত্রী। তখনি ঢাকাতে সংঘটিত হয়েছিল পুলিশ ধর্মঘট, পুলিশ বাহিনীর দাবি-দাওয়ার কারণে। আর এই ধর্মঘটের অজুহাতে প্রথম চোটেই আবু হোসেন সরকার আবার গ্রেপ্তার করতে আরম্ভ করলেন কমিউনিস্ট ও বামপন্থী সেই সমস্ত রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের যাঁরা দীর্ঘদিন কারাবাসের পরে কিছুকাল পূর্বে মাত্র মুক্তি পেয়েছিলেন। আবু হোসেন সরকারের এমন পদক্ষেপ ছিল যেমন অগণতান্ত্রিক তেমনি কেন্দ্রীয় সরকারের হুকুম-বরদারী। আমার নিজেরও এমন অবস্থাতে আশঙ্কা হচ্ছিল যে, সরকার আমাকে বোধ হয় গণপরিষদের করাচি অধিবেশনে আদৌ যোগদান করতে দিবে না এবং গ্রেপ্তার করবে।

ব্যাপারটা ঘটলও তাই। এই আশঙ্কার মধ্যেই আমি করাচি অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে বিমান আরোহণের জন্য তেজগাঁ বিমান বন্দরে হাজির হলাম। হয়ত সেটা আগস্ট বা সেপ্টেম্বর মাস, '৫৫ সালের। বিমানে চলেছেন পূর্ববঙ্গের সকল প্রখ্যাত নেতা যাঁরা গণপরিষদের সদস্য। শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ—এঁরাও সেদিন যাত্রা করেছেন করাচীর জন্য। আমি বিমানে যথারীতি আরোহণ করেছি। বিমান ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। পি. আই. এ. সুপার কনসটেলেশন। পথে কোথাও বিরাম না নিয়ে এক দমকে প্রায় পাঁচ ছ'ঘণ্টা আকাশ যাত্রার পরে পৌঁছে যায় করাচি। বিমান ছাড়ার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। তবু যেন কেন বিমান ছাড়ছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন দেখা গেল, একজন পুলিশ কর্মচারী বিমানের সারিবদ্ধ সিটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আওয়াজ দিচ্ছেন : 'হু ইজ সরদার করিম?' আমি বুঝলাম, আমার আশঙ্কা সত্য হতে চলেছে। আমি দাঁড়িয়ে বললাম : 'আই অ্যাম সরদার ফজলুল করিম।' পুলিশ অফিসার ভদ্রতার সঙ্গে বললেন : 'ইউ উইল প্লিজ কাম ডাউন। ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট। আপনি নেমে আসুন। আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সেদিনও ভেবেছি, এখনো ভাবছি, এসব ঘটনা আমার মতো সরল, ক্ষুদ্র আর গোবেচারী মানুষের জীবনে দুর্লভ অভিজ্ঞতাই বটে। একে নির্বিকারভাবে উপভোগ করা ছাড়া এ নিয়ে বিব্রত বোধ করে কোন লাভ নেই। আমি নেমে আসতে আসতে শেখ মুজিব এবং আতাউর রহমান সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম এই বলে : 'আপনারা দেখুন, আমি গণপরিষদের সদস্য। আমাকে এরা তার অধিবেশনে যোগ দিতে দিচ্ছে না।'

নিচে নামিয়ে এনে তেজগাঁও বিমানবন্দরের থানা অফিসার ভদ্রতা সহকারে বসিয়ে মাফ চাইলেন। বললেন : 'আমাদের কিছু করার নাই। আমাদের মাফ করবেন। উপর থেকে নির্দেশ এসেছে, এই দেখুন।' সেই নির্দেশে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে : 'সরদার ফজলুল করিম গণপরিষদের সদস্য। তিনি যে কোন সময়ে করাচী যেতে পারেন। তিনি এ জন্য তেজগাঁও বিমানবন্দরে উপস্থিত হলেই তুমি তাঁকে নিজে গ্রেপ্তার করে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দিবে।' না, আমার মনে করার কিছু নেই। আমি থানা অফিসারকে তাঁর সৌজন্যের জন্য ধন্যবাদ জানালাম। থানা অফিসার একটি জীপে করে আমাকে ঢাকা জেলে পাঠিয়ে দিলেন। কয়েক মাস ব্যবধানের পরে আবার আমি ফিরে এলাম সেই পুরোন বন্দী নিবাসেই। তখন সেখানে নতুন গ্রেপ্তারকৃত এবং পুরোন বন্দীরা অনেকে রয়েছেন। পুনরায় মিলিত হলাম তাঁদের সঙ্গে।

কিন্তু এ কাহিনীর চমৎকারিত্ব এখানেই শেষ নয়। করাচিতে যখন অধিবেশন বসল গণপরিষদের, তখন পূর্ববাংলার সবচেয়ে জোরালো আর তেজী যুবনেতা শেখ মুজিব প্রশ্ন করেছিলেন : 'আমরা জবাব চাই, সরদার ফজলুল করিমকে কেন গ্রেপ্তার করা হয়েছে?'

হ্যাঁ, এ প্রশ্নের জবাব যে একটা দিতে হবে তা কেন্দ্রীয় সরকার জানতেন এবং আবু হোসেন সরকারও জানতেন। কারণ, বুর্জোয়া আইন পরিষদের ইংরেজি ঐতিহ্য যা একটু তখনো বহাল ছিল তাতে গণপরিষদের একজন নির্বাচিত সদস্যকে সুনির্দিষ্ট কোন ফৌজদারি অপরাধমূলক কাজের অভিযোগ বাদে গ্রেপ্তার করা চলে না। আর সে কারণেই কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারকে জরুরি তারে জানিয়েছিল, 'একটা কিছু কারণ বলো, সরদার ফজলুল করিমকে কেন গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গণপরিষদে এর জবাব দিতে হবে।' এমন জরুরি তারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎস অবশ্য আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট। তারা জবাব চেয়েছিল ওয়াশিংটনের পাকিস্তান দূতাবাসে : 'কেমন করে একজন বামপন্থী রাজবন্দী কারাগার থেকে গণপরিষদে নির্বাচিত হতে পারেন তা ব্যাখ্যা করো।' ওয়াশিংটনের পাকিস্তান দূতাবাস জবাব চেয়েছিল পাকিস্তানের বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে। আর বৈদেশিক মন্ত্রণালয় চেয়েছিল প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী জনাব আবু হোসেন সরকারের কাছে। আবু হোসেন সরকারের হোম ডিপার্টমেন্ট জবাব চেয়েছিল ঢাকা জেলের কর্তৃপক্ষের কাছে আর সে জবাব চাওয়ার সঙ্গে নির্দেশ দিয়েছিল, সরদার ফজলুল করিমের বিরুদ্ধে যা হোক একটা অভিযোগ নিয়ে আসো।

আর সেই অভিযোগের তল্লাশিতে তারা শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করল এবং বলল : সরদার ফজলুল করিমকে আমরা মুক্তি দিইনি, তিনি জেল থেকে পালিয়ে গেছেন। সুতরাং তার বিরুদ্ধে ফৌজদানি দণ্ডবিধির অমুক ধারা মতে নির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হচ্ছে। এ ছাড়াও জেল থেকে সরকার– সকল কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হল যে, সরদার ফজলুল করিমকে এবার আর ভুলক্রমেও ছাড়া হবে না। কারণ তিনি এই নির্দিষ্ট অভিযোগ থেকে মুক্তি পেলেও আমাদের বিনাবিচারে অনির্দিষ্টকাল আটকের বিধান রয়েছে। তা থেকে তিনি মুক্তি পাবেন না।

বাইরের দুনিয়ার মানুষ, বিশেষ করে দূরকালের আজকের পাঠকবর্গ এমন জটিল কাহিনীর রস কতখানি উপভোগ করতে পারবেন, তা জানিনে। তবে অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতাতে আমি যে সমৃদ্ধ হচ্ছিলাম, এতে কোন সন্দেহ নেই।

সুতরাং আমার আর দ্বিতীয়বার গণপরিষদে যাওয়া হল না। বিমান আরোহণ করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এসে আমাকে অবতরণ করতে হল।

এবং এবার একটি নতুন অভিজ্ঞতা হতে শুরু করল। কয়েকদিন বিরতিতে ঢাকা কোর্টে জেল থেকে গমনাগমন একজন রাজবন্দীর পক্ষে একেবারে অবাঞ্ছিত নয়। এরই মাধ্যমে সে রাজবন্দী অন্তত কিছুক্ষণের জন্য বাইরের জগতের আলো-হাওয়ার, তার চলমান জীবনের, রাস্তার গাড়িঘোড়ার, জন যাতায়াতের কিছুটা সাক্ষাৎ, কিছুটা আভাস পায়। আর এমন আলো হাওয়া টেনেই তাকে বন্দী নিবাসের অন্ধকারে মানসিকভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হয়।

প্রবীণ আইনজ্ঞ আতাউর রহমান খানের একটা গুণ এই যে, তিনি যেমন সুরসিক তাঁর আলাপ আলোচনাতে, তেমনি তিনি গণতন্ত্রীমনা। ভাষা আন্দোলনের সময় থেকেই তিনি স্বদেশের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন। যখনকার কথা বলছি সেই '৫৪-'৫৫ সনে তিনি আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা। প্রাদেশিক পরিষদ এবং গণপরিষদ– উভয়েরই প্রথম সারির তিনি সদস্য। আমাকে তিনি প্রথম পরিচয় থেকেই বয়োকনিষ্ঠ স্নেহভাজন হিসাবে দেখে এসেছেন। আমার বিমানে গ্রেপ্তার তাঁর চোখের সামনেই ঘটেছে। তিনি কৌতুক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোধ করেছেন সমগ্র ব্যাপারটাতে। তাই যখন আমার বিরুদ্ধে জনাব আবু হোসেন সরকারের গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে 'জেল-পলায়নের' কেস হাজির করা হল তখন তিনি নিজের আগ্রহেই কেসটির আইনবিদের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ব্যাপারটা কোর্ট পর্যন্ত গড়ালে সরকারই নাজেহাল হবে ভেবে আতাউর রহমান সাহেব নিজে আবু হোসেন সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন এ মামলা তুলে নিতে। তখনো জনাব আবু হোসেন সরকার তাঁর স্বভাবসুলভ সিদ্ধান্তহীন ও অসহায় ভাব দেখিয়ে বলেছিলেন : 'এ কেসে তো কিছু হবে না। কিন্তু কী করি? করাচির হুকুম!'

কাজে কাজেই আমার বিরুদ্ধে মামলা কোর্টেই ফয়সালা করতে হল। খুব যে বেশিদিন গড়িয়েছিল, তা নয়। বার দুই তিন হয়ত আমি উঁচু দেয়াল ঘেরা সেন্ট্রাল জেল থেকে সকাল দশটায় সরকারি জিপের সামনে বসে বংশাল আর নওয়াবপুরের লোকজনদের প্রত্যেককে নিজের একেবারে পরিচিত ও আত্মীয় সম বোধ করার অনুভূতি নিয়ে ঢাকার আদালতে যাতায়াত করতে পেরেছিলাম। তারই শেষ দিনের বাদী আর বিবাদী পক্ষের জেরা— জবাববন্দীটি ছিল নিম্নরূপ :

বাদীপক্ষ জেল কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত জেলার জবানবন্দী করলেন, সরদার ফজলুল করিমের মুক্তির আদেশ ছিল না, আদেশ ছিল ভিন্নতর ফজলুল করিম সরদারের। কিন্তু সরদার ফজলুল করিম ভুল পরিচয় দানে জেল থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন!

বিবাদী, মানে অভিযুক্ত আমার আইনবিদ আতাউর রহমান খান অতিরিক্ত জেলারকে জেরা করলেন :

ভালো কথা, সরদার ফজলুল করিম মিথ্যা পরিচয়ে জেল থেকে চলে এসেছেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন, তিনি কি জেল গেটে বসে থাকতেন, না তাঁকে কড়াকড়িভাবে জেলের ভেতরে সেলের মধ্যে আটকে রাখা হত?

: হ্যাঁ, এ কথা ঠিক, তিনি জেলের ভেতরে সেলে থাকতেন।

: তাহলে তিনি সেল বা ডিগ্রি থেকে জেল গেটে এলেন কী করে?

: আমরা ডেকে এনেছিলাম।

: ডেকে এনেছিলেন? কি নামে? আপনি কি সরদার ফজলুল করিমকে চিনেন?

: হ্যাঁ, আমি চিনি। উনি সরদার ফজলুল করিম।

: আর অপর যে ফজলুল করিম সরদার, তিনি কি ঢাকা জেলে এই সময়ে বন্দী ছিলেন?

: না, তিনি রাজশাহী জেলে ছিলেন।

: তাহলে তাঁর মুক্তির আদেশ ঢাকা জেলে এল কী করে?

: স্বরাষ্ট্র বিভাগ থেকে পাঠিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

: তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল কী? আপনারা, মানে জেলের অফিসাররা সরদার ফজলুল করিমকে জেলের ভেতর থেকে ডেকে গেটের অফিসে আনলেন, তাঁর নিজের স্বাক্ষরাদি গ্রহণ করলেন, তাঁকে সসম্মানে অপর কয়েকজন রাজবন্দীর সঙ্গে মুক্তি দিলেন। তিনি মুক্তি পেলেন। এখন তাঁর বিরুদ্ধে ভিন্ন পরিচয়ে জেল থেকে বেরিয়ে যাবার অদ্ভুত অভিযোগ আসে কেমন করে?

অতিরিক্ত জেলার সরল মানুষ। এবার তিনি ভেঙ্গে পড়লেন।

: স্যার, আমি কী করব? হোম থেকে হুকুম দিয়েছে, সরদার ফজলুল করিমের নামে কেস একটা করতে হবে। তাই আমি কেস করেছি।...

কোর্টের হাকিম ব্যাপারটিকে আর অগ্রসর হতে দিলেন না। বললেন, যাই হোক, ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে সরদার ফজলুল করিম জড়িত হতে পারেন না।

মোট কথা, এ নালিশ থেকে কোর্ট আমাকে মুক্ত করে দিল। কিন্তু তাতে কী? নিরাপত্তা আইনের সীমাহীন সময়ের বিধান তো রয়েছেই। তাই এমন অদ্ভুত অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়েও আমাকে ফিরে যেতে হল আমার পরিচিতি জগত, বন্দী নিবাসে।

তবু অতিরিক্ত জেলারের উপরওয়ালা, বিশেষ করে স্বরাষ্ট্র বিভাগ সব দায়িত্ব চাপাল ঐ অতিরিক্ত জেলারেরই উপর। তিনি নাকি তাঁর দায়িত্ব পালনে অবহেলা দেখিয়েছেন। তিনি আমার পিতার নাম ইত্যাদি নাকি জিজ্ঞাসাবাদ করে লিখিত পরিচয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেননি। আর সেই অপরাধেই হল তার সাসপেনশন।

অথচ আমার এই আলোচ্য ব্যাপারে অতিরিক্ত জেলারের আদতেই কোন দোষ ছিল না। তখন যুক্তফ্রন্টের আমলে এসে গেছে রাজবন্দীদের মুক্তির পালা। আজ কয়েকজনের মুক্তি, তো কাল অপর কয়েকজনের। আবু হোসেন সরকার যে একদিনেই সাধারণ মুক্তি ঘোষণা করে সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দিবেন, সে সাহস তাঁর ছিল না। অপর দিকে যুক্তফ্রন্টের একেবারে প্রথম দফায় ঘোষিত অঙ্গীকার, 'সকল রাজবন্দীর মুক্তি'—তাকেও তিনি পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারছিলেন না। তাই কোন পরিচিত রাজবন্দীকে মুক্তি দিলে তিনি আবার তাকে পরামর্শ দিতেন, দেখবেন ভাই, আপনার রিলিজের খবরকে যেন কাগজে আবার বড় করে না ছাপে। তাহলে করাচির চাপে আবার অঘটন ঘটবে।

সে যা হোক, দু'একদিন অন্তর দলে দলে এই মুক্তির মধ্যে স্বাভাবিকভাবে এসেছিল আমার মুক্তির কথাটি।

অতিরিক্ত জেলার ভদ্রলোকের নিজের জবানীতে : আমার দোষ কোথায় বলুন। আমি কী করব? আপনারা যেদিন মুক্তি পান সেদিন দুপুরে হোম (অর্থাৎ হোম ডির্পাটমেন্ট) থেকে আমাকে ফোন করা হল : 'আজ বিকেলে কয়েকজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজবন্দী ছাড়া পাবেন। আমি তাদের নাম বলছি। লিখে নিন এবং তাদেরকে রিলিজের জন্য রেডি করুন।' আর যে নামগুলি হোম থেকে ফোনে বলেছিল তার প্রথমেই ছিল ফজলুল করিম-এর নাম। আমি তখনি জিজ্ঞেস করেছিলাম ফোনে : উনি সরদার ফজলুল করিম তো? জবাবে হোম বলেছিল : ঢাকা জেলে এই নামে আর কেউ নাই তো? আমি বলেছিলাম, না, সরদার ফজলুল করিমই আছেন। তাঁকে আমরা চিনি। তিনি এক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। আর এর জবাবে হোম বলেছিল, তবে উনিই রিলিজড হবেন।'

এই কারণেই আমাদের রিলিজের সময়ে ভদ্রলোক অত খুঁটিনাটিভাবে কাগজপত্র মেলাননি। কিন্তু এটা তো মারাত্মক ব্যাপার কিছু নয়। সকলকেই আগে-পরে মুক্তি দেওয়া হচ্ছিল। আসলে এই ভুলের সুযোগ নিয়ে আবু হোসেন সাহেব করাচির হুকুমে আমার বিরুদ্ধে একটা নির্দিষ্ট অভিযোগের কেস করে করাচিকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। আর করাচি কর্তৃপক্ষ গণপরিষদকে দেখাতে চেয়েছিলেন যে, রাজনৈতিক কারণে নয়, বিশেষ অভিযোগের কারণে সরদার ফজলুল করিমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

দেশের সমাজব্যবস্থা, এমন কি কোন সরকার পরিবর্তনের আন্দোলনে জড়িত কোন রাজনৈতিক কর্মীর জন্য এ রকম হাস্যাস্পদ অভিযোগে (এর চেয়েও হাস্যকর অবিশ্বাস্য কত অভিযোগে কত কর্মী অভিযুক্ত হয়েছেন।) অভিযুক্ত কোন অভিনব ব্যাপার নয়। এ নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করারও কিছু নেই। আমি সে চিন্তা করিওনি। মোটকথা আমার গ্রেপ্তারটা একেবারেই রাজনৈতিক, আমাকে যে আদৌ মুক্ত জগতে থাকতেন দেওয়া হবে না, এমন কি আমি গণপরিষদের নির্বাচিত সদস্য হওয়া সত্ত্বেও, তা এতেই প্রমাণ হল যে এই মিথ্যা অভিযোগ থেকে বিচারালয় আমাকে মুক্তি দিলেও সরকার নিরাপত্তা আইনে আমাকে আটক করে রাখতে থাকলেন এবং আমার পক্ষে আর গণপরিষদে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান তৈরির বির্তকাদিতে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হল না।

এই গল্পটাই একটু বিস্তারিতভাবে 'মধ্যরাতের অশ্বারোহী' কবি ফয়েজকে তাঁর আগ্রহাতিশয্যে এদিন আমি বলতে বাধ্য হলাম।

ফয়েজ শেষে প্রশ্ন করলেন : তাহলে আপনি সত্যি সত্যি ছাড়া পেলেন কবে?

: কেবল আমি নই, আমরা সকলে, অর্থাৎ রাজবন্দী সকলে মুক্তি পেলেও আওয়ামী লীগ যখন ১৯৫৬ সনের শেষ দিকে পূর্ব-পাকিস্তানের সরকারে আসীন হল এবং আতাউর রহমান খান শেখ মুজিবকে নিয়ে তাঁর মন্ত্রিসভা গঠন করলেন তখন। তাঁরা প্রথমেই নিরাপত্তা আইন একেবারে বাতিল করে দিলেন এবং আমাকে সহ সকল রাজবন্দীকে কারাগার থেকে সংবর্ধনা জানিয়ে মুক্ত করে নিয়ে এলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ব-পাকিস্তানে সরকারের এই পরিবর্তন অবশ্য কেন্দ্রের পরিবর্তনের কারণেই সম্ভব হয়েছিল। ১৯৫৬ সনের গোড়ার দিকে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয়। বিভিন্ন দলের সমঝোতার মাধ্যমে এসকেন্দার মীর্জা প্রেসিডেন্ট হন। এ সময়েই আওয়ামী লীগ এবং সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নেতৃত্বে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ-রিপাবলিকান পার্টির সরকার গঠিত হয় (অক্টোবর, ১৯৫৬)।

: কিন্তু তারপরও তো আপনি আবার গ্রেপ্তার হয়েছেন? ফয়েজ আবার প্রশ্ন করলেন।

আমি বললাম : হ্যাঁ, সে আর এক পর্যায়ে। ১৯৫৮ সনের অক্টোবর মাসে এসকেন্দার মীর্জা এবং আইয়ুব খান যখন গণতান্ত্রিক সকল ব্যবস্থা বিনষ্ট করে দেশব্যাপী সামরিক আইন জারি করল, পার্লামেন্ট ও আইনসভাগুলি ভেঙ্গে দিল, সকল রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল, তখন। কিন্তু কেবল তখনই নয়। পাকিস্তানের শেষ দশাতে সেই ১৯৭১ সনের ভয়াল বছরে আবার পাকিস্তান সামরিক বাহিনী অপর সকলের মতো আমাকেও গ্রেপ্তার করে নিক্ষেপ করেছিল বন্দীশালায়। কিন্তু সে কাহিনী আজ নয় (১৬-৩-৮১)।

*　　　　*　　　　*

কয়েকদিন আগের 'বিচিত্রতা'য় দেখলাম ফয়েজ তাঁর মধ্যরাতের অশ্বারোহী সিরিজের একটি লেখাতে আমার বলা এ কাহিনীটির সারমর্ম উল্লেখ করেছেন। তিনি অবশ্য তাঁর সরস হাতে এর চমৎকারিত্বের দিকটাতেই জোর দিয়েছেন। কত বিচিত্র রকমে জেলগমন এবং জেল থেকে নিষ্ক্রমণ হয় এবং হয়েছে, তার অন্যান্য দৃষ্টান্তের সঙ্গে আমার কাহিনীটিও উল্লেখ করেছেন। তবে এ রকম কাহিনীর মূল মর্ম এর চমৎকারিত্ব নয়। আমাদের দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রাজনৈতিক কর্মীর উপর প্রতিষ্ঠিত সরকারের আইনহীন, নীতিহীন হয়রানী ও নির্যাতনের দৃষ্টান্ত হিসাবেই এর তাৎপর্য (২৬-৪-৮১)।

॥১৯৮১॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একুশ থেকে একুশ

মনোবিজ্ঞানে 'ফিকশেসন' বলে একটি কথা আছে। বাংলাতে একে আমরা বলতে পারি 'আবদ্ধতা'। কিংবা আরো নির্দিষ্ট করে বললে 'খুঁটা গাঁড়া'। এর অর্থ, আমাদের মন অনেক সময়ে একটি ব্যক্তি, বিষয় বা বস্তুতে এমনভাবে আকর্ষিত বা আসক্ত হয়ে পড়ে যে, সে আর তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। বাস্তব অবস্থা বা নিজের দৈহিক বয়স হয়ত এমনভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে যে, এমন আবদ্ধতা আর ব্যক্তির পক্ষে মানানসই থাকছে না, তবু ব্যক্তি সেখান থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হচ্ছে না। বলা চলে ব্যক্তি হয়ত বুঝছেই না যে, তার এই স্থানুবৎ আবদ্ধতা আর তাকে মানায় না। এমন হলে ব্যাপারটি অন্যের চোখে রোগ বলে মনে হয়। মনোবিজ্ঞানে এ রোগের নিরাময় বিধি কী তা আমি জানিনে। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারির ক্ষেত্রে আমারও যেন তেমনি একটি আবদ্ধতার ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেছে। ব্যাপারটির একটি মনোবিশ্লেষণেও আমি চেষ্টা করেছি। একুশে ফেব্রুয়ারি ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে বোধ হয়েছে একটি রহস্য-পুরুষ হিসাবে। তাকে প্রথম ভেবেছি রহস্য-শিশু হিসাবে যার জন্ম হয়েছে ২১শে ফেব্রুয়ারি ৫২ সালে। তারপরে তাকে মনে হয়েছে বর্ধমান তরুণ হিসাবে। এখন তো সে বয়সের দিক থেকে বয়ঃপ্রাপ্ত যুবকই নয়, প্রায় ত্রিশ বছরের পুরো মানুষ। এমন বোধের কারণ হয়ত এই যে, একুশে ফেব্রুয়ারিকে আমি নিজে চোখে দেখিনি। তবু সে যেভাবে পূর্ববাংলার মানুষকে আপাদমস্তক আন্দোলিত করেছিল তাতে তাকে রহস্যময় এক শক্তি বলে আমার মনে হয়েছে যার সঙ্গে ইতিপূর্বে আমার তেমন সাক্ষাৎ ঘটেনি। আমার, – মানে সেই পঞ্চাশ দশকের বামপন্থী অগ্রগামী রাজনৈতিক কর্মী, বিশেষ করে পাকিস্তানের নিশ্ছিদ্র কারাগারগুলিতে বন্দী মানুষের–ব্যক্তিগত ঋণেরও কিছু ব্যাপার আছে। সে অনুভূতির কথা স্থানান্তরে এবং বারান্তরে আমি কিছুটা প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু গেল কয়েক বছর আমার একটা বিশেষ আগ্রহ ও আবদ্ধতা এই দাঁড়িয়েছে যে, প্রতি একুশের প্রতিপালনকে আমি বিশেষ উৎসাহ নিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি। আবার সকলের সঙ্গে একুশের রাত্রিতে বা প্রত্যুষে নগ্নপায়ে পথে নেমেছি, শহীদ মিনারের কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৌঁছার চেষ্টা করেছি, বাংলা একাডেমীর কবিতা পাঠ বা গানের আসরে হাজির থেকেছি। এমন কি কোন সভাতে অন্য সাথীদের সঙ্গে বক্তৃতাও করেছি। এবং প্রতি একুশের সন্ধ্যাতে সেই একুশের স্মৃতিচারণ করে রোজনামচা লিখেছি। পুরনো খাতার পৃষ্ঠা ওল্টাতে গিয়ে দেখলাম, এ রকম একুশের বিবরণ একাধিকই জমা হয়ে গেছে। একুশের উপর এমন রোজনামচা তৈরির তাগিদ আমার এসেছে প্রধানত এদিক থেকে যে, আমি বড় দুর্বল স্মৃতির মানুষ। আমি কিছুতেই গতকালকার বাজারের হিসাব লিখতে বসে মনে করতে পারিনে, এক সের ডাল এগার টাকায় কিনেছি না সাড়ে দশে পেয়েছি, কিংবা এক সের তেল সয়াবিন এনেছি, না ভালো তেল এবং তা কততে, কিংবা ডিমের দাম কি ছিল অথবা এক সের টমেটো বা তিতে এখনো ছ'টাকা না চার টাকা। এই আশঙ্কা একুশকে নিয়েও। পাছে আমি ভুলে যাই এবারকার একুশের পথযাত্রার কথা, কে কেমনভাবে নিল এবারের একুশকে। এ কথা মনে রাখার কি কোন তাৎপর্য নেই? আমার মনে হয় আছে। একুশ থেকে একুশ বা ফালগুন থেকে ফালগুনে কেবল একুশের বয়স বৃদ্ধি নয়, আমাদের রাষ্ট্র, সমাজ ও জীবনেরও বিকাশ ও বিবর্তন। সে কোন দিকে? তার আভাস অন্য কোন দিনের উদযাপন না হোক একুশ থেকে একুশে একুশের উদযাপন তার আভাস নিশ্চয়ই কিছু ভেসে ওঠে। আর সে চিন্তা থেকেই আমার পুরনো খাতা থেকে '৭৭ আর '৮০ : এই দু বছরের 'একুশে ফেব্রুয়ারি'কে পাঠকদের কাছে পেশ করার একটা আকর্ষণ বোধ করছি।

AMARBOI.COM

'৭৭-এর একুশ

॥ ২১-২-৭৭ ॥ সাতাত্তরের একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান আজ শেষ হল। আমি আমার ছোট ছেলে তিতুকে নিয়ে সকালে সাড়ে ছ'টার দিকে বেরিয়েছিলাম শহীদ মিনারে কেমন জন-জমায়েত হয়েছে তা দেখার জন্য। রাস্তায় বেরিয়ে দেখলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভলান্টিয়ার বাহিনী এবং সরকারি পুলিশ সকলে জন-জমায়েতকে আজিমপুরে গোরস্থানমুখী করে দিচ্ছে। সোজা শহীদ মিনারে যাওয়ার উপায় নেই। আজিমপুর গোরস্থান হয়ে যেতে হবে। শহীদ মিনারে সোজা যাওয়ার সব পথ বন্ধ। এ নির্দেশের একটা তাৎপর্য ভালো বলে বোধ হল। আজিমপুরে ভাষা আন্দোলনের দুজন শহীদের বাঁধানো কবর আছে। একজন বরকত। অপর জন শফিক। অন্যান্য বছর প্রতিষ্ঠানগতভাবে অনেকে গোরস্থানে এসে এঁদের কবরে ফুল দিয়ে যেতেন। আবার অনেকে সোজা শহীদ মিনারে যেতেন। এবার আর তা হবার উপায় নেই। সকলকেই গোরস্থানের মধ্য দিয়ে শহীদ বরকত-শফিকের কবর হাতের ডানে রেখে আজিমপুরের রাস্তা ধরে শহীদ মিনারের দিকে এগুতে হয়েছে। আমরা দু'জনও গোরস্থান হয়ে ছাত্র-কিশোর-কিশোরী-শিশু এবং জনতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাইনে দাঁড়িয়ে আজিমপুর রাস্তা ধরে শহীদ মিনারের দিকে এগুলাম। দু লাইনে। কিন্তু শহীদ মিনারের কাছাকাছি আবার এক লাইন হয়ে এগুবার নির্দেশে সময় এত অধিক লাগছিল যে, মাঝখান থেকে বেরিয়ে এসে বাংলা একাডেমীতে গিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম বাংলা একাডেমীতে বিরাট শামিয়ানার নিচে কবিতা পাঠের আসর বসে গেছে। এর পরে শুনলাম, শহীদ মিনারে কাউকে দাঁড়াতে দেয়া হয়নি। এমনকি মিনারের বিপরীতে যে সমস্ত বাণীর ফেস্টুন ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে তাকে পড়ার সুযোগও দেয়া হয়নি। মোটকথা কয়েক বছর যাবত একুশের অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করার যে চেষ্টা চলেছে তাতে এবার আর কোনদিকে কোন ব্যতিক্রম ঘটতে পারেনি। আগের দিনে শহীদ মিনারে স্বতঃস্ফূর্ত জনজমায়েত হত। শহীদ মিনারে রাত বারোটা থেকে শিশু-কিশোর-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা জমায়েত হতে আরম্ভ করত। তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকত। হয়ত কোন সঙ্গীতের আসর বসত। পোস্টারের প্রদর্শনী হত। তাই দেখত। শহীদ মিনারের কাছে একটি বিষাদ কিন্তু উদ্দীপনার আবেগ তৈরি হত। তা থেকে সহজে কেউ সরে আসতে চাইত না।

এখন আর সে আবেগের কোন অস্তিত্ব নেই। সবই সুশৃঙ্খলিত। তবু একুশের একটা টান আছে। সেই টানে রাজনীতির বাইরে যারা আছে তারাও পথে বেরিয়ে এসেছে। এই নিয়ন্ত্রণকে মেনেই শহীদ মিনারে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। রাজনীতির দল-উপদল নিজেদের অভিমতও যে কিছু পরিমাণে এ উপলক্ষে প্রকাশ করার চেষ্টা না করেছে, তা নয়। গত রাতে কোন ছাত্রদলের শহীদ মিনারের উপরের চত্বরে ওঠা নিয়ে পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে নাকি বিরোধ ঘটেছে। পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করেছে। কিন্তু সব মিলিয়ে এ একুশ নিয়ন্ত্রিত ও আবেগহীন আনুষ্ঠানিকতার একুশ। একজন রিকশাওয়ালা দুপুরে শহীদ মিনার থেকে প্রত্যাগতদের পায়ের জুতোর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'শুধু এখন নয়। সকালেও অনেকের পায়েই জুতা ছিল। সাহেব, সে একুশ আজ আর নাই। আর বছর দুই যাওবা থাকবে, তারপরে আর তাও থাকবে না।' এক বন্ধু বললেন, নিয়ন্ত্রণকারী এক স্বেচ্ছাসেবক নাকি শহীদ মিনারের পাদপীঠে নিজে স্বজুতায় থেকেই অপরকে জুতা খোলার নির্দেশ দিয়েছেন। একুশ উপলক্ষে সরকারি প্রতিষ্ঠান, প্রধানত বাংলা একাডেমী ও শিল্পকলা একাডেমী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। বাংলা একাডেমীতে জনসমাগম কম হয়নি। তাদের অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল সন্ধ্যাবেলার নাট্যানুষ্ঠান কিংবা সঙ্গীতানুষ্ঠান। এর সাথে কিছু আলোচনাও ছিল। ছোটদের বিতর্ক ছিল। '৭৬ সনের জন্য বাংলা একাডেমীর সাহিত্য পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে গতকাল। ছটি ক্ষেত্রে এঁরা সাহিত্য পুরস্কার দিয়ে থাকেন। এবার অনুবাদে আমার নাম এঁরা এঁদের এই নির্বাচনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এটা আমাকে বিব্রত করেছে বেশি। বেশ কয়েকজন অভিনন্দন জানিয়েছেন আমাকে। আমি নিজেও একদিন বাংলা একাডেমীর কর্মচারী হিসাবে এই সাহিত্য পুরস্কার প্রদানের সংগঠনগত ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলাম। এরূপ পুরস্কার প্রদানের আদৌ কোন যৌক্তিকতা নেই, এমন কি মনে করিনে। কিন্তু বছর থেকে বছরে এই সাহিত্য পুরস্কারের নির্বাচন এমন সব অ-সাহিত্যিক বিবেচনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছ যে এ পুরস্কারের উদ্দীপনামূলক চরিত্র অনেকখানি বিনষ্ট হয়েছে। আর তাছাড়া কোন পুরস্কারের লক্ষ্য নিয়ে আমি আদৌ কোন কাজ করি নি। আমার কাজেরও তেমন বৃহৎ কোন পরিমাণ নেই। আমি পেশাগত সাহিত্যিকও নই। নিজের অনুভূতিতে যে কাজ করা আবশ্যক বোধ করেছি নিজের শক্তিমতো তা করার চেষ্টা করেছি। আগামীতেও তা করব। এ সব পুরস্কার প্রদান অনেক ক্ষেত্রে নানা ঈর্ষা এবং কটূক্তি বা বক্রোক্তির উদ্রেক করে। সেদিন থেকে আমাকে একুশের সাহিত্য পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত না করলেই আমি অধিকতর উপকৃত বোধ করতাম। কিন্তু এ নির্বাচনে আমার কিছু করণীয় ছিল না। আমাকে পূর্বাহ্নে জিজ্ঞেস করলে আমি সবিনয়ে এটি নাকচ করতাম। কিন্তু আজ প্রকাশ্যভাবে বিবৃতি দিয়ে এটি প্রত্যাখ্যান করার তাৎপর্য ভিন্নতর। সে তাৎপর্যকে আমি বুঝি। কিন্তু তেমন রাজনীতিক পদক্ষেপ নেয়াও এক ধরনের বাড়াবাড়ি বই আর কিছু নয়। এরূপ উদাহরণ যে ইতিমধ্যে কিছু তৈরি না হয়েছে তা নয়। বদরুদ্দীন উমর বছর দুই আগে তাঁকে প্রদত্ত বাংলা একাডেমীর সাহিত্য পুরস্কার বিবৃতি দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বদরুদ্দীন উমর তাঁর প্রতিবাদী অভিমতের জন্য বেশ আলোচিত সাহিত্যিক ও ব্যক্তিত্ব। মতামতের জন্য উঁচু অধ্যাপনা পরিত্যাগ করছেন। সাহিত্য দ্বারা রাস্টযন্ত্র সাহিত্যিকদের ক্রয় করার চেষ্টা করে। তিনি সেভাবে ক্রীত হতে চাননি। তাঁর এ কথা জোর যে নেই তা নয়। কিন্তু এ রাষ্ট্রযন্ত্র জনসাধারণের টাকাতেই চলছে। এর প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান। তার কাগজ, বেতার, টেলিভিশন এবং নানা শিক্ষা ও সাহিত্য প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ টাকার ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। প্রত্যাখ্যানের নীতিতে এর সবগুলিকেই প্রত্যাখ্যান করতে হয়। কিন্তু সেরূপ প্রত্যাখ্যানের একটি নৈরাজ্যিক অর্থ যে রয়েছে সেটিও অস্বীকার করা চলে না। এবার আর যাঁদেরকে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার দেয়া হয়েছে তাঁদের মধ্যে কবিতায় রয়েছেন মতিউল ইসলাম, ছোটগল্পে সুচরিত চৌধুরী, নাটকে মমতাজউদ্দীন, উপন্যাসে দিলারা হাশেম, প্রবন্ধে সিরাজ উদ্দিন কাসেম পুরী এবং শিশু সাহিত্যে ফয়েজ অহ্‌মদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'৮০-এর একুশ

। । ২৪-২-৮০ । । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ২১শে ফেব্রুয়ারী বিকেল পাঁচটায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে একুশের স্মরণে আলোচনা সভা ডেকেছিলেন। গোড়ার দিকে উপস্থিতি হয়ত দশজনও ছিল না। পরের দিকে হয়ত পঁচিশ জনে পৌঁছেছিল। সেখানেও সংগঠকদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে কিছু বলতে হয়েছিল। যারা স্বভাব বক্তা নয়, ভিতর থেকে বক্তৃতার বেগ যারা বোধ করে না তাদের জন্য এমন অনুরোধ বড় বিব্রতকর। তবু আমাকে কিছু বলতে হয়েছিল। প্রথমে বলেছিলেন ড. মহব্বত আলী, শরীফ উল্লাহ ভুঁইঞা, ড. অজয় রায়, ড. শামসুল হক মোল্লা, জনাব আবুল কালাম আজাদ– এঁরা। আমার ব্যক্তিগত কিছু আবেগের প্রকাশ ব্যতীত বলার আর কিছু ছিল না। আমি রাজনৈতিক কর্মী, বিপ্লবী বা নেতা নই। একুশে ফেব্রুয়ারীর সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতাও আমার নেই। তবু বয়সের দিক দিয়ে পঞ্চান্ন বছরে পা দিয়ে কারুর অনুরোধ উপেক্ষা করার যেমন ক্ষমতা নেই, তেমনি বলতে গেলেও বয়সগত অভিজ্ঞতার কিছু স্মৃতিচারণ ব্যতীত তেমন বলারও আমার কোন পুঁজি নেই। সেই অভিজ্ঞতার কথাই বলার চেষ্টা করলাম: ১৯৪৮ সালের প্রথমে ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি এবং '৫২ সালের বন্দীদশার কথা। বন্দীদের মনে '৫২-এর একুশ কি আশা ও ভরসার কথা শুনিয়েছিল, কিভাবে একুশ শত শত রাজনৈতিক বন্দী, যাঁরা বছরের পর বছর ধরে অন্ধকারগুহায় নির্যাতনে, নিষ্পেষণে, নিরাশায় মুষড়ে পড়ছিল তাদের কিভাবে একুশ নবজীবন দান করেছিল, তার কথা। একুশের সপ্তাহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পালিত হচ্ছে। গত কয়েকদিনের আলোচনায় অন্য সবার মতো আমিও আজকের একুশের অনুষ্ঠান সর্ব-স্বতায় দুঃখ প্রকাশ করেছি। তথাপি শিক্ষক সমিতির আলোচনায় আমি যখন বলেছি যে, তথাপি একুশ এখানো আমাদের উদ্বেগের বিষয়, আমরা চেয়ে থাকি উদ্বেগাকুল, চিন্তান্বিত, শঙ্কিত মন নিয়ে আগামী একুশ কেমন করে আসবে এবং একুশ পার হয়ে গেলে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি, সরকার থেকে আরম্ভ করে প্রতিষ্ঠান, সমাজব্যবস্থার সকল প্রতিষ্ঠান– তখন আমি নিজের একটি অনুভূতির কথাই বলেছি। একুশ এখনো আমাদের সামনে একটি প্রশ্ন, একটি জিজ্ঞাসা। সরকার থেকে শুরু করে নানা রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত নিজ নিজ ইচ্ছা ও কামনা থেকে এ প্রশ্নের জবাব দিতে চায়। তবু আশঙ্কা থাকে, এবারের একুশ জীবনের কি সত্যকে উদঘাটন করবে?

*　　　*　　　*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবার রাত বারোটার পর থেকে 'আমার ভাই-এর রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভুলিতে পারি'– হৃদয়ের বেদনার্ত এ সুরের গুঞ্জন আমার বাসার পাশের প্রধান সড়কটিতে যত না শুনেছি তার চেয়ে বেশি শুনেছি নানা রাজনৈতিক দলীয় শ্লোগান: 'জেলের ভেতর গুলি কেন,–জবাব চাই, জবাব চাই,' 'জিয়া শাহীর গদিতে–আগুন জ্বালো এক সাথে' কিংবা সরকারী দল বি এন পির শ্লোগান, 'জিয়া আছে যেখানে আমরা আছি সেখানে।' রাতে আমি নিজে বেরুইনি। মেয়ে স্বাতী রাতের প্রথম দিকেই চলে গেল তার মেডিকেল কলেজ হস্টেলে। বারোটার পরে সে তার বান্ধবীদের নিয়ে শহীদ মিনারে যাবে ফুল দিতে। ছোট ছেলে তিতুকে নিয়ে মেয়েকে মেডিকেল কলেজ হেস্টেলে পৌঁছে দিয়ে মিনারের সামনে একুশকে আবাহনের সাজসজ্জার আয়োজন দেখলাম। বেশ কিছু ফেস্টুন কবি-সাহিত্যিকদের উদ্ধৃতি দিয়ে টানিয়ে দিয়েছে মিনারের উল্টোদিকের চত্বরে। নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার যে চরণের উদ্ধৃতি দিয়েছে তাতে ভুল রয়েছে বলে নজরে পড়ল। তিতুও বলল : আব্বা, এ লাইন তো হবে 'অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ,' অত্যাচারের তো নয়।' আমারও মনে হল, তাই। কোথাও দেখলাম, শব্দের বানানে ভুল আছে, তবু লাল নীল কালিতে বড় বড় পোস্টার এবং তার উপর প্রক্ষিপ্ত উজ্জ্বল আলো চত্বরটিকে ভরে তুলেছে। জাসদের কর্মীরা দেখলাম আবদুর রব এবং মেজর জলিলের ছবি টাঙ্গিয়ে দিচ্ছে দু'দিকে দু'টো গাছের সঙ্গে আর তার প্রশ্ন: রব-জলিল জেলে কেন? শহীদ মিনারের চূড়ায় দেখলাম শেখ মুজিবের একটি ছবি টানানো হয়েছে। তাঁর পাশে জাসদের ফাঁসিতে নিহত কর্নেল তাহেরের ছবিও রয়েছে। একুশের পূর্বে শহীদ মিনারের ব্যবস্থাপনায় থাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট কমিটি। এবার সে কমিটির নেতৃত্ব নির্বাচিত ছাত্র সংসদ 'ডাকসুর' হাতে। ডাকসুর নেতৃত্ব প্রধানত জাসদ কর্মীদের হাতে। তাদের কর্মী এবং ডাকসুর সহ-সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না এবং সাধারণ সম্পাদক আখতার-উজ্জামান দু'জনেই প্রথম শ্রেণীর বাগ্মী এবং সংগঠক। কিন্তু শহীদ মিনারের চত্বরে ও চারপাশে যে জনতার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি সে হচ্ছে লোহার টুপি পরা সুসজ্জিত পুলিশ বাহিনী। সশস্ত্র বাহিণীও বোধহয় মজুদ আছে। অনেকে বলেছেন, এবার শহীদ মিনারে যত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে তেমনটি ইতিপূর্বে আর কখনো করা হয়নি। পুলিশ বাহিনী থাকুক বা না থাকুক দেশের রাজনৈতিক যা ব্যবস্থা তাতে শহীদ মিনারের পুষ্পদানের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে, বিশেষ করে সরকারী দল বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ কর্মীদের মধ্যে না কোন সংঘাত বেঁধে যায়—এ আশঙ্কা সবার মনে ছিল। কিন্তু তেমন কিছু হয়নি। একুশের সকালে আগের রাতের যে বিবরণ পাওয়া গেল তাতে বোঝা গেল যে, বারোটার পরে প্রেসিডেন্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিয়াউর রহমান তাঁর মন্ত্রীবর্গ নিয়ে নিয়ে শহীদ মিনারে গিয়েছিলেন। মিনিট কয়েকের মধ্যে তিনি ও তাঁর সহকর্মীগণ পুষ্পমাল্য স্থাপন করে চলে যান।...

ছোট ছেলে তিতু সকাল ছটার দিকে বাসা থেকে বেরিয়ে ঘুরে এল। আমাদের বাসার পাশ দিয়ে নীলক্ষেত সড়ক দিয়ে খণ্ড খণ্ড মিছিল আজিমপুর কবরস্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সেখান হয়ে সমস্ত সংঘবদ্ধ মিছিল শহীদ মিনারে এসে শেষ হবে। কখন কোন মিছিল রাত বারোটা থেকে গিয়েছে এবং তাদের জমায়েতের কোনটি কী রূপ ধারণ করেছিল তা আমি দেখিনি। আমি রাস্তায় বেরিয়েছি সকাল সাতটায়। খালি পায়ে একটি ব্যাগ হাতে পশ্চিম দিকে এগুতে গিয়ে দেখলাম, পেছন থেকে একটি শোভাযাত্রা আসছে। সেটি দেখার জন্য নীলক্ষেত আর পুরাতন রেল সড়কের রাস্তার চারমাথায় দাঁড়িয়েছিলাম। তখনি বেশ কয়েকটি মিছিল দেখলাম। প্রথমটি জাসদ, মানে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল এবং তাদের ছাত্র শাখা ছাত্রলীগ সহ অন্যান্য অঙ্গসংগঠনের ফেস্টুনসহ মিছিল। তারা সবাই শ্লোগান দিচ্ছিল। এর পরে এল আওয়ামী লীগ এবং তার অঙ্গসংগঠনসমূহের মিছিল। এ মিছিলের সামনেও আমার পরিচিতি কিছু নেতাকে দেখলাম। আবদুল মালেক উকিল, মহিউদ্দীন আহমদ—এঁদেরকে দেখলাম। ড. কামাল হোসেন শেখ সাহেবের মন্ত্রিসভার বৈদেশিক মন্ত্রী ছিলেন। '৭৫ এর আগস্টের পরে বিদেশে ছিলেন। সম্প্রতি বুঝি দেশে ফিরেছেন। আওয়ামী লীগের পরে এল চৌধুরী হারুনুর রশীদের ন্যাপ। ন্যাপ এখন অনেক উপদলে বিভক্ত। হারুনুর রশীদ সাহেবকে দেখে বুঝলাম, এটি তাঁর ন্যাপ। এর পরে মনি সিংহের নেতৃত্বে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এবং আরো কয়েকটি গণসংগঠনের কর্মীরা এলো। তাদের নিজ নিজ নামের ফেস্টুন দেখলাম। জেনারেল ওসমানী সাহেবকে দেখলাম, তাঁর দলের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। হাসপাতাল কর্মীদের, বিশেষ করে মহিলা কর্মীদের মিছিলের দৃশ্যটিও চোখ পড়ল। মোট কথা মারামারি না করে একের পর এক নিজেদের দলীয় বা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের অভাব-অভিযোগের আওয়াজ এবং ফেস্টুনসহ আজিমপুরের মাজার হয়ে শহীদ মিনারের দিকে অগ্রসর হওয়ার এই দৃশ্য আমার ভালো লেগেছে। অন্তত বিরোধী কিছু দল যে ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের দাবিদাওয়া ও অভিমত দেশের সামনে পেশ করতে চাচ্ছে, তার একটি আভাস শহীদ মিনারের উদ্দেশ্যে অগ্রসরমান এই মিছিলে প্রকাশ পেয়েছে।

আমিও কিছু রাস্তা ঘুরে শহীদ মিনার হয়ে বাংলা একাডেমীর কবিতা পাঠের আসরের দৃশ্য দেখতে গিয়েছিলাম। শহীদ মিনার পার হওয়ার সময়ে দেখলাম, মাহমুদুর রহমান মান্না তাঁর আকর্ষণীয় কণ্ঠে দক্ষতার সঙ্গে অক্লান্তভাবে বিভিন্ন মিছিল ও জন-জমায়েত সম্পর্কে ধারা বিবরণী দিয়ে যাচ্ছেন। মাহমুদুর রহমান মান্নার বিভিন্নমুখী পরাদর্শিতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা একাডেমীতেও বিরাট শামিয়ানার নিচে কবিতা পাঠের আসর অন্যান্য বছরের মতোই বসেছে। মঞ্চে কবি আবুল হোসেন সভাপতিত্ব করছেন। প্রধানত তরুণ কবিরা তাঁদের কবিতা পড়ছেন। নির্বাধ পাঠ। কারুরই পাঠ করতে কোন অসুবিধা নেই। একাডেমীর পক্ষ থেকে কারুরই কোন অভিমতে আপত্তি নেই। এ ঐতিহ্যটি ভালো তৈরি হচ্ছে বলে আমার মনে হয়। হয়ত অনেকের কবিতা অনেকে শুনছে না। হয়ত অনেক কবিতাই দুর্বল। তবু আজকের দিনের কোন কবিতা বক্তব্যহীন নয়। এবং সাধারণ শ্রোতা-দর্শক সপ্রশংসভাবে গ্রহণ করছে কবিদের সব প্রকাশকে। বক্তব্যের প্রধান সুর : অন্যায়, অবিচার বা শাসনের অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী সুর। কবি সানাউল হকের সঙ্গে দেখা হল। এখন তিনি সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। তরুণ কবিদের এই তেজী মনোভাবে সানাউল হক দেখলাম বেশ উজ্জীবিত বোধ করছেন। সানাউল আমার শিক্ষা জীবনেরও সাথী, যদিও আমার চেয়ে বয়সে জ্যেষ্ঠ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন আমার আগে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে 'তুমি' সম্বোধনে হৃদ্যতা বিদ্যমান। সানাউল ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখের একুশের সপ্তাহ উদ্বোধনে বাংলা একাডেমীতে বেশ জোরালো বক্তব্য রেখে সকলের প্রশংসা পেয়েছেন। আজ যে চারদিকে শাসনযন্ত্রের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সকল মহৎ ঐতিহ্য ও চেতনাকে বিকৃত করার একটা অপচেষ্টা চলছে, সানাউল হক তার প্রতি তীক্ষ্নভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

* * *

গতকাল মানে ২৩ তারিখের বিকেলে সাংবাদিকতা বিভাগের একুশের আলোচনাতে যোগদানের জন্য আমার প্রতি আহ্বান আমার কাছে বেশ আকস্মিকভাবে এসেছে। বিশ্বদ্যিালয়ের কোন বিভাগই একুশকে যে তেমন গুরুত্ব সহকারে পালন করে, তার কোন পরিচয় নেই। সবাই অপর সব অনুষ্ঠানের অযুহাত দিয়ে নীরব থাকে। কিন্তু একুশ তারিখে কিংবা বাইশ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকদের সহযোগে বিভাগে বিভাগে কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনার ব্যবস্থা করতে পারেন। এটি বিভাগীয় কাজ হিসেবেই গণ্য হওয়া উচিত। কিন্তু এর কোন আগ্রহ কোথাও আছে বলে মনে হয় না। আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে তো নয়ই। কিন্তু ব্যতিক্রম দেখলাম সাংবাদিকতা বিভাগে। তাঁদের কি একটি ক্লাব (গণ-সংযোগ ক্লাব বোধহয়) আছে। তাঁদের তরফ থেকে ২৩ তারিখ বিকেলে বিভাগীয় একটি কক্ষে তাঁরা আয়োজন করেছিলেন 'আমাদের সংস্কৃতি চেতনা ও একুশ'— নামে একটি আলোচনার। বিভাগীয় সংগঠকগণ, বিশেষ করে ছাত্র-কর্মীরা গত দুদিন ধরেই আমাকে খুঁজে বার করে বারবার অনুরোধ করেছেন, আমি যেন আলোচনাটিতে যোগদান করি। তাঁদের এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐকান্তিক আমন্ত্রণ এবং অনুরোধ আমাকে বিব্রত করেছে। কেন যে আমার উপর তাঁদের দৃষ্টি পড়ল, তা আমি এখনো বুঝতে পারছিনে। একটি কারণ হয়ত এই যে, এমন একটি ধারণা তাঁদের হয়েছে যে, লোকটি দুর্বল এবং কোন অনুরোধ বা আদেশ অমান্য করতে পারে না। এ ধারণা যথার্থ।

তাই মনের অস্বস্তি সত্ত্বেও আমি তাঁদের আলোচনাটিতে যোগ দিয়েছিলাম। আলোচনায় ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক আহমেদ হুমায়ুন, অবজারভার পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক জনাব নজরুল ইসলাম, বিভাগীয় অধ্যাপক সাখাওয়াত আলী খান, ওয়াজির হোসেন। তাছাড়া ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক এবং এই বিভাগেরই ছাত্র সুবক্তা আখতারউজ্জামান এবং আরো কয়েকজন আলোচনা করলেন। আহমেদ হুমায়ুন সংক্ষিপ্তভাবে ও সুনির্দিষ্ট করে বললেন, একুশের মূল চরিত্র হচ্ছে জনগণের সার্বিক মুক্তি। সে মুক্তি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত একুশ সার্থক হয়েছে বলা চলে না। এবং বললেন যে, এটাও লক্ষণীয় যে, সেই '৫২ সালের আন্দোলনো সঙ্গে ব্যাপকতম জনতা যতটা সম্পৃক্ত ছিল আজ একুশের আবেদনে তারা যেন ততটা উদ্বুদ্ধ বা সম্পৃক্ত নয়। যেন একটা দূরত্ব দাঁড়িয়ে গেছে একুশের শহরভিত্তিক উদযাপন আর শ্রমিক কৃষক জনতার দূর থেকে নিস্পৃহ দর্শনের মধ্যে। কথাটি ঠিক। কয়েকজন আলোচক বাংলা ভাষার প্রচলন বা শিক্ষা প্রসঙ্গে ইংরেজি অবহেলিত যেন না হয় এবং ইংরেজি অবহেলিত হওয়ার পরিণাম সম্পর্কেও বললেন। আখতারউজ্জামান বললেন, একুশের স্মৃতিচারণের যে আবর্তে আমরা আবর্তিত হচ্ছি তার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে একুশ তাঁর সার্থকতা লাভ করতে পারবে না। সংগঠকরা আমাকে উপস্থিত করতে গিয়ে 'প্রধান অতিথি' ইত্যাদি বলে আমার অবস্থা আরো সঙ্গীন করে তুললেন। আমার বক্তব্যের পূর্ব পর্যন্ত যারা বলেছিলেন তাঁদের সকলের বক্তব্যই আমার বেশ ভালো লেগেছিল। সেদিক থেকে আলোচনাটি বেশ ভালো হয়েছিল। আমি সেজন্য সংগঠকদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানালাম। আমার নিজের বক্তব্য বলতে গিয়ে কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বললাম। বললাম : আমার অনুভূতিতে একুশ নিজেই একটা নতুন সংস্কৃতি, এর পূর্বে আমাদের ছিল না। বাংলাদেশের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক দীনতার ফাঁককে একুশের চেতনা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনেকখানি পূর্ণ করে দিয়েছে। কিন্তু একুশ ভাষা আন্দোলনে হলেও একুশ অবশ্যই একটি প্রতীকী আন্দোলন। ভাষার জন্য ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয়নি। ভাষা মানুষের জীবনের মুক্তি এবং প্রকাশের জন্য। তাই মানুষ মাত্রের যে স্বপ্ন, একটি সুখী জীবন যাপন করার স্বপ্ন এবং সমাজ রাষ্ট্রগতভাবে একটি সঙ্গতিপূর্ণ সুখী সমাজ গঠন করার স্বপ্ন তা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত একুশের সংগ্রামী তাৎপর্য নিঃশেষিত হবে না। অবশ্য সরকারের পর সরকার এসেছে ও গেছে এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের চেষ্টা হয়েছে ক্ষমতায় আসার পূর্বে একুশের সংগ্রামী শক্তিকে ব্যবহার করে ক্ষমতাকে লাভ করার এবং ক্ষমতা লাভের পরে একুশকে অনুষ্ঠানে মাত্র সীমাবদ্ধ করে রাখার। এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই একুশ অগ্রসর হয়ে এসেছে। এং সেদিক থেকে এবারের একুশ কোন ব্যতিক্রম নয়। এবারের একুশকেও প্রকাশিত হয়েছে তার প্রতিরোধী শক্তির চরিত্র। আর তাই আমি নিজে তমাশা বোধ করছিনে চারদিকের একুশের অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠান সর্বস্বতায়। একুশে অবশ্যই সংগ্রামী তরুণ তার অনুষ্ঠান সর্বস্বতার আবর্ত থেকে বার করে নিয়ে আসবে এবং তরুণদের সেই সংগ্রামী প্রয়াস আগামী একুশেতে আবার কিভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে তা দেখবার দুর্বার আগ্রহ অপর সকলের ন্যায় আমরাও। সেদিক থেকে শুধু অতীতে নয়, বর্তমানও এক একুশ থেকে আর এক একুশকে দেখার আগ্রহ এবং আকর্ষণও আমাদের এই কষ্টকর জীবনে বেঁচে থাকার প্রেরণা বিশেষ। আর তাই একুশ আজো আমাদের জীবনের সঞ্জীবনী। ব্যক্তব্যটি এভাবে বলার চেষ্টা করে সংকুচিতভাবে আমি বসে পড়লাম। সংগঠকগণ ও সমবেতরা সহর্ষে আমাকে ধন্যবাদ জানালেন। আমার নিজের প্রসন্নতা এখানে যে, তাঁদের এই আকস্মিক আমন্ত্রণের দায়িত্ব আমি যথাসাধ্য পালন করার চেষ্টা করেছি।

॥১৯৮১॥

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোরট্রেট

মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়ার কথা মনে করেই উপরের শিরোনামটি। বাংলাদেশের জীবনে জিয়া অভিনব না হলেও অবশ্যই একটি তাৎপর্যময় চরিত্র। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টের ঘটনা যেমন একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ চরিত্রের যবনিকা ঘটিয়েছিল, তেমনি তার পরবর্তী ঘটনাবলি আর একটি চরিত্রকে বিকশিত করে তুলেছিল। তখন থেকে বিশেষ করে '৭৫-এর নভেম্বর যখন জনাব জিয়াউর রহমানকে সরাসরি রাজনৈতিক মঞ্চের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এল তখন থেকেই সোৎসুক দৃষ্টি নিয়ে আমি তাঁকে বুঝবার চেষ্টা করেছি। আমার মনের প্রশ্ন ছিল, প্রেসিডেন্ট জিয়ার নিজের মনের চিন্তাভাবনার রূপরেখাটি কী? আমি তাঁর কোন অন্তরঙ্গ ব্যক্তি নই। তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় দিকে পারেন তাঁর সহকর্মীগণ যাঁরা তাকে বেশ কাছ থেকে দেখেছেন, বিশেষ করে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ পেয়েছেন যেসব অধ্যাপক, সাহিত্যিক বা রাজনীতিবিদ, যাঁরা প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমন্ত্রণে তাঁর উপদেষ্টা বা মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তাঁরা জনাব জিয়ার একটি পূর্ণাঙ্গ পোরট্রেট তৈরি করতে পারেন। আমি রাজপুরুষদের সাক্ষাতে যেতে বরাবরই বিশেষভাবে সঙ্কোচ বোধ করি। সে সঙ্কোচের একটা বড় কারণ, রাজপুরুষদের সাক্ষাতে তাঁদের সঙ্গে আলাপে সব সময় একটা সৌজন্য রক্ষা করতে হয়। তাঁরা যা বলেন তাকেই সহাস্যে সমর্থন বা প্রশংসা করতে হয়। তাঁদের সঙ্গে সমানে সমানে কোন মত বিনিময় চলে না। তাঁদের কোন বক্তব্যে দ্বিমত পোষণ করলেও তা বলা যায় না। বলা যায় না এ কারণে নয় যে, তাঁরা দ্বিমত বলতে দেন না। তাঁরা বরঞ্চ সকলকেই অভ্যর্থনা জানান এই বলে কোন সঙ্কোচ করবেন না। বলুন, আপনি যা মনে করেন।' তবু আপনি যা মনে করেন তা বলতে আপনি সঙ্কোচ বোধ করেন। বাঙ্গালী রাজপুরুষ, আপনার আমার সঙ্গে অর্থাৎ জনতার সঙ্গে কথা বলেন একজন রাজপুরুষ হিসাবেই। রাজপুরুষ যে, সে রাজপুরুষই। এমনকি ক্ষুদ্র বাংলাদেশর রাজপুরুষও।

প্রেসিডেন্ট জিয়াকে কিছুটা কাছ থেকে দেখেছিলাম একবার যখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক মিলন কেন্দ্র এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনে দ্বিধাহীনভাবে বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং শিক্ষকদের প্রথম কাতার থেকে ধরে ধরে বক্তৃতা দিইয়েছিলেন। সেদিনকার সেই ঘটনাটির অনুভব আমার নিকট বেশ কৌতুকজনক মনে হয়েছিল এবং অনুষ্ঠান শেষে বাসায় ফিরে তাঁর একটি স্মৃতিচারণও সেদিন করেছিলাম। আর একদিন আরো একটু কাছ থেকে তাঁকে দেখেছিলাম বঙ্গভবনে, যখন তাঁর পক্ষ থেকে কিছু লেখক সাহিত্যিক, শিক্ষককে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। এঁদের মধ্যে কেন আমাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল তার ব্যাখ্যা আমার আজো জানা নাই। সে ডাকে যেতে যেমন সঙ্কোচবোধ করেছিলাম, তেমনি না যেতেও সঙ্কোচ হয়েছিল। যাওয়ার সঙ্কোচ : এমন রাজকীয় দাওয়াতে যাওয়ার আমি উপযুক্ত নই। তাছাড়া বঙ্গভবনে যাওয়ার একটা লাইন আছে। আমি সে লাইনে না থাকলেও বঙ্গভবনের দাওয়াত পেয়ে যাওয়াটাও বন্ধু-বান্ধবের মুখে সহাস্য এই মন্তব্যটি তৈরি করবে : শেষ পর্যন্ত অমুকও লাইন লাগিয়েছে। এই এক চিন্তা। আবার না যাওয়ার চিন্তা হচ্ছে সৌজন্যবোধ থেকে। রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডাকলে যাওয়াটাই তো কর্তব্য। তাঁর দাওয়াতে না যাই কোন যুক্তিতে। যাই হোক, সে সাক্ষাৎটি খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল। অপর সাথীদের সঙ্গে বঙ্গভবনে গিয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে চা-নাশতা খেয়েছিলাম। মুখর সাহিত্যিক, অধ্যাপক বন্ধুরাই কথা বলেছিলন, প্রস্তাব তুলেছিলেন। প্রেসিডেন্ট জিয়া বলেছিলেন : আপনারা সাহিত্যিক, লেখক। দিন, আপনাদের স্কীম দিন। আপনারা কি চান বলুন। 'মানি উইল বি নো প্রব্লেম।' এর চেয়ে বড় ভরসা আর কি হতে পারে। দরিদ্র বাংলাদেশে প্রেসিডেন্ট জিয়ার এটাই বোধ হয় ছিল বড় ভরসার বাণী : মানি ইজ নো প্রব্লেম। শুধু সাহিত্যিকদের কাছে নয়, সবখানেই তিনি একথা বলতেন এবং প্রেসিডেন্টের দান যদি ব্যক্তিগত দান হয় তাহলে প্রেসিডেন্ট জিয়া তাঁর নিরন্তর শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামে ভ্রমণকালে স্কুলে, মাদ্রাসায়, মসজিদে, ক্লাবে, যুবসংঘে, মহিলা সমিতিতে যত টাকা দান করেছেন বা দান করার কথা ঘোষণা করেছেন, এমন ঘোষণা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে অভূতপূর্ব। কিন্তু এর যে কেবল ইতিবাচক দিক, উৎসাহজনক দিকই ছিল, তা নয়। এর নেতিবাচক বা বিপজ্জনক দিকও ছিল। এটা বাংলাদেশে অনালোচিত নয়। প্রেসিডেন্ট হলেও একটা রাষ্ট্রের তিনি একজন কর্মচারী। তাঁর উচিত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত আইন কানুন মেনে চলা। তার উচিত নিয়মনীতির প্রতি তাঁর আনুগত্যই যে বড় এবং প্রথম তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। কিন্তু সদ্য স্থাপিত কোন রাষ্ট্রের কোন রাজারই বোধ হয় এই বোধটি থাকে না। নিয়মের বাধ্য হওয়া তিনি চিন্তা করতে পারেন না। তিনি মনে করেন, আমি যদি নিয়মের বাধ্য হই, তাহলে আমি আর রাজা কিসের? এবং তাঁর এই অনুচ্চারিত মনোভাবটি তাঁর পার্শ্বচরদের সরব সমর্থনে একেবারে মহাসত্যে পরিণত হয়। তাঁর অনুগতগণ বলতে থাকেন : 'হুজুর, স্যার, আপনারা আবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ম কী? আপনার ইচ্ছাই নিয়ম। আপনার হুকুমই আইন।' অথচ রাজা প্রতিমুহূর্তে কিন্তু অপরকে, মানে জনতাকে আইনের কথা বলছেন। কিন্তু নিজে আইনের উর্ধ্বে উঠে অপরকে যে আইনের অধীনে আনা যায় না, এই উপলব্ধিটি আমাদের দেশের আধুনিক রাজাদের আসতে এখনো বেশ বিলম্ব আছে। বিলাতের রাজা বা রানীর মতো পানসে রাজা বা রানী হতে কোন আসল রাজা চায়? অবশ্য বিলাতের রাজা বা রাণীও এত সহজে যে পানসে হয়েছেন তা নয়। কিন্তু সে আর এক ইতিহাস এবং আর এক দেশের ইতিহাস। আসলে কে কার ইতিহাস থেকে শেখে? কেউই বোধ হয় কারুর ইতিহাস থেকে শেখে না। তার নিজের অভিজ্ঞতাই তাকে শেখায়। আমাদের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাও আমাদের শেখাবে। তার পূর্বে শেখ মুজিব রাজা হবেন এবং নিহত হবেন; মেজর জিয়া রাজা হবেন এবং নিহত হবেন। এবং রাজা হবেন এবং নিহত হবেন। ...ব্যক্তি হিসাবে আমার অবশ্য ইচ্ছা, আহা সব রাজার মৃত্যুকে অতিক্রম করে যদি আমি সব রাজার মৃত্যুকে দেখতে পেতাম। সে থাক। সে আশা তো অবাস্তব। কিন্তু দুই রাজার জন্ম এবং মৃত্যু তো দেখলাম। এদিক দিয়ে রাজার চেয়ে সাধারণ প্রজার ভাগ্যই ভালো। সে মারী, মহামারী, বেমারীতে যখন তখন মরলেও রাজার মতো তাকে মরতে হয় না। তাই বলি, আহা রাজারা কী অসহায়! মন থেকে প্রার্থনা জাগে, আমার যদি কোন বড় শত্রু থাকে, জাগতিক জীবনে তার যত অমঙ্গল আমি কামনা করিনে কেন, এমন রাজার মৃত্যু যেন তার ভাগ্যে না জোটে।

৩০ শে মে ১৯৮১ তারিখে মর্মান্তিকভাবে নিহত জিয়ার লাশ যখন ঢাকায় আনা হল তখন মানুষের ঢল নেমেছিল তাঁর জানাজায় শরিক হতে। লক্ষ লক্ষ মানুষ। এখনো তাঁর মাজারে হাজারে হাজারে লোক আসে। এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক নেতাদের এমন হত্যাকাণ্ড কামনা করে না। কখনো করেনি। ১৯৭৫ সালেও করেনি। অথচ কোন কালের মানুষই সার্বিকভাবে কোন শাসক বা শাসকগোষ্ঠীর শর্তহীন সমর্থক বা সমালোচক থাকে না। সাধারণ মানুষ রাজনীতিককে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মোকাবেলা করতে চায়। হত্যার মাধ্যমে নয়।

: তাহলে ১৯৭৫-এ মুজিব হত্যার পরে কেউ টু শব্দটি করল না কেন?

প্রশ্ন করলেন কয়েকদিন আগে জনৈক বন্ধু। আমি বললাম : এ প্রশ্নটির জবাব একটু ভেবে দিতে হয়। আমরা চিন্তা করে দিই না বলেই মনে করি '৭৫-এর হত্যাকাণ্ডে জনসাধারণের সমর্থন ছিল– এমন অভিমত জনসাধারণের প্রতি অবিচার।

এমনকি আজো, জিয়ার হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ঢাকা কিংবা অন্যত্র যে প্রকাশ দেখেছি সেই শোকের প্রকাশ চট্টগ্রামের মানুষের পক্ষে ঘটনার দিক ৩০শে মে কিংবা পরদিন চট্টগ্রামে দেখানো সম্ভব হয়নি। সে দুদিন দারুণ আশঙ্কা আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুশ্চিন্তায় চট্টগ্রামের মানুষকে শহর থেকে আশ্রয়ের সন্ধানে যেতে হয়েছে। এমনি আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তার পরিস্থিতি ছিল ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট। একথা ঢাকাবাসীর অজানা থাকার কথা নয়। আমার বাসায় সামনের রাস্তাতে ট্যাঙ্কের দাপাদাপি এখনো আমার চোখে ভেসে ওঠে। আর শুধু ঢাকা নয়। ঢাকার সেদিনকার শাসকরা শেখ মুজিবের কোন গায়েবানা জানাজার আহ্বান জানায়নি। কেউ শেখ মুজিবের মৃত্যুতে আহা শব্দ উচ্চারণ করুক এ ইচ্ছা সেদিনকার শাসকদের আচার-আচরণে প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশিত হয়েছে এর বিপরীত ইচ্ছা। তাই ১৯৭৫ এর হত্যাকাণ্ডে দেশবাসী বিমূঢ় হয়নি এবং তাকে তারা সমর্থন করেছে, এটা বলার অর্থ শুধু অনির্দিষ্ট ও নৈর্ব্যক্তিক জনতার প্রতি অবিচার করা নয়। এর অর্থ, যদি একথা বলেন তাঁর নিজের উপরও অবিচার করা। এমন কোন লোক কি পাওয়া যাবে যে বলবে কিংবা বলেছে : আমি শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ড সমর্থন করি বা সমর্থন করেছি। এমন কথা বলা অ-মানবিক বলেই যে কেউ বলতে পারে না, তাই নয়। রাজনৈতিক যুক্তি হিসাবে একথা কোন নাগরিক বলতে পারে না। এ কথা বলার অর্থ, সে নিজেও অপর কারুর দ্বারা এমনিভাবে নিহত হোক, এ কথা বলা, এ ভাগ্য কামনা করা। না, এমন কথা কল্পনা করা যায় না।

*   *   *

জনাব জিয়া একদিন অপরিচিত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে তিনি সামনে এসেছিলেন। ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্টের থেকে ঘটনাবলি তাঁকে রাজনৈতিক চরিত্রে পরিণত করেছে। তাই জনাব জিয়ার রাজনৈতিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের আলোচনা দেশের স্বার্থে আবশ্যক।

জিয়ার অনুসারীদের পক্ষে তাঁকে বিভিন্নভাবে প্রশংসা করতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। প্রেসিডেন্ট জিয়ার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড তাঁকে শত্রু-মিত্র সকলেরই সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছে। কিন্তু মিত্রদের আবেগময় প্রশংসার মাত্রায় যে আতিশয্য দেখা যাচ্ছে, সেটাতেই মরহুমের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে।

যেদিন জিয়ার লাশ এল ঢাকাতে, সেদিন বিমানবন্দরে সরকারি বেসরকারি নেতাদের জমায়েত হয়েছিল। তাঁদের কাছে টেলিভিশন প্রেসিডেন্টের এমন জীবনাবসানের উপর মন্তব্যের অনুরোধ করেছিল। স্বাভাবিকভাবে সকলেই এমন ঘটনাতে শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। সরকারি নেতাদের শোকবাণীর মধ্যে প্রেসিডেন্ট জিয়ার তথ্যমন্ত্রী জনাব শামসুল হুদা চৌধুরীর বাণীটি কানে ঠেকল। বাণীটি যেমন স্বাভাবিক তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ। শোকাহত কণ্ঠে তিনি বললেন : 'এই মুহূর্তে আমি কী বলব। কেবল বলতে পারি প্রেসিডেন্ট জিয়া আমাদের গণতন্ত্র দিয়ে গেছেন। এখন সে গণতন্ত্র কে রক্ষা করবে, আমি তা জানিনে।...' শোকের মুহূর্তের কোন কথা ধরতে নেই। তবু স্বতঃস্ফূর্ত এই অভিমতটির সত্য এখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে, সরকারি দল এবং জিয়ার অনুসারীগণ তাঁকে দেখেছেন এমন সামরিক নেতা হিসাবে যিনি দেশকে গণতন্ত্র দিয়েছিলেন। তাঁদের প্রশংসাবাণীতে এমন অভিমিতও ব্যক্ত হয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসে এমনটি ঘটেনি যে, কোন. সামরিক নেতা দেশকে গণতন্ত্র দিয়েছেন। কিন্তু এই সার্বজনীন মনোভাবটির যেটা মারাত্মক দিক সে হচ্ছে এই যে, এখানে গণতন্ত্রকে ব্যক্তিবিশেষের দান হিসাবে দেখার ও দেখাবার প্রয়াস রয়েছে। গণতন্ত্র ব্যক্তির দান হিসাবে আসতে পারে না। ব্যক্তির দান হিসাবে আসে স্বৈরতন্ত্র, গণতন্ত্র নয়। গণতন্ত্র দ্রব্য নয়, যা কোন ব্যক্তি, সে যতোই বিরাট, ধনী বা ক্ষমতাবান হোক, দান করতে পারে। গণতন্ত্র একটি জীবনপ্রণালী, জনসাধারণের অধিকারবোধ এবং সচেতন চেষ্টার মাধ্যমেই যার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এবং গণতন্ত্রের পরিমাণ ও গুণও নির্ভর করে জনসাধারণের ব্যাপকতম অংশের মধ্যে এই অধিকারবোধ ও সংগ্রামের সচেতন প্রচেষ্টার গুণাগুণের উপর। আমরা যদি গণন্ত্রকে কোন সহৃদয় ডিক্টেটরের ব্যক্তিগত দানের ব্যাপার বলে মনে করি, তাহলেই গণতন্ত্রে অনিশ্চয়তা আসতে বাধ্য। তখনি প্রশ্ন জাগে, এই সহৃদয় ব্যক্তির তিরোধানের পর আমাদের অবস্থা কী হবে? আর এই মনোভাব থেকেই অভিমত বেরিয়ে আসে : 'তারপরে গণতন্ত্রকে কে রক্ষা করবে, তা আমি জানিনে।'

প্রেসিডেন্ট জিয়া সচেতনভাবে নিজের জন্য একটি মোহ বা ক্যারিজমা তৈরি করে তুলেছিলেন। দেশে তিনি ছাড়া তাঁর দলের মধ্যে কেউ বক্তা ছিল না। এবং তিনি ছাড়া কেউ কর্মী ছিল না। এমন কোন সভার কথা আমাদের জানা নেই যেখানে তাঁর উপস্থিতিতে অপর কোন বক্তা বক্তৃতা করে থাকলেও সেই নেতার বক্তৃতার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। সচিত্র টেলিভিশনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রেসিডেন্ট জিয়ার নিদারুণ পরিশ্রমপূর্ণ উচ্চকণ্ঠ বক্তৃতার রেকর্ড প্রচার করা হয়েছে। সে চিত্রে যেমন উদ্ভাসিত হয়েছে প্রেসিডেন্ট জিয়ার প্রাণান্তকর পরিশ্রমের মূর্তি, তেমনি ধরা পড়েছে তার পাশে এবং পেছনে উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান সহকর্মী, সাথী ও অনুসারীদের ক্লান্ত, উদ্বেগপূর্ণ অসহায় মুখচ্ছবি।

প্রেসিডেন্ট জিয়া সম্পর্কে প্রশংসার আতিশয্যের প্রকাশ দেখা গেল তাঁর দলীয় পত্রিকা 'দেশ'-এর একটি রিপোর্টের শিরোনামে। শিরোনামটি ছিল : 'প্রেসিডেন্ট জিয়ার শোকে মাটি কাঁদে, গাছ কাঁদে, গাছের পাতা কাঁদে।'

একটি সরকারি পত্রিকা ১৬ই জুন তারিখে প্রেসিডেন্ট জিয়ার জাতীয়তাবাদী দলের সেক্রেটারী জেনারেল ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর মরহুম জিয়ার 'জীবন ও দর্শন' শীর্ষক আলোচনার রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। তাতে ডা. বদরুদ্দোজা বলেছেন : 'মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ছিলের শতাব্দীর এক বিস্ময়। তিনি ছিলেন একটি সামগ্রিক চরিত্র। মানুষ হিসাবে, রাষ্ট্রপতি হিসাবে এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনীতিবিদ হিসাবে এমন সফল ব্যক্তিত্বের নজির সমসাময়িক পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।' তাছাড়াও দলের মহাসচিব বলেন : 'এ দেশের মানুষের মধ্যে প্রেসিডেন্ট জিয়ার রাজনীতির যে ব্যাপ্তি ঘটেছে, আগামী কয়েক শ' বছরে তা অব্যাহত থাকবে।'...

দলীয় নেতার এরূপ ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা দলের দিক থেকে বোধগম্য। তবু এর আতিশয্যের দিকটি পরিণামে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির অনিষ্টই সাধন করে।। তাঁর চরিত্র ক্রমান্বয়ে স্বাভাবিকতা হারিয়ে কৃত্রিক হয়ে ওঠে। এবং যতো সে কৃত্রিম হয়, যত তাকে দলীয় শক্তি বা সরকারি প্রচারযন্ত্র শক্তিশালী করে তুলতে চায়, মানুষের মনের কাছে তার স্বাভাবিক আবেদনে তত চিড় ধরতে থাকে।

ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। মানুষের জীবন যৌথ জীবন। সংঘ ব্যতীত মানুষ অচল। সংঘের মধ্যে অবশ্যই নেতৃত্বের সমস্যা রয়েছে। নেতা এবং কর্মীর সমস্যা। তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের সমস্যা। নেতা বলতে যে কেবল একজনকে বুঝাবে, তা নয়। কিন্তু যে সমাজ ও সংঘ যত দুর্বল, সে সমাজ বা সংঘেই একক নেতৃত্বের উপসর্গ তত বেশি। সেখানেই যৌথ নেতৃত্বের চেতনা কম। অনুসারীদের পক্ষে এমন সংঘের একক নেতৃত্বকে মাত্রাতিরিক্তভাবে বড় করে তোলা একটি মানবিক প্রবণতা। সমাজ ব্যবস্থা নির্বিশেষে এই প্রবণতার দৃষ্টান্ত আধুনিক ইতিহাসে কম নেই। যৌথ জীবনে সংঘের বিশিষ্ট, চতুর, বুদ্ধিমান বা সাহসী ব্যক্তি কিংবা নেতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু যে বিষয়ে নেতা ও কর্মীদের সতর্ক থাকা আবশ্যক তা হচ্ছে, এই ভূমিকাকে যেন পরিমিতির সীমা পেরিয়ে যেতে দেওয়া না হয়। তেমন হলে এমন ব্যক্তি ও সংঘের সহায়ক শক্তি হিসাবে থাকে না। তখন সংঘই ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার যন্ত্রে পরিণত হয়। যাই হোক, এর তত্ত্বগত আলোচনার স্থান এটি নয়। এবং এর দরকারও করে না। কারণ, এটি আমাদের সকলেরই জানা। কিন্তু জানা এক কথা, আর তাকে মানা আর এক কথা। এমন সত্যকে মানা হয় খুব কম ক্ষেত্রেই। আর সেই না মানার মাশুলই আবার সেই সমাজ বা সংঘকে দিতে হয়।

ব্যক্তিক একক নেতৃত্বের প্রবণতা শেখ মুজিবুরের মধ্যেও তাঁর সরকার প্রতিষ্ঠার পরে প্রকট হতে আরম্ভ করে। তাঁর এই প্রবণতাকে তাঁর অনুসারীগণ আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে সাহায্য করে তাদের স্তাবকতা দিয়ে।

জিয়া সাহেবেরও ছিল একক নেতৃত্ব। একক পদ্ধতি। তিনি নাকি নিজে ক্ষোভের সঙ্গে বলতেন : আমার একাকেই সবকিছু করতে হয়। এই একক নেতৃত্ব, এই একক চিন্তা, একক কর্মব্যস্ততা, একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ যেমন একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তির অস্বাভাবিক শক্তির দিক, তেমনি তিনি যে সমাজ, দল, সরকার বা রাষ্ট্রের নেতৃত্ব করেন তার মারাত্মক দুর্বলতারও দিক।

এমন একক নেতৃত্ব বা শাসককে স্বৈরশাসক বলি কিংবা সহৃদয় ডিক্টেটর বলি, তাতে কিছু যায় আসে না। সে এককই থেকে যায়।

এই একক শাসনের সমস্যার শুরু আজকের নয়। আদিকাল থেকেই এ চলে এসেছে। প্রাচীন পণ্ডিত এ্যারিস্টটল এই সমস্যাটির যে আলোচনা করেছেন। তা যেমন অন্তর্ভেদী তেমনি দূরগামী। আর তাই সে আলোচনা সমাজ জীবনের আলোচনাতে একটি চিরায়ত মর্যাদা লাভ করেছে।

এরিস্টটল তাঁর 'পলিটিকস' গ্রন্থে শাসনের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটি তুলেছিলেন। কোন শাসন শ্রেয়, ব্যক্তির, না আইনের? তিনি বলেছিলেন, ব্যক্তি যতই জ্ঞানী বা গুণী হোক না কেন, তবু সে মানুষ। তার রাগ, বিরাগ, ইচ্ছা, অনিচ্ছা আছে। এবং তার শাসন সেই রাগ-বিরাগ ইচ্ছা-অনিচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য। কিন্তু আইনের শাসন যতোই কঠিন বা কঠোর হোক, আইন মানে যুক্তি ও প্রজ্ঞা। আর তাই আইনের শাসন রাগ-বিরাগ প্যাশন বা প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত। আর সে কারণেই ব্যক্তি যতোই উত্তম হোক, আইনের শাসন ব্যক্তি-শাসনের চেয়ে শ্রেয়।

বৃহৎ নেতাদের সম্পর্কে একটা প্রশংসার বাক্য আমাদের দেশে বেশ প্রচলিত। আমরা যাঁকে বড় মনে করি তাঁকে সাধারণত এই বলে আখ্যায়িত করি যে, তিনি নিজেই একটা প্রতিষ্ঠান ছিলেন। তিনি মারা গেলে বলি : হি ওয়াজ অ্যান ইনসটিটিউশন ইন হিমসেলফ। এমন আপ্তবাক্য আমরা হক সাহেবের উপর প্রয়োগ করেছি! এমন বাক্য আমরা শেখ সাহেবের উপর প্রয়োগ করেছি। ভাসানী সাহেবের উপর করেছি। এবং এমন বাক্য আমরা জিয়া সাহেবের উপর প্রয়োগ করছি। কিন্তু আসলে এটি কি কোন প্রশংসার বাক্য? চিন্তা করে দেখলে দেখা যাবে, এ বাক্যটি কেবল যে আতিশয্যের বাক্য তাই নয়। এ বাক্যটি নিন্দার বাক্য। যে ব্যক্তি নিজেই প্রতিষ্ঠান তিনি তো কোন 'প্রতিষ্ঠানের' অধীন নন। সকলে তাঁর 'প্রতিষ্ঠানের' অধীন। এমন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের বিকাশে কেবল যে কোন সহায়ক শক্তি নন তই নয় এমন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের বিকাশের প্রতিবন্ধক। আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত যে আইনগত, শাসনগত, সমাজগত, দলগত কোন প্রতিষ্ঠান বিকশিত হয়নি,– এমন প্রতিষ্ঠান যে ব্যক্তিকে অতিক্রম করে কার্যকর থাকে, যার নিয়ম, শৃঙ্খলা ও শক্তি সাধারণ মানুষের সামাজিক জীবনের মূল নির্ভর– তার কারণ এইসব 'অতিপুরুষগণ– যাঁরা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বে বলে বিবেচনা করেছেন এবং যাঁদেরকে তাঁদের অনুসারী এবং স্তাবকগণ বুঝিয়েছেন, তারা নিজেরাই এক একটা প্রতিষ্ঠান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ নিয়ে ক্ষোভ করে লাভ নেই। কোন জনগোষ্ঠীর বিকাশের ইতিহাসে এ এক অপরিহার্য অভিজ্ঞতার পর্যায়। একে পাশ কাটিয়ে সহজ পথে প্রতিষ্ঠানের বিকাশের কোন উপায় নেই। আমাদের অতিপুরুষদের শক্তি, দান ও অ-দানের অভিজ্ঞতায় যদি এ শিক্ষা আমাদের হয় যে, প্রতিষ্ঠানের উপরে ব্যক্তি নয়, অতিপুরুষ নয়, ব্যক্তির উপরই প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি নির্বিশেষে এ কথা সত্য, ব্যক্তির ভরসা ব্যক্তি নয়, অতিপুরুষ নয়, তথা মানুষের ভরসা তাদের যৌথ শক্তির সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান– তবে তাতেই আশা, তাতেই মঙ্গল।

॥ ১৯৮২ ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশে দর্শন চর্চার ভূমিকা

পণ্ডিতজনেরা বলেন, ইউরোপে দর্শনের শুরু প্লেটো থেকে না হলেও দর্শনের শেষ প্লেটোতে। কারণ প্লেটোর পরে যা কিছু দর্শনের ক্ষেত্রে রচিত হয়েছে তা প্লেটোর পাদটীকা বৈ আর কিছু নয়। এ উক্তিতে প্লেটোর যে বড়ত্ব তা স্বীকৃত হয়েছে। প্লেটো কেবল যে বংশগতভাবে উঁচু, মানে অভিজাত ছিলেন তাই নয়, বুদ্ধিগতভাবেও তেমনি তিনি সূক্ষ্ম, গভীর ও অভিজাত ছিলেন। এবং কেবল গ্রিস বা ইউরোপের ক্ষেত্রে যে, তাঁর অভিমত বা দর্শনের আলোচনা, তাই নয়। আধুনিক জগতে ইউরোপই (মার্কিন মুলুককেও আমরা ইউরোপ মনে করি) সকল অস্ত্র-শস্ত্র, গবেষণা-প্রজ্ঞা, শিক্ষা-দীক্ষা, কূট-কৌশল, যুদ্ধ-বিগ্রহ, চিন্তা-ভাবনা, দান-ধ্যান মোট কথা দীন ও দুনিয়ার কেন্দ্র। এ কারণে প্লেটো আজ আর কেবল গ্রিস বা ইউরোপের দার্শনিক নন, তিনি বাংলাদেশ সহ সমগ্র পৃথিবীর দার্শনিক।

আর এ লোকটিকে অতীত বলেও উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। তিনি বিরাট পরিমাণেই বর্তমান ও সাম্প্রতিক। আমাদের সাম্প্রতিক জীবনের অশন-বসন, শাসন-শোষণ, শক্তি-মুক্তি, শ্রেণী, সাম্য, অসাম্য– কোন প্রশ্নেই প্লেটোর ছায়াকে অতিক্রম করার সাধ্য আমাদের নেই।

রাষ্ট্রশাসন বা জনমুক্তির কথাই যদি ধরি, এখানে প্লেটোর দর্শনের সত্যই যে আমাদের চিন্তাভাবনার নিয়ামক তা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায়।

কিন্তু আমার এ রচনা দার্শনিক প্লেটোর ওপর অধ্যাপক বা শিক্ষক হিসাব কোন তত্ত্বগত আলোচনা নয়। তবু প্লেটোর কথা এলেই রাষ্ট্রশাসনের ক্ষেত্রে তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তির কথা মনে পড়ে, যতক্ষণ না দার্শনিক শাসক হচ্ছেন কিংবা শাসক দার্শনিক হচ্ছেন ততক্ষণ সংকট থেকে রাষ্ট্রের মুক্তি নেই।

প্লেটোকে আজকালকার স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-মাস্টারগণ কল্পনা বিলাসী বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে দার্শনিক শাসকের কথা বলেছেন, এ জন্যই নাকি তিনি কল্পনা-বিলাসী, ইউটোপিয়ান। আর কল্পনাবিলাসীর কথা কার জন্য গ্রাহ্য? আমার কিন্তু সেরূপ মনে হয় না। আমি প্লেটোর একজন ভক্ত। এবং সে ভক্তি এই কারণে যে প্লেটোর যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে এ প্রত্যয় আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোরালো যে, তিনি চিন্তাবিদ ছিলেন, কল্পনা করেছেন, কিন্তু কল্পনা বিলাসী ছিলেন না। বস্তুত প্লেটো বাস্তবের মধ্যে বাস করেছেন, বাস্তব নিয়ে কল্পনা করেছেন। বাস্তবের সমস্যা তাঁর কল্পনার কেন্দ্র। আর বাস্তবের প্রধান সমস্যা যে মানুষের রাষ্ট্রজীবনে যৌথ জীবন যাপনের সমস্যা, এ কথা জোরের সঙ্গে এবং যুক্তির সঙ্গে বলার জন্যই তাঁর উপর আমার অপার ভক্তি।

আর এখানেই তিনি আমাদের সমকালীন আর সমসাময়িক। আমাদের এই ক্ষুদ্র বাংলাদেশেরও সমস্যা রাষ্ট্রীয় জীবনে যৌথ জীবন যাপনের সমস্যা। রাষ্ট্রীয় জীবনে যৌথ জীবন যাপনের সমস্যাকেও আমরা এই ক্ষুদ্র বাংলাদেশের মানুষেরা, তার কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, শিল্পপতি, শাসকগণ, বাংলাদেশ তৈরি করার পরে যত ঘনিষ্ঠভাবে বুঝতে পারছি এত ঘনিষ্ঠভাবে আর কোনদিন বুঝতে পারিনি। পাকিস্তানও পৃথিবীর খুব বৃহৎ রাষ্ট্র ছিল না। কিন্তু যৌথ জীবন যাপনের সমস্যার মোকাবেলায় পাকিস্তানের যুগে বাংলাদেশের মানুষের একটা অজুহাত ছিল যে, পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত আমাদের জীবনের সমস্যার সমাধান হবে না। এ কারণে পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা অর্জনের পরেই এই বাংলাদেশীদের যৌথ জীবনের সত্যকার সমস্যার মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এখন আর 'পাকিস্তান'-এর অজুহাত দিয়ে বলা চলে না : ভাইসব আর একটু সবুর করুন। স্বাধীনতা এলেই আমাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

আজ তাই বাংলাদেশে আমরা সবাই চিন্তা করছি, কেমন করে আমাদের মুক্তি ঘটবে, কেমন করে একটি সুখী, যৌথ, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন আমরা তৈরি করতে পারব। আমাদের সামাজিক রাষ্ট্রীয় জীবন সমস্যার আকীর্ণ। একই রাষ্ট্রের আমরা অধিবাসী। কিন্তু তারই কেউ পথে-ঘাটে পশুর অধম হয়ে জীবনপাত করছে, আর কেউ আধুনিক সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাধিক দামী ফল ফসল উপভোগ করছে। আমাদের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবনে কেবল ক্ষুধার হাহাকার নয়, নৈতিক বোধ দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। দুর্নীতি, ঘুষ, হত্যা, রাহাজানি ব্যাপকভাবে আমাদের সামাজিক জীবনকে ছেয়ে ফেলেছে। এথেন্সের প্লেটো প্রায় আড়াই হাজার বছর পরেও আমাদের কাছে অপরিচিতি নন। কারণ তাঁর এথেন্স নগর রাষ্ট্রও সেদিন এমনি বৈপরীত্য, মূল্যবোধের ক্ষয়, হত্যা, অবিশ্বাস, রাহাজানি দ্বারা আবিষ্ট ছিল। এথেন্সের চিন্তাবিদ মাত্রেরই সেদিন একটি মাত্র প্রশ্ন ছিল : এই সংকট থেকে আমাদের মুক্তি কিসে? প্লেটোর যে প্রশংসা প্রাপ্য সে হচ্ছে এই যে, সেকালের চিন্তাবিদদের মধ্যে তিনি অবশ্যই অন্যতম একনিষ্ঠ চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি মানুষের জীবন নিয়ে, তার রাষ্ট্রীয় যৌথ জীবনের সমস্যা নিয়ে গুরুতরভাবে চিন্তা করেছেন। সেই চিন্তার ভিত্তিতেই তিনি বলেছেন : দার্শনিকরা শাসক না হলে কিংবা শাসকরা দার্শনিক না হলে আমাদের মুক্তি নেই। আর তখনকার গণতান্ত্রিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাসন ব্যবস্থার উপর তাঁর ক্ষোভ ছিল এখানেই। গণতন্ত্রী শাসক মানে রাষ্ট্রীয় শাসনে অধিক সংখ্যকের অংশগ্রহণ। প্লেটোর অভিমত : এখানেই ভ্রান্তি। রাষ্ট্রশাসন একটা ডাল-ভাতের ব্যাপার নয় যে, যার দু পা আছে সেইই শাসক হতে পারে। গণতন্ত্র হচ্ছে মূর্খের শাসন। মূর্খতার কারণেই সংকট। প্লেটোর গুরু সক্রেটিস এ কথাই বলেছিলেন। বলেছিলেন, জ্ঞানেই ধর্ম। অর্থাৎ জ্ঞান হলে পরে, কোন সঙ্কট থাকতে পারে না। সমস্যা বা সংকট মানে আমাদের অজ্ঞনতা। অন্যায় দ্বারা যে আমরা আবিষ্ট, তার কারণ আমরা 'ন্যায়' কাকে বলে জানিনে। আর যখন আমরা জানব ন্যায় কী তখন অন্যায় করা আমাদের পক্ষে কেমন করে সম্ভব হবে? কারণ মানুষ তো যুক্তিবাদী প্রাণী। সে তো যুক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। যুক্তি বলে, যেটা ন্যায় সেটাই অনুসৃত হওয়া উচিত। আর মানুষ যখন জানল ন্যায় কী তখন তার পক্ষে আর অন্যায় করা সম্ভব হবে কেমন করে? কথাটার মধ্যে যুক্তি আছে। এ যুক্তি প্রায় স্বতঃসিদ্ধের মতো। ন্যায়কে জানলে আর অন্যায় করা যুক্তিবাদী মানুষের পক্ষে কেমন করে সম্ভব? সক্রেটিস আর তাঁর শিষ্য তাই মোক্ষম মুক্তির পথ বাতলালেন : জ্ঞানীরা, মানে দার্শনিকরা শাসক হলে আর সঙ্কট থাকবে না। তখন শাসকরা বুঝবে যে, রাষ্ট্রের শাসন কোন ক্ষমতা, শক্তি বা লাভের ব্যাপার নয়। রাষ্ট্রের শাসন সর্বোত্তম জ্ঞানের ভিত্তিতে কঠিনতম দায়িত্ব পালনের ব্যাপার। তখন মানুষের মধ্যে শাসক হওয়ার প্রতিযোগিতার বদলে আমরা দেখতে পাব শাসক না হতে চাওয়ার প্রতিযোগিতার। কারণ, কঠিনতম দায়িত্ব পালন করতে কে চায়? আর তখন সর্বোত্তম জ্ঞানীদের আমরা জোর করেই শাসক বানাব। আমরা বলব সেই সর্বোত্তম জ্ঞানীদের : এ কঠিন দায়িত্ব আপনাদের পালন করতে হবে। আপনারা ব্যতীত আর কে পারবে এ দায়িত্ব পালন করতে? কারণ, আপনারা সর্বোত্তমভাবে জ্ঞানী।

AMARBOI.COM

প্লেটোর এ দর্শন একেবারে রামসুন্দর বসাকের বাল্যশিক্ষার দর্শন : 'সদা সত্য কথা বলিবে।' এর কোন প্রতিবাদ করা চলে না। এর কোন বিপরীত ভাবা চলে না। জ্ঞানেই মুক্তি— এ কথার আর প্রতিবাদ কী হতে পারে?

বাল্যশিক্ষার 'সদা সত্য কথা বলিবে' উপদেশটি নিয়ে আমরা হাসিঠাট্টা করি। আমরা বলি : এ কথা কোন কাজের নয়। এ কথা কেউ পালন করে না। এ উপদেশ পালন করা সম্ভব নয়।

কিন্তু আদতেই কি কথাটি অকাজের? যদি অকাজেরই হবে তাহলে সমাজপতিরা, রাষ্ট্রশাসকরা, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচ করে আধুনিক কালের এমনি বাল্যশিক্ষা, বয়স্ক, অল্প বয়স্ক, আবালবৃদ্ধবণিতা— সকলের জন্য কেন লক্ষ লক্ষ কপি মুদ্রণ করছেন এবং বিলিবন্টন করছেন; ঢাকা ইউনিভারসিটির ন্যায় বড় মাদ্রাসা থেকে প্রত্যন্ত গ্রামের মক্তবটিতে অহোরাত্র ওস্তাদজীরা এই আপ্তবাক্য কেন কণ্ঠস্থ করাচ্ছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্লেটো বলেছেন, দার্শনিকদের শাসক হতে হবে কিংবা শাসকদের দার্শনিক বানাতে হবে। এমন গল্প আছে যে, প্লেটো তাঁর একগুঁয়ে ব্রত নিয়ে সাইরাকিউজ রাষ্ট্রের রাজাকে ভোর পাঁচটায় পালঙ্ক থেকে তুলে অঙ্ক জ্যোতিষ্ক, উচ্চতর অধিবিদ্যা, সঙ্গীত, ব্যাকরণ– ইত্যাদির পাঠ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কাহিনী বলে যে, সে শাসক সৌজন্য আর বন্ধুত্বের খাতিরে প্লেটোর এমন মাস্টারীকে কিছুদিন সহ্য করলেও পরিণামে অতিষ্ঠ হয়ে মাস্টার প্লেটোকে দাসের হাটে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। এ কাহিনীর সত্য-মিথ্যা যাই হউক প্লেটোর দর্শনের মূল উক্তি এই বলেই পরিচিতি যে, তিনি মনে করেছিলেন, রাষ্ট্রীয় সংকটের মূল হচ্ছে অজ্ঞানতা। এ অভিমতের বিচার আজকে নয়, সেদিনও প্লেটোর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যে না হয়েছিল তা নয়।

কিন্তু এ অভিমতের প্রতিবাদ কি এ কারণে যে, এরূপ অভিমত বাস্তবে প্রয়োগযোগ্য নয়? বাস্তবে দার্শনিক পাওয়া যায় না বলে? যদি পাওয়া যেত তাহলে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যথার্থই শোষণ, হানাহানি, অবিশ্বাস, দুর্নীতি, হত্যা, রাহাজানির কোন অস্তিত্ব থাকত না?

কিন্তু আসলে 'দর্শন'ই বা আমরা কাকে বলব, আর 'দার্শনিক'ই বা কে? অপর দিকে বলা যায় : আসলে দর্শন কী নয় এবং দার্শনিক কে নয়?

'দর্শন' বললে কি নির্দিষ্ট মহৎ কোন কিছু বুঝায়? 'দার্শনিক' কথাটি বললে কি কোন চিরকুমার, সত্যবাদী, মহাজ্ঞানী, দয়ালু, অহিংস, স্বার্থশূন্য কোন মহাপুরুষকে বুঝায়?

বাংলা ও ইংরেজির বাইরে কোন ভাষার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। তবু শুনেছি ইংরেজি 'ফিলসফি', আর বাংলায় 'দর্শন'-এর ন্যায় প্রত্যেক ভাষাতেই দর্শনরূপ একটি শব্দ আছে। ইংরেজি ফিলসফি শব্দ নাকি প্লেটোর গ্রীক ভাষা থেকে উপজাত হয়েছে : সফোজ বা জ্ঞান থেকে ফিলসফি বা ফিলসফার : জ্ঞান থেকে জ্ঞানী। বাংলাতে এ বিষয়টি দর্শন-এর মাধ্যমে কী করে ব্যক্ত হল, তার হদিস আমার জানা নেই। তবে এর একটি মিল এভাবে দেখানো যায়। দর্শন-এর অর্থ দেখা বটে, কিন্তু দুই চোখ দিয়ে কোন কিছুকে সাধারণভাবে দেখা নয়, সমস্ত বোধ-বুদ্ধি-ক্ষমতা দিয়ে কোন কিছুকে সম্যক ও সামগ্রিকভাবে দেখা। আর সম্যকভাবে দেখার মাধ্যমেই কোন কিছুর জ্ঞান আমরা অর্জন করি। আর সেদিক থেকে দর্শন মানেই জ্ঞান।

কিন্তু তাতেই ব্যাপারটা নির্দিষ্টভাবে কি কিছু হল? প্লেটোর গুরু সক্রেটিস বলেছেন : জ্ঞানই ধর্ম বা জ্ঞানই পুণ্য। ধর্ম, পুণ্য– এসব অবশ্যই ভালো ব্যাপার, মহৎ ব্যাপার। এর ফলে জ্ঞানকে ধর্মের সমার্থক করে সক্রেটিস-প্লেটো জ্ঞানকে পবিত্র করেছেন। কারণ দর্শন পবিত্র। জ্ঞান অর্জনে আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়াসের তাৎপর্য বোঝা যায়। আমি ছোটকালে দেখেছি আমার মা মুদ্রিত বা লিখিত কোন কাগজের টুকরো কিংবা বই-এর খণ্ড পেলেই ভক্তিভরে তাকে কপালে ছোঁয়াতেন। আর আমাদেরও শাসন করতেন, লিখিত কাগজের টুকরো কিংবা বই-এর গায়ে যেন আমাদের পা স্পর্শ না করে। কারণ, পা লাগানো মানে তো অপমান করা, জ্ঞানকে অপমান করা। আমাদের সেকালের সরল গ্রাম্য মায়েদের কাছে জ্ঞানই ছিল ধর্ম। কিন্তু তাই বলে সেই সরল গ্রাম্য জননীরা কি অভাব অনটন এবং বুভুক্ষার হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন জ্ঞানকে ধর্ম জ্ঞান করে?

আসলে দর্শন মানেও কিছু মহৎ নয়, জ্ঞান মানেও ধর্ম নয়। দর্শন অবশ্যই জ্ঞান। কিন্তু জ্ঞান ধর্ম নয়। শ্রেণী স্বার্থে বিভক্ত সমাজে নয়। জ্ঞান অস্ত্র। জ্ঞান মানুষের হাতে অস্ত্র। তবে অস্ত্রের অবশ্যই একটা ধর্ম আছে। সে ধর্ম হচ্ছে অস্ত্রধারীর স্বার্থ রক্ষা করা। মানুষ আদিকাল থেকে যেমন নানা প্রাকৃতিক সমস্যা দ্বারা জীবন যাপনের ক্ষেত্রে আকীর্ণ ছিল, সামাজিক-রাষ্ট্রীয় জীবনেও নানা প্রশ্ন তার ক্রমবিকাশের পথে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ বাঁচার এবং এগিয়ে যাবার অনিবার্য তাগিদ থেকে প্রকৃতির রহস্য সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে জ্ঞান অর্জন করেছে। সামাজিক-রাষ্ট্রীয় প্রশ্ন বা সমস্যা সম্পর্কেও মানুষ তেমনি জ্ঞান অর্জন করে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে।

কিন্তু 'দর্শন', 'জ্ঞান' এগুলো সাধারণ শব্দ। এরা নির্দিষ্টভাবে কিছু বুঝায় না। অনির্দিষ্টভাবে অনেক কিছু বুঝায়। দর্শন বলতে জ্ঞান। আবার জ্ঞান বলতে কোন কিছুর রহস্য উদঘাটন। কিন্তু মানুষ জ্ঞানের রাজ্যে অগ্রসর হয়েছে সুনির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ রহস্য উদঘাটনের মাধ্যমে। সেই বিশেষের ভিত্তিতেই মানুষের জ্ঞানরাজ্য নানা ভোগ-উপভোগে বিভক্ত হয়েছে : পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ্ক শাস্ত্র, গণিতবিদ্যা, মনোবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা ইত্যাদি।

জ্ঞানের মতো 'মানুষ' শব্দটিও সাধারণ। মানুষ বলতে অবশ্যই ছোট-বড়, কালো-সাদা, ধনী-নির্ধন, এশীয়-অত্রশীয়, বাঙ্গালী-অ-বাঙ্গালী– সকল মানুষকে বুঝায়। কাজেই জ্ঞানের রাজ্যে মানুষ অগ্রসর হয়েছে, কথাটা অর্থশূন্য নয়। তবু 'জ্ঞানের রাজ্যে মানুষ অগ্রসর হয়েছে' বললে সুনির্দিষ্টভাবেও কিছু বুঝায় না। অনির্দিষ্ট এই বাক্য তৈরি হয়েছে নানা ভাগ উপভাগে বিভক্ত মানুষের দৈনন্দিন সুনির্দিষ্ট কর্মকাণ্ড, সংঘাত-সংঘর্ষের মাধ্যমে।

সদ্য সত্য কথা বলিবে– এমন বড় কিংবা সাদারণ কথা যেমন মিথ্যা নয়, তেমনি আবার তা কাজেরও নয়। কাজের কথা হচ্ছে, 'সদা সত্য কথা বলিবে'– এ বাক্যের মুদ্রক কে, কে একে প্রচার করেছে, এবং সে কি সদা সত্য কথা বলে? যদি না বলে তবে কেন বলে না এবং না বললেও কেন সে এমন বাক্য ছাপে এবং প্রচার করে? কাজের কথা হচ্ছে, এ সমস্ত নির্দিষ্ট প্রশ্ন এবং তার নির্দিষ্ট জবাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্লেটো বলেছিলেন, দার্শনিকের শাসক হওয়া আবশ্যক। কিন্তু দার্শনিক বলতে তিনি সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলেন নি। অবশ্য তিনি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দার্শনিক তৈরি করতে এবং সেখানে অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতিষ্ক বিদ্যা, সঙ্গীত, অধিবিদ্যা প্রভৃতি সেদিনকার প্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট বিষয়সমূহ তাঁর একাডেমীর শিষ্যদের পাঠ হিসাবে নির্দিষ্ট করেছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন করা যায় যে, গণতন্ত্রকে মূর্খের শাসন বলতে কি তিনি এই বুঝিয়েছিলেন যে, সেদিন যাদের হাতে রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা ছিল তারা কেউ এ সমস্ত বিদ্যায় আদৌ রপ্ত ছিলেন না, তারা কেউ অঙ্কশাস্ত্র, অধিবিদ্যা, জ্যোতিষ্ক জানতেন না? কিংবা প্লেটো কি সত্যিই বিশ্বাস করতেন যে, এ সমস্ত বিদ্যা যাঁরা জানেন তাঁরা শাসন করলেই শাসনের ক্ষেত্রে আর কোন সংকট থাকবে না? প্লেটো একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যাপক ছিলেন, কিন্তু এমন কথা বিশ্বাস করার মতো সরল ছিলেন বলে মনে হয় না।

মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে হাজার দু'হাজার বছরের ব্যবধান কোন ব্যবধান নয়। এমন ব্যবধানে মানুষের সামাজিক জীবনের সমস্যা জটিলতর হওয়া ব্যতীত সহজতর হয়নি। কাজেই সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্লেটোর অভিমত বাসি কিংবা আলোচনার অতীত হয়ে যাওয়ার কোন কারণ ঘটেনি। অপর দিকে, জ্ঞানই ধর্ম একথা যদি স্বীকার্য হয় তাহলে প্রাকৃতিক রহস্যের ক্ষেত্রে জ্ঞানের যে বিপুল বিস্তার ঘটেছে, মানুষ জ্ঞানকে যেভাবে আয়ত্ত করেছে তাতে আজকের সামাজিক রাষ্ট্রীয় জীবনমাত্রই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত, জ্ঞানীরাই শাসন করছে। কিন্তু তাতে কি আমাদের রাষ্ট্রীয়-সামাজিক জীবন সংকটমুক্ত হয়েছে? আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র-মাস্টারগণ অবশ্য পরস্পর বলে থাকি : বাংলদেশর রাষ্ট্রীয় জীবনের সমস্যার মূল কারণ এই যে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি আর যাই হউন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম. এ. পাস করেননি এবং বাংলাদেশের সংসদের সদস্যগণের কতজনই বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠ করেছেন : এরা যদি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম. এ পাস করতেন কিংবা আমরা যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম. এ. পাস করেছি কেবল তাদের হাতেই যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ন্যস্ত হত তাহলে বাংলাদেশের জনসংখ্যার সমস্যা থেকে অনাহার সমস্যা কোনটাই থাকত না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এমন কথা বিশ্বাস করে রাষ্ট্রপতিও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম. এ. পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আমাদের সামনে হাজির হবেন না, আর আমরাও সকলে সরকারের মন্ত্রী এবং পার্লামেন্টের সদস্য হব না!

কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জ্ঞানই রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রীয় সঙ্কট থেকে মুক্তি দিতে পারে না। যেমন অর্থনৈতিক জ্ঞানই আমাদের রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্তি দিতে পারেনি। কেননা, অপর যেকোন বিভাগে অ-জ্ঞানীরা অধিষ্ঠিত থাকুক না কেন, আমাদের রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিভাগে, ডিপার্টমেন্ট অব ফিনান্স-এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাঁদরেল অর্থনীতিক বৈ অপর কেউ প্রতিষ্ঠিত হন নি। কিন্তু তাতে আমাদের রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সংকট কি হ্রাস পেয়েছে?

এ ক্ষেত্রে অবশ্য প্রশ্নটা উল্টো করেও প্রতিপক্ষ করতে পারেন। তাঁরা বলতে পারেন, তাহলে কি যাদের অর্থনীতিক জ্ঞান নেই তাদের হাতে অর্থনীতি-বিভাগের দায়িত্ব দিলে রাষ্ট্রের আর্থিক সংকট নিরসন হয়ে যাবে? না, এমন জবাবও দেওয়া কারুর পক্ষে সম্ভব হবে না। অর্থনীতির জ্ঞান বাদে অর্থনীতিক বিভাগ পরিচালনা সম্ভব নয়, যেমন বিমান চালনার বিদ্যা যার আয়ত্তে নেই তার পক্ষে বিমান চালনা সম্ভব নয়।

তাহলে তো এক সমাধানহীন উভয়সংকটের মোকাবেলা আমাদের করতে হচ্ছে। জ্ঞানীতেও সমাধান নেই, অজ্ঞানীতেও সমাধান নেই।

আসলে ব্যাপারটা তাই। জ্ঞানীতে সমাধান নেই, অদার্শনিকেও সমাধান নেই। পূর্বকালের কথা বাদ দিয়ে আধুনিক বা সমসাময়িক কালের কথা বললে এমন কোন রাষ্ট্র নেই যা অজ্ঞানী বা অদার্শনিক দ্বারা চালিত হচ্ছে। জ্ঞানীরাই রাষ্ট্র চালাচ্ছে। এবং শাসক মাত্রই দার্শনিক। প্লেটো কি অর্থে শাসককে দার্শনিক হতে বলেছেন তা হয়ত স্পষ্ট নয়। কিন্তু কোন কালের কোন শাসকই যে দার্শনিক বৈ অপর কিছু ছিলেন না এবং নেই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ফ্রান্সের অমিতবিক্রমশালী শাসক ষোড়শ লুঁই নাকি উচ্চারণ করতেন : আমিই রাষ্ট্র। তাঁর এ কথা অবশ্যই সুনির্দিষ্ট দর্শনের সাক্ষাৎবাহী। ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস বলেছিলেন, মানুষের যেমন ঈশ্বরের বিধান সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার কোন অধিকার নেই, তেমনই অধিকার নেই রাজার বিধান সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলার প্রজার। আরো কানের কাছে এসে বলা যায়, আমাদের পরিচিতি ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খাঁ যখন বলেন, বাঙ্গালীরা একটা হীনম্মন্য জাত, কিংবা বলেন, মৌলিক গণতন্ত্রই আসল গণতন্ত্র এবং আমাদের রাষ্ট্রপতি যখন বিপুল মুদ্রাস্ফীতি, বিলাসব্যাসন ও অনাহার, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে বলেন : টাকা কোন সমস্যা নয়, মানি ইজ নো প্রব্লেম, তখন এই শাসকবৃন্দ এবং তাঁদের সাথী শাসক-শ্রেণীকে আর যে কেউ অ-দার্শনিক বলুন না কেন আমি তাঁদের অ-দার্শনিক বলতে পারিনে।

প্লেটো বুঝেছিলেন কিনা জানিনে। আসলে শাসক মাত্রই দার্শনিক। বিনা দর্শনে কেউ শাসক হয় না এবং কোন শাসকই দর্শনবিহীন নয়।

এত কথা বলার অর্থ আমার এই যে, যে কোন সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনের ন্যায় আমাদের এই ক্ষুদ্র, নিকট এবং জনসংখ্যা ও সমস্যায় আকীর্ণ বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সমস্যাটা দার্শনিক ও জ্ঞানীশাসক না থাকার নয়। সমস্যাটা হচ্ছে বিশেষ দর্শন ও বিশেষ দাশনিকের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বিশেষ কথাটাকেই আমরা বড় মনে করি। যেমন 'মানুষ' নির্বিশেষ কথাটি রাম রহিম বিশেষের চেয়ে মূল্যবান। কারণ রাম রহিম মরে যায়, কিন্তু মানুষ মরে না। তবু বিশেষ দিয়েই নির্বিশেষ তৈরি। রাম রহিম না হলে মানুষ সম্ভব হত না।

এ দিক থেকেই বলতে হয়, এই যে আমরা বাঙ্গালীরা, আপামর সকলেই একটি মাত্র শব্দ 'সমস্যা' নিয়ে একটি ঐক্যতান সৃষ্টি করেছি এবং মনে করছি এমন দুর্বার, দুর্ভেদ্য বাংলাদেশী জাতীয় ঐক্য আর কোনদিন তৈরি হয়নি : এমন ঐক্যের কাছে ভারত-রুশের সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ থেকে আরম্ভ করে চীন-মার্কিন আর্থিক সাম্রাজ্যবাদ সকলেই পর্যুদস্ত হতে বাধ্য, সেই ঐক্যতানের মধ্যে সকলের সমস্যা বা সংকটই কি এক?

শুনতে পাই পাকিস্তানের ২২ পরিবার থেকে বাংলাদেশে নাকি ৬২ পরিবারের জন্ম কিংবা বৃদ্ধি হয়েছে। এর পরিসংখ্যান আমার জানা নেই। কিন্তু এ কথা আন্দাজ করা যায়, ঢাকায় যত হাজার প্রাইভেট কার, মানে গাড়ি, আছে তত হাজার লক্ষপতি আছে। লক্ষপতি মানে শুধু লক্ষ টাকার মালিক নয়। এখন একটা গাড়ির দামই নাকি দেড় লক্ষ থেকে দুই লক্ষ টাকা। কাজেই লক্ষপতি মানে শুধু এক লক্ষের পতি নয়, কোটিপতিও এক কোটির পতি নয়। আমাদের সংকট-সমস্যাকীর্ণ রাষ্ট্রে এদেরও সমস্যার অন্ত নেই : তেলের সমস্যা, রঙিন কাচ আর পাথরের সমস্যা, রঙিন টেলিভিশন আর ভিসিআর-এর সমস্যা। আমি এক লক্ষেরও পতি নই, প্রতিমাসে যার নির্দিষ্ট মায়নার ক্রয়ক্ষমতা শতকরা বিশ-ত্রিশ ভাগের হারে কমছে তেমন একজন বাঁধা মাইনের কর্মচারী (মাস্টার) এবং যার কোন 'সাইড বিজিনেস' নেই। তাই আমার পক্ষে বাংলাদেশের লক্ষপতি, কোটিপতিদের সমস্যা আন্দাজ করাও সম্ভব নয়। আমি কিছু জানি আমার নিজের পরিবারের আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক সমস্যার কথা—অর্থাৎ বাঁধা মাইনের মধ্যবিত্ত কর্মচারীর সমস্যার কথা এবং নিজের জীবন দিয়ে বুঝি, এই যদি আমার অবস্থা হয় তাহলে আমার চেয়েও আর্থিক সঙ্গতিতে যে দুর্বল তার অবস্থা কী?

কাজেই সমস্যার ঐক্যতানের মধ্যে সকলের সমস্যা এক নয়। আর সমাধানের ক্ষেত্রেও সমাধান রাষ্ট্রপতির দার্শনিক হওয়া নয়। তিনি দার্শনিক হয়েই আছেন। সমাধান যার যে সমস্যা তার প্রয়োজনীয় সে দর্শনের মধ্যে।

জনমুক্তি বা বৃহত্তর সংখ্যক মানুষের ন্যূনতম সঙ্গতিপূর্ণ যৌথ সামাজিক রাষ্ট্রীয় জীবন তৈরির প্রশ্ন যদি আসে তাহলে আমাদের তাই বলতে হবে : এখানেও সমাধান কোন নির্বিশেষ দর্শনে নেই, সমাধান বিশেষ দর্শনের মধ্যে নিহিত। সে দর্শন হচ্ছে : 'মানুষ' বললেই সব শেষ হয়ে যায় না। মানুষ কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, শিল্পপতি হিসাবে বা শোষকশোষিতে বিভক্ত, এই তথ্য ও তত্ত্ব শোষিত শ্রেণীর পক্ষ থেকে উদঘাটন করার দর্শন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসলে সমাজে কেবল ধনী-নির্ধনের লড়াই চলছে না। লড়াই চলছে দর্শনে দর্শনে। স্বাধীনতা যুদ্ধই বলি আর '৭৫-এর হত্যাকাণ্ড বা দৈনন্দিন জীবনে দ্রব্যমূলের বৃদ্ধিই বলি সবই হচ্ছে দর্শনে দর্শনে লড়াই-এর প্রকাশ।

আমার রচনার শিরোনাম 'বাংলাদেশে দর্শন চর্চার ভূমিকা'— এই কথাটিকে লক্ষ্য করে বললে কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের পক্ষ থেকে যা বলা আবশ্যক সে হচ্ছে : বাংলাদেশে প্রবলভাবে যে দর্শনের চর্চা হচ্ছে সে হচ্ছে প্রবলদের, প্রতিপত্তিবানদের তথা শোষকদের দর্শন। দর্শনকে যখন আমরা শোষক-শোষিত নির্বিশেষ এক মহৎ কিছু বলে বুঝানোর চেষ্টা করি তখন আমরা শাসনকারী সেই প্রবলদের তথা শোষকদের দর্শনেরই পরিপোষণ করি। গুরু প্লেটো তাঁর নিজের শ্রেণীর স্বার্থে যে কাল-জয়ী অবদানটি রেখে গেছেন সে হচ্ছে এই যে, দর্শনকে তিনি তাঁর অসীম শক্তিশালী ভাষা এবং যুক্তির জোরে নির্বিশেষ মহৎ কিছু বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। দার্শনিক বলতে তিনি বিরাট, সুউচ্চ, মহৎ ও দুর্লভ কিছু বুঝাতে চেয়েছেন এবং শাসন ক্ষমতা সেই দার্শনিকদেরই প্রাপ্য বলে রাষ্ট্রীয় শাসনকে তিনি সাধারণ মানুষের অধিকারের বাইরে রাখার চেষ্টা করেছেন।

প্লেটো সচেতন রাজনীতিক ছিলেন। তিনি জানতেন এমন ব্যাখ্যা মিথ্যা। এমন মিথ্যা প্রচারে তাঁর লজ্জিত হওয়া উচিত। এই লজ্জার উল্লেখ করে 'রিপাবলিক'-এর চরিত্র গ্লকন সক্রেটিসকে বলেছিলেন : সক্রেটিস এবার আমি তোমার সঙ্কোচের কারণ বুঝতে পারছি। এমন মিথ্যা বলতে তোমার লজ্জিত হওয়াই স্বাভাবিক।"

সক্রেটিস জবাবে বললেন : ঠিকই বলেছ, গ্লকন। কিন্তু কাহিনীর এখানেই শেষ নয়। আরো আছে। আমি অর্ধাংশ মাত্র বর্ণনা করেছি। যাদের কাহিনীর ভিত্তিতে নাগরিকদের সম্বোধন করে আমরা বলব : "নাগরিকবৃন্দ! আপনারা আমাদের ভাই। কিন্তু বিধাতা আপনাদের ভিন্নভাবে গঠন করেছেন। আপনাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আছে যাদের আদেশ দানের ক্ষমতা আছে। এদের গঠনে স্বর্ণের মিশ্রণ আছে। এ কারণেই তারা সর্বাধিক সম্মানের অধিকারী। কিন্তু অন্যদের গঠনে আছে রৌপ্যের মিশ্রণ। এরা হচ্ছে রাষ্ট্রের সহায়ক বা সৈন্যবাহিনী। আর যারা কৃষক বা উৎপাদক এবং কারিগর তাদের গঠনে আছে পিতল এবং লৌহের মিশ্রণ।"

প্লেটো একে বলেছেন রাজকীয় মিথ্যা, 'রয়াল লাই'। এমন রাজকীয় মিথ্যার প্রচারই প্লেটো থেকে আজ অবধি চলে এসেছে। কিন্তু শেষ বিচারে এই উৎপাদক শ্রেণী, শ্রমজীবী মানুষ, যাদের গঠনে আছে 'পিতল ও লৌহের মিশ্রণ' তাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃতি মূল নিয়ন্তা। তারা স্তব্ধ হলেই প্লেটোর দার্শনিক শাসকও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্তব্ধ হতে বাধ্য। শ্রমই সৃষ্টির মূল। শ্রমজীবী মানুষই সৃষ্টি করেছে সমাজ ও সভ্যতা। তাদের বঞ্চিত করবার জন্য তারা মূর্খ, তারা প্রদীপের পিলসুজ যার নিচে অন্ধকারই অনিবার্য– এ মিথ্যা 'দার্শনিক শাসকরা' আদিকাল থেকে প্রচার করে আসছে।

প্লেটো বলেছেন, ন্যায়ের একটা আপন অস্তিত্ব আছে, ব্যক্তির জ্ঞান অজ্ঞান নিরপেক্ষভাবে। এবং আমরা বলব দর্শন যদি জ্ঞান অর্থাৎ সমাজ, রাষ্ট্র, প্রকৃতি কোন বিধানে বিবর্তিত হচ্ছে তার জ্ঞান হয় তাহলে তারও ব্যক্তি নিরপেক্ষ একটা অস্তিত্ব আছে। 'দার্শনিক শাসক' সাদাকে কালো এবং কালোকে সাদা বলে যত সূক্ষ্ম প্রচারই করুক না কেন কেন তাতে সাদা কালো এবং কালো সাদা হয়ে যাবে না। রাজকীয় মিথ্যার বিভ্রম ছিন্ন করে করেই শ্রমজীবী মানুষ ইতিহাসের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে এসেছে, অগ্রসর হয়ে এসে পৌঁছেছে এই কলিযুগে। এ যুগের অনিরুদ্ধ বাস্তবতা হচ্ছে, আদিকাল থেকে প্রচলিত ও প্রচারিত সেই রাজকীয় মিথ্যাকে উদঘাটন করার শ্রমজীবী মানুষের ক্ষমতা। যে জ্ঞানান্বেষী, যে মানব প্রেমিক এবং যে সভ্যতার স্রষ্টা শ্রমজীবী মানুষের পক্ষীয় বলে নিজেকে গণ্য করে তার কর্তব্য হবে শ্রমজীবী মানুষকে অধিক থেকে অধিকতরভাবে তার নিজের দর্শনের সত্য ও শক্তির জ্ঞান দিয়ে সমৃদ্ধ ও সশস্ত্র করে তোলা। বাংলাদেশসহ সমগ্র পৃথিবীর মানুষের মুক্তি ও প্রগতির দ্রুততা ও অনিবার্যতা নির্ভর করছে শ্রমজীবী মানুষের তার নিজের দৃষ্টি ও শক্তির এই দর্শনের জ্ঞানে অধিক থেকে অধিকতরভাবে সমৃদ্ধ ও সশস্ত্র হয়ে ওঠারই উপর।

এমন দর্শনের পাঠ অবশ্যই বাংলাদেশের বড় মাদ্রাসার দর্শনের বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বা অর্থনীতির কিংবা সমাজবিদ্যার শ্রেণীকক্ষে পণ্ডিত প্রফেসরদের কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। এ দর্শন ও জ্ঞানের মূল পাঠ শ্রমজীবী শোষিত মানুষের জীবন ও সংগ্রামের ক্ষেত্র থেকেই শ্রমজীবী এবং তার মিত্রকে আহরণ করতে হবে।

॥১৯৮০॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষার প্রশ্নে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

এই লেখাটির প্রথমে সামসু মিয়ার উল্লেখ আবশ্যক। পুস্তকের দোকানে যাঁরা যাতায়াত করেন সামসু মিয়াকে তাঁরা জানেন। সামসুর রহমান খান। আগে নিউ মার্কেটের নওরোজ কিতাবিস্তানে বসতেন। তাঁর দোকানে গেলে খুব আগ্রহের সঙ্গে দোকানের সব বই-এর কথা বলতেন। কিছুদিন আগে থেকে দেখছি, তিনি আর নওরোজ কিতাবিস্তানে বসেন না। তাঁদের সঙ্গে হয়ত এখন তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। পথে দেখা হতে একদিন বলেছিলেন, তিনি এখন বসেন মরহুম গোলাম রহমান সাহেবের প্রিমিয়ার বই-এর দোকানে। শিশু সাহিত্যিক গোলাম রহমান। স্বাধীনতার পরপরই কারা একরাতে নিরীহ সাহিত্যিক গোলাম রহমনাকে তাঁর বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করল। সেদিন গোলাম রহমান সাহেবের বই-এর দোকানে ঢুকতেই দেখলাম, পেছনের দিকে সামসু মিয়া রয়েছেন। আমাকে দেখে তিনি নিজেই আগ্রহের সংগে বললেন, বই-এর বিক্রির বাজার যা মন্দা! তবু তিনি কষ্ট করে নানা জায়গা থেকে পুরাতন দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। যা ইতিমধ্যেই সংগ্রহ হয়েছে, তার মধ্য থেকে কয়েকখানা বই দেখালেন। এর মধ্যে আছে 'বেঙ্গল আন্ডার দি লেফটেন্ট্যান্ট গভর্নর্স, ১৮৫৮-১৮৮৪, ১৮৯৮ সালে রচিত একখানি দীনিয়াত শিক্ষা, নওয়াব আহসান উল্লাহকে উৎসর্গীত। তাছাড়া দেখালেন বাংলা ভাষা সমস্যার উপর রচিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর এককপি প্রবন্ধ সংকলন। একখানি পুস্তিকা। সামসু মিয়া বললেন : এই বইখানি আপনি এখন কোথাও পাবেন না। এ এখন দুষ্প্রাপ্য। ১৯৪৯ সনে রেনেসাঁস পাবলিকেশসন পুস্তিকাখানি প্রকাশ করেন। কিন্তু আর তার পরে এর কোন মুদ্রণ হয়নি। সামসু মিয়ার কাছ থেকে প্রবন্ধ সংকলনখানি আমি নিয়ে এসেছিলাম সম্ভব হলে তা নিয়ে একটু আলোচনা করার জন্য।

'আমাদের সমস্যা' নামে বাংলাদেশের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা ও লিপি সমস্যার উপর ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ৭৩ পৃষ্ঠার এই পুস্তকখানি আজ, বিশেষ করে একুশে ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি বার্ষিকীতে আলোচনার দাবি রাখে। '৪৯ সাল থেকে হিসাবে করলে পঁচিশ বছরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধিককাল অতিক্রান্ত হয়েছে। এ পুস্তক আজ দুস্প্রাপ্য। কিন্তু কেবল দুস্প্রাপ্যতাই এ নিয়ে আলোচনার একমাত্র কারণ নয়।

এ পুস্তকের উল্লেখ বদরুদ্দীন উমরের 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি'র প্রথম খণ্ডে রয়েছে। বদরুদ্দীন উমর তাঁর গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ 'সূত্রপাত'-এ এই পুস্তকের ভিত্তিতে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লার অভিমত আলোচনা করেছেন। পুস্তকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' শিরোনামের প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ভাষা সম্পর্কে অভিমত, বিশেষ করে বাংলা ভাষার মর্যাদা ও স্বীকৃতির পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে তিনি উর্দু, আরবি ও ইংরেজি সম্পর্কে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তার উদ্ধৃতি দিয়ে বদরুদ্দীন উমর যথার্থই বলেছেন : ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর উপরোক্ত ভাষা বিষয়ক মন্তব্য এবং সুপারিশগুলির মধ্যে অনেক জটিলতা এবং পরস্পর বিরোধিতা থাকলেও এগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ জটিলতা এবং পরস্পর বিরোধী চিন্তা তাঁর মধ্যেই শুধু ছিল না। সমসাময়িক রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ এবং জনসাধারণের চিন্তার মধ্যেও এ জটিলতা এবং পরস্পর বিরোধিতা যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিলো।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'আমাদের সমস্যা' পুস্তিকার লেখা কটি পাঠ করে আমার মনে তাঁর মতামতের জটিলতার চেয়েও সে অভিমতের একক সাহসিকতার দিকটি বিশেষভাবে সাড়া জাগিয়েছে।

পুস্তিকাটির মধ্যে দশটি প্রবন্ধ আছে। তাদের নাম যথাক্রমে : ১. আমাদের ভাষা সমস্যা ২. বাংলার মুসলিম সাহিত্য ও তাহার বাহন ৩. সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা ৪. আমাদের সাহিত্য ৫. পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা সমস্যা ৬. পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার ভাষা সমস্যা ৭. সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসার শিক্ষা সংস্কার ৮. বাংলা বানান ও অক্ষর সংস্কার ৯. সোজা বাংলা ১০. আরবি হরফে বাংলা ভাষা। পরিশিষ্টটিও উল্লেখযোগ্য। পরিশিষ্টে তৎকালীন পূর্ব বাংলা সরকার ভাষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যে প্রশ্নমালা সাহিত্যিক শিক্ষাবিদদের মধ্যে প্রচার করেছিল সে প্রশ্নমালার যে জবাব ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সরকারের নিকট পাঠিয়েছিলেন, হুবহু সেই জবাবটিও ইংরেজিতে মুদ্রিত হয়েছে।

বাংলাদেশ তথা পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন, যার সূচনা ঘটেছিল ১৯৪৮ সনে, এই অঞ্চলের জনজীবনের সামাজিক-রাজনীতিক-সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশে একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন। আমাদের জাতীয় জীবনে এ আন্দোলনের প্রভাব আজো নিস্ক্রিয় হয়ে যায়নি। এ আন্দোলনের বিস্তারিত এবং পরিপূর্ণ ইতিহাস আজো উদঘাটিত এবং লিখিত হয়নি। বদরুদ্দীন উমরের আগ্রহ এবং নিরলস প্রচেষ্টাই এক্ষেত্রে একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। অন্যান্য তরুণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যিক এবং গবেষকরাও একাজে নিশ্চয়ই অদূর ভবিষ্যতে অগ্রসর হয়ে আসবেন। ভাষা সমস্যা এবং ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের ক্ষেত্রে ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর 'আমাদের সমস্যা' শীর্ষক পুস্তিকাখানি একটি মূল্যবান উপাদান। এ পুস্তিকাখানির তাই আজ পুনর্মুদ্রণ আবশ্যক। আমি বর্তমানের ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর এই পুস্তকের কয়েকটি রচনার কিছু তাৎপর্য উল্লেখের চেষ্টা করব।

পুস্তিকার প্রথম প্রবন্ধ 'আমাদের ভাষা সমস্যা'। এটির রচনাকাল ১৩২৪ সাল—অর্থাৎ ইংরেজি ১৯১৭-১৮ সাল। পাদটিকায় একটি কৈফিয়ৎ হিসাবে লেখা হয়েছে : "১৩২৪ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতিরূপে কলিকাতায় প্রদত্ত অভিভাষণ হইতে উদ্ধৃত। আজ দীর্ঘকাল পরেও আমাদের ভাষা সমস্যা নূতন করিয়া দেখা দিয়াছে।"

১৯১৭-১৮ সালের কথা। আজ থেকে আটান্ন বছর আগের কথা। মানুষমাত্র তার মাতৃভাষার চর্চা করে। একটা জনগোষ্ঠীও তাদের মাতৃভাষাকেই নিজেদের ভাষা বলে জানে। বাঙ্গালীর ভাষা বাংলা। বাংলার ভিত্তিতেই বাঙ্গালী। সে বাঙ্গালীর মধ্যে বিভিন্ন বিশ্বাস, অবিশ্বাস, আচার-আচরণ থাকতে পারে। কিন্তু বিশ্বাস-অবিশ্বাস, নির্বিশেষে বাঙ্গালী তার নিজ ভাষার চর্চার মাধ্যমেই নিজের আত্মিক, সাংস্কৃতির, বৈষয়িক বিকাশকে সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করতে পারে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ঐতিহাসিক কারণে বাঙ্গালী মুসলমানদের মাতৃভাষা বাংলার চর্চা স্বাভাবিকভাবে ঘটেনি। বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের মধ্যকার উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে বাংলা ভাষার প্রতি একটি বৈরীভাব ছিল। উনবিংশ ও বিশেষ করে বিংশ শতকে রাজনীতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশ-ধারায় এ সমাজের নিম্নতর শ্রেণীসমূহ, বিশেষ করে তার কৃষক সমাজের সন্তানগণ যখন শিক্ষিত হতে শুরু করে তখন তাকে উচ্চতর শ্রেণীর বৈরী ও প্রতিকূল মনোভাবের মোকাবেলা করে নিজের মাতৃভাষার চর্চার অধিকারকে আদায় করতে হয়। তাই বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষার সমস্যা কেবল যে পাকিস্তান আমলেই সমস্যা ছিল তাই নয়। এ সমস্যা পাকিস্তানের চাইতেও পুরাতন। পাকিস্তান আমলের বৈশিষ্ট্য এই যে, এই পর্যায়ে সমগ্র পূর্ব বাংলা একটি রাষ্ট্রীয় বৈরিতার মোকাবেলায় বাংলা ভাষার মর্যাদাকে অর্জন করেছে তীব্র আওয়াজ, বিক্ষোভ, আন্দোলন এবং রক্তাক্ত সংগ্রামের মাধ্যমে। কিন্তু সেই ষাট বছর আগেও মাতৃভাষার প্রেমিকদের লড়াই করতে হয়েছিল তার নিজের সমাজের উচ্চতর শ্রেণীর বৈরী মনোভাবের বিরুদ্ধে। উভয় ক্ষেত্রে প্রতিকূল শক্তির মানসিকতা একই। শতাব্দীকাল পূর্বে উচ্চতর শ্রেণীর আশঙ্কা ছিল বাংলা ভাষার ব্যাপকতর চর্চা নিম্নতর শ্রেণীকে সচেতন করে তুলবে। সামাজিক মান-মর্যাদা সুবিধা ভোগে তাদের সংকীর্ণ শ্রেণীগত একচেটিয়া আধিপত্য বিপন্ন হবে। এই মানসিকতাই সেদিনও প্রকাশিত হয়েছে উর্দুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আভিজাত্য, উর্দু ধর্মীয় ভাষা, ইসলামী সংস্কৃতির বাহন ইত্যাকার অসার যুক্তির মাধ্যমে। যার স্বার্থ বিপন্ন, তার কোন অসার যুক্তিতেই সঙ্কোচ আসে না। পাকিস্তান আমলেও পাকিস্তানের মুষ্টিমেয় শাসকশ্রেণীর আশংকা ছিল বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার স্বীকৃতি রাষ্ট্রের বিপুল জনসংখ্যাকে সচেতন করে তুলে তাদের স্বার্থের আসনকে দ্রুতগতিতে নাজুক করে তুলবে। বাঙ্গালী মুসলমান অর্থাৎ তার সাধারণ কৃষক-শ্রমিক-মজুরের, তার মধ্যবিত্তের চেতনার বিকাশের সত্য স্বীকৃত সত্য। তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ আমার উদ্দেশ্য নয়।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বৈশিষ্ট্য, তিনি কেবল যে পাকিস্তান আমলেই ভাষা আন্দোলনের সূচনাতেও সমাজের স্বাভাবিক বিকাশকে অনুধাবন করেছেন, তাকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করেছেন এবং তার পক্ষে যুক্তি উপস্থিত করেছেন, তাই নয়। প্রায় ষাট বছর পূর্বকার মুসলমান সমাজের ভাষা বিতর্কের ক্ষেত্রেও তিনি স্বাভাবিক ও প্রগতির পক্ষ গ্রহণ করেছিলেন। আর এই ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা যে সচেতন ও সুস্পষ্ট ছিল তার একটি চমৎকার সাক্ষ্য আলোচ্য পুস্তিকার প্রথম প্রবন্ধটি বহন করে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর এই অভিভাষণটির উদ্বোধনী উক্তিটি এদিক থেকে উদ্ধৃতিযোগ্য।

"...আমরা বঙ্গদেশবাসী। আমাদের কথাবার্তার, ভালোবাসার, চিন্তা-কল্পনার ভাষা বাংলা। তাই আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। দুঃখের বিষয়, জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় এই সোজা কথাটিকেও আমাদের মধ্যে এক সম্প্রদায়কে বুঝাইয়া দিলেও তাহারা জোর করিয়া বুঝিতে চাহেন না। তাই মধ্যে মধ্যে আমাদের মাতৃভাষা কি কিংবা কি হইবে, তাহার আলোচনা সাময়িক পত্রিকাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। হা আমাদের সূক্ষ্মবুদ্ধি!"

যে কোন ভাষারই বিকাশ আছে। সে বিকাশের নানা কারণ, উপকরণ। আমরা সমাজের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ঘাতপ্রতিঘাতগুলিকে দেখতে পাই। নিকট দৃষ্টিতেও সেগুলিকে আমরা ধরতে পারি। কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে তেমনটি আমরা পারিনে। আজ এই মুহূর্তে বাংলা ভাষার মধ্যে কি কি শক্তির দ্বন্দ্ব চলছে এবং তার মাধ্যমে বাংলা ভাষা বাংলাভাষীর ন্যায়ই কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তা খুব সহজে আমরা ধরতে পারিনে। তবু বেশ কিছু সময়ের ব্যবধান দিয়ে যদি ভাষাকে পরিমাপ করা যায় তাহলে তার পরিবর্তনকে চিহ্নিত করা চলে। তখন দেখা যায় শতাব্দীকালে পূর্বে এই ভাষার মনমেজাজ চেহারা যা ছিল, এখন আর তা নেই। নানা উপাদান ভাষার এই পরিবর্তনের স্রোতকে সমৃদ্ধ করে। বাংলা ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান উপাদান নিশ্চয়ই বাঙ্গালী মুসলিম সমাজের ব্যাপকতর জনসংখ্যার এই ভাষা অধিকার অর্জনের সচেতন সংগ্রাম। এই উপাদান সমগ্র বাংলা ভাষার বিকাশের ইতিহাসে নিশ্চয়ই একটি স্পষ্ট ছাপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এঁকে দিবে এবং একদিন বাংলাভাষার ইতিহাসকার মাত্রই এই ছাপকে বিস্ময়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট করতে বাধ্য হবেন।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বহু ভাষাবিদ ছিলেন, তিনি ভাষাতত্ত্ববিদ ছিলেন। মানুষের সামাজিক ইতিহাসের বিকাশের একটি ধারাকে আমরা এভাবে নির্দিষ্ট করি যে, মানুষের সমাজ কতিপয় থেকে বহুর অভিমুখে ধাবিত হচ্ছে। অর্থাৎ অভিজাততন্ত্র থেকে লোকতন্ত্র বা গণতন্ত্রের দিকে সে অগ্রসর হচ্ছে। পূর্বে যেখানে সামাজিক রাষ্ট্রীয় শক্তি, ক্ষমতা, সুযোগ-সুবিধা, কর্মকাণ্ড অল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল আজ সেখানে অধিকতর মানুষ সেই শক্তি ও সুযোগ করায়ত্ত করার সংগ্রাম করছে। ইতিহাসের অগ্রগতির ধাপগুলি জনতার এই সংগ্রামের ক্রমাধিক সাফল্য দ্বারা চিহ্নিত। কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে কি হয়? ভাষা ব্যবহার করে মানুষ সমাজকে গঠন করে এবং সেই সমাজের আর্থিক-সাংস্কৃতিক শক্তির ভিতকে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতরের মধ্যে বিস্তারিত করছে। সমাজের এই বিকাশের সঙ্গে ভাষার বিকাশও কি সংযুক্ত নয়? পৃথিবীর অপর সকল ভাষার ক্ষেত্রে কি হয়েছে, আমাদের জানা নেই। কিন্তু বাংলা ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রটিকে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যেন সমাজ-বিজ্ঞানীর এই দৃষ্টি থেকেই দেখেছিলেন। এবং তার ধারাবাহিকতায় এই লোকমুখীনতাকে তাই তিনি আগ্রহের সাথে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। বাংলা ভাষার ইতিহাস পাঠে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিটি বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ গতিবিচারে আমাদের গভীরতর বিচেনার দাবি রাখে।

"যেমন রাজনীতির ক্ষেত্রে অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র আছে, ভাষার ক্ষেত্রেও তদ্রূপ অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্র আছে। ভারতীয় ভাষা হইতে আমি ইহার উদাহরণ দিতেছি; যে সময়ে ঋষিগণের মধ্যে বৈদিক ভাষা প্রচলিত ছিল, সেই সময়ে সাধারণ আর্যগণের মধ্যে বৈদিক হইতে কিছু বিভিন্ন লৌকিক ভাষা প্রচলিত ছিল। বৈদিক ছিল অভিজাততন্ত্রের ভাষা। ঋষিরা বলিলেন লৌকিক ভাষা অগ্রাহ্য, অকথ্য। নম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষীতবৈ। ম্লেচ্ছাভাষা ব্যবহার করিও না। অপভাষা ব্যবহার করিও না। যদি কর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।"—ঋষিদিগের শত-সহস্র দোহাইতেও কিন্তু বৈদিক ভাষা পূজা অর্চনায় ছাড়া অন্যত্র লৌকিক ভাষার নিকট টিকিতে পারিল না। গণতন্ত্রের নিকট অভিজাততন্ত্রের পরাজয় হইল।

"পরবর্তীকালে উচ্চবর্ণের লৌকিক ভাষাকে মার্জিত করিয়া সংস্কৃত করিয়া লইল। সাধারণে লৌকিক ভাষা পালি ব্যবহার করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকারেরা বলিলেন না ম্লেচ্ছাভাষা শিক্ষেত– ম্লেচ্ছভাষা শিখিও না। তখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের দুর্দশা, বৌদ্ধধর্ম তখন নবীনতেজে দণ্ডায়মান। কেহ ব্রাহ্মণের কথা শুনিল না। বৌদ্ধ গণতন্ত্রের পক্ষ লইল। পালি ভাষা এক বিপুল সাহিত্যের ভাষা হইল। গণতন্ত্রের নিকট অভিজাততন্ত্রের পরাজয় হইল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আর এক যুগ আসিল ।..এ যুগের উচ্চশ্রেণী প্রাকৃত নিম্নশ্রেণীর অপভ্রংশের নিকট পরাজিত হইল। এই অপভ্রংশ বাংলা, উড়িয়া, আসামী, হিন্দী, গুজরাতী, মারহাঠী প্রভৃতি দেশিয় ভাষাসমূহের মূল।

"তারপর আধুনিক যুগ। এ যুগে পণ্ডিতেরা সাধারণের ভাষাকে মাজিয়া ঘষিয়া সাধুভাষা করিয়া লইলেন, বিশাল জনসাধারণের ভাষাকে ইতর ভাষা বলিয়া ফেলিয়া রাখিলেন। বর্তমানে এই ইতরভাষা পণ্ডিতেরা ভাষার উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। পণ্ডিত তাহার অন্ধ সংস্কৃত ভক্তির জন্য বাংলাভাষাকে সংস্কৃতের দুর্বহ শিকলে বাঁধিতে চাহিতেছেন। আর ইতর ভাষা সেই শিকলকে কাটিতে চাহিতেছে। তাহার চেষ্টা ফলবতী হইবে কি? যদি ভারতের ভাষা-ইতিহাসের শিক্ষা মিথ্যা না হয়, তবে নিশ্চয়ই একদিন এই ইতর ভাষা সাধু ভাষাকে, যেমন লৌকিক বৈদিককে, পালি সংস্কৃতকে, প্রাকৃত পালিকে, অপভ্রংশ প্রাকৃতকে ঠেলিয়া দিয়াছিল, সেইরূপে ঠেলিয়া ফেলিবে।...

ভাষার ক্ষেত্রে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর এই দৃষ্টিভঙ্গীকে আমরা বলতে পারি গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। অপর পণ্ডিতদের কথা আমার জানা নেই। কিন্তু ডক্টর মুহম্মদর শহীদুল্লাহর এই মনোভাবটি আমায় চমৎকৃত করেছে। আর এই দৃষ্টিভঙ্গীই ছিল ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মৌলিক এবং কেন্দ্রীয় দৃষ্টিভঙ্গী। এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তিনি কখনো বিচ্যুত হয়েছেন বলে আমার জানা নেই। ভাষা এবং সাহিত্যের সকল সমস্যার বিচারে তিনি তাঁর এই গণতান্ত্রিক এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গী ব্যবহার করেছেন। চিন্তা করলে তাঁর এই কৃতিকে বিস্ময়কর মনে হয়। কারণ, বিভিন্ন ভাষার জ্ঞান তাঁকে যে পাণ্ডিত্য দিয়েছিল সে পাণ্ডিত্যের আভিজাত্যের রক্ষণশীলতাই পণ্ডিত শহীদুল্লাহর পক্ষে স্বাভাবিক হত। কিন্তু ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর পাণ্ডিত্যের আভিজাত্যের রক্ষণশীলতা এবং সংকীর্ণতাকে কেটে উতর জনতার কাতারে শামিল হয়েছিলেন। এ বৈশিষ্ট্য কেবল ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশিত হয়েছিল জীবনের ব্যক্তিগত আচার আচরণেও। সেখানে তিনি গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের মতোই অকপট ও সরল।

ভাষার আন্তরিক সংগ্রামের মধ্যকার এই লোকমুখীনতাকে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন এবং তাকে সমাদর করেছিলেন বলেই বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষাসমূহের সাহিত্যিক শক্তি ও সম্ভাবনাকে তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। বৃদ্ধ বয়সেও অতুলনীয় শৃঙ্খলা, নিয়মাবর্তিতা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে বাংলা একাডেমীর তরফ থেকে আঞ্চলিক ভাষার শব্দবৈচিত্রের সংগ্রহ, সম্পাদনা এবং অভিধান আকারে তার প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন করেছেন। এ কাজটি তাঁর অন্যতম মহৎ কীর্তি।

'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' প্রবন্ধটির প্রকাশকাল ১৩৫৪, ১২ই শ্রাবণ। ১৯৪৮ সালের মধ্যভাগ। বাংলা ভাষার ভবিষ্যতের প্রশ্ন বাঙ্গালীদের, বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্র সম্প্রদায়ের মনকে '৪৭ সালের শেষের দিক থেকেই আলোড়িত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে আরম্ভ করে। উর্দুকে সমগ্র পাকিস্তানের এবং বিশেষ করে পূর্ব বাংলার জীবনের সর্বক্ষেত্রে চাপিয়ে দেবার ষড়যন্ত্রে এই মহল উদ্বেগ বোধ করতে থাকে। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেল ডক্টর জিয়াউদ্দিন আহম্মদ এ সময়ে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করে অভিমত ব্যক্ত করেন। পূর্ব বাংলায় নিযুক্ত পাকিস্তানি আমলাদের ব্যবহার ও মনোভাবে বাংলা ভাষা সংস্কৃতি বিরোধী মনোভাব ক্রমান্বয়ে রূঢ়ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। '৪৭-এর ডিসেম্বরে করাচীর শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এসব কারণে পূর্ব বাংলার সংবেদনশীল বুদ্ধিজীবী মহল উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে।

ড. জিয়াউদ্দিন আহম্মদের উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে গিয়ে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ উক্তি করেছিলেন : "আরবি ভাষাকেই আমি বিশ্বের মুসলমনাদের জাতীয় ভাষারূপে গণ্য করি।" তাঁর এরূপ উক্তি অপর উক্তি ও যুক্তি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করলে কিছু ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। বস্তুত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সচেতনভাবে আরবির কথা উল্লেখ করেছিলেন। উর্দু ইসলামী ভাষা, ধর্মীয় ভাষা এবং মুসলমনাদের ঐক্যের বাহন ইত্যাকার ভিত্তিহীন যুক্তিকে খণ্ডন করার জন্য, আরবিকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য নয়। পাকিস্তানে বাংলার মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে তাঁর অভিমত সেদিনও ছিল দ্বিধাহীন। উর্দুর দাবি খণ্ডন করে তিনি বলেন, "পাকিস্তান ডমিনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মাতৃভাষা বিভিন্ন, যেমন পুষতু, বেলুচী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী এবং বাংলা কিন্তু উর্দু পাকিস্তানের কোন অঞ্চলেই মাতৃভাষারূপে চালু নয়।"

"উপরি উক্ত ভাষাসমূহের মধ্যে বাংলাভাষার সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করিয়াছে। কত অধিকসংখ্যক লোকে একটি ভাষা বলে, এই অনুযায়ী বাংলাভাষা বিশ্বভাষার মধ্যে সপ্তম স্থান অধিকার করিয়াছে। যদি বিদেশী ভাষা বলিয়া ইংরেজি ভাষা পরিত্যক্ত হয়, তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ না করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই।"...

বাংলাদেশের কোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দু বা হিন্দী ভাষা গ্রহণ করা হইলে ইহা রাজনৈতিক পরাধীনতারই নামান্তর হইবে। ডঃ জিয়াউদ্দীন আহম্মদ পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহনরূপে প্রাদেশিক ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষার সপক্ষে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি একজন শিক্ষাবিদরূপে উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। ইহা কেবল বৈজ্ঞানিক শিক্ষানীতি বিরোধী নয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের নীতিবিগর্হিতও বটে।"

ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর এই শেষের উক্তিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভাষার প্রশ্ন যে কেবল ভাষাতেই সীমাবদ্ধ নয়, স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের সঙ্গে সে যে জড়িত এই উক্তিটিতে তার উপলব্ধিটি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'বাংলা বানান ও অক্ষর সংস্কার' প্রবন্ধটিও উল্লেখযোগ্য। বাংলাভাষা আমাদের মাতৃভাষা। তার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে আবেগের দিক আছে। আবেগের প্রয়োজনীয়তা আছে সেখানে। কিন্তু সে আবেগ থেকে ভাষা সম্পর্কে অন্ধ মোহও আমাদের মনে সৃষ্টি হতে পারে। প্রতিকূল শক্তির আক্রমণ থেকে বাংলার অস্তিত্বকে রক্ষা করতে গিয়ে এরূপ মনোভাবের সঞ্চার হওয়ার সম্ভব যে, বাংলাভাষা ত্রুটিহীন, সম্পূর্ণ এবং সকল পরিবর্তনের উর্ধে। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী যে আমাদের সঞ্চারিত হয়নি এমনও নয়। বস্তুত বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলন থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধিকার আন্দোলন যখন স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিণত হয়ে সফল হল তখন থেকে ভাষার ক্ষেত্রে আমাদের যে মনোভাব প্রকাশিত হচ্ছে তা উপরোক্ত মনোভাবেরই আর এক রূপ। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন। এখন আর বাংলা সম্পর্কে কোন চিন্তা ও উদ্বেগের কোন কারণ নেই। তাই আজ আমরা বাংলার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একেবারে চিন্তাহীন। আর তাই বাংলাদেশে শাসন ও শিক্ষার সর্বস্তরে বাংলা প্রচলন ও ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের কোন কার্যক্রম নেই, কোন পরিকল্পনাও নেই। বিশ্বের সকল ক্ষেত্রের জ্ঞানবিজ্ঞানকে বাংলার ভাণ্ডারে সংগ্রহ করে আপামর জনসাধারণের জীবনে তাদের শিক্ষার মাধ্যমে পৌছে দেবার কোন আওয়াজ আন্দোলন আহ্বান আজ আর আমাদের আলোড়িত করে না। এমন আন্দোলন কেউ সংগঠিতও করে না।

কিন্তু ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এক্ষেত্রেও এক অনন্য পুরুষ। ভাষাকে তিনি মানুষের জীবন ও জীবিকার বাহন হিসাবেই জানতেন। আর শিক্ষাই হচ্ছে মানুষের শক্তি। ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা। তাই একদিকে যেমন তিনি বাংলাদেশে সার্বজনীন শিক্ষার জন্য বিরামহীনভাবে আমৃত্যু প্রতিটি বক্তব্যে, ভাষণে, প্রবন্ধে নিজের গভীর আবেগ দিয়ে দাবী উচ্চারণ করেছেন, তেমনি এই ভাষাকে বিপুল জনতার কার্যকর বাহন করার জন্য তার প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করার কথাও চিন্তা করেছেন। কেবল মৃত ভাষাই পরিবর্তনের উর্ধে। জীবন্ত ভাষা জীবন্ত জাতির মতোই সচল। সে অগ্রসর হয়। চারদিক থেকে সে সংগ্রহ করে এবং সমৃদ্ধ হয়। আর গতিকে তার যে আভরণ বোঝা ও ভার হয়ে রুদ্ধ করার চেষ্টা করে তাকে সে বর্জন করে স্বচ্ছন্দ গতি ধারণ করে। কিন্তু এটা কোন অলৌকিক উপায়ে সাধিত হয় না। এ পরিবর্তনের একটি প্রয়োজন জনতার জীবনের চাহিদাকে বুঝা এবং সেই উপলব্ধি অনুযায়ী জনতার অনুরাগী এবং ভাষার কৃতি পুরুষের ভাষার আবশ্যকীয় সংস্কার সাধন করার চেষ্টা করা। ডক্টর শহীদুল্লহ এই চেতনা নিয়েই বাংলাকে সহজতর এবং ব্যাপকতম সাধারণ মানুষের নিকটতম করার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। তাঁর সে সকল প্রস্তাব গ্রহণীয় কিংবা গ্রহণীয় নয়, তা নিয়ে আজ ভাষা অনুরাগীদের মধ্যে ফলপ্রসূ আলোচনা আবশ্যক। এ চিন্তা থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি সাধারণ মানুষের অক্ষরজ্ঞান সহজ করার সোজা বাংলারও প্রস্তাব করেছিলেন। সে প্রস্তাব 'সোজা বাংলা' প্রবন্ধটিতেও রয়েছে।

'আরবি হরফে বাংলা' প্রবন্ধটি এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য যে, পাকিস্তানী শাসকচক্র ধর্মের দোহাই দিয়ে আরবি হরফে বাংলা লেখার নামে বাংলাকে বিকৃত করার যে চেষ্টা একদিন করেছিল তার আভাস যেমন এই প্রবন্ধে আছে, তেমনি আমৃত্যু ধর্মপরায়ণ যুক্তিবাদী ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব যে দ্বিধাহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তার ঘোষণাও এই প্রবন্ধে রয়েছে। প্রবন্ধটির প্রকাশকাল ১৩৫৬, ইংরেজি ১৯৪৯-৫০।

"আমাদের কয়েকজন মাননীয় রাজনীতিক এবং তাঁহাদের কয়েকজন অনুরক্ত ভক্ত পূর্ব পাকিস্তানী আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব তুলিয়াছেন।– বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনভিজ্ঞ কয়েকজন লেখক বলিয়াছেন, যেহেতু মহাকবি আলাওল আরবি অক্ষরে তাঁহার কাব্য লিখিয়াছেন, অতএব আমরা কেন আরবি অক্ষরে বাংলা লিখব না? একে তো এইটি একটি ভুল ধারণা। অন্য পক্ষে ইহার মূলে কোন যুক্তি নাই।— নবীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য আমরা বহু সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও শিল্পী চাই। তাহার জন্য আশু প্রয়োজন জ্ঞানবিজ্ঞান। এই জ্ঞান বিস্তারের জন্যই অক্ষর জ্ঞানের প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস আরবি হরফ প্রবর্তনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে জ্ঞানের স্রোত রুদ্ধ হইয়া যাইবে।– এইজন্য যাহারা আরবি হরফের জন্য প্রস্তাব করিতেছেন তাঁহাদিগকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করি, এই বিতর্ক বহুল বিষয়ে চেষ্টার অপব্যয় না করিয়া বরং অনতিবিলম্বে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করিতে এবং দেশব্যাপী জনশিক্ষার জন্য চেষ্টিত হইতে যেন তাঁহারা পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগকে সক্রিয় করেন। যাহারা ধর্মের দোহাই দিয়া পাকিস্তকানকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে চিরনিমগ্ন রাখিতে চাহেন, তাহারই পাকিস্তানের দুশমন। ইহাই আমার বিশ্বাস।"

* * *

আমার এ আলোচনা ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'আমাদের সমস্যা' নামক দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধ সংকলনখানির অতীব গুরুত্ব ও তাৎপর্যের কথাটি উল্লেখ করার জন্য। কেবলমাত্র পুনর্মুদ্রণের মাধ্যমে সংকলনখানিকে আবার বাংলা ভাষার সুধী সমাজের নিকট পরিচিত করা যায়। আশা করি বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ কিংবা ডক্টর শহীদুল্লাহর গ্রন্থসমূহের স্বত্বাধিকারীগণ ডকটর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর গ্রন্থরাজির পুনঃপ্রকাশসহ বর্তমান প্রবন্ধ সংকলনখানিকে বিশেষভাবে প্রকাশের কথা বিবেচনা করে দেখবেন।

॥১৯৭৬॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষাদান– ভাষার প্রশ্ন

আমাদের দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মতো একটি সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয় কোন ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হবে, এটা কোন স্বাভাবিক প্রশ্ন নয়। এটা কোন সমস্যার বিষয় হওয়া উচিত নয়। অপর কোন দেশে এরূপ প্রশ্ন উদ্ভট। তবু মহামারী ও অনাহারে মৃত্যু যেরূপ অস্বাভাবিক হলেও আমাদের দেশের জীবনে স্বাভাবিক ও নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা, তেমনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষাদানের মাধ্যমের প্রশ্নটিও আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে আজো একটি অমীমাংসিত প্রশ্ন। এ কারণে প্রশ্নটির আলোচনা আবশ্যক।

আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে, এরূপ কয়েকটি দেশের উল্লেখ করা যায়। প্রতিবেশী ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম– এ সমস্ত দেশও ইংরেজ ও ফরাসি শাসনে দীর্ঘকাল যাপন করেছে। ইংরেজদের ও ফরাসিদের ভাষা ও সভ্যতার প্রত্যক্ষ প্রভাব এ সমস্ত দেশে এককালে খুবই প্রবল ছিল। কিন্তু দেশি-বিদেশী পর্যটক ও ওয়াকেবহাল ব্যক্তিগণ বলেন যে, এ সমস্ত দেশের শিক্ষা ও শাসনের মাধ্যমে বর্তমানে অবিমিশ্রিভাবে তাদের নিজ নিজ দেশের জাতীয় ভাষা। ইংরেজি কিংবা ফরাসী নয়।

ইংরেজি শুধু ভাষা নয়। ইংরেজি একদিন একটি বৈদেশিক শাসনের বাহন হয়ে এসেছিল। ইংরেজি শিক্ষা, সভ্যতা ও শাসনের একটি শুভ দিকও ছিল। ইংরেজ শাসনের মাধ্যমে সুপ্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশ পাশ্চাত্য জগতের একটি আধুনিক প্রসারমান ও আগ্রাসী অর্থনীতি, শাসন ও সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছিল। এ সম্পর্কে একদিকে এ দেশের সম্পদ লুণ্ঠিত এবং এ দেশের অধিবাসিগণ নিহত, ধর্ষিত ও পর্যুদস্ত হতে থাকলেও, এ দেশের প্রচলিত প্রচলিত অর্থনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙে পড়লেও এদেশবাসী আত্মিকভাবে আলোড়িত হয়েছিল। ফলে এ দেশেও নূতন চেতনা জন্মলাভ করে এবং বিকশিত হতে থাকে। এ চেতনা ছিল জাতীয়তাবাদের চেতনা। ইংরেজ শাসন অপার শক্তিশালী হলেও তাকে বিদেশী বলে গণ্য করে তার বৈরীশক্তি জাগরিত হতে থাকে। তারই পরিণতিতে এক সময়ে ভারত বিভক্ত হলেও ইংরেজ শাসনকে প্রত্যক্ষভাবে এদেশ পরিত্যাগ করতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইংরেজ শক্তি প্রত্যক্ষভাবে দেশত্যাগ করলেও তার পরোক্ষ প্রভাব বিলুপ্ত হয়নি। এই পরোক্ষ প্রভাবের প্রধান হাতিয়ার ইংরেজি ভাষা এবং ইংরেজি ভাষা-শিক্ষিত এ দেশের শাসক শ্রেণী। যে কোন জিনিসেরই একটি সীমা থাকে। সীমার অতিরিক্তে তার চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে। যাকে আমরা উত্তম বলি, তার ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। সেজন্য আমাদের দেশে একটি প্রবাদ আছে : "অতি ভালো ভালো নয়।" আমাদের নিকট ইংরেজি ভাষার একটি উত্তম দিক ছিল। কিন্তু তারও একটি সীমা আছে। আমাদের জাতীয় জীবনের সামাজিক-অর্থনীতিক-রাজনীতিক বিকাশের ক্রমগতিতে ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে উত্তমের সে সীমা বহুদিন হল অতিক্রান্ত হয়েছে। ইংরেজি ভাষা আমাদের সমাজের সার্বজনীন ও সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে আজ আর সহায়ক শক্তি নয়। সে আজ প্রতিবন্ধকে রূপান্তরিত হয়েছে।

মুখে আমরা যে যাই বলি না কেন, বর্তমান অবস্থায় এই তাৎপর্যের উপলব্ধিটুকু আমাদের মধ্যে অনুপস্থিত। 'আমাদের' শব্দ দ্বারা আমি বাংলাদেশের একবারে সীমাবদ্ধ শিক্ষিত জনাংশের কথা বলছি। সাত কোটির মধ্যে এদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ মাত্র। এরা ইংরেজি 'শিক্ষিত'। ইংরেজিতে এরা আই. এ., বি.এ, এম.এ. পাস করেছে। এরাই হচ্ছে বাংলাদেশের শাসকশ্রেণী।

পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশে বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির জন্য রক্তাক্ত সংগ্রাম হয়েছিল। এ সংগ্রামের একাধিক তাৎপর্য ছিল। ভাষার মর্যাদা স্বীকৃতির দাবির ঘোষণা প্রধান হলেও এ সংগ্রামের মূলে ছিল বাংলাদেশের নিপীড়িত মানুষের আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষা। এ সংগ্রাম ব্যাপকতা লাভ করেছিল। শাসন-শিক্ষা-বাণিজ্য– জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। বাংলা ভাষার স্বীকৃতি ও প্রচলনের সঙ্গে এ দেশের শোষিত শ্রমিক-কৃষক ও নিম্নবিত্তের অর্থনীতিক বিকাশের প্রশ্ন বিশেষভাবে জড়িত ছিল। মাতৃভাষার সার্বজনীন প্রচলনের মাধ্যমেই মাত্র বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশের নিকট শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হতে পারত। বাংলা ভাষার সংগ্রাম শ্রেণীনির্বিশেষে সকল বাঙালীর মনে একটি মহৎ আবেগের সঞ্চার করেছিল। কিন্তু আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করলেও, এর নেতৃত্ব ছিল শুরু থেকে শেষ অবধি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে। শিক্ষিত এই সীমাবদ্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনে ভাষা কোন মূল সমস্যা ছিল না। তারও ছিল আত্মপ্রতিষ্ঠার সমস্যা। আসলে ভাষার জন্য কেউ ভাষা চায় না। ভাতের জন্যই ভাষা। জীবনের জন্য ভাষা। মধ্যবিত্ত শ্রেণী ভাষা আন্দোলনকে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার, তথা শাসক হওয়ার ইচ্ছার হাতিয়ার হিসাবে দেখেছিল। ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশে যে আবেগের জোয়ার সৃষ্টি করে তার ভিত্তিতেই পরবর্তীকালের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার আন্দোলন বিকাশ লাভ করে এবং পরিণতি প্রাপ্ত হয়। ১৯৭১ সালের ঘটনাবলির উল্লেখের প্রয়োজন করে না। ঘটনা পরম্পরায় আন্দোলন, সংঘর্ষ, ভারতীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপমহাদেশে যুদ্ধ ইত্যাদির পরিণামে বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণী শাসনের ক্ষমতা লাভ করেছে। এটাই তার মূল লক্ষ্য ছিল।

সংখ্যায় সীমাবদ্ধ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী একটা সঙ্কটগ্রস্ত অর্থনীতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে তার শাসনের পরিধিকে গণভিত্তিক করতে পারে না। সেরূপ কার্য তার স্বার্থবিরোধী। এ মধ্যবিত্তের স্বার্থ হচ্ছে, কত দ্রুত সে মধ্যবিত্ত থেকে ধনীতে পরিণত হতে পারে। সমাজতন্ত্র কিংবা গণতন্ত্র– যাই তার মুখের আওয়াজ হোক না কেন, সমাজতন্ত্র বা গণতন্ত্র যদি তার এই উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক না হয়, তাহলে তাকে কার্যে পরিণত করার তার আন্তরিক ইচ্ছা থাকবে না। এটাই স্বাভাবিক। বিগত তিন বৎসরের বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা মধ্যবিত্তের এই শ্রেণী-চরিত্রকেই উজ্জ্বল ও সত্য বলে প্রমাণিত করেছে। মার্কসবাদের সেই মূল তত্ত্বই সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, কোন শ্রেণী তার শ্রেণী-স্বার্থের বিরোধী কাজ করতে পারে না। ব্যক্তি বিশেষ শ্রেণীর টানকে ছিন্ন করতে পারে। ধনিক শ্রেণীর ব্যক্তি বিপ্লবী হতে পারে। কিন্তু ধনিক শ্রেণী অবশ্যই ধনিক শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত হবে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থে, শ্রমিক শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে।

একটা বন্ধ্যা অর্থনীতিতে শিক্ষার প্রসার শাসক শ্রেণীর জন্য সমস্যা বৃদ্ধি করে। জনসংখ্যার মধ্যে ক্রমাধিক অধিকার বোধের সৃষ্টি করে, শাসক শ্রেণীর শাসনের অধিকারের উপর প্রশ্ন উত্থাপনকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং রুটি-রুজির দাবি অধিকতর সোচ্চার হয়ে ওঠে। শিক্ষার প্রসার শিক্ষিত বেকার বাহিনীর বৃদ্ধিকে প্রকটতম করে তোলে। এ কারণে সঙ্কটগ্রস্ত পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে আবদ্ধ কোন শাসক শ্রেণী শিক্ষার প্রসার যে শুধু আন্তরিকভাবে কামনা করতে পারে না, তাই নয়। শিক্ষার ক্রম প্রসারে সে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। শাসক শ্রেণী কথাটিকে অনেকে সংকীর্ণ অর্থে কেবল কোন সময়ের গুটিকতক লোকের সরকারের উপর প্রয়োগ করেন। আমি সেরূপ সংকীর্ণ অর্থে শাসক 'শ্রেণী' কথাটিকে বলছিলেন। বাংলাদেশের শাসক শ্রেণীর মধ্যে আমি নিজেও অন্তর্ভুক্ত রয়েছি। শিক্ষা সম্প্রসারণ থেকে উদ্ভূত সমস্যার আশঙ্কায় শাসনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত কেবল প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী বা রাজনৈতিক নেতাই যে আতঙ্কগ্রস্ত হন, তাই নয়। এরূপ বন্ধ্যা অর্থনীতিতে যেখানে উৎপাদনের বিকাশ নেই, সুবিধাভোগী শ্রেণীর প্রত্যেকেই শিক্ষার বিন্দুমাত্র প্রসারে নিজেদের সুবিধা হ্রাসের আশঙ্কায় আতঙ্কিত বোধ করে।

এই কারণেই যে-মধ্যবিত্ত একদিন আবেগের সঙ্গে উচ্চারণ করেছিল : 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি?' সে মধ্যবিত্তের মন থেকে ভাষার সে আবেগ আজ অন্তর্হিত হয়ে গেছে। সে আজ আতঙ্কিত। তাই যে দেশে শিক্ষার হার নামে মাত্র ২০ শতাংশ, যে সাত কোটি মানুষের দেশে গুরুত্বপূর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র গুটি ছয়েক এবং কয়েক লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী মাত্র প্রচলিত উচ্চ শিক্ষার দরজায় পৌঁছতে সক্ষম হয়, সে দেশে শিক্ষিত মানুষ উদ্বৃত্ত বলে বিবেচিত হয় এবং শিক্ষার দ্বার কেমন করে রুদ্ধ ও সংকুচিত করা যায় তার সলা-পরামর্শ-গবেষণায়-রিপোর্টে শাসকদের দিন কাটে। এখানে কেবলমাত্র উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এই তথ্য যে, সমাজতন্ত্র ও সার্বজনীন শিক্ষার ঘোষণা সত্ত্বেও বিগত তিন বছরে বাংলাদেশ তার শিক্ষানীতি নির্ধারণ করতে পারেনি।

সম্প্রতি যে বাংলাদেশের মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি পর্যায়ে পাসের হার ভীতিজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে– এটি উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাৎপর্যপূর্ণ। পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা অবশ্যই শিক্ষার্থীর জ্ঞানের নিম্নমানের পরিচায়ক কিন্তু শিক্ষার্থী বা পরীক্ষার্থীর জ্ঞানের নিম্নমান কেবল তার ব্যক্তিগত অবহেলা, অজ্ঞানতা বা অরাজকতারই পরিচায়ক নয়। বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর অকৃতকার্যতা শিক্ষাব্যবস্থারও অবনয়নের সাক্ষ্য। বিগত বছরের তুলনায় পাসের হারের হ্রাস শিক্ষাব্যবস্থার মানোন্নয়নের আদৌ কোন সূচক নয়। পাসের হার যদি হ্রাস পেয়ে থাকে বা হ্রাস করা হয়ে থাকে তবে এ কথাও সত্য যে, বিগত বছরের তুলনায় শিক্ষাব্যবস্থার মানও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ তার অবনয়নের গতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। উপযুক্ত শিক্ষকের সেই অভাব, অনাহারী শিক্ষকদের শিক্ষাদানে অনাগ্রহের বৃদ্ধি, গ্রন্থাগারের অধিকতর সংকোচন, সেখানে উপযুক্ত পুস্তকের অভাব, বাজারে পুস্তকের-কাগজের-কালির মূল্য বৃদ্ধি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই জ্ঞানের উপকরণ সংগ্রহে অধিকতর অক্ষমতা : মোটকথা সব মিলিয়ে জ্ঞানের মানের অধিকতর অবনতি।

আসলে শিক্ষার মানের এই ক্রম অবনতি, অধিকতর সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর অকৃতকার্য হওয়া– ইত্যাদি ঘটনা কারুর ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও পরিকল্পনার ফল না হতে পারে; কিন্তু সামাজিক-অর্থনীতিক-রাজনীতিক পরিস্থিতির সামগ্রিক ফলে দেশে শিক্ষার প্রসারের বদলে যে শিক্ষা সংকোচনের নীতি কার্যতঃ অনুসৃত হচ্ছে– এটি অস্বীকারের উপায় নেই।

কিন্তু এ নীতি কি আমাদেরকে তীব্রতর সঙ্কট থেকে রেহাই দিতে সক্ষম হবে? আমরা যারা ভীত, সন্ত্রস্ত তারা কি এই নীতিতে সংকটকে প্রতিরোধ করতে পারব? যুক্তি বলে : না, তা সম্ভব হবে না। জনসংখ্যা অনিবার্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকার মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এবং পরিণামে এমন এক সংকট নেমে আসবে, যে সংকট সমস্ত মধ্যবিত্তকে– তার মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, তার সচিব, উপসচিব, তার শিক্ষক-অধ্যাপক– কাউকে রেহাই দিবে না। সকলকে ভাসিয়ে নেবে।

এই সর্বগ্রাসী সঙ্কটের সঙ্গে অবশ্যই রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষাদানের মাধ্যমের একটি নিগূঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান। এ কেবলই 'ধান ভানতে শিব সঙ্গীত' নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আমাদের মন ও মানসিকতা এই সর্বগ্রাসী সঙ্কটের আবহাওয়াতেই আচ্ছন্ন।

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এ সঙ্কট থেকে মুক্তির পথ বর্তমান লেখকের জানা নেই। তথাপি যুক্তির ভিত্তিতে শিক্ষার যে ক্ষেত্রের সঙ্গে আমরা জড়িত, তার সম্ভব ও অসম্ভবের দিকটির আলোচনা আমরা করতে পারি।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়াবলি দূর বিদেশ তথা পাশ্চাত্যের গ্রিস, ফরাসি, জার্মানি, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা থেকে আমদানিকৃত কোন জটিল এবং কেবল মাত্র ইংরেজিতে বোধগম্য বিষয় বলে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। আমরা নিশ্চয়ই কেউ এরূপে তাকে বিবেচনাও করিনে। আমরা রাষ্ট্রেই বাস করি। শুধু বাস করিনে, আমরা তো একটি রাষ্ট্রের জন্মদানও করেছি। আমাদের জন্মভূমি এবং জন্মভূমির প্রতিবেশের একটি ইতিহাসও আছে। এই ইতিহাসের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হতে হতে আমরা বর্তমান মুহূর্তে এসে উপনীত হয়েছি। এ বিষয়টির আলোচনা, পর্যালোচনা অবশ্যই আনন্দের এবং উৎসাহের ব্যাপার। এর মধ্যে কঠিন, দুর্বোধ্য, এবং একে প্রকাশের জন্য বিদেশী ভাষার আশ্রয় গ্রহণের অপরিহার্যতার কোন প্রশ্ন নেই। সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টটল, প্রভৃতি জ্ঞানী-গুণী-মনীষীর রচনা ও সৃষ্টি আজ আন্তর্জাতিক ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। তার সঙ্গে আমাদের শিক্ষক, শিক্ষার্থী সকলের পরিচয় আবশ্যক। কিন্তু এর কোনটির সঙ্গেই বিদেশী কোন ভাষা : ফরাসি, জার্মানি বা ইংরেজি– কেউ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকবে, এমন কোন কথা নেই। এ সমস্ত বিষয়ের আলোচনা আমাদের মাতৃভাষায় কেবল যে সম্ভব তাই নয়। এ সমস্ত বিষয়ের চর্চার যদি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে, তবে বাংলা ভাষায় যত এদের আলোচনা, ব্যাখ্যা ও প্রকাশ ঘটবে তত ব্যাপকভাবেই তার প্রভাব সমাজ জীবনে পরিলক্ষিত হবে।

আমাদের শিক্ষার্থী অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন উঠলে এ কথা তো অবিসংবাদিতভাবে আজ সত্য যে, সকল জ্ঞান ও শিক্ষার মাধ্যম অবিলম্বে এবং এই মুহূর্তে বাংলা হওয়া আবশ্যক।

কারণ, বাস্তব অবস্থার কারণে এবং সঙ্গতভাবেই ইতিমধ্যে শিক্ষার একটা পর্যায়– অর্থাৎ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের প্রতিটি বিষয়ে বাংলা প্রচলিত হয়ে গেছে। সকল ছাত্র-ছাত্রীই এখন উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত বাংলাভাষায় শিক্ষালাভ করছে। পূর্বকালে অর্থাৎ ইংরেজ আমলে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত ইংরেজি শিক্ষার উপর যে জোর ছিল, সে জোর আজ আর নেই। মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি একটি বিষয় হিসাবে রক্ষিত হয়ে থাকলেও তার পঠন-পঠনের মান অনেক অবনত হয়ে গেছে। সে চর্চা উচ্চতর শ্রেণীতে ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক অনুধাবনে আদৌ সাহায্য করে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বর্তমানে যে অসঙ্গতি ও বৈপরীত্য প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে সে হচ্ছে এই যে, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বাংলা প্রচলিত হলেও ডিগ্রি এবং ডিগ্রি উত্তর পর্যায়ে সকল পাঠ্যপুস্তকই ইংরেজিতে লিখিত। এই সমস্ত পাঠ্যপুস্তক, যেমন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাস, সরকার পরিচালনার সমস্যা–ইত্যাদি সংক্রান্ত সকল পাঠ্যপুস্তক ইংল্যান্ড ও আমেরিকার গ্রন্থকারদের রচিত। এই সমস্ত গ্রহন্থকারের রচনা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ডিগ্রি পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে অনুধাবন করা আদৌ সম্ভব নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশ, ডিগ্রি পর্যায়ের প্রায় ৯৫ শতাংশ এবং ডিগ্রি উত্তর পর্যায়ের ৫০ শতাংশের অধিক তাদের প্রশ্নপত্রের জবাব নিজ বুদ্ধিমতো বাংলাতে দিচ্ছে। এ ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। কিন্তু তাদের এই অবস্থায় সাহায্য করার জন্য শিক্ষকমণ্ডলীর তরফ থেকে তেমন কোন প্রচেষ্টা নেই। শিক্ষকমণ্ডলী তাঁদের আলোচনা বাংলায় করার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা প্রকাশের ক্ষমতাকে সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে একটি মনোভাব রয়েছে যে, বাংলা ভাষায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়াবলি ব্যাখ্যা করা চলে না। এ মনোভাবের কোন যুক্তি নেই। তবু এর প্রধান ভিত্তি এই যে, শিক্ষকমণ্ডলী ইংরেজি পুস্তকের উপর নির্ভর করে তাঁদের আলোচনা উপস্থিত করেন। বাংলা উপস্থাপনার জন্য বাংলা পুস্তকের অভাবের কারণে যে পরিশ্রম, উদ্যোগ ও আন্তরিকতা প্রদর্শন আবশ্যক তা আমদের মধ্যে খুব দেখা যায় না।

এই অবস্থায় ডিগ্রি পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকাশ ক্ষমতা যে কতো দুর্বল, তার পরিচয় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে যতো না প্রকট হয়ে ধরা পড়ে তার চেয়ে অধিক ও মর্মান্তিকভাবে ধরা পড়ে তাদের দেওয়া জবাবপত্রে। এ জবাবের মান মুখে বলে বা কোন উদ্ধৃতি দিয়ে বুঝানো সম্ভব নয়। যাঁরা পরীক্ষক তাঁরাই একে সাক্ষাৎভাবে দেখেছেন। হস্তাক্ষর থেকে বাক্য গঠন, শব্দের বানান এবং কোন বিষয়ের অর্থ প্রকাশের অক্ষমতা ও দৈন্যের চেহারা কেবলমাত্র তাদের জবাবের চিত্রপ্রতিলিপি বা 'ফটোস্ট্যাটে'র মাধ্যমেই কিছুটা বুঝানো সম্ভব। কিন্তু সেরূপ প্রদর্শনী বর্তমান আলোচনায় সম্ভব নয় বলে আমি ডিগ্রির : পাস ও সাবসিডিয়ারী এবং প্রথম পর্ব এম. এ. পরীক্ষার্থীদের জবাবের কিছু ইংরেজি ও বাংলা নমুনা উদ্ধৃতি সহযোগে পেশ করার চেষ্টা করছি।

নমুনা ক : প্রশ্ন : Discuss Plato's System of Education and Communism.

জবাব : "প্লেটোর শিক্ষাব্যবস্থা সত্যই আমাদের জীবনের কল্যাণ সাধন করে, তিনি আমাদিগকে সৎপথে, সৎভাবে, সৎচিন্তা করিতে উপদেশ দেন, তাহার চলার ভঙ্গি সত্যই সুন্দর, তিনি রাষ্ট্রে মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সভাইকে উপদেশ দেন। তিনি বলিয়াছেন যে মানুষ হানাহানি কানাকানি না করে সবাইর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাথে প্রীতি ভালোবাসা সেই সাধ বজায় রাখার উপদেশ দেন সবাই ভাই ভাই, সবাই একই মায়ের সন্তান তাই তাহাদের প্রতি কোন রেশারেশি না করে সভাই মিলেমিশে থাকার কথাই তিনি বলেন ... ছোট বড় সবাই তাহার কাছে সমান তাহার শিক্ষা-ব্যবস্থা ও সাম্যবাদ সত্যই অতুলনীয়। তাহার জীবন চরিত আলোচনা করিলে দেখা যায় আমরা কিছুই না। তাহার জীবন নিষ্কলঙ্ক এবং পাপশূন্য, তাহার শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা অনুসরণ করিলে চলিতে আমাদের কোন অসুবিধা ও সম্বন্ধনীয় হইতে হয় না।"

আর একটি জবাব : "প্লেটোর শিক্ষাব্যবস্থা সত্যই আমাদের জীবনের কল্যাণ সাধন করে। তিনি আমাদিগকে সৎপথে সৎভাবে সৎচিন্তা করিতে উপদেশ দেন। তাহার চলার ভঙ্গি সত্যই সুন্দর। .... তিনি বলিয়াছেন মানুষে মানুষে হানাহানি কানাকানি না করে .... সবাই একই মায়ের সন্তান। তাই কাহারো প্রতি কোন রেষারেষি না করে সবাই মিলে মিশে থাকার কথাই তিনি বলেছেন। তাহার মন ও ধারণা ছিল অন্যরূপ। তিনি বাইরের জগৎ ও ভিতরের জগৎ সবাইর সাথেই বন্ধুত্ব ভাব ছিল। ছোট বলিয়া কাহাকেও দূরে এবং বড় বলিয়া কারেও সামনে রাখিতেন না।"

একাধিক ছাত্র হুবহু এই ভাষায় এই জবাবটি দিয়েছে। তারা একে অপরের জবাব নকল করে থাকলেও এর মূলে কোন বাঙালি লেখকের মুদ্রিত কোন পুস্তক আছে বলেই অনুমান হয়।

নমুনা খ : প্রশ্ন : Discuss the methods applied in the study of Political Science. রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত পদ্ধতি সমূহের আলোচনা কর।

জবাব : "পরীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে পরীক্ষা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা হয়। যেমন একটি পেঁয়াজ ছিলা হয়। এবং তাহা কাটা হইলে দেখা যায় যে, মধ্যে কি আছে না আছে। এই ভাবে পরীক্ষণ পদ্ধতিকে দেখা হয়। তাহা ছাড়া একটি ডিম আনিলাম তাহা ভালো না মন্দ দেখার জন্য ভাঙ্গিলাম"....

বক্তব্য প্রকাশের অক্ষমতাটি লক্ষণীয়। শব্দের সঠিক রূপের সঙ্গে পরিচয়ের দুর্বলতাও আমরা খেয়াল করিতে পারি। জবাবদাতা 'পদ্ধতি' লিখেছে 'পদ্ধতি' নয়। শুধু একটি দৃষ্টান্ত নয়। বহু ছাত্র 'সংজ্ঞা'র বানান লিখেছে সংগা হিসাবে। অধিকাংশই বাংলা বানানের ু, ূ ি, ী এবং শ, ষ, ও স-এর মধ্যে পার্থক্যের ক্ষেত্রে নির্বিকার। যদৃচ্ছা এদের ব্যবহার করেছে। এমন কি এরা 'নির্দিষ্ট' শব্দের সঙ্গে নির্দিষ্টরূপে পরিচিত নয়। নির্দিষ্ট এদের নিকট নি-দৃষ্ট (নিদৃষ্ট)। বাংলা অভিধান ব্যহারের কোন পরিচয় কারুর জবাবপত্রে পাওয়া যায় না।

নমুনা গ: প্রথম পর্ব এম. এ. পরীক্ষার্থীদের জবাবের নমুনা :

প্রশ্ন : সাম্য এবং স্বাধীনতার কি পার্থক্য? What do you understand by equality and liberty?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জবাব : "Man is equal. Man cannot equal of society but unequal. It is manyclass of the society. Man cannot live without alone. So one society is the highest capitalist in the family. Another society is a medium capitalist in the family. This is equality springs two sources. Namely Nature and Nature another strangth and weight. Liberty means the duty to keeps to the left."

প্রশ্ন : হবস্-এর চিন্তাধারা বর্ণনা কর।

জবাব : Hobbes was the middle aged political philosopher. He was the forerunner of Machiavelli and Aristotle.

প্রশ্ন : রাষ্ট্র স্বাভাবিক সংস্থা-এ্যারিস্টটল, কোন যুক্তির ভিত্তিতে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন?

জনাব : এ্যারিস্টটল স্বাভাবিক রাষ্ট্রের যে চিত্র অংকন করেছেন তাতে বলা যায় যে, তিনি অশিক্ষিত স্ত্রীলোককে ক্রীতদাসের পর্যায়ে ফেলেছেন তা সম্মত হয়নি।

প্রশ্ন : রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে মেকিয়াভেলীর অবদান কি?

জবাব : মিকিয়াভেলী...রাজনীতিকে নৈতিকতার ভেড়াজাল হইতে মুক্ত করেন।

প্রশ্ন : Machiavelli's political thought is devoid of ethics—Explain.

জবাব : Eithics comes from a condition of the public theory of law. It is a very sincerely cercumstance of condition. So political condition already given below of Machiavelli. Many definitions of writers athead. Actually writers of Machiavelli confirm of his theory. Political thought actually system depends of the society. Principles of all concerned in the time. Nevertheless, Principles comes human behavier of the family.

প্রশ্ন : প্লেটো কোন যুক্তির ভিত্তিতে পরিবার প্রথাকে বিলুপ্ত করার প্রস্তাব করেছিলেন?

জবাব : শাসকগোষ্টির যখন নিজ নিজ পরিবার থেকে দূরে—অর্থাৎ পরিবার প্রতিপালন না করে রাষ্ট্রের মহব্বতে রাষ্ট্রের কাতিরে নিজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> নিজ কর্তব্য পালন করিবে তখনই রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হইবে ।... যদি শাসক ও যোদ্ধাগণ নিজ নিজ পরিবার না গড়ে রাষ্ট্রের অধীন থেকে কাজ করে তাহা হইলে রাষ্ট্র সোনার রাষ্ট্রে পরিণত হইবে । কারণ, তাহাদের দুনিয়ার যস, খ্যাতি ও অর্থের মায়ায় তাহাদিগকে অন্যায় কাজ অর্থাৎ বেআইনিভাবে ও জুলু বাজি না করে দেশে ও দশের খেদমত করিতে পারিবে । তাহারা প্রয়োজন অনুসারে নিজেদের কামনা বাসনা চরিত্রতা করিবার সুযোগ করে নিতে বলেছেন ।...

কথা হতে পারে এরূপ নমুনা ব্যতিক্রম মাত্র, সাধারণ গড় নয় । কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা সেরূপ নয় । এই নমুনাই সাধারণ গড় । সুন্দর হস্তাক্ষরে মোটামুটি শুদ্ধ বাক্য গঠনের জবাবই ব্যতিক্রম ।

ছাত্র-ছাত্রীদের জবাবের নমুনার এই পদ্ধতি এবং উল্লেখ তাদের প্রতি কোন তাচ্ছিল্য প্রকাশের জন্য নয় । তাদেরকে অভিযুক্ত করণের জন্যও নয় । এ নমুনা আমাদের শিক্ষার বর্তমান মানের নির্দেশক । এবং এ মানের জন্য শিক্ষার্থী নিজে দায়ী নয় । তার পরিবেশ এবং শিক্ষাব্যবস্থাই দায়ী । এই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আমরা শিক্ষকরা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ । তাই এই দায়িত্ব আমাদেরও ।

এ দায়িত্বের একটা দিক এই যে শিক্ষকদের ইংরেজি আলোচনা যতোই গভীর ও উত্তম হোক না কেন, সে আলোচনা বৃহত্তর সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট 'গ্রিকের চেয়েও গ্রিক'—অর্থাৎ দুর্বোধ্য ।

পরীক্ষাপত্রে নিম্নমানের জবাবের অপর একটি বড় কারণ, উচ্চমানের বাংলা পাঠ্যপুস্তকের অভাব । শিক্ষার্থী পাঠে মনোনিবেশ করবে । এ জন্য তার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে । স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাশহীন ধারাবাহিক ক্লাস অনুষ্ঠান এবং শিক্ষাদানের উপর জোর দিতে হবে । ক্লাসে আলোচিত বিষয় আয়ত্ত্ব হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য ছাত্র-ছাত্রীর লেখার অনুশীলনী বৃদ্ধি করতে হবে । কিন্তু এইই যথেষ্ট নয় । এর পরেও কথা থাকে, কোন বাংলা বই পাঠ করে তারা বিষয়কে আয়ত্ত্ব করবে? কারণ, বই পাঠ করে পঠিত সেই বিষয়ে পরীক্ষার উত্তর পত্রে পুনঃপ্রকাশের মাধ্যমেই তাকে তার কৃতিত্বের পরিচয় দিতে হবে । কিন্তু কোথায় উন্নতমানের সেই বাংলা পাঠ্যপুস্তক? যারা পড়াশুনায় আগ্রহী তাদের অধিক সংখ্যকের ক্ষেত্রে উপযুক্ত মানের বাংলা পাঠ্যপুস্তক না থাকা তাদের কর্তৃকার্যতার প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করছে । শিক্ষা সঙ্কটের এই হচ্ছে দ্বিতীয় দিক ।

কাজেই বাংলা মাধ্যমের অনিবার্যতা, তার আশু প্রয়োজনীয়তা, ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যাল্পতা, তার মর্মোদ্ধারে শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক অক্ষমতা, উন্নতমানের বাংলা পাঠ্যপুস্তকের বিরাট অভাব এবং অবাঞ্ছিত মানের বাংলা বই এর বাজারে প্রাপ্যতা— এই সব মিলিয়ে শিক্ষার মান অবনয়নের ক্ষেত্রে যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্ট হয়েছে তার তাৎপর্য অনুধাবন শাসন ও শিক্ষার প্রতিটি স্তরের বিবেকবান ব্যক্তিদের অবশ্য ও অপরিহার্য দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেই আমি মনে করি।

এরূপ অবস্থা চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষার মান অকল্পনীয়ভাবে নিচে নেমে যাবে। ফলে আমাদের শিক্ষা ও শাসনের ক্ষেত্রে যাদের আমরা পেতে থাকব তারা না শিক্ষিত, না অশিক্ষিত। অশিক্ষিত মানুষের সারল্য তারা হারাবে বটে, কিন্তু তার স্থানে শিক্ষা ও সংস্কৃতির কোন প্রলেপ তাদের বুদ্ধি বিবেকে আদৌ পড়বে না।

বিশ্ববিদ্যাল কর্তৃপক্ষ মুখে শিক্ষার অবনত মান সম্পর্কে আফশোস প্রকাশ করেন। কিন্তু বাস্তবভাবে তার উন্নতির জন্য কোন কার্যকর পন্থা গ্রহণ করেছেন বলে আমার জানা নেই। বাংলা মাধ্যমের আশু প্রয়োজনীয়তার বোধ তাঁদের চেতনায় একুশের আবেগের জোয়ারকালে যাওবা ছিল, আজ ভাটার টানে তাও লুপ্ত প্রায়। তবু যদি তাঁদের মধ্যে এ বোধের কিছু রেশ থেকে থাকে তবে তাঁরা প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি এবং বিভাগ ভিত্তিক একটি করে উচ্চতর অর্থাৎ ডিগ্রি এবং ডিগ্রিউত্তর পর্যায়ের উপযুক্ত মানের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য দায়িত্বশীল কমিটি গঠন করতে পারেন। এই সমস্ত কমিটির দায়িত্ব হবে, প্রয়োজনীয় পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত করা এবং উপযুক্ত শিক্ষক, সাহিত্যিক, লেখক নিযুক্ত করে রচনা, সংকলন, অনুবাদ এবং মর্মানুবাদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের মেয়াদে এবং জরুরি ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচনা করা এবং তা প্রকাশের ব্যবস্থা করা। যে সমস্ত শিক্ষক লেখক এরূপ কাজের উপযুক্ত বিবেচিত হবেন এবং যাঁদের উপর এরূপ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হবে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁদের বর্তমানকার দৈনন্দিন দায়িত্ব (যথা ছাত্রদের ক্লাস নেওয়া) থেকে নির্দিষ্ট সময়ে জন্যই রেহাই দিয়ে তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয় আর্থি ও মানসিক পরিবেশ তৈরি করে দিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনও এরূপ দায়িত্বের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যাতে এরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করেন তার পরামর্শ দিতে পারেন।

॥১৯৭৪॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত

আজকাল ইউনির্ভার্সিটির ক্লাস বন্ধ। বন্ধ না থাকলে রোজ ইউনিভার্সিটি যেতাম। ক্লাসের আগে পরে শিক্ষকদের কমনরুমে বসতাম। চা খেতাম। আর পরস্পর কথা বলতাম। দেশের অবস্থার কথা। শিক্ষার কথা। শিক্ষকদের কমনরুম মানে শিক্ষকদের আড্ডাখানা। কথক মাত্রই আড্ডাখানা ভালোবাসে। আড্ডাখানার প্রতি আমারও একটা আকর্ষণ আছে। সে আকর্ষণ কথা বলার জন্য নয়। কথা শোনার জন্য। আমি নিজে ভালো কথক নই। আড্ডাখানার আদৌ কোন কথক নই, আড্ডা বা মজলিশে কেবল তারাই কথা বলতে পারে যারা কথার শিল্পী। কথার শিল্পী নানা ধরনের হতে পারে। এ অভিজ্ঞতাটি শিক্ষকদের এই মজলিশে বসে বসে আমার জন্মেছে। কারুর গলাটা বেশ দরাজ। ঐ দরাজ গলার জন্যই তাঁর কথা শ্রোতাদের মনযোগ আকর্ষণ করে। কেউ আছেন যাঁরা কথায় কথায় গল্প বলতে পারেন। শুধু গল্প নয়, সে গল্পে তাঁরা বুদ্ধির প্রাখর্য বা সূক্ষ্ম রসিকতার চেয়ে স্থূল রসের অধিক যে যোগান দিতে পারেন। তাঁরা এমন গল্প বলেন যে, সে গল্পের হাবভাব, আকার-ইঙ্গিত শ্রোতামাত্রের কান খাড়া করে তোলে।

রাজ্জাক স্যারের বন্ধু মাহমুদ সাহেব যাই বলুন না কেন, সুন্দরভাবে তা পরিবেশন করতে পারেন। লোক তিনি ঢাকার। কিন্তু অনেকদিন কোলকাতা থেকে থেকে সেখানকার বলার ভঙ্গীটি যেমন আয়ত্ত করেছেন, তেমনি পশ্চিমবঙ্গের সামাজিকও রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ধারা উপধারার বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও সংগ্রহ করেছেন। তাই তাঁর আলাপ এখনো আমাদের কাছে বেশ আনন্দদায়ক। অধ্যাপক মাহমুদ সম্প্রতি কোলকাতা থেকে চলে এসে ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেছেন। রাজ্জাক স্যারের কাছে যেয়ে বসতে ভালো লাগে। অতীত ইতিহাসের কথা বলতে তিনি ভালোবাসেন। সেই ১৯৩৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে শুরু করেছেন। সেই থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে শিক্ষক হিসাবে যুক্ত রয়েছেন। শিক্ষকতার এই ধারবাহিকতা অবশ্যই একটি বিশেষ ক্ষমতার পরিচায়ক। অধ্যাপক সা'দ উদ্দীনও বেশ গল্প বলতে পারেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গতকাল ছুটির মধ্যেও কমনরুমে যেয়ে দেখলাম সা'দ উদ্দীন, ডক্টর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, মনিরুজ্জামান মিঞা, সোহরাব হোসেন– বেশ কয়েকজন শিক্ষক বসে আড্ডা দিচ্ছেন। আমি গিয়ে উপস্থিত হতেই অধ্যাপক সা'দ বললেন, সরদার ভাই, আমি কাল রাতে আপনার লেখাটি পড়ে খুব ভেবেছি। আপনি একটি ভালো পয়েন্ট তুলে ধরেছেন আপনার লেখাটিতে।' আমি একটু চমকিত হলাম। প্রথমে বুঝতে পারলাম না, আমার কোন লেখা অধ্যাপক সা'দের নজরে পড়েছে। আমি বললাম : আমি খুব খুশি হলাম একথা শুনে যে, সা'দ সাহেব আমার লেখা পড়েছেন। কিন্তু কোন লেখা?

: আপনার বাংলাদেশের শাসক শ্রেণীর চরিত্র সম্পর্কিত লেখাটি।

এবার আমার মনে পড়ল, একুশে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে লেখক শিবিরের আয়োজিত সেমিনারে আমার একটি আলোচনা এই নামে বদরুদ্দীন উমর তাঁর 'সংস্কৃতি' পত্রিকায় ছেপেছেন। আমি জানি এটি কোন সুসম্পূর্ণ লেখা নয়। একটি প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে। সেই প্রশ্নটিকেই আমি এই আলোচনাটিতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী কে এবং তাদের শ্রেণীগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কি? আমি বলেছি, বাংলাদেশের এটি একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যে, এখানকার শাসকরা কেবল যে মধ্যবিত্ত, তাই নয়। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত, শ্রেণী হিসাবে বর্তমানে একেবারে নিরঙ্কুশ ও প্রতিদ্বন্দ্বী বা ক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রতিযোগীহীন; একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সাধারণতঃ এরূপ স্বাধীনভাবে ও এককভাবে কোন রাষ্ট্র শাসনের অধিকার পেতে দেখা যায় না। এদিক থেকে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত এক তুলনাহীন দায়িত্ব লাভ করেছে। বাংলাদেশে একটি সুস্থ সুখী রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবন তৈরি করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানের দায়িত্ব। কিন্তু এ দায়িত্ব পালনে সে সফল কিংবা ব্যর্থ হবে তার অনুমান একমাত্র তার চরিত্রের বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই করা সম্ভব। অথচ এই কাজটি কেউ যে তেমন করেছেন, এরূপ আমার চোখে পড়েনি।

আমার লেখাটিকে উপলক্ষ করে এই প্রশ্নটিই উঠলো।

সা'দ বললেন, একথা ঠিক যে বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের তেমন কোন মহৎ ঐতিহ্য নেই। বস্তুত আমরা যারা আজ মধ্যবিত্ত হয়েছি তারা যে কোন শ্রেণীর নবজাগরণের সংগ্রাম থেকে জাত, এমন নয়। এ মধ্যবিত্তের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য যে এরা পাকিস্তানের পূর্বে হিন্দু সমাজের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বৃটিশ শাসকের অনুগ্রহে ছোট এবং মধ্যম কেসেমের চাকরি-বাকিরর মাধ্যমে মধ্যবিত্ত হয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টির পরে পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত তৈরি হয়েছে পাকিস্তানী শাসকদের প্রয়োজনে এবং পরের দিকে বৈষম্যের আওয়াজ তুলে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকদের কাছ থেকে প্রশাসন, এবং সামরিক বাহিনীতে কিছু অধিক পরিমাণ সুযোগ সংগ্রহের মাধ্যমে। এ বিকাশেও মধ্যবিত্তকে দীর্ঘদিন কোন আত্মদানকারী সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয়নি এবং তেমন দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও চিন্তার কোন উদারনীতিক, গণতন্ত্রী বা সাম্যবাদী ঐতিহ্য তৈরি হয়নি যাকে আমরা তার সঙ্কট মুহূর্তের নোঙর বলে চিহ্নিত করতে পারি। বাংলাদেশের এ মধ্যবিত্ত কেবলই কেরানি, কর্মচারী, সাব ডেপুটি, সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারী, পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট, দারোগা, জমাদার। এবং সমাজের উৎপাদন থেকে এ বিচ্ছিন্ন। সা'দের মতে, ইউরোপের মধ্যবিত্ত এরূপে উৎপাদনের সাথে সম্পর্কহীনভাবে তৈরি হয়নি। বস্তুতঃ অষ্টাদশ উনবিংশ শতকে ইংল্যান্ড ও ফরাসি দেশে মধ্যবুর্জোয়ারাই মধ্যবিত্ত। তারাও শিল্পকারখানার মালিক ছিল। কিন্তু তারা আকারে মধ্যম বা পাতি। কিন্তু তারা বুর্জোয়া সমাজেরই অংশ। একটা উৎপাদক শ্রেণীর অংশ। আর এ কারণে তার স্বার্থ রক্ষা ও বৃদ্ধির চেষ্টায় তাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। তার নিজের বিকাশের জন্য গণতন্ত্র ও উদারতার আওয়াজ তাকে তুলতে হয়েছে। সা'দের এই পয়েন্টটি আমার ভালো লাগল।

ড. সিরাজুল ইসলাম বললেন: "এমন কি পশ্চিমবাংলায় অর্থাৎ হিন্দুসমাজের মধ্যবিত্তের সঙ্গেও আমাদের বাংলাদেশের এই মধ্যবিত্তের চারিত্রিক পার্থক্য আছে। হিন্দুমধ্যবিত্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্টি হলেও এরা পরবর্তীকালে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছে। নিজে পরিশ্রম করে একটা ব্যবসায়, একটা ব্যাংক কিংবা একটা ক্ষুদ্র শিল্প তৈরি করার চেষ্টা করেছে। সামাজিক অনেক কুসংস্কারকে সে ভাঙার চেষ্টা করেছে। এবং এর মধ্যে তৈরি হয়েছে তার কিছু প্রগতিশীল ঐতিহ্য।"

সা'দ বললেন: "তবু ভারতের হিন্দুসমাজের মধ্যে বর্ণাশ্রমের বিভাগ আজো এত গভীর যে, বর্ণের ভেদাভেদের মনোভাব এখনো তার প্রগতিশীল এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভার বা প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করছে। সেদিক থেকে মুসলিম সমাজের এই বৈশিষ্ট্য আছে যে, এখানে জন্মগতভাবে কিংবা ধর্মগতভাবে কেউ কারুর চেয়ে নিকৃষ্ট– এ বিশ্বাস কোন অংশের মধ্যে নেই। আমাদের আপামরের মধ্যে আজ যে নৈরাজ্য ও অবাধ্যতার হাওয়া এর একটা উৎস নিশ্চয়ই মুসলিম সমাজে বর্ণাশ্রমের অনুপস্থিত।"

ড. সিরাজুল ইসলাম বললেন: "আমাদের, অর্থাৎ বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের যেটা মারাত্মক বৈশিষ্ট্য সে হচ্ছে এই যে, নিজেদের শ্রমের ভিত্তিতে সৃষ্ট কোন সম্পদ বা বিত্তের সঙ্গে আমাদের কোন যোগ নেই। আমরা একটি বাড়ি তৈরি করিনি যার রক্ষণাবেক্ষণে আমাদের মনে মমতার সঞ্চার হবে। বাংলাদেশ স্বাধীন করতে চেয়েছি পাকিস্তানীদের তৈরি বাড়িগুলি দখল করার জন্য এবং স্বাধীন হওয়ার পরে সেগুলি জবরদস্তিতে দখল করেছি। আমরা কোন শিল্পকারখানা নিজেরা তৈরি করিনি: পাকিস্তানিদের তৈরি কারখানা দখল করেছি। আর সে কারণেই জানিনে, নিজেদের পরিশ্রমের পুঁজি দিয়ে কারখানা তৈরি করা কাকে বলে। ওকে রক্ষা করতে তাই আমাদের কোন দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয় না। এ দখলী কারখানাকে আমার নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের অংশ বলে বোধ হয় না। আর তাই এর মালিক বা ম্যানেজার হিসাবে অধিষ্ঠিত হয়ে আমার চিন্তা, একে রক্ষা করা নয়, একে ধ্বংস করা এবং দায়দায়িত্বহীন কালো টাকার মালিক হওয়া। আর এতে আমাদের কোন বিবেকের দংশন নেই। কারণ, আমাদের কোন বিবেক নেই। শুধু শ্রেণী নয়। কোন ব্যক্তির বিবেকও আঘাত-সংঘাত ব্যতিরেকে, সংগ্রামী সংকটের পরীক্ষা ব্যতিরেকে রাতারাতি তৈরি হয় না। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত অতি সহজে মধ্যবিত্ত হয়েছে। সে উচ্চতর শ্রেণী থেকে অর্থনীতিক সংকটে হৃত-সম্পদ-মধ্যবিত্ত নয়; নিম্নতর কোন শ্রেণীর প্রাণান্তক পরিশ্রমের ফল থেকেও সে উদ্ভূত নয়।"

আমি বললাম : কিন্তু এ মধ্যবিত্তের একটা বৈশিষ্ট্য আমার কাছে মঙ্গলকর বলে বোধ হয়েছে। অন্তত এর একটা ইতিবাচক দিক একদিন ছিল। সে হচ্ছে, কৃষকসমাজের সঙ্গে তার যোগ। হিন্দুমধ্যবিত্ত যেখানে বাংলাদেশের বৃহত্তর কৃষকসমাজ থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন, সেখানে মুসলমান সমাজের মধ্যবিত্ত বাংলাদেশের কৃষকের সাক্ষাৎ সন্তান। তার সঙ্গে তার কৃষক বাবা, মামা, চাচা, ফুফা, ভাই ভগ্নিপতির সম্পর্ক এখনো একেবারে ছিন্ন হয়ে যায়নি। বস্তুতঃ বাংলাদেশের কৃষকসমাজের সঙ্গে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত কেরানি, কর্মচারী, রাজনীতিক, আন্দোলনকারী এবং ছাত্রসমাজের নাড়ির যোগ ছিল বলেই মধ্যবিত্ত ছাত্রদের ভাষা আন্দোলন কালক্রমে জাতীয় অর্থাৎ তার বৃহত্তর কৃষকশ্রেণীর আন্দোলনের রূপ পেয়েছিল। অবশ্য এ বৈশিষ্ট্যেরও অপর দিক আছে। কৃষকসমাজের সঙ্গে এর সম্পর্কের এই ঘনিষ্ঠতা এর মানসিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতারও চিহ্ন। তার রাজনীতি এখনো তাই গ্রামীণ দলাদলি, ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং গ্রামীণ প্রশ্রয়-প্রতিশোধের পর্যায় অতিক্রম করে, যাকে বলে আধুনিক বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অর্থনীতিক বিকাশ ভিত্তিক রাজনীতির স্তরে উন্নীত হতে পারেনি।'

আমি সাদকে বললাম : আপনি বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত করে লিখুন। এই কাজটি খুবই জরুরি : বাংলাদেশের শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তের শ্রেণীগত চরিত্রের বর্ণনা, বিশ্লেষণ এবং আলোচনা। আমার লেখাটি এদিক থেকে একটি প্রশ্নের উত্থাপক মাত্র।

একটি মৃতদেহ

২-৮-৭৪

বন্ধুবর অধ্যাপক আবুল কাসেম চৌধুরী সেদিন বলেছিলেন : 'নবাবপুর রাস্তায় একটা লোক মরে পড়ে আছে। না খেতে পেয়ে মারা গেছে।"

রাস্তায় কংকলসার লোকের সারি দেখা যায়। রাস্তার এখানে সেখানে বসে ঝিমুচ্ছে, পয়সা চাচ্ছে, নয়ত অর্ধমৃতের মতো পড়ে আছে। ভোর না হতে বাসার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরজায় আঘাত পড়ে : 'মাগো দুটো ভাত দ্যান।' আমরা দিই নে। আমরা দিতে পারিনে। ক জনকে দেব? কেমন করে দেব? দুশো টাকা চালের মণ। নিত্যপ্রয়োজনীয় সব জিনিসের প্রতিদিন দাম বাড়ছে। হয়ত খুব কম বাসাতেই কিছু দিতে পারে। তবু দুয়ার থেকে দুয়ারে যায়। যদি এক টুকরা বাসি রুটি, এক মুঠো ভাত কিংবা অন্য কিছু মিলে যায়। কিন্তু এ প্রাপ্তির পরিমাণ যথেষ্ট নয়। তার ফলে বেশির ভাগ ভিক্ষুকের দেহ ক্রমান্বয়ে কৃশ ও কংকালসার হয়ে আসছে। তবু আমি নিজে এতদিন অনাহারে মৃত্যু দেখেনি। কিন্তু আজ রিকশা করে গুলিস্তানের দিকে যেতে ডিআইটি বিল্ডিং— যে বিল্ডিংএ টেলিভিশনের স্টুডিও আছে এবং যেখান থেকে রোজ রাতে দেশ-বিদেশের নানান ছবি দেখানো হয়— সেই ডিআইটি বিল্ডিং-এর বাইরের দেয়ালের পাশে সত্যিই দেখলাম, একটা মৃতদেহ পড়ে আছে। একটি প্রৌঢ়ের দেহ। দাঁত কটি বার হয়ে আছে। দৃষ্টি আকাশের দিকে। শুকনা দেহটি চিৎ হয়ে আছে। আমি কাছে যাইনি। কেউ চমকে থেমে যায়নি। গাড়ি ঘোড়ার বেগ কমেনি। হাত কয়েক দূরে ট্রাফিক পুলিশ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে আছে। তবু নির্ঘাত ওখানকার শায়িত দেহটা একটা মৃতদেহ। এটা কোন জীবিত মানুষের দেহ, এটা হতে পারে না। কিন্তু আজ বাংলাদেশে এটা কোন ব্যতিক্রম নয়। কোন অস্বাভাবিকই অস্বাভাবিক বা বিস্ময়কর নয়। কোন মৃত্যুই মৃত্যু নয়। তাই যদিও আমি নিশ্চিত জানি, ঐ লোকটা মরে গেছে, হয়তো আজ নয়, দুদিন থেকে মরে পড়ে আছে, তবু আমি গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়লাম না, কাউকে ডাকলাম না, অপর পাশের ফুটপাত ধরে ধাবমান যাত্রী কেউ থামল না এবং অদূরে ট্রাফিকের পুলিশটির ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে কোন ব্যত্যয় ঘটলো না।

www.amarboi.com

মেয়েটি কাঁদছে

২৯-৯-৭৪

ছোট্ট মেয়ে। সাত আট বছরের। মেয়েটি কাঁদছে। বায়তুল মোকাররমের সামনে আলগা দোকান পসারের মাঝখানে ইফতারির পূর্বক্ষণটাতে। আমার চোখে কান্নারত মেয়েটির দৃশ্য এখনো ভাসছে। আমি গিয়েছিলাম টুকিটাকি কিনতে। মেয়টি কেন কাঁদছে? আজকাল কার কান্নার দিকে কে খেয়াল করে? তবু দেখলাম, কয়েকটি লোক এর সামনে কিছু পয়সা ফেলে দিল। আমার কানে গেল, কে যেন বলছে : বাবা মরে গেছে। কিভাবের মরে গেছে এ প্রশ্ন খোঁজ করিনি। কিন্তু যেটা স্বাভাবিবক, নিশ্চয়ই তাই ঘটেছে। মেয়েটির বাবা কিংবা কোন আপনজন, যার উপর ও নির্ভর করত, সে মারা গেছে। এ এখানকার একেবারে স্বাভাবিক ব্যাপার। আমি আজকাল আর তেমন রাস্তা হাঁটিনে। হাঁটলে মৃতপ্রায় আর মৃত মানুষের সাক্ষাতের তেমন অভাব ঘটে না। মরে গেছে। কাপড় ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে পয়সা চাচ্ছে কাফনের। কিংবা পয়সা চাওয়ারও কেউ নেই। মরে পড়ে আছে। যারা বেঁচে আছে আজো তারা শ'তে শ'তে, হাজারে হাজারে দরজা থেকে দরজায় যেয়ে ধাক্কা মারে : মাগো দুটি ভাত দ্যান। মাগো একটি রুটি দ্যান। কে দেয়? যে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তের দরজায় যেয়ে আঘাত হানছে তার কজনার দান করার ক্ষমতা আছে? কতজনকে তুমি দান করবে? তবু সেই অভাবী মানুষেরা মেয়েটিকে পয়সা দিচ্ছে। কেউ দশ পয়সা। কেউ বিশ পয়সা। কে এক ভদ্রলোক একটি আধুলি দিলেন ওর সামনে। কিন্তু মেয়েটি নির্বিকার। ওর চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। নাক মুখ ভিজে গেছে। মেয়েটি একটি পয়সাও হাতে ধরছে না। যে দশ পয়সাটা ওর ভাঁজ করা হাঁটুর ওপরে পড়েছে সে দশ পয়সাটাও ও সরিয়ে রাখল না : যে আধুলিটা সামনে পড়ে আছে সেটিও সে হাতে তুলে নিল না। এরূপ সাধারণত হয় না। এরূপ সাধারণত দেখা যায় না, এই নির্বিকারত্ব, এমনকি ভ্রুক্ষেপহীনতা। করুণার হাতে ছুঁড়ে দেওয়া দশ পয়সা বিশ পয়সার ওপর একটি বিত্তহীন শিশুর, একটি ক্রন্দনরতা দুঃখীর...

মেয়েটি কাঁদছে। শব্দহীন। কম্পনহীন। ছবিটি আমার চোখে এখনো ভাসছে।...

॥১৯৭৪॥

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুদ্ধিজীবী কে এবং তার ভূমিকা

বছরখানেক আগের কথা। 'পারাপার' নামে একটি সাহিত্যপত্রের সম্পাদক, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগের ছাত্র, নাছোড়বান্দা হয়ে আমার কাছে একটি লেখা চেয়েছিলেন। আমি আমার অক্ষমতার ওপর জোর দেয়াতে তিনি আমার কাজ সহজ করার জন্য বলেছিলেন, আপনাকে পুরো কোন প্রবন্ধ লিখতে হবে না। আমাদের কয়েকটি লিখিত প্রশ্নের লিখিত জবাব দিলেই সেটি আমরা সাক্ষাৎকার হিসাবে ছাপাব। এ রকমে আমরা ইতিপূর্বেও আমাদের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন সাহিত্যিকদের সাক্ষাৎকার ছেপেছি। মোটকথা, এই তরুণ সম্পাদকের তাগিদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যেমন, তেমনি তার প্রচেষ্টাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্য নিয়ে তার পেশ করা কয়েকটি প্রশ্নের আমি জবাব দিয়েছিলাম। কিন্তু সে জবাবের পরে বহুদিন গত হয়েছে। তরুণ এই সম্পাদকের সঙ্গে আর আমার সাক্ষাৎ ঘটেনি এবং তার পত্রিকার প্রকাশিত কোন সংখ্যাও আমি দেখেনি। এমন হতে পারে, আমার জবাব কটি তার পছন্দ হয়নি। তাই তা মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হয়নি। আর অমনোনীত লেখার কথা কোন সম্পাদক বা খাতির করে লেখককে জানাবার কষ্ট স্বীকার করেন? আমারা জবাব কটি তেমন কিছু ছিল না। তা প্রকাশ করার তেমন কোন যুক্তি আছে বলে সম্পাদককে দেওয়ার সময়েও আমি মনে করিনি। তবে সেই নবীন সম্পাদকের তৈরি করা প্রশ্ন কটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন আমার কাছে আমাদের সমাজে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা সম্পর্কে। শুধু প্রশ্ন কটি তুলে দেয়া সঙ্গত হবে না মনে করে আমার জবাবসহ তাঁর প্রশ্ন কটিকে এখানে তুলে দিলাম পাঠকদের নিকট এই অনুরোধ জানিয়ে, আমার জবাবকে খুব গুরুত্ব সহকারে না নিয়ে আমাদের এই তরুণ সম্পাদকদের উত্থাপিত প্রশ্ন' কটি সম্পর্কে যেন তাঁরা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তা করেন।

: আপনার মতে বুদ্ধিজীবী কথাটির অর্থ কি? বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ কাদের নিয়ে গঠিত?

এ প্রশ্নটির জবাব আমিও খোঁজ করছি। বাংলাদেশের ছাত্র, মাস্টার, সাংবাদিক, লেখক, কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার এদের মধ্যে শব্দটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশেষভাবে ব্যবহৃত। কেবল যে সাধারণ শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত তাই নয়। কিছুটা আবেগ সহকারে ব্যবহৃত। 'বুদ্ধিজীবীর বিবেক কী বলে', বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব, শহীদ বুদ্ধিজীবী, বুদ্ধিজীবীর কর্তব্য, এই সঙ্কটে বুদ্ধিজীবীরা কোন পক্ষ নিবেন, আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সংকটাকীর্ণ বাংলাদেশে এরূপ শব্দ বা বাক্যের সঙ্গে আমরা বিশেষভাবে পরিচিত। এরূপ ব্যবহারে বুদ্ধিজীবী কথাটির একটি বিশেষ আবেগমণ্ডিত অর্থ হয়ত বাংলাদেশের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে গেছে। আর সে অর্থ হয়ত এই যে, বুদ্ধিজীবী বলে একদল লোক আছে যারা সকলে সৎ, মহৎ, বিবেকমান এবং সংগ্রামী। যারা এরূপ লোককে লক্ষ্য করে এই সব গুণের আশা করে কথা বলেন তাঁরাই আবার এদের কেউকে পছন্দ না হলে কিংবা এদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত ভূমিকা না পেলে বুদ্ধিজীবীর বিশ্বাসঘাতকতা, বুদ্ধিজীবীর স্বীয় কর্তব্য পালন না করা'– প্রভৃতি অভিযোগেও উদ্দিষ্ট বুদ্ধিজীবীকে অভিযুক্ত করেন।

আমার কাছে বহুদিন যাবৎ ব্যাপারটা ধোঁয়াটে বলে বোধ হয়েছে। উপরে যে সমস্ত প্রচলিত শব্দ বা বাক্যাংশ ব্যবহারের উল্লেখ করা হয়েছে, চিন্তা করে দেখলে সে সমস্ত শব্দ মতামত বা ইচ্ছা-অনিচ্ছা নির্বিশেষে সুনির্দিষ্টভাবে কোন কিছুই বুঝায় না।

কোন শব্দই অবশ্য অনড় নয়। শব্দ অর্থের বাহক। শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়, পুরান শব্দ নতুন অর্থ সংগ্রহ করে। কিন্তু সেটা একটা দীর্ঘকালের প্রক্রিয়ার কথা। সে প্রক্রিয়ার একটি উপাদানা আবার এও যে, কোন বিশেষ সময়ে কোন শব্দের ব্যবহার ও প্রয়োগকে নির্দিষ্ট অর্থবহ করার জন্য আমরা প্রচলিত অভিধান ও বিশ্বকোষ সমূহের উপর নির্ভর করি। অভিধানই আমাদের বলে, শব্দটি কোন অর্থ ধারণ করে। সেদিক থেকে দেখা যাক বুদ্ধিজীবী কথাটির আভিধানিক অর্থ কী?

'বুদ্ধি' কথাটির নির্দিষ্ট অর্থ, মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা, অনুধাবন করা বা বুঝার ক্ষমতা। ইংরেজিতে ইনটেলেক্ট বা ইনটেলিজেন্স এর অর্থ হচ্ছে ফ্যাকালটি অব নোয়িং অ্যান্ড রিজনিং, আনডারস্ট্যানডিং– এটি একটি নির্দিষ্ট অর্থ। এক্ষেত্রে কোন মতান্তর নেই। এবং মানুষ মাত্রেরই এই বুদ্ধি বা ইনটেলেক্ট আছে। তার পরিমাণ ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে কম কিংবা বেশি হতে পারে।

'–জীবী' শব্দাংশকে আমরা সাধারণত অপর একটি শব্দ বা শব্দাংশের পরে বসিয়ে একটি কথা তৈরি করি। সেদিক থেকে জীবী বলতে 'জীবীত বা জীবনযুক্ত বা জীবন ধারণের চেষ্টা' যদি বুঝানো হয় তাহলে কোন কর্ম বা পেশামূলক শব্দের শেষে 'জীবী' যোগ করে আমরা সেই কর্মদ্বারা জীবন ধারণের চেষ্টা বা অবস্থাকে বুঝাতে পারি। এ ভাবে কৃষিজীবী, শ্রমজীবী (দৈহিক শ্রম বিক্রি করে জীবন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারণকারী), ব্যবহারজীবী, ব্যবসায়জীবী, প্রভৃতি কথাগুলির ব্যবহার বোধগম্য। এর দ্বারা এক একটি পেশাকে বুঝানো হয়। এবং এরূপ ব্যবহারে আমাদের চিন্তার পারস্পরিক আদান-প্রদানে কোন অসুবিধা বা দ্ব্যর্থকতার সৃষ্টি হয় না।

কিন্তু ব্যবহারজীবী, আইনজীবী প্রভৃতি কথা বলতে বলতে আমরা বিশেষ করে বাঙ্গালীরা, বুদ্ধিজীবী কথাটারও ব্যবহার এবং প্রচলনের চেষ্টা শুরু করেছি। এবং এ চেষ্টার বেশ কিছুটা বয়সও হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শব্দটি কি সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বুঝাচ্ছে?

শব্দের অর্থ হিসাবে বুদ্ধিজীবী বলতে বুঝাবে বিবেকবান বা সত্যবান ব্যক্তি নয়, বুঝাবে বুদ্ধিদ্বারা যে জীবিকা অর্জন করে বা জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করে তাকে। একটি বাংলা অভিধানে তাই বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে– বুদ্ধিজীবী মানে বুদ্ধিবলে জীবিকা অর্জন করে বা স্বীয় কার্য সাধন করে এমন। কিন্তু সেদিক থেকে আমার প্রশ্ন মানুষ মাত্রই তো বুদ্ধি দ্বারা জীবিকা অর্জন করে বা অর্জন করার চেষ্টা করে। কেননা, জমির চাষ যা যন্ত্র চালনা এবং হিসাবের খাতা লিখন থেকে কবিতা রচনা সর্বক্ষেত্রেই মানুষের বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। কাজেই কেবলমাত্র বুদ্ধি দ্বারা কেউ জীবন ধারণ করে এবং এমন কোন কর্ম বা পেশা আছে যাতে বুদ্ধির আবশ্যক হয় না, এমন কথা বলা যায় না। সে দিক থেকে বুদ্ধিজীবী কথাটি কাল্পনিক। বুদ্ধিজীবী'র কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই।

কার্ল মার্কস সমাজবদ্ধ মানুষের যে অর্থনৈতিক ও সামগ্রিক বিশ্লেষণ দিয়েছেন তাতে তিনি এই অভিমতটি উপস্থিত করেছেন যে, মানুষ মাত্রই তার জীবন ধারণের জন্য পরিবেশ বা প্রকৃতির সঙ্গে আর্থিক বা জীবনধারণের কর্মকাণ্ডে জড়িত। আর্থিক কর্মকাণ্ডকে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। এবং সে হিসাবে যে কোন মানুষ তার সময়ে ক্রিয়াশীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কোন না কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই ভিত্তিতে আমরা আমাদের বর্তমান সমাজের মানুষের কাউকে কৃষক, কাউকে জোতদার, কাউকে শ্রমিক, কাউকে পুঁজিবাদী বা পুঁজির মালিক হিসাবে, এমনকি বিত্তের পরিমাপে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত না নিম্নবিত্ত বলে অভিহিত করি। এরূপ অভিধার প্রধান লক্ষ্য এই যে, কোন মানুষই কোন আর্থিক অবস্থানের উর্ধ্বে নয়। এবং সকলেই মোটামুটি আপন আপন আর্থিক অবস্থানের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। এ দিক থেকে বুদ্ধিজীবী বললে বুদ্ধিকে একটা আর্থিক কর্ম বলে চিহ্নিত করতে হয় এবং বুদ্ধিজীবী দ্বারা একটি বিশেষ আর্থিক শ্রেণী বা অবস্থার লোককে নির্দিষ্ট করতে হবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী হিসাবে বিশেষ কোন পেশার সাক্ষাৎ কি আমরা পাই?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের দেশে অবশ্য স্বেচ্ছামূলক ও ব্যক্তিগত ইচ্ছার ভিত্তিতে কখনো কখনো বুদ্ধিজীবী বলতে বিত্তের দিক থেকে আমরা মধ্যম শ্রেণীর শিক্ষক, অধ্যাপক ও সাংবাদিকদের বুঝাবার চেষ্টা করি। কিন্তু বুদ্ধিজীবীর মধ্যে লেখক হিসাবেও কাউকে নির্দিষ্ট করা, অন্তত আমাদের দেশে চলে না। কারণ কেবল কবিতা প্রবন্ধ গল্প বা উপন্যাস লিখে এবং তাও অন্যের নিযুক্ত কোন কর্মচারী না হয়ে জীবনধারণ করার মতো শ্রেণী বা সম্প্রদায় এখনো আমাদের দেশে তৈরি হয়নি। কাজেই বুদ্ধিজীবী বলতে যদি আমরা কেরানি, শিক্ষক কিংবা সাংবাদিকদের ধরি তাহলেও এ ব্যবহার অপ্রয়োজনীয় ও নিরর্থক। কারণ কেরানিকে কেরানি বলাই শ্রেয়, শিক্ষককে শিক্ষক এবং সাংবাদিককে সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী বলার চেয়ে। কারণ, কেরানি বলতে একটা পেশাকে বুঝায় এবং যিনি কেরানি তিনি তাঁর জীবনের চিন্তাভাবনার আন্দোলনে তাঁর সেই অবস্থানের স্বার্থ দ্বারাই চালিত হবেন। এটাই স্বাভাবিক। শিক্ষক ও সাংবাদিকের ক্ষেত্রেও একথা সত্য।

আমাদের দেশে বুদ্ধিজীবী কথাটির প্রচলিত বিশেষ অর্থের হয়ত একটা ঐতিহাসিক পটভূমি কল্পনা করা যায়। ভারতীয় উপমহাদেশে উনিশ শতকে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে এবং সমাজকে নিজেদের স্বার্থবহ করে পরিবর্তন করার চেষ্টায় এই বিদেশী শাসন যন্ত্রেরই বিভিন্ন স্তরে নিযুক্ত কেরানি কর্মচারিগণের মধ্য থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি বক্তৃতা দানে, প্রবন্ধাদি বা কবিতা, গল্প, উপন্যাস রচনায় বাস্তব অবস্থার উন্নয়কামী এবং বিভিন্ন অবিচারমূলক প্রথা, আচার আচরণ ও বিধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাতে এঁদেরকে প্রধানত বুদ্ধিমান, সাহসী, বিবেকমান, ন্যায়বান ইত্যাদি বলে চিন্তা করা হয়েছে এবং কালক্রমে বুদ্ধিজীবী বলতে যারাই অন্যায় এবং মিথ্যার বিরুদ্ধে ন্যায্য এবং সত্য কথা বলে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। এরূপ একটি ঐতিহাসিক পটভূমির কথা চিন্তা করলেও বুদ্ধিজীবী শব্দটি অর্থহীন। কারণ ব্যক্তি হিসাবে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যে কোন শ্রেণীর যে কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে আসতে পারে, বুদ্ধিজীবী বলে বিশেষ কোন শ্রেণীর পক্ষ থেকে নয়। আবার বুদ্ধিজীবী বলতে একই সময়ে বিভিন্ন পক্ষীয় বিভিন্ন অর্থাৎ পরস্পর বিরোধী অভিমতের লোককেও বুঝাতে পারে। মোট কথা বুদ্ধিজীবী কথাটা বললে একটি ধোঁয়াটে শব্দকে বুঝায়, নির্দিষ্ট অর্থবোধক কোন বাস্তব অস্তিত্ব নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে যে সমস্ত চিকিৎসাজীবী, শিক্ষাজীবী (শিক্ষক) এবং সাংবাদিক প্রতিপক্ষের হাতে নিহত হয়েছেন তাঁদের আমরা শহীদ বুদ্ধিজীবী বলি। কিন্তু আসলে বুদ্ধির কারণে তারা নিহত হননি। নিহত হয়েছেন পক্ষাপক্ষির সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংকটকালে স্বাধীনতা পক্ষীয় অভিমত পোষণ করারই জন্য। আর এই স্বাধীনতা সমর্থন সূচক অভিমত পোষণকারী শহীদদের মধ্যে পেশা হিসাবে কেউ চিকিৎসাজীবী ছিলেন, কেউ শিক্ষাজীবী ছিলেন এবং অযুত মানুষ ছিলেন কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী। অপরদিকে বিপক্ষীয় দলেও বুদ্ধিজীবী ছিল। তারাও এই সকল শ্রেণীতে কমবেশী বিভক্ত ছিল। তার অর্থ, বুদ্ধিজীবী হিসাবে যদি বলি তাহলে দেখি বুদ্ধিজীবীরা কেবল নিহত হননি। বুদ্ধিজীবীরা হত্যাও করেছেন। এক পক্ষীয় বুদ্ধিজীবী অপর পক্ষীয় বুদ্ধিজীবকে হত্যা করেছ। মোটকথা মানুষকে তার অর্থনৈতিক কার্যক্রম বা জীবিকা নির্বাহের নির্দিষ্ট কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতেই অভিহিত করা শ্রেয়। তাতে তার সামগ্রিক ভূমিকার কারণ অকারণের ভিত্তি নির্ণয় করা সহজতর হয়।

বুদ্ধিজীবী কথাটি কেবল যে অস্পষ্ট, তা নয়। এটি অপকারীও বটে। অপকারী বিশেষ করে তাদের জন্য যারা সমাজকে সুনির্দিষ্টভাবে অনুধাবন করে তার অগ্রমুখী রূপান্তরের রূপরেখাটি অনুসরণ করতে চায় এবং সমাজ রূপান্তরের প্রক্রিয়াতেক সাহায্যকারী ভূমিকা রাখার প্রয়াস পায়। এই অপকারের দিক থেকে বুদ্ধিজীবীর মূলে আছে বুদ্ধিবাদ। বুদ্ধিবাদ কথাটিকে নির্ধারিত করে দর্শন কোষে নিম্নোক্ত সংজ্ঞাটি তুলে ধরা হয়েছিল।

"বুদ্ধিবাদ : জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি তার দেহ ও বাস্তব পরিবেশ বিচ্ছিন্ন কোন স্বাধীন শক্তি নয়। বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সম্পর্কের মাধ্যমে ব্যক্তির মানসিক বা বুদ্ধিগত ক্ষমতার জন্ম হয়েছে এবং তার বিকাশ ঘটেছে। বুদ্ধির এই আপেক্ষিক বিচার বা তার দ্বন্দ্বমূলক বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি সর্বযুগে সমান নয়। প্রাচীনকালে মানুষের অসহায় অবস্থায় বুদ্ধি ও বাস্তব অবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক সহজবোধ্য ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে মানুষের বুদ্ধির যত বিকাশ ঘটেছে, তত অনেকের কাছে বুদ্ধি বাস্তব অবস্থা, এমনকি মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা মস্তিষ্ক থেকে বিচ্ছিন্ন বিদেহী ও বিমূর্ত এক শক্তিরূপে প্রতিভাত হয়েছে।..একদিকে বিজ্ঞানের অগ্রগতি অপরদিকে মানুষের সমাজে ধনী ও নির্ধনের আধুনিক শ্রেণী সংগ্রাম বুদ্ধি ও বাস্তবের পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ককে সাধারণভাবে অনস্বীকার্য করে তুললেও বর্তমান কালেও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বুদ্ধিকে স্বাধীন শক্তি হিসাবে অত্যধিক গুরুত্বদানের একটি প্রবণতা দেখা যায়। বুদ্ধিকে মানুষের সমাজ ও ইতিহাস থেকে বিচ্ছন্নভাবে বিবেচনা করার এই প্রবণতাকে বুদ্ধিবাদ বলা চলে।" (দর্শন কোষ, পৃঃ ২৩৬)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই আলোচনার ভিত্তিতে যে প্রশ্নটি নিয়ে আমরা কথা শুরু করেছিলাম, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ কাদের নিয়ে গঠিত, তার জবাবে বলব : বাংলাদেশে শ্রমজীবী আছে, ব্যবহারজীবী আছে, শিক্ষকতাজীবী আছে, কিন্তু বুদ্ধিজীবী বলতে কেউ নেই। বুদ্ধিমান আছে, বুদ্ধিজীবী নেই। এবং এদিক থেকে শ্রমিক কৃষক থেকে শুরু করে সাহিত্যিক পর্যন্ত সকলেই বুদ্ধিমান।

তবে একথা ঠিক, শুধু বাংলাদেশে নয় ধনবাদী সমাজে সর্বত্র এতদিন শ্রমের ক্ষেত্রেও দৈহিক বা কায়িক শ্রম এবং মানসিক শ্রম বলে একটি বিভাগমূলক শব্দ প্রচলিত ছিল। এরও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শ্রমজীবী মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা। ভাবটা এরূপ যেন কায়িক শ্রম অন্ত্যজ এবং মানসিক শ্রম অভিজাত। এ জন্য মানসিক শ্রমের মূল্য বেশি এবং কায়িক শ্রমের কম। কিন্তু সে পার্থক্য দেশ ও সমাজ যত বেশি বিজ্ঞানভিত্তিক হচ্ছে, যত বেশি আধুনিক বৈজ্ঞানিক কারিগরি কৌশল দ্বারা জীবনের প্রতিটি কাজ সম্পাদিত ও পরিচালিত হচ্ছে তত এই কায়িক শ্রম আর মানসিক শ্রমের পার্থক্যও হ্রাস পাচ্ছে। এখন কোন শ্রমকেই আর কেবল কায়িক বলা চলে না এবং এমন কোন শ্রমও নেই যার জন্য কায়িক কোন শ্রমের আদৌ আর আবশ্যক হয় না। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম ঘোষিত লক্ষ্য হচ্ছে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষাকে ক্রমাধিক পরিমাণে সার্বজনীন করার মাধ্যমে কায়িক শ্রম ও মানসিক শ্রমের বৈষম্য দূর করে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা যেখানে শ্রমের ক্ষেত্রে উঁচু-নীচু অর্থাৎ কোনটি স্থূল, দৈহিক, হেয় এবং কোনটি সূক্ষ্ম মানসিক, অভিজাত এরূপ কোন পার্থক্য থাকবে না। সমাজতান্ত্রিক সমাজতে তাই সকলেই যথার্থরূপে বুদ্ধিজীবী বলে বিবেচিত হবে, বিশেষ কেউ নয়।

: বাংলাদেশের শ্রমজীবীদের সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে কি স্বাভাবিক? যদি স্বাভাবিক না হয় তাহলে এই সম্পর্ক কিভাবে স্বাভাবিক করা সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?

: আমাদের সমাজ ব্যবস্থার সামগ্রিক রূপটি অস্বাভাবিক এবং তার মধ্যে শ্রমজীবীদের সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কও অস্বাভাবিক। বুদ্ধিজীবী কথাটিকে আমরা অর্থাৎ লেখাপড়া জানা ডিগ্রিধারী মধ্য ও উচ্চ পর্যায়ের অফিসার, সাহিত্যিক সাংবাদিক আমরা সবাই সম্মানজনক শ্লাঘামূলক একটি পদবি বা ভূষণ বলে গণ্য করি। তাই কেউ যদি আমাকে বুদ্ধিজীবী বলে অভিহিত করে তবে আমার মতো একজন শিক্ষক বেশ গর্বিত বোধ করে। এতে তার নিজের মধ্যে বেশ একটা অহামিকা বোধের সৃষ্টি হয়। সে নিজেকে অপর সকলের থেকে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশেষ করে অজ্ঞ শ্রমিক– কৃষক এক কথায় শ্রমজীবী মানুষ থেকে পৃথক বলে বিবেচনা করে। শ্রমজীবী মানুষ থেকে এই পার্থক্য ও দূরত্বকেই সে তার শিক্ষা আর জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে সচেতন ও অচেতনভাবে অর্জন করে। তাই আমাদের দেশে যে ব্যক্তি যত উঁচু পর্যায়ের শিক্ষিত সে ব্যক্তি তত বেশি শ্রমিক ও কৃষক অর্থাৎ যারা শ্রমের বিনিময়ে জীবনধারণ করে তাদের কাছ থেকে নিজেকে অধিক দূরত্বে অবস্থিত বলে গণ্য করে। আমরা শিক্ষা অর্জন করি শ্রমকে সকল সৃষ্টির মূল হিসাবে বিবেচনা করার জন্য নয়, সকল শ্রমকে সম্মান করার জন্য নয়। আমরা শিক্ষালাভ করি, যে শ্রমে মাথার ঘাম পায়ে পড়ে দেহকে স্বেদসিক্ত করে তাকে ঘৃণ্য মনে করতে। তাই শিক্ষার শুরুতে আমরা কেউ যদি বা মাটির কাছাকাছি থাকি, কেউ যদি হালের লাঙ্গল হাতে সবল পেশির কৃষকের সন্তান হই তবে যত বেশি প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক থেকে কলেজে আর কলেজে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হই ততবেশী আমার কৃষক পিতাকে অস্মরণীয় মনে করতে থাকি। যতবেশী শিক্ষিত হই ততবেশী হাতের শক্তিতে কাজ করা এবং পায়ের শক্তিতে হাঁটাকে আমরা অস্বাভাবিক বলে গণ্য করতে থাকি। এ কারণেই এক পুরুষ আগের কৃষকের যে সন্তান লেখাপড়া শিখে আজ দেশের শাসক শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে সে যদি এক মাইল পথ হেঁটে গ্রামে-গঞ্জে সেই কৃষকের সঙ্গে মোলাকাতে যায় তবে সেটি আধুনিক বিশ্বের অত্যাশ্চর্য এক ঘটনা হিসেবে সংবাদপত্রে সচিত্র সংবাদ হয়ে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয় : প্রেসিডেন্ট বা মন্ত্রী সাহেব আজ এক মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করেছেন! শ্রম ও শ্রমজীবী মানুষকে এমন হীনতার চোখে দেখাই হচ্ছে আমাদের সমাজের বুদ্ধিজীবীদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য–সে বুদ্ধিজীবী আমি শাসক কিংবা অশাসক যাই যাই না কেন।

সমাজকে স্বাভাবিক না করে শ্রমজীবীর শ্রমের শোষণে বুদ্ধিজীবী তথা অপর সকল পরগাছার যেখানে প্রতিপালন সেখানে সমাজ রূপান্তর ব্যতীত মানুষে মানুষে সম্পর্কের স্বাভাবিকতা আশা করা যায় না। তবু এই সমাজের যে শিক্ষিত ব্যক্তি বিবেকবান তাকে বর্তমান সমাজের অস্বাভাবিকতা সম্পর্ক সচেতন হতে হবে এবং নতুন সঙ্গতিপূর্ণ সমাজের এই মূল প্রত্যয়ে প্রত্যয় হতে হবে যে, বুদ্ধিজীবী বলে ভিন্নতর কোন শ্রেণী নেই। সকলেই শ্রমজীবী ও শ্রমই হচ্ছে সৃষ্টির মূল। শ্রমজীবীতে শ্রমজীবীতে বিভেদ ও পার্থক্য সৃষ্টি করার বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার স্থূলসূক্ষ্ম নানা প্রচেষ্টা ও প্রয়াসের মূল উদঘাটনের সচেতন চেষ্টা এবং শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের সাথে একাত্ম হওয়ার কার্যকর পদক্ষেপের মাধ্যমেই এমন সচেতন শিক্ষিত ব্যক্তিকে বুদ্ধিজীবীর কৃত্রিম ব্যবধানকে অতিক্রম করে শ্রমজীবী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের নিকটবর্তী হতে হবে। এটিও একটি প্রক্রিয়ার প্রশ্ন, সংগ্রামী প্রক্রিয়া। এর সচেতন পরিচর্যার মাধ্যমেই সমাজ রূপানত এর প্রবহমান ধারায় বেগ সঞ্চারিত হবে এবং এর পরিচর্যাতেই শ্রমজীবীর সঙ্গে তথাকথিক বুদ্ধিজীবীরও সম্পর্কে অস্বাভাবিকতা বিদূরিত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

: বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের সাধারণ প্রবণতা কী? এক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম কি আপনি লক্ষ্য করেছেন? যদি লক্ষ্য করে থাকনে, তাহলে তা কী?

: বুদ্ধিজীবী বলতে যদি আমরা মধ্যবিত্ত কেরানি কর্মচারী শিক্ষক সাংবাদিককে বুঝি তাহলে এদের সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে দোদ্যুলমানতা। এই অংশের একজন হিসাবে বলতে পারি, আমরা একদিকে যেমন আমাদের আর্থিক অবস্থার নাজুকতা এবং লেখাপড়াগত জ্ঞান দ্বারা এই সমাজ ব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্যতা কিছুটা বুঝতে পারি, তেমনি যেহেতু আমরা এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই আনুষঙ্গিক উপকরণ, সেকারণে এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনকে আমরা কল্পনা করতে পারিনে। তাই সমাজে রূপান্তরের কথা মুখে বললেও আমাদের সমগ্র সত্তা দিয়ে আমরা তার কামনা করিনে এবং শ্রমজীবী মানুষের সাথে শর্তহীনভাবে নিজেদের ভাগ্যকে জড়িত করতে পারিনে। এই সমাজের আমরাও ব্যক্তিগতভাবেও সুবিধাজনক থেকে অধিকতর সুবিধাজনক অবস্থাতে উন্নীত হতে চাই। আবার এই ক্ষয়গ্রস্ত সমাজের সামগ্রিক ক্ষয়ের গতিতে নিজেদের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত দেখে আতঙ্কিত হই। এই দোদুল্যমানতার ব্যতিক্রমী চরিত্র আপেক্ষিকভাবে শান্ত বা সমাজের কম সংকটজনক অবস্থাতে বিরল। কিন্তু সমাজের সংকট যখন ক্রান্তিকালে উপস্থিত হয় শ্রমজীবী জনতা যখন কাতারে কাতারে সংগ্রামের ময়দানে হাজির হয়, তখন তাদের অমিত দোদুল্যমান. মধ্যবিত্ত আমরাও উজ্জীবিত হই। অপর সময়ে যে সিদ্ধান্ত বা আত্মত্যাগের যে দৃষ্টান্ত আমরা স্থাপন করতে পারিনে, এই ক্রান্তিকালে, অবস্থার সামগ্রিক কারণে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। তারই দৃষ্টান্ত হিসাবে ৫২ সালের এবং '৭১ সালের মধ্যবিত্ত ছাত্র শিক্ষক সাংবাদিক চিকিৎসকদের আত্মদানের কাহিনী আমাদের উদ্দীপিত করে।

: অনেকের মতে বুদ্ধিজীবী সমাজের ভূমিকার উপরই বাংলাদেশের সামাজিক উত্থান-পতন নির্ভরশীল। এ সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

: তথাকতিক বুদ্ধিজীবীর উপর কিংবা মধ্যবিত্ত শিক্ষিতের উপর নয়, বাংলাদেশের সামাজিক রূপান্তর নির্ভর করে শ্রমজীবী অর্থাৎ কলে কারখানায় এবং ক্ষেতে খামারে কর্মরত শ্রমজীবী শ্রেণীর আর্থিক ও মানসিক বিকাশর উপর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রমজীবী মানুষেরা যত অধিক পরিমাণে শ্রমজীবী চরিত্র অর্জন করবে যত অধিক সে সংগঠিত এবং নিজেদের অনিবার্য ভূমিকা ও শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবে ততো অধিক বাংলাদেশের সামাজিক রূপান্তর সংগঠিত হতে থাকবে। শিক্ষিত বিশেষ করে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত ছাত্র শিক্ষক কেরানি কর্মচারী সাংবাদিক সাহিত্যিকদের মধ্যকার অগ্রগামী অংশের কর্তব্য হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষেরই অর্থের বিনিময়ে আহৃত তাদের জাতীয় আন্তর্জাতিক তথ্য, তত্ত্ব এবং ইতিহাসের বিকাশ ও গতির জ্ঞান দ্বারা সমাজের ভবিষ্যৎকে অবলোকন করা, মানুষের ভবিষ্যতে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সংগ্রামে, সংগঠনে, আলোচনায়, ভাষায়, সাহিত্যে সংগ্রামী মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানো এবং সংগ্রামী মানুষের তেজ ও চেতনা দ্বারা যেমন নিজেদের বিশ্বাস ও চেতনাকে দৃঢ়তর করা, তেমনি নিজেদের জ্ঞান দ্বারা সংগ্রামী শ্রমজীবীর চেতনাকেও উন্নত করার চেষ্টা করা। বুদ্ধিজীবীর উপর সমাজের উত্থান পতন নির্ভর করে, মধ্যবিত্ত ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারী সাংবাদিক সাহিত্যককে এই প্রবঞ্চনামূলক আত্মম্ভরিতা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে।

: বাংলাদশের বুদ্ধিজীবী সমাজের ভিতরকার বিভিন্ন বিরোধ এবং তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের অভ্যন্তরে কোন আদর্শগত বিরোধ আপনি লক্ষ্য করেছেন কি? লক্ষ্য করে থাকলে তার বৈশিষ্ট্য কী?

: বাংলাদেশের অন্যতম সমাজ অর্থাৎ মুসলমান সমাজের বুদ্ধিজীবী তথা মধ্যবিত্ত নিজের অস্তিত্বের জন্ম এবং বিকাশকে সাধারণত ১৯৪৭ সাল থেকে গণ্য করে থাকে। এদের সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে এর অধিক পূর্বে না যাওয়া। এটা এদের সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা এবং এর উপর সাম্প্রদায়িক আদর্শগত তত্ত্বের প্রভাবের চিহ্ন। কিন্তু এই সীমাবদ্ধ পর্যায়েও বাংলাদেশের ঢমুসলমান সমাজের মধ্যে শ্রেণীবিন্যাসের বেশ পরিমাণ রূপান্তর ঘটেছে। ১৯৪৭ সনে মুসলমান সমাজে যে পুঁজিভিত্তিক শ্রেণী ছিল না, আজ ঐতিহাসিক নানা কারণে তার উদ্ভব ঘটেছে। এর চরিত্রগত দুর্বলতা ও বৈশিষ্ট্য অবশ্য বিশ্লেষণের দাবি রাখে। ১৯৪৭ সনে মুসলমান মধ্যবিত্ত সংখ্যায়, শক্তিতে ও চরিত্রে যা ছিল এই পর্যায়ের মধ্য দিয়ে তারও পরিবর্তন ঘটেছে। ক্ষেতের কৃষকের সঙ্গে অর্থাৎ জমির সঙ্গে এই মধ্যবিত্তের যোগ ১৯৪৭ এর সময়ে যত ঘনিষ্ঠ ছিল, সে যোগ আজ তত ঘনিষ্ঠ নেই। ৪৭ এর মধ্যবিত্তের অধিকাংশ যদি কৃষকের ঘর থেকে এসে থাকে, তবে আজ মধ্যবিত্তের অর্থাৎ কিংবা তারও অধিক অবশ্যই পুরুষানুক্রমে মধ্যবিত্ত। অর্থাৎ মধ্যবিত্তের সন্তান মধ্যবিত্ত। শিক্ষত মধ্যবিত্তের সন্তান শিক্ষিত ছাত্র শিক্ষক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্মচারী। কৃষক ও শ্রমজীবী অপরাপর মানুষ থেকে ভিন্ন এই মধ্যবিত্তের একটা নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থ দাঁড়িয়ে গেছে যে, স্বার্থকে চেতন অবচেতনভাবে রক্ষার জন্য শ্রেণী হিসাবে জনতার স্বার্থের বিপক্ষে যেতেও তাদের অনেক সময়ে সঙ্কোচ হয় না। এই মধ্যবিত্ত থেকেই শাসক। এবং শাসক ও মধ্যবিত্তের ঐক্যবদ্ধ হাতেই রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব এবং সমাজের রূপান্তরের প্রতিরোধ চেষ্টায় সে যন্ত্রের ব্যবহার। এ কারণে বুদ্ধিজীবী বলতে আজ আর কোন একটি আদর্শের অনুসারী ব্যক্তিকে বুঝায় না। এই 'বুদ্ধিজীবী'র মধ্যেই রয়েছে শ্রমজীবী অর্থাৎ ব্যাপকতর মানুষের সংগ্রামের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য শত্রু এবং এই বুদ্ধিজীবীর মধ্যেই রয়েছে শ্রমজীবীর সুহৃদ, মিত্র। এই উভয় অংশের স্বার্থ এবং চিন্তাগত বিরোধই নানা আবরণে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীর চিন্তাজগতকে আকীর্ণ করে আছে।

শ্রমজীবী সংগ্রামী মানুষের সুহৃদকে এই বিরোধের মধ্যে সচেতনভাবে শ্রমজীবী জনতার পক্ষ অবলম্বনের চেষ্টায় সতত নিরত থাকতে হবে।

॥১৯৮১॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূহের কিশতি

৮ সেপ্টেম্বর '৮৮ : আমার এ রচনা নূহের কিশতির উপরে বসে রচিত। নূহের কিশতির তলদেশে ফুটো ছিল কি? থাকলে আর জোড়ায় জোড়ায় জীব আর জীবনের নমুনা টিকে থাকত না। কিন্তু আমার কিশতির তলায় আর ডাইনে বাঁয়ে ফুটো। একজন অনুগতকে সংগ্রহ করেছি। সে কিশতির পানি মিনিট ধরে কেবল সেঁচে চলেছে। একটি ঘরের দুই দরজায় জেদী, অবুঝ বড় ছেলের দাবীতে ইটের পরে ইট গেঁথে বাঁধ দেওয়া হয়েছে। এক এঞ্চি করে পানি যত বেড়েছে, তার সে বাঁধ তত উঁচু হয়েছে। এখন সে মেঝে থেকে তিনফুট তো বটেই। ঘরের বাইরে উঠানে পানির উচ্চতা প্রায় পাঁচফুট। উঠান পেরিয়ে রাস্তায় উঠতে হলে তার উচ্চতা আরো বেশি। রিকশার বাচ্চারা ডাকে : 'পানি পার', 'পানি পার'। এই রাস্তার পাশের বাসাগুলো থেকে লোকদের বড় রাস্তায় উঠিয়ে দেবে। কয়েকশ গজের দূরত্ব। ভাড়া ট্রিপ বা জনপ্রতি পাঁচ টাকা। তবু এতে ওদের কিছু হয়।

আমার কিশতিকে আমি বলি এক মাল্লার ফুটো কিশতি। এক মাল্লা তথা এক মাঝি। সে আমি। মাঝে মাঝে একেবারে অসহায় বোধ হয়। আমার সংসারের বাক্স-পেটারা, আলমারী, জিনিসপত্র সব ডুবে গেছে। আমার বই এর আলমারীর এ তাক, ও তাক থেকে বই সরাবার উপায় থাকে নি। কোথায় সরাব? কেমন করে সরাব? কেবল ভেবেছি, সেই ১ তারিখ থেকে : পানি আর বাড়বে না, পানি আর বাড়বে না। কিন্তু উত্তর থেকে নেমে আসা পানির চাপে মধুবাগের বিলের পানি উল্টো ধাক্কা দিয়েছিল আমাদের বাসার নিষ্কাষণী ড্রেনগুলোতে প্রায় দশদিন আগে। যে ড্রেন দিয়ে আমার ধোয়ামোছার পানি বেশ স্বচ্ছন্দে চলে যেত রাস্তার ড্রেনে, এবং রাস্তার মাটির নীচে ড্রেন সে পানি নিয়ে ফেলত মধুবাগের বিলের সাথে সংযুক্ত বড় ম্যানহোলের ড্রেনে, সে ড্রেন আট দিন আগেই উল্টো পানির চাপে ফুসে উঠে নীচের পানি রাস্তায় এবং আশ-পাশের বাসায় উগড়ে দিচ্ছিল।

আলামত খারাপ ছিল। কিন্তু তার পরিমাণ কি, কতদিনে তার চরম এবং শেষ, তা বুঝার উপায় কি? আর তা থাকলেই আমার মত অসহায় ব্যক্তি তার স্ত্রী, পুত্রসহ বাসার আসবাবপত্র মাথায় করে কোথায় গিয়ে উঠব? কেমন করে উঠব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধানমণ্ডী বা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার বহুতলের দালানে বাস করা লোক নই আমি। নিম্নাঞ্চলীয় এলাকায় কোন রকমে নীচু জমিতে আধা-কাঁচা একটি টিনের ঘর করে তাতে স্ত্রী-পুত্রদের উঠিয়ে এনেছিলাম বছরখানেক আগে। ভেবেছিলাম, বাৎসরিক সাধারণ বন্যার ধকল কোন রকমে সামলানো যাবে। দু'একদিনের ব্যাপার হবে। খাট আর আলমারীর নীচে দু'একখানা ইটের গোঁজ দিয়েই বাঁচা যাবে। কিন্তু সে কল্পনা আমার অবাস্তব এবং অনভিজ্ঞতার কল্পনা।

কিন্তু আমি কল্পনাই বা আর কত করতে পারি? আটচল্লিশ বছরের উপর ঢাকায় আছি। বন্যা আগেও হয়েছে। কিন্তু এমন উচ্চতায় তার পানির ঢল পৌঁছেনি কখনো। এবং এত দীর্ঘস্থায়ীও হয়নি। এখন বুঝতে পারছি, আগামীতে এবারের উচ্চতাও ছাড়িয়ে যাবে।

আমি এরশাদ সাহেবের দোষ দিইনে। টেলিভিশনে আর দৈনিক কাগজে প্রচারিত তাঁর ছবি দেখে বুঝতে পারি; তিনি খুব পরিশ্রম করছেন। হেলিকপটার নিয়ে দেশের এখান, ওখান সবখানে যাচ্ছেন। শুকনো জায়গা পেলেই নামছেন। কিন্তু শুকনো জায়গা পাচ্ছেনই নাকি খুব কম। রাস্তা বা বাঁধের ওপর আশ্রয় নেওয়া মানুষকে কেবল বলছেন : 'তাওক্কালাল্লাহু : আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখুন। আল্লাহর উপর বিশ্বাস থাকলে এ দুর্যোগ আর বিপর্যয়ের মোকাবেলায় আমরা অবশ্যই কামিয়াব হব।'

তিনি আর কি বলতে পারেন? রাজনৈতিক দলগুলোও তাঁকে দোষারোপ করে গণতান্ত্রিক সরকারের দাবীর পুনরুক্তি ছাড়া আর কি করতে পারে? তাই তারা করছে।

কথাটা নিয়ে চারদিকের জনসমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত জ্ঞানের দ্বীপ ঢাকা ইউনিভারসিটির চূড়ায় আরোহণ করে আমরা শিক্ষকরা বিমর্ষভাবে আলাপ করছিলাম। এক সহযোগী বলছিলেন : 'ড্রেজিং বাদে যেখানে কোন বিকল্প নাই, সেখানে সেই ড্রেজিং এর মহাপরিকল্পনার কথা কোন কালের কোন সরকারই করল না।' অপর একজন বললেন : 'একি মুখের কথা! আর একি এই অঞ্চলের কোন একটি রাষ্ট্র বা সরকারের ব্যাপার? এ জন্য এ অঞ্চলের ভারত-নেপাল-বাংলাদেশ : সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার আবশ্যক। সম্মিলিত পরিকল্পনার প্রয়োজন।' আর একজন বললেন : 'তেমন পরিকল্পনা কেমন করে হবে? নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্বের প্রয়োজনে একে অপরকে অহরহ অভিযুক্ত করব, নিজের ব্যক্তিত্ব রচনায় অপরকে হেয় করব এবং আবার এক টেবিলে বসে যথার্থই এই এলাকার সকল রাষ্ট্রের সকল মানুষের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্ব সহকারে পরিকল্পনা করব এবং রাষ্ট্রের কৃত্রিম সীমানা উপেক্ষা করে এক মহাপরিকল্পনা কার্যকর করব : এমন চিন্তাই তো অবাস্তব।'

এ কথার তো কোন জবাব নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূগোল প্রাকৃতিক। রাষ্ট্র কৃত্রিম। হিমালয়ের পাদদেশ এবং হিমালয় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তারিত জনপদ : তার নদ–নদী, খাল-বিল প্রাকৃতিক। কিন্তু সেই নদ-নদীকে আমার গঙ্গা, আমার পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র নাম দিয়ে, তার এপাড় থেকে ওপাড় যাওয়াকে নিষিদ্ধ করে আবেগের ভিত্তিতে রাষ্ট্র তৈরি করা কেবল যে কৃত্রিম, তাই নয়। মানুষের এই কৃত্রিম আচরণে, বন উজার করা থেকে আরম্ভ করে, অপরের তোয়াক্কা না করে নিজের জমিতে বাঁধ দেওয়া, সে বাঁধে পানি আটকানো আর ছেড়ে দেওয়া ইত্যাদিতে এটা স্পষ্ট হচ্ছে যে, অপ্রাকৃতিক এই অবস্থা তার সর্বমোট প্রতিক্রিয়ায় এই অঞ্চলের জনজীবনে বছর থেকে বছরে সৃষ্টি করছে অকল্পনীয় বিপর্যয়। হাজার হাজার মানুষ মরছে। লক্ষ লক্ষ ঘরবাড়ি ধসে যাচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে। বছর থেকে বছরে এই প্রক্রিয়ার বেগ এবং বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। গভীরতর হচ্ছে। মানুষের কৃত আচরণের এই ফলাফল নিয়ে মানুষ রাজনীতি করছে। চূড়ার নেতা মনে করছে : হাজার মানুষ মরলেও আমি তো মরছিনে। কিন্তু তার ব্যক্তিগত বাঁচাকে অতিক্রম করে একদিন, এই অবস্থা চলতে থাকলে, এই অঞ্চলের সমগ্র জনপদ যে বিপুলভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, সে অনুমান আজ আর অকল্পনীয় নয়। কিন্তু এমন সাধারণ তথা বৃহৎ সত্যের উপলব্ধি সাধারণভাবে ভারত-নেপাল-বাংলাদেশ : রাষ্ট্রসমূহের বর্তমান কিংবা আগামীর কোন নেতৃত্বের মধ্যে যে গুরুতর ভাবে আসবে, সে আশা অকল্পনীয়।

কিন্তু এসব বড় কথা থাক। নিজের ফুটো কিশতির কথা বলি।

ফুটো কিশতির পানি সেঁচে কি কিশতি বাঁচানো যায়? আমি জানি, তা যায় না। পাশের দুটো ঘর একেবারে ডুবে গেছে। কিন্তু বড় ছেলের জিদ, তার ঘর বাঁচাতে হবে। দরজার মুখ সে বন্ধ করেছে। কেন পানি আটকাবে না? কিন্তু আমার দুর্বল কাঠামোর বাড়ির মেঝে আর দেওয়াল ভেদ করে এখন পানি ঢুকছে। সে পানি সেঁচে আমি কুলাব কি করে? তবু অনুগত কাজের লোকটিকে বারবার তাগাদা দিই : 'বাবা, ফেল, পানি ফেলে একটু বাঁচিয়ে রাখো।'

তবে মনে একটু সান্ত্বনা এই যে, রাত দুটো কিংবা তিনটাতেও শুনতে পাই, আশ-পাশের ডুবন্ত বাড়ির নীচতলা থেকে আমার ঘরের মতোই পানি সেঁচার শব্দ।

সেপ্টেম্বর '৮৮-এর এক তারিখ থেকে সাত তারিখ পর্যন্ত পানি রোজই বেড়েছে। রেডিও আর টিভি বলেছে ৭ তারিখ থেকে বুড়িগঙ্গা আর শীতলক্ষ্যার পানি কিছুটা হ্রাস পেতে শুরু করেছে। সে কথা শুনে ইতোমধ্যেই নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত– আমার মনেও কিছুটা ভরসার উদ্রেক হয়। কারণ ভয় হচ্ছিল, কোন্ উঁচুতে পানি উঠবে, তার হদিস কি?

কিন্তু আমার এই মগবাজার-মধুবাগ-নয়াটোলা এলাকার নীচু জমির বাড়িঘরের পানি হ্রাস পাওয়ার লক্ষণ এখনো পরিষ্কার নয়। বরঞ্চ পানিতে ডোবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম্যানহোলের একেবারে অন্তর থেকে এবার কয়লার খনির চাইতেও কালো গাঁদ বেরিয়ে আসছে। যে-পানির রং এতদিন কিছুটা পরিষ্কার বা সবুজে ছিল, সে পানির রং এখন একেবারে নিকষ কালো এবং তার দুর্গন্ধ বর্ণনার উর্দ্ধে। এর মধ্যেই নিজের 'চালে' বসে নিজের ঘরকে পাহারা দিচ্ছি। আগে কোন যায়গাতে দাগ টানতে না টানতে সাপের পিচ্ছিল দেহের গতিতে সে দাগ মুছে গিয়ে পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন, কাল থেকে, চিহ্ন দেবার চেষ্টা করছি, কোন্ দাগ থেকে পানি কতটুকু হ্রাস পাচ্ছে, তা পরিমাপ করার। দেয়াল যুৎসই কোন যায়গা পাচ্ছিনে যার দিকে দিনেরাতে চোখ রাখতে পারি। অবশেষে দেখলাম, পানির হ্রাস-বৃদ্ধি মাপতে হয়তো সামনের দেয়ালে এক যায়গায় আস্তরের রেখায় ভেসে ওঠা অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্বের ঐ কোন্টা ধরেই মাপা দরকার। ওখানেই চোখ রাখি। দেখি, ওখান, থেকে পানির পরিমাণ দক্ষিণ তথা নীচের দিকে কতটা সময়ে কি পরিমাণ হ্রাস পায়।

কিন্তু এই হ্রাসের পরিমাণ যে বৃদ্ধির মত দ্রুত নয়, তা বুঝতে পারি। তাই দিনরাত মনের উদ্বেগ আর প্রশ্ন : কবে, কতদিনে দেখা যাবে তীর, পাওয়া যাবে শুকনো মাটিতে পা রাখার একটু স্থান। নূহের কিশতি কতদিনে ভিড়েছিল তীরে?

এর মধ্যেই আবার আশঙ্কা : রাহাজানি, ছিনতাই-এর। কি সমাজ আমাদের! কি তার ব্যবস্থাপনা! এতদিন খবরের কাগজেই দেখেছি, দুই চারটি ঘটনার কথা।

আজ ইউনিভরাসিটির কমন রুমে আনিসের (অধ্যাপক আনিসুজ্জামান) কাছ থেকে পলাশী বাজারের পথে তাঁর স্ত্রীর হাত থেকে সকাল ন'টায় বালা আর আংটি ছিনিয়ে নেবার খবরে একেবারে মর্মাহত হলাম।

আনিস আগে বললেন, তিনি আমার বাসায় যাবার চেষ্টা করেছিলেন। সেই কথা। তাঁর সেই খবরে আমি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হলাম। আত্মীয়জনদের মধ্যে তেমন কেউই তো আমার ডুবে যাওয়া বাড়ির দোরগোড়ায় যাওয়ার চেষ্টা করে নি। তাদের দোষ দেওয়া যায় না। এমন চেষ্টা করা সহজ নয়। মগবাজার-মধুবাগের পথে একাধিক জায়গায় হাঁটুর উপরে পানি। তারপরে যে গলিতে আমার বাসা সেখানে পানির পরিমানে রিকশার পাদানি ডুবে যায়। তবু এর মধ্যে আনিছ গিয়েছিলেন আমার অবস্থা জানতে। আমি আগে সে খবর পাই নি। আজ সেকথা বলতেই মাত্র বুঝলাম।

কিন্তু তারপরে নিজের অবস্থার কথা বলতে গিয়ে বললেন : তাঁর স্ত্রী সকাল ন'টায় নীলক্ষেতের বাসা থেকে পলাশী বাজারে যাচ্ছিলেন বাজার করতে। পথে ব্রিটিশ কাউনসিলের কোণায় কয়েকটি যুবক তাঁর রিকশা থামিয়ে ছোরা আর পিস্তল উঁচিয়ে হাতের বালা আর আঙ্গুলের আংটি ছিনিয়ে নিয়েছে। পথের মানুষ দাঁড়িয়ে দেখেছে। কেউ কিছু করতে পারে নি। ডাকাতি হয়েছে তাঁর আর এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মীয়ের বাড়িতেও। সামাজিক-রাষ্ট্রীক অবস্থার কি নিদারুণ পরিচয়-বাহক সব ঘটনা। কোন প্রতিরোধ নাই। কারুর যেন কোন উপায় নাই, আত্মধ্বংসী এরূপ নীতি, ঘটনা, দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে সক্রিয় অবস্থান গ্রহণ করার। সরকার থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দলসমূহ পর্যন্ত সকলেই যেন ভবিতব্যের সামনে অসহায়। ভবিতব্য এই বন্যা। ভবিতব্য সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্ত প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করার এবং ধ্বংস হওয়ার প্রক্রিয়া। ভবিতব্য শেখ মুজিবুরের হত্যা। ভবিতব্য জিয়াউর রহমানের নিহত হওয়া। ভবিতব্য জেনারেল এরশাদের প্রেসিডেন্ট হওয়া। ভবিতব্য তাঁর উজ্জীবনী গান সচিত্রভাবে টেলিভিশনে প্রচারিত হওয়া। ভবিতব্য একমাত্র সেই গান দ্বারা আমাদের উজ্জীবীত হওয়ার চেষ্টা করা। এবং ভবিতব্য আমরা যে-অসহায় শিক্ষক : আমাদের সন্তানদের মস্তান হয়ে যাওয়া। সকাল ন'টায় রাস্তার উপরে মায়ের হাত থেকে ছুরি হাতে সন্তানের দ্বারা বালা আর আংটি ছিনতাই হওয়া। এবং চারপাশের মানুষের তাকিয়ে থেকে তাই দেখা।...

তবু নূহের কিশতি তীর একদিন নিশ্চয়ই পাবে। শান্তির পায়রা কিশতি থেকে উড়ে গিয়ে দূর দিগন্ত থেকে ফিরে এসে অভয় বাণী শোনাবে। ক্ষতি, মাশুল তো কত ঘটবে : আমার এবং আনিসের এবং কত আত্মজন, বন্ধুজনের। কত জন্ম এবং জনপদ ধ্বংস হবে। তবু অদম্য আশা নিয়ে মানুষকে এই অনুভূতিকে লালন করতে হবে; মানুষই প্রকৃতির সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কের ভিতরে উপর মানুষের সমাজ-সভ্যতাকে তৈরি করেছে। মানুষের নির্বুদ্ধিতায় বারংবার তার ধ্বংসও ঘটেছে। তবু আবার ধ্বংসের মধ্যদিয়ে মানুষের সুবিবেচনা, সততা আর বিবেক মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছে। দাঁড়িয়েছে। মোকাবেলা করেছে অসতের, অন্ধকারের। যদি মানুষের ভবিতব্য কিছু থাকে তবে সে তার এই অনিবার জীবনাভিযানের উঠতি-পড়তির ভবিতব্য। চরম পরাজয়ের ভবিতব্য নয়।... পুনশ্চ: আজ রাতের টেলিভিশনের খবর : ত্রাণ শিবিরে দুটি শিশুর জন্ম হয়েছে। একটি কোন জননীর কন্যা অপরটি কোন জননীর পুত্র। শিশুদের পিতা-মাতা সকৃতজ্ঞভাবে একটির নাম রেখেছে প্রেসিডেন্ট এরশাদের শিশুকালের ডাকনাম : 'পেয়ারা'। অপর কন্যা সন্তানটির নাম রাখা হয়েছে 'ফার্স্ট লেডী' বেগম এরশাদের শিশুকালের ডাক নাম, 'ডেইজী'।

খবর শুনতে শুনতে আমি ভাবি : শিশু দুটির কি ভাগ্য!

৮-৯-৮৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ প্রসঙ্গে

"সমাজতন্ত্র : সমাজভুক্ত সকল ব্যক্তির হিতার্থে
(ভূমি ও কলকারখানা প্রভৃতি) উৎপাদনের
সহায়ক সমস্ত কিছুই রাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত হওয়া
উচিত : এই মতবাদমূলক শাসনব্যবস্থা,
Socialism".
–সংসদ বাঙ্গালা অভিধান

যার কোন বিকল্প নাই, সে কারুর কাছে ভাল কিংবা মন্দ, যা বলেই বিবেচিত হোক না কেন, তাকে মিথ্যা প্রমাণের চেষ্টায় অহেতুক পরিশ্রমেরই ব্যয়। এর অপর কোন সার্থকতা নেই।

অবশ্য, অনিবার্যকে নিবারণ করার চেষ্টা করে তারা, যারা সেই অনিবার্যের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্বকে বিপন্ন দেখে। যারা সেই অনিবার্যকে নিজেদের জীবনের ও সংগ্রামের পরিণাম হিসেবে দেখে তারা তাকে নিবারণের চাইতে স্বাগত জানাতে চায়।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই হেগেলের এরূপ উক্তিকে অনুধাবন করার চেষ্টা করা যায় যে, 'বুদ্ধিমানরা ইতিহাসের সঙ্গে যায়, নির্বোধকে ইতিহাস টেনে নেয়।'

সমাজতন্ত্র কাকে বলে?

নানান জনের নানান ব্যাখ্যা। কিন্তু ব্যাখ্যার পূর্বে মূলকে মানতে হবে। সমাজই মূল। সমাজ থেকে সমাজতন্ত্র।

সমাজতন্ত্রের নানা ব্যাখ্যা হতে পারে এবং হবে : রাষ্ট্রীয়করণ, বিরাষ্ট্রকরণ, যৌথ করণ, অযৌথ করণ, ব্যক্তিগত মালিকানা : তার পরিমাণ ও সীমা; নিয়ন্ত্রণহীন বাজার, নিয়ন্ত্রিত বাজার ইত্যাদি। দেশ ও কাল নির্বিশেষে এর কোন অপরিবর্তনীয় সংজ্ঞা বা ধার্যকৃত চরিত্র থাকতে পারে না। কিন্তু কাল থেকে কালে, আর দেশ থেকে দেশে এই সর্ব সমস্যা ও তার বিভিন্ন সমাধান– প্রচেষ্টা 'সমাজতন্ত্রের' অনিবার্যতাকে নাকচ করতে পারে না।

প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিত এ্যারিসটটল বলেছেন : 'মানুষের রাষ্ট্রের আসল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, মানুষের রাষ্ট্র হচ্ছে মানুষের সমবায়ে সংগঠিত একটি সংস্থা।'

এই সমবায় ব্যবস্থা চার হাজার বছর পূর্বে কিরূপ ছিল তার গবেষণা মার্কস-এঙ্গেলস্‌ও শেষ করেন নি। তাঁরা বলেছেন : 'মানুষের ইতিহাস যতটুকু আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেনেছি, 'তার লিখিত ইতিহাস', তাতে অনুমান করি 'আদিতে' মানুষকে বাধ্যতামূলকভাবেই সমবায়গত জীবন যাপন করতে হয়েছে। সেটা কোন আদর্শ অবস্থা নয়। তা ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু মূল যেটা, তথা মানুষের সমাজ, তার ক্রমান্বয়ে অধিক পরিমাণে সমবায়ী হওয়ার লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া ছাড়া উপায়ন্তর নাই।

এবং সে কারণেই তাঁরা বলেছেন, মানুষের শেষহীন অভিযাত্রায় মানুষকে ক্রমাধিক পরিমাণে সমবায়ী সমাজ তৈরি করতে হবে। এই স্বপ্ন মানুষকে দেখতে হবে। এই স্বপ্নই তার চালকশক্তি। এই অভিযাত্রায় তার হাজার উঠতি-পড়তি, অগ্রগমন-পশ্চাৎ-হটা ঘটবে। তবু মানুষ এগিয়ে যাবে।

সাম্যবাদের দৃষ্টান্তের জন্য আমাদের দূর ভবিষ্যতের অপেক্ষা করতে হয় না। গরীব-ধনী প্রত্যেকটি পরিবারই সাম্যবাদী নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত পরিবার। ছোট-বড়, মা-বাবা, ভাই-বোন, অক্ষম-সক্ষম : সকলকে নিয়ে যে-পরিবার সে পরিবারের নীতি হচ্ছে : from each according to his capacity. to each according to his necessity : প্রত্যেকের নিকট থেকে তার ক্ষমতামত গ্রহণ এবং প্রত্যেককে তার প্রয়োজনমত প্রদান।

মার্কস-এঙ্গেলস স্বপ্ন দেখেছিলেন : পারিবারিক এই সাম্যবাদী নীতি একদিন সমগ্র মানবসমাজে পরিব্যপ্ত হয়ে পড়বে। সমগ্র মানবসমাজই একটি পরিবারে পরিণত হবে যে-মনুষ্য পরিবারের পরিচালনার স্বাভাবিক নীতি হবে : প্রত্যেকের নিকট থেকে তার ক্ষমতানুযায়ী এবং প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী।

আজ পরিবারের মধ্যে যে-নীতি সার্বজনীনভাবে স্বাভাবিক বলে গৃহীত কিন্তু মনুষ্য সমাজের বিকাশের অসম্পূর্ণতার কারণে যে-নীতি অস্বাভাবিক বলে বিবেচিত, সে নীতি মানুষ্য সমাজের সম্পদ ও শক্তির বিপুল বিকাশে সেদিন পরিবারের ন্যায়ই সার্বজনীনভাবে স্বাভাবিক বলে গৃহীত হবে।

এর চাইতে মহৎ স্বপ্ন আর কি হতে পারে? মার্কস-এঙ্গেলস আমাদের এই স্বপ্নের যুক্তিকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ করেছেন। মার্কস এবং এঙ্গেলস্-এর নিকট আমরা তাই ঋণী।

মানুষের ভবিষ্যতের সেই দিন কবে? মার্কস যদি সেই দিন সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন, আর সে ভবিষ্যদ্বাণী যদি বাস্তবে সত্য না হয়েও থাকে, তবু মনুষ্য সমাজের সামনে যে স্বপ্নকে তাঁরা তুলে ধরেছেন, সে স্বপ্নের মৃত্যু নাই।

স্বপ্নের সেই দিন কবে? আমি বলব 'ত্রিশ হাজার বছর' পরে মানুষের জীবনে সেই দিন প্রায় আসন্ন হয়ে আসবে যে-দিন মানুষের সমাজ অদ্যকার চাইতে অধিকতরভাবে বুঝতে সক্ষম হবে যে, সাম্যবাদের কোন বিকল্প নাই। আদিম সাম্যবাদ যদি, প্রাকৃতিকভাবে অচেতন এবং বাধ্যতামূলক ছিল তো ভবিষ্যতের সাম্যবাদ হবে মানুষের যৌথ এবং সচেতন স্বেচ্ছামূলক জীবনাচরণেরই প্রকাশ।

এ হচ্ছে দূরের কথা। দূর-দৃষ্টির কথা। নিকটে অবশ্য অনেক দ্বন্দ্ব, অনেক ব্যাখ্যা, অনেক রাশিয়ার পতন-উত্থান, অনেক রিগান-বুশের যাওয়া এবং আসা;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক হাঁ এবং না। জোয়ার এবং ভাটা। এই দ্বন্দ্ব, উত্থানপতন, হাঁ ও না'র বৈচিত্র্যও সমাজের দ্বন্দ্বমূলক রূপান্তরের তত্ত্বের সত্যতারাই সাক্ষ্য বহন করে, তার শূন্যতার নয়।

সমাজের দ্বন্দ্বমূলক রূপান্তরের তত্ত্বকে যারা আজ মিথ্যা বলে নাকচ করার চেষ্টা করছে তারা তাদের সেই চেষ্টার মাধ্যমেই দ্বন্দ্বমূলক রূপান্তরের তত্ত্বকে সত্য বলে প্রমাণিত করছে। মার্কসবাদ বলে যদি কিছু থাকে তবে মার্কসবাদের বিরুদ্ধতাও মার্কসবাদের অঙ্গীভূত। পক্ষ-বিপক্ষের মধ্যদিয়েই মার্কসবাদ বিকশিত হয়ে এসেছে।

মার্কসবাদের পক্ষ-বিপক্ষের দ্বন্দ্ব বর্তমানে যেরূপ দেশে দেশে ব্যাপ্ত ও বিস্তারিত, ইতিহাসে এমনটি আর কখনো হয়নি। সেদিক থেকে বর্তমানের বিশ্বব্যাপী এই তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব মার্কসবাদের সবলতারই পরিচায়ক। দুর্বলতার নয়।

আজকের পৃথিবী ক্ষুদ্র বটে। আবার বিচিত্ররূপে বৃহৎও বটে। রাশিয়ার ব্যাপার যেমন রাশিরার ব্যাপার, তেমনি আমাদেরও ব্যাপার। আমেরিকার ব্যাপার যেমন আমেরিকার ব্যাপার, তেমনি আমাদেরও ব্যাপার। এবং বাংলাদেশের ব্যাপার যেমন বাংলাদেশের, তেমনি পৃথিবীরও। আবার এও সত্য যে, রাশিয়ার ব্যাপার আমাদের ব্যাপার হলেও, রাশিয়ার কোন সরকার বা ব্যবস্থা ডুবলে বা আদর্শগতভাবে ব্যর্থ হলে আমাদেরও ডুবতে হবে কিংবা আদর্শগতভাবে ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হতে হবে, এমন কোন স্বতঃসিদ্ধ কথা নেই।

স্টালিন ব্যক্তি হিসাবে ভাল কি মন্দ, হৃদয়হীন কিংবা হৃদয়বান, ইতিহাসের সামগ্রিক বিচারে সেটি বড় কথা নয়। মানুষ মাত্রই 'হ্যাঁ' এবং 'না' দিয়ে তৈরি। যারা মৃত স্টালিনকে এক কবর থেকে তুলে আর এক কবরে সমাধিস্থ করাকেই তাদের দৈনন্দিন কর্ম-কাণ্ড, চিন্তাভাবনার একমাত্র নিয়ামক করে তোলে, তারাই স্টালিনকে অতিমানুষে পর্যবসিত করে। তার শক্তিকে অনস্বীকার্য করে তোলে। লেনিনের গলায় যারা দড়ি লাগিয়ে টানে তারাও লেনিনের শক্তিকে স্বীকারই করে। অস্বীকার নয়। টেলিভিশনের ছবিটি আমি বিপরীতভাবে দেখেছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল, লেনিন তাঁর ধ্বংসকারীর গলায় দড়ি লাগিয়ে টানছে। রাশিয়ার সাম্প্রতিক বিস্ফোরণের বর্বরতাকে যারা 'জনতার' রোষ বলে আখ্যায়িত করছে, তারা একথা বিস্মৃত হয় যে, মহতের বিরুদ্ধে বর্বরের বর্বরতা মহতের মহত্ত্ব এবং বৃহত্ত্বকে হ্রাস করতে পারে না। নিজের হ্রস্বতাকেই কেবল সে প্রকট করতে পারে। তাই লেনিনকে যারা টেনে নামায় তাদের মুখে জ্ঞানের কোন কথা কিংবা মনুষ্য জীবনের মহৎ ভবিষ্যতের কোন কথা উচ্চারিত হয় না। এটাই স্বাভাবিক।

১৮-৯-৯১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গণতন্ত্র এবং সহনশীলতা

কোন একটি ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্র-কাঠামোর বিকাশ ও বিবর্তন অশেষ কৌতূহল এবং তাৎপর্যের বিষয়। ভূখণ্ড প্রাকৃতিক। ভৌগোলিক। রাষ্ট্রীয় কাঠামো সেদিক থেকে কৃত্রিম তথা মানবিক। রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভাঙ্গনে ও গড়নে মানুষই প্রধান ভূমিকা পালন করে। অবশ্য মানুষের সেই কর্মকাণ্ডের উপরও ভৌগোলিক জলবায়ু, ভূমির গঠন ইত্যাদিরও প্রভাব অনস্বীকার্য। আবার মানুষের কর্মকাণ্ড বললেও সে কমকাণ্ডের অন্তর্গত রক্ত, রং, ভাষা, সংস্কার, বিশ্বাস ইত্যাদি উপাদানগুলির জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কালক্রমে এক অতিমানবিক শক্তিতে পরিণত হয়ে তাকে প্রাকৃতিক শক্তিতে পর্যবসিত করে একটা রাষ্ট্রের মানুষকে তার কৃপার পাত্র করেও তুলতে পারে।

ভারতীয় উপমহাদেশের আধুনিক ইতিহাসের নবতর একটা পর্যায়ের সূচনা ঘটেছে ১৯৪৭ সালের মধ্যভাগে। আনুষ্ঠানিকভাবে ইংরেজ শাসনের অবসানে এবং ভারতে অবিভক্ত রাষ্ট্রের বদলে দুটি রাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়ে।

পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশ ভারতের দুই প্রান্তে অবস্থিত দুটি ভূখণ্ড নিয়ে গঠিত পাকিস্তানের পূর্বাংশে অবস্থিত ছিল। পাকিস্তানের মূল দুর্বলতা ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র তৈরি করার দাবীতে যতো না ছিল, তার অধিক ছিল রাষ্ট্র কাকে বলে, এই মূল প্রশ্নটিতে দৃষ্টিদানের প্রজ্ঞার অভাব। অবশ্য রাষ্ট্র কাকে বলে, এ কথাটিও আপেক্ষিক। এখনও রাষ্ট্র বলতেই নদী-নালা, পাহাড়-পর্বতের মত নির্দিষ্ট এমন কিছু বুঝায় না যার বৈশিষ্ট্য এবং চরিত্র সম্পর্কে একের সঙ্গে অপরের দ্বিমতের কোন অবকাশ থাকে না।

'রাষ্ট্র', 'গণতন্ত্র', 'স্বৈরতন্ত্র' এবং এরূপ রাজনৈতিক পরিভাষার বহু শব্দই যে কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে পক্ষে-বিপক্ষে বিভক্ত মানুষের মধ্যে দড়ি টানাটানি, রক্তারক্তি ইত্যাদির নিমিত্ত। নিমিত্ত বললেও এরা মানুষের সামাজিক-রাষ্ট্রীয় জীবনে পরিহার্য নয়। মানুষের রাষ্ট্রীয় জীবনের বিকাশে এই শব্দগুলি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং দাঁড়াচ্ছে। নিত্যদিন আমরা এদের ব্যবহার করি। 'ক' যদি একভাবে এর কোন একটি বা একাধিকের ব্যাখ্যা করে, 'খ' তবে তার বিপরীত বা ভিন্নতর ব্যাখ্যা দেয়। ব্যাখ্যা দেয় ঠাণ্ডা মাথায় নয়। উত্তেজনা সহকারে। কারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পক্ষ-বিপক্ষের যারা মাতব্বর বা প্রধান তাদের মাতব্ববী বা প্রাধান্যের ভিত্তি হিসাবে এগুলিকে তারা দেখে। আর তাই 'গণতন্ত্র' কেবল শব্দে সীমাবদ্ধ থাকে না। 'গণতন্ত্র' একটা ব্যবস্থাতে রূপান্তরিত হয়। 'স্বৈরতন্ত্র'ও একের কাছে বর্জনীয়, নিন্দনীয়। অপরের কাছে সে আদৌ স্বৈরতন্ত্র নয়। সে উত্তম এবং অপরিহার্য শাসনব্যবস্থা। অবশ্য 'গণতন্ত্র' আজকাল প্রশংসামূলক শব্দ এবং 'স্বৈরতন্ত্র' নিন্দামূলক শব্দ বলে বিবেচিত। ফলে কোন 'স্বৈরতন্ত্রী' সরকারই নিজেকে স্বৈরতন্ত্রী বলে আখ্যায়িত করে না।

ইতিহাসের এমন পাঠের কৌতুকজনক বিষয়টি মনে হয় এই যে, 'গণতন্ত্র' শব্দটি ভাষা নির্বিশেষে পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় জীবন মাত্রেই যে কোন যুগে কোন না কোন ভাবে যেমন পরিচিত শব্দ থেকেছে, তেমনি তার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিতর্কও উত্থাপিত হয়েছে।

গণ থেকে যখন গণতন্ত্র, 'ডিমস' থেকে 'ডিমক্রাসি', তখন কালে কালে পৃথিবীর মানুষের মধ্যে সকলেরই শাসন করার অধিকার আছে, এ বোধ যত বৃদ্ধি পেয়েছে, তত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

প্লেটো, এ্যারিসটটল সেই প্রাচীন নগর-রাষ্ট্র এথেন্সের রাজনৈতিক জীবনে গণতন্ত্রের যে বিশ্লেষণ করেছেন এবং তার বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন, তা থেকে বুঝা যায়, গণতন্ত্র সেকালের রাষ্ট্রীয় জীবনেও এক পরিচিত শাসনব্যবস্থা হিসাবে বিদ্যমান ছিল।

'রিপাবলিক' গ্রন্থের মধ্যে প্লেটোর দেওয়া গণতন্ত্রের বিশ্লেষণ ও যুক্তি যথার্থই দূরগামী ও শক্তিশালী।

কিন্তু তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র যদি প্রতিষ্ঠিতও হয় তবু সে যে এক ঘণ্টার অধিক দু ঘণ্টা স্থায়ী হবে না, সে বিষয়ে প্লেটো খুবই বাস্তববাদী ছিলেন।

মানুষ কেবল স্বর্ণ দিয়ে তৈরি নয়। তার মধ্যে তাম্র ও পিতলও আছে। কতিপয় শাসক যদি স্বর্ণ দিয়েও তৈরি হয়, তবু সে স্বর্ণের নিখাদ থাকার সম্ভাবনা কম। কারণ স্বর্ণময় মানুষ আসলে মানুষ তো। তার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার তো থাকবে। তা যদি থাকে তবে একের স্ত্রীর সঙ্গে অপরের স্ত্রীর খুনসুটি শুরু হওয়া পরিচয়ের পরে ঘণ্টা আধেকের ব্যাপার বই তো নয়। একথা প্লেটো বুঝতেন। তাই অনতিবিলম্বে শুরু হয়ে যাবে 'আদর্শ রাষ্ট্রের শাসকদের মধ্যে প্রথমেই সম্মান বা মাতব্বরীর কমবেশির লড়াই। সেই লড়াই থেকে আসবে ধনসম্পদের লড়াই। কারণ, ক্ষমতার মূল তো ধনসম্পদ। ধন সম্পদের লড়াই কেবল সম্পদবানদের অন্তর্দ্বন্দ্বেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। সংখ্যাগুরু নির্ধনেরা শিকারীর চোখ নিয়ে তাদের শাসকদের পর্যবেক্ষণ করে। তাদের মনে অনুরণিত হতে থাকবে চিরায়ত এই ধ্বনি : 'তোমরা খাবে, আমরা খাবো না : তা হবে না, তা হবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্লেটো বলেন, গণের যুক্তি বিদ্যা বা বিত্তের যুক্তি নয়। গণের যুক্তি সংখ্যার। তাদেরও দুপা আছে তারা সংখ্যায় অধিক। এই তাদের যুক্তি।

প্লেটো গণের লোক ছিলেন না। তিনি ছিলেন অভিজাত। কিন্তু এথেন্সের গণ তথা অ-দাস শ্রেণীর গণরা অভিজাতদের চাইতে সংখ্যায় অধিক। সে সত্য এবং তার শক্তিকে প্লেটো উপেক্ষা করেন নি। অভিজাততন্ত্র বা কতিপয়ের তন্ত্র অনিবার্যভাবে সংখ্যার শক্তি দ্বারা উৎপাটিত হবে। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের পর্যায়ক্রমিক বিচ্যুতির বিশ্লেষণে এ সত্যটি বেরিয়ে আসে। সেকালে অবস্থাতে যেটা বিস্ময়কর তা হচ্ছে এই যে, তবু অভিজাত প্লেটো গণতন্ত্রকে উত্তম বলে মনে না করলেও, তিনি তাকে সর্বাধম বলে গণ্য করেন নি। সেই অধমেরও অধম হচ্ছে স্বৈরতন্ত্র বা এক শক্তিমানের শাসন। কেমন করে সেই স্বৈরশাসন গণতান্ত্রিক নৈরাজ্যের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়ায় এবং গণকে হত্যা করতে শুরু করে, সে বর্ণনা বাংলাদেশের মানুষের জন্য অশেষভাবে শিক্ষণীয়।

কিন্তু এখানে গণতন্ত্র সম্পর্কে প্লেটোর সমালোচনার কথাই বলছি : "গণতন্ত্রে কারো কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যার শাসন করার গুণ আছে, সে শাসন করতে বাধ্য নয়।... যে অপরাধী সে দণ্ডিত নয়। যে দণ্ডিত, সে অপরাধী নয়। স্বচ্ছন্দে সে ঘুরে বেড়ায়। বলা চলে এ এক অবাধ 'স্বাধীনতার' রাজত্ব। এখানকার পশুরাও অপর কোন রাজত্ব থেকে অধিক স্বাধীন।... মোটকথা, তুমি বলতে পার, এ হচ্ছে এক অদ্ভুত রকমের অরাজক ব্যবস্থা, যেখানে বৈচিত্র্যের অভাব নেই, আর যেখানে সমান এবং অসমান– সকলেই সমান।" [রিপাবলিক : ৮ম পুস্তক– ৫৫৮]

এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি, গণতন্ত্র যেমন অনিবার্য, তেমনি আদিকালের ব্যাপার। সবকালে সর্বত্র লড়াইটা বর্তমানের মত ছিল না বটে। কিন্তু জ্ঞাত এবং লিখিত মানবেতিহাসের যে কোন পর্যায়েই সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগুরুর শক্তির বিরোধ বিদ্যমান ছিল। কোথাও প্রচ্ছন্ন। কোথাও বেশ পরিমাণে প্রকাশ্য।

ইতিহাসের সে প্রসঙ্গে বাদ দিয়ে আধুনিক বাংলাদেশের গণতন্ত্রের মুহূর্তটিতে আসা যাক।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের গণতন্ত্রের ইতিহাসটিও কৌতূহল এবং শিক্ষাজনক।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নানা অপদানকে আমরা জানি। তার বিশ্লেষণ আমরা করি। কিন্তু ইচ্ছাকৃত না হলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনিচ্ছাকৃত অবদানও কিছু ছিল। রেলগাড়ি আর টেলিগ্রাফের লাইন যেমন তার একটি অনিচ্ছাকৃত অবদান, তেমনি আর একটি অনিচ্ছাকৃত অবদান হচ্ছে ব্রিটিশ 'গণতান্ত্রিক'– সাম্রাজ্যবাদের পার্লামেন্ট, রাজনৈতিক দল, দলীয় শাসন ইত্যাদির সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতবর্ষের মানুষ, বিশেষ করে তার আর্থিকভাবে অবস্থিত উপরতলার মানুষের পরিচয় ঘটানো। সে পরিচয়ের সূত্র ধরেই ভারতবর্ষে, 'সুযোগ', 'সুবিধা', 'অধিকার', 'স্বাধিকার' এবং 'স্বাধীনতার আন্দোলন বিকশিত হয়েছিল। এই আন্দোলনে বিভিন্নভাবে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ জড়িত হয়েছিল। পূর্ববাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের উপরও সেই আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল। তার নিজস্ব সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশের প্রাধান্যের বিশেষ প্রভাব গোড়াতে মুসলিম-সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক আন্দোলনে থাকলেও, কালক্রমে এই সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরেও শ্রেণীগত পরিবর্তন যে সংঘটিত হতে থাকে এবং নীচের মানুষ ও তাদের মুখপাত্ররা উপরতলায় উঠে আসতে চেষ্টা করে, সেই বৈশিষ্ট্যটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এবং সে কারণে সাম্প্রতিকতম বাংলাদেশের গোড়াতে গণতন্ত্রের সংসদীয় কাঠামো সাংবিধানিকভাবে গৃহীত হওয়ার ব্যাপারটি ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু '৭২ সালের অনতিকাল পরে শাসকদল এবং তার নেতা সেই সংসদীয় কাঠামো বদল করে তাকে একদলীয় এবং প্রেসিডেন্টীয় পদ্ধতিতে পরিবর্তন করলেন।

ইতিহাসের এই পর্যায়টি এখনো আলোচিত হচ্ছে। এবং তার ঔচিত্য-অনৌচিত্যের বিশ্লেষণ এখনো শেষ হয় নি। তথাপি সাম্প্রতিকতম ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলি এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত শ্রেণীগুলি নানা ঘটনা এবং আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সংসদীয় কাঠামোতে আবার প্রত্যাবর্তনও করেছে।

গণতন্ত্রের প্রশ্নে একটি সংসদীয় কাঠামো তৈরি করা যদি কেন্দ্রীয় কিংবা একমাত্র ব্যাপার হয়, তাহলে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের মূল প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেছে, একথা বলা যায়। কিন্তু গণতন্ত্র বলতে কেবল সংসদীয় কাঠামো বুঝাবে, এমন কোন কথা নেই। কাঠামোগতভাবে প্রেসিডেন্ট-পদ্ধতির ব্যবস্থাও গণতান্ত্রিক বলে অভিহিত হতে পারে।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের কৌতুকজনক একটি ঘটনা হল, একদিকে শেখ মুজিবুর রহমানকে যেখানে সংসদীয় পদ্ধতি বাতিল করে প্রেসিডেন্ট-পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য অপরাধী করা হয়, সেখানে অপরদিকে শেখ মুজিবুর রহমানের পরবর্তী সকল সামরিক-বেসামরিক শক্তিমানরা সেই প্রেসিডেন্ট-পদ্ধতিকে বহাল রাখতে বুদ্ধিগত যুক্তির চাইতে দেহগত তথা সামরিক যুক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে কসুর করেন নি। সে যা হোক, সামরিক সরকার এবং সামরিক নেতার হাত থেকে শক্তির কেন্দ্র তথা সরকারকে মুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে সংগঠিত ও বিকশিত আন্দোলনই সংসদীয় কাঠামোকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই বলে একটি নির্বাচনের অনুষ্ঠান করে (হোক সে বিশ্বাসযোগ্য, গ্রহণযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক একটি সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত) একটি সংসদ গঠন করে, সেই সংসদের নিয়ম মাফিক অধিবেশন আহ্বান করে, তাতে হাল্কা-গুরু পরিহাসের বিনিময় করে, সদস্যদের মাহিনা-ভাতা বৃদ্ধি করে গণতন্ত্রের খেলা খেললেই গণতন্ত্র স্থাপিত হয়ে যায় না। এটা তত্ত্বের কথা নয়। এটা বাংলাদেশের বাস্তব অভিজ্ঞতা।

এই খেলার প্রয়োজনকে অস্বীকার করার কথা নয়। কিন্তু যেকোন খেলার জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে খেলোয়াড়, দর্শক, নির্বাচক, সালিস : সকল মহলেরই একটা খেলোয়াড়ী মনোভাব থাকা। পরস্পরের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক মনোভাব নয়। খেলার মনোভাব। আক্রমণের মনোভাব এবং তার প্রকাশ আর কিছু না করুক, খেলাটাকেই পণ্ড করে দেয়। হরহামেশা আমাদের ফুটবল খেলা পণ্ড হওয়া থেকেই তা আমরা বুঝতে পারি।

গণতন্ত্র একটি বিধিবদ্ধ খেলাই বটে। এবং এর মূল ভিত্তি হচ্ছে সহনশীলতা।

গণতন্ত্রের ভিত্তি যে সহনশীলতা তা ব্যাখ্যা করে বুঝানোর উপায় নেই। জীবনের কতগুলি মৌলিক সত্য আছে যাকে শব্দের পেছনে শব্দ গেঁথে প্রমাণ করা যায় না। এর একমাত্র পাল্টা প্রশ্ন : যদি সহনশীলতা গণতন্ত্রের ভিত্তি না হয়, তাহলে তুমি এর প্রতিপক্ষ, প্রমাণ কর যে, অসহনশীলতাই হচ্ছে এর ভিত্তি। সেই অসহনশীলতার চর্চা আমরা এখন প্রতিমুহূর্তে প্রত্যক্ষ করছি। অসহনশীলভাবেই একে অপরের অসহনশীলতার বিরুদ্ধে তপ্তবাক্য উচ্চারণ করছি। কেবল তপ্ত বাক্য নয়। তপ্ত রক্ত আমরা পাত করছি। কিন্তু সমস্যার কোন সমাধান হচ্ছে না। আমরা যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরেই থাকছি।

AMARBOI.COM

সুন্দর সুন্দর বাক্যের ওস্তাদ ছিলেন, জাঁ জ্যাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮ খ্রি.) আমি বাঙ্গাল তাকে পুরো জানিনে। তবু যেটুকু জানতে পেরেছি তাতে মধ্যবিত্তের সন্তান এই মধ্যবিত্ত ভবঘুরে রুশোকে আমার নিকট-আত্মীয় বলেই বোধ হয়। হবস-লক বেনথাম : এঁদেরকে সমীহ করতে হয়। কিন্তু রুশোকে যেন ভালবাসা যায়। তাঁকে ভালবাসতে ইচ্ছা হয়।

যে-বাক্য আর শব্দেই তিনি বলুন না কেন, যখন সেই প্রাক-ফরাসি বিপ্লবের যুগে তিনি 'মানুষ' শব্দের সামনে সমান চিহ্ন (=) দিয়ে লিখেছিলেন 'স্বাধীনতা', তথা ব্যক্তির স্বাধীনতা, তখন তিনি গণতন্ত্রের কথাই বলেছিলেন। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে, ব্যক্তির উপর আরোপিত দাসত্বের বিরুদ্ধে এমন আবেগপূর্ণ সংগ্রামীর সাক্ষাৎ সমগ্র চিন্তার ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি নেই। আজ তাঁর কথার অন্তর্গত সত্যকে সামনে এনে আমরা বলতে পারি : গণতন্ত্র=সহনশীলতা। সহনশীলতা বাদে গণতন্ত্র হয় না। এবং গণতন্ত্র বাদে সহনশীলতার দৃষ্টান্ত নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে এই ঢাকারই বিধ্বস্ত জগন্নাথ হলের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সেদিনকার সেই '৫৮ সালের জাতীয় সংসদের অধিবেশনটির দৃশ্য ভেসে উঠছে। সেদিন কি আমি পূর্ববঙ্গ তথা সেদিনকার পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সংসদের অধিবেশন কক্ষের অন্তত : দর্শকের গ্যালারীতে সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত ছিলাম? হয়ত নয়? তবু কাছাকাছি তো ছিলাম। সেদিনকার জাতীয় সংসদের একজন সামান্য সদস্য হিসাবে তার সম্পর্কে আগ্রহের আমার অভাব ছিল না। কি ভয়ানক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

গণতন্ত্রের খেলায় একের উপর অপরের ঝাঁপিয়ে পড়ার ঘটনা। শব্দযন্ত্রের দণ্ডের উৎপাটন আর ভারী পেপারওয়েটের গোল্লার ছোড়াছুড়ি। আর সেই মজার খেলার পেপারওয়েট পড়বি তো পড়, একেবারে আম্পায়ারের মাথায়? এবং তাতে তাঁর মৃত্যু। হয়ত রেফারীর বিরুদ্ধে মিথ্যা পেনাল্টির অভিযোগ ছিল। থাকতে পারে। হয়ত কুচক্রীর প্ররোচনা ছিল। থাকতে পারে। কিন্তু সে কুচক্রীও তো খেলারই একটি অংশ। রাষ্ট্রেরই মানুষ। এবং প্ররোচিত কুশীলররা এই খেলারই এপক্ষ, ওপক্ষ। আহা! কি সে দৃশ্য! সাবালকদের কি নাবালকী বুঝ এবং আচরণ!

সেই এক ঘটনা। সেই এক দৃশ্য। পাকিস্তান পর্যায়ের বলে, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আচার-আচরণের ইতিহাসের বাইরের ব্যাপার নয়। এই কথাটা আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। ইতিহাসের সত্যকে বিস্মৃত হয়ে মহৎ ইতিহাস তৈরি করা যায় না।

এ আলোচনার কোন শেষ নেই। এবং এর কোন বিকল্পও নেই।

আমার রুশোর কথা বলি। রুশোর বিরুদ্ধে তাঁর এক বান্ধবীর অভিযোগ ছিল : তুমি বড় বেশি উল্টো পাল্টা কথা বল। রুশো বলেছিলেন : আমি সত্যকে মান্য করি। উল্টোপাল্টাকে স্বীকার করি। সত্য যদি উল্টো-পাল্টা হয় তাহলে উল্টোপাল্টা বলা ছাড়া আমার উপায় কি? তুমি এতোটা বুঝবে না।

যথার্থই সত্য উল্টোপাল্টা। সত্য সোজা নয়। সত্য তো টাকা। কাগজের টাকা হলেও টাকা। টাকার দুপিঠ। তার এক পিঠে কলাগাছ, তো আর এক পিঠে মসজিদ। দুটো নিয়েই সে। এক চোটে দুটোকে দেখা যায় না। সে মানুষের বাহ্য দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা। কিন্তু অন্তদৃষ্টিতে তো এপিঠ ওপিঠ : দু পিঠকেই একই সময়ে দেখা চাই।

শেষ কথায় রুশো আমাদের প্রায় ঘাবড়ে দেন। গণতন্ত্র অনিবার্য, অপরিহার্য। গণতন্ত্র বাদে গণের আর কি আরাধ্য হতে পারে? তবু সে ডুমুরের ফুল। 'ইফ মেন ওয়েআর গডস, দেয়ার কুড বি ডিমোক্রাসি' : মানুষ দেবতা হলেই মাত্র গণতন্ত্র সম্ভব হত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুশো দেবতা খুব মানতেন, এমন ইতিহাস নেই। আর দেবতারা তেমন নিষ্পাপ কিছু নন। এটা একটা কথার কথা। তবু কথাটার নিহিতার্থ এই যে, গণতন্ত্র হচ্ছে আত্মশাসন। আর আত্মশাসন তথা স্বশাসনের মতো কঠিন শাসনও আর নেই। এর কোন বিকল্প নেই। এটা কারুর দান নয়। নিজের সৃষ্টি। গণতন্ত্র কেউ কাউকে দান করতে পারে না। গণতান্ত্রিক হয়েই মাত্র গণতন্ত্রকে অর্জন করতে হয়। অগণতান্ত্রিক হয়ে নয়। এর কোন সহজ প্রাপ্তিও নেই। আর এমন কোন দিনক্ষণ, মুহূর্ত নেই যখন বালখিল্য আচরণ, অসহনশীলতা, মূর্খতা ও দূরদৃষ্টিহীন আচরণ দ্বারা গণতন্ত্রকে অর্জন করা যায়।

এমন কথায় আমাদের হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। রুশোর কথা সত্য। কোন দেশেই গণতন্ত্র স্থাপিত হয় নি। কারণ সব দেশের মানুষই মানুষ। দেবতা নয়। তবু সব দেশের গণেরই আরাধ্য হচ্ছে গণতন্ত্র। দুষ্প্রাপ্য বটে। তথাপি আরাধ্য।

*   *   *

পুনশ্চ : তার মানে, সহনশীলতা বলতে কি বাংলাদেশের মূল ভিতকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করেছে যে শক্তি বা সংগঠন, তাকেও রাষ্ট্র গণতান্ত্রিকভাবে সহ্য করবে? তাকে সহ্য না করলে, আইনগতভাবে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তা অগণতান্ত্রিক হবে? সহনশীলতা বলতে কি এমন বুঝাবে : প্রকাশ্যে যে-লোক বা দল নর হত্যার আওয়াজ তুলছে, বলছে নরহত্যা জায়েজ, এবং নরহত্যায় তার হক আছে, এবং নর হত্যা যে করেছে এবং করে চলেছে, রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে যে সদম্ভে অস্বীকার করছে, তেমন দল এবং ব্যক্তিকেও কি সহনশীলতার দোহাই পেড়ে সহ্য করতে হবে? এখন যুক্তি হচ্ছে নৈরাজ্যিকতার যুক্তি। রাষ্ট্রের মূল ভিত্তিকে যে স্বীকার করে না, রাষ্ট্রের নাগরিক তথা অংশীদার বলে রাষ্ট্রও তাকে স্বীকার করে না। গণতন্ত্র খেলা বটে, কিন্তু নৈরাজ্যিক খেলা নয়। গণতন্ত্রের মূলকে স্বীকার করে গণতন্ত্রের খেলায় নামতে হবে। মূলকে অস্বীকার করে নয়। বর্তমান মুহূর্তে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের এই হচ্ছে সংকট। এ সংকটের সমাধানে মূলে যেতে হবে। মূলকে স্বীকার করতে হবে। এর কোন অন্যথা নেই।

২৫-১-৯২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'৮৫-র 'রক্ত খরচ'

গরীবের কবির এই এক গুণ, সে নিজের জীবনবোধ থেকে যে বাণী উচ্চারণ করে তার মর্মার্থ যে তখনি আমরা সাধারণেরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই, তা নয়। তাহলে আর আমাদের উপলব্ধির সঙ্গে কবির উপলব্ধির কোন তফাৎ থাকে না। কিন্তু নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে ক্রমান্বয়ে নিজেদের মিত্র সেই কবির বাণীর অর্থ আমরা উপলব্ধি করতে পারি। সে উপলব্ধি তখন নিজেদের দৈনন্দিন মর্মান্তিক জীবনের সহায়– সাথী হয়ে মনে অনুপ্রেরণা যোগায়।

কিশোর দরিদ্র, কবি সুকান্ত লিখেছিল :

হিসেবের খাতা যখনি নিয়েছি হাতে
দেখেছি লিখিত– 'রক্ত খরচ' তাতে।...

সুকান্তের এ বাণী যে কত মর্মান্তিকভাবে সত্য, তা এই আমি, যে-বাংলাদেশের একটি মধ্যবিত্ত শিক্ষক-কর্মচারী, সেও অনুভব করছি এই '৮৫-র যবনিকাতে, ১৬ ডিসেম্বর, বিজয় দিবসের বাজারের খাতাটি হাতে নিয়ে।

যে দু'তিনটি সন্তান আছে, তারা বিজয় দিবসের আর কিছু মর্ম বুঝে না। তারা মাইকে গানবাজনার আওয়াজ শুনেছে। দোকানপাটে, বাড়িতে লাল নীল পতাকার মালা দেখছে। আনন্দের দিন। বিজয়ের দিন। কার উপর বিজয়? কার বিরুদ্ধে লড়াই? কিসের বিজয়? তার কথা তাদের না বুঝাই স্বাভাবিক। ১৬ ডিসেম্বরের রাষ্ট্রীয় বাণীতেও সে ইতিহাসের ইঙ্গিতেরও কোন সাক্ষাৎ তারা পায় না। '৭১-এ হয়ত এদের মধ্যকার কনিষ্ঠটির জন্মও ঘটেনি। কিংবা '৭১-এ সে ছিল ৫-৬ বছরের শিশু। কিন্তু তার এই আনন্দের দিনে দাবী একটু ভাল খাবারের। তাই হুকুম করেছে, পোলাউ-এর চাল আনতে হবে। মোরগের কোরমা করতে হবে। টমেটোর সালাদ বানাতে হবে। মিষ্টি দইও আনতে হবে।

সেই বাজারেরই হিসাব। হিসাবের একটা অভ্যাস প্রায় স্বভাবগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। রোজ বাজার থেকে ফিরে হিসাবের খাতায় খরচ লিখি। এমন খরচের খাতা খোয়া যেতে যেতেও অন্তত : বছর দশেকের আছে। তা নিয়ে গবেষণা চলে। কিন্তু সে গবেষণা আজ থাক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজকের বাজারে একটি ছোট কিসেমের মোরগ কিনেছি ৪০ টাকা দিয়ে। ঘরের মানুষের আপত্তি। এতে তো একবেলাও হবে না। এর কোন পাল্টা জবাব আমি দিতে পারি নি। সের দুই একটু ভাল চাল কিনেছি। তার সের দর সতের টাকা। দুই সেরের দাম ৩৪ টাকা। ঘি জাতীয় একটু সাদা রংএর কিছু লাগে। গাওয়া ঘি নয়। তার সের ১৬০ টাকার কম নয়। তারও বেশি আছে। আমি এনেছি আমেরিকান বাটার অয়েল। তারমধ্যেই মানামানের ব্যাপার আছে। আমার নিম্ন মানেরটি দোকানদার দিয়েছে ৫২ টাকা সের দরে। সর্ষের তেল নয়। সায়াবিন দিয়েছে ২৮ টাকা সের দরে। এক সের। কয়েকটি টমেটো এনেছি। সের একটু নাকি কমেছে। ষোল টাকা হিসাবে। রসুনও একটি উপাদান। এনেছি দু'ছটাক। তার দামের সের পড়েছে ৩২ টাকা। চিনি আধা সের। দাম ১৩ টাকা। বলে কয়ে একটাকা কমিয়েছি। সের ২৬ টাকা। মশুরের ডাল একসের ২০ টাকা। মিষ্টি দইএর কথা বলছিলাম। তার একসেরের একটি মাটির ভাণ্ড আনতে খরচ হয়েছে ৩০ টাকা। এখানে যোগ দিয়ে লাভ নেই। খাতায়ও যে রোজ যোগ দিই, তা নয়। খরচ করি। সাধ্যমত খরচ করে যাই, স্ত্রীপুত্রদের দাবীতে। এ খরচের রসদ সংগ্রহের ইতিকথা থাক।

সাংবাদিক বন্ধুদের একটা পেশাগত অনুষ্ঠান আছে, সালতামামীর। '৮৫ সালটা কেমন গেল। '৮৪-র তুলনায়। রাজনীতিক নেতাদের এক হিসাব। সাহিত্যিকদের হয়ত আর এক হিসাব। আমি না সাহিত্যিক, না রাজনীতিক। তবু জীবনের হিসাব নিকাশের একটা ব্যাপার তো থাকে। কেবল চাল-ডালের হিসাব নয়। হিসাব মিটিং মিছিলের। গুলি গোলার। বোমা পটকার। এলএমজি, এসএমজির। সে হিসাবে হয়ত বলা যাবে, '৮৪- তে যদি বুকে গুলি বেশি বিদ্ধ হয়ে থাকে, '৮৫-তে তা বেশি হয়ত বিদ্ধ হয়েছে হাঁটুতে, পায়ে। '৮৪-তে বেশি বেড়িয়েছিল। মিছিল করেছিল মানুষ। '৮৫-তে সে দৃশ্য হয়ত কম। ছাত্র-পোলা-পানরা তো প্রায় পাঁচ মাস তাদের বড় মাদ্রাসা তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তালাবদ্ধ থাকাতে বাড়ি ঘরে বা ময়দানে মাঠে আড্ডা দিয়ে কাটিয়েছে। সেই যে ১লা মার্চ তারিখে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল, ইংরেজিতে বলেছিল, 'ক্লোজড্ সাইনীডাই' তার মেয়াদ জুলাই শেষ হওয়ার আগে ফুরিয়েছে বলে স্মৃতিতে বলে না। এক রিকশাওয়ালা নিউমার্কেট থেকে আমাকে রিকশায় তুলে ইউনিভারসিটির পাশে এসে জিজ্ঞেস করেছিল : 'সাব, ক'দিনের বন্ধ?' আমি ইংরেজি বাক্যের কি বাংলা করব? বলেছিলাম, অনির্দিষ্টকাল। রিকশাওয়ালাই আমাকে সংশোধন করে বলেছিল : 'তার মানে, জন্মের মত' তার মারাত্মক কথাটার তাৎপর্যের মধ্যে আর আমি এগুতে সাহস পাই নি।

উরির চরের প্লাবনে হাজারে হাজারে মানুষ ভেসে গেছে। তাদের সে ভাসমান লাশ আর চর-চালার দৃশ্য দেখতে আগত বৈদেশীকদের মধ্যে পাকিস্তানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামরিক প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁর খাতিরটা একটু বেশি চোখে ঠেকেছিল। আমার সব চাইতে বেশি চোখে ঠেকেছিল আচম্বিতে টেলিভিশনের পর্দায় দেখা তাঁর দাঁতের পাটি আর উচ্চ কণ্ঠের হাসি : হা! হা! হা! সে হাসিতে আমার বুকটা জানিনে কেন, সেদিন কেঁপে উঠেছিল। 'সার্ক' সম্মেলনে দেখলাম, সাভার স্মৃতি সৌধে নীত হলে, সৌধের সামনে অপর সকলে যদিবা প্রলম্বিত হস্তে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে ছিলেন, প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক নিজের ডানহাতখানি নিজের বুকের উপর আড়াআড়ি চেপে ধরে দণ্ডায়মান ছিলেন। হয়ত অপরের থেকে ব্যতিক্রমী হবার জন্যই। কিংবা হয়ত তাঁর বুকে একটা ব্যথা বোধ হয়েছিল। কিসের ব্যথা?

আমরা সাধারণ মানুষ। রাজনীতিকেরা রাজনীতির খেলা খেলেন। নাটক দেখান। তাঁদের মিটিং মিছিলে ডাক দিলে যেতে মন চায়। কারণ তখন তাঁদের উদাত্ত ভাষা এবং হাত পায়ের সঞ্চালন একটা নাটককে তৈরি করে। সে দৃশ্যে নানাভাবে মন মোহিত হয় দর্শক এবং শ্রোতাদের। এবং সে নাটক দেখতে সিনেমা হলের মত পয়সা দিয়ে টিকেট কিনতে হয় না। ফ্রি! কিন্তু একেবারে কি ফ্রি? কখন কোনখান দিয়ে কার মিটিংএ সাপ দৌড়াবে, কি বোমা ফাটবে বা বন্দুক ছুটবে, তার নিশ্চয়তা কি? তাই মন টানলেও অনেক সময়ে জীবনের আশঙ্কায় এমন বিনা পয়সার নাটকেও সামিল হতে পারিনে।

তবু দ্বিধান্বিত পায়ে পায়ে এবং নানা আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব নিয়েও আমরা সাধারণেরা আওয়াজ পেলে অগ্রসর না হই, তা নয়। এক, দুই, তিন করে মানুষের যে জমায়েত হয়, সে জমায়েত যে আর এক রকম বুক কাঁপানোর দৃশ্যেরও তৈরি করতে পারে, তার দৃষ্টান্ত '৮৪-তে একাধিক ঘটেছিল। পঁচাশিতে তেমন নয়। হয়ত তেমন দৃশ্যে এমন আওয়াজের পক্ষবিপক্ষ– উভয়ই কিছুটা চমকে গিয়েছিল। তাই এক পক্ষ যদি এবার দড়ি হ্রস্ব করেছে, অপরপক্ষ তাকে দীর্ঘ করার তেমন বেপরোয়া কোন চেষ্টা করেনি। কিন্তু এমন কথায় রাজনীতিক বিশ্লেষণের কথা আসে। আমি তাতে যাবো না।

জগন্নাথ হলের মর্মান্তিক ঘটনা জাতির মনকে এখনো শোকাভিভূত করে রেখেছে। কিন্তু এই ঘটনার এই প্রতীকী তাৎপর্যকে তো অস্বীকার করা যায় না যে, এই ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন অবকাঠামোর অন্তঃসারশূন্যতা। এই অবকাঠামোর সমূল পরিবর্তন যে আরো কত বলির মাধ্যমে ঘটবে, তার ইয়ত্তা কোথায়। কতো ঘটনার সাক্ষী জগন্নাথ হলের এই মিলনায়তন! এই মিলনায়তনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সমাজ জগন্নাথ হলের উদ্যোগে স্বাগত সংবর্ধনা জানিয়েছিল ১৯৪৬ সনে আন্দামানের নির্বাসন থেকে প্রত্যাগত মুক্তিপ্রাপ্ত ঐতিহাসিক সংগ্রামী রাজবন্দী গনেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, অম্বিকা চক্রবর্তী এবং তাঁদের সাথীদের; এই মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে পূর্ববঙ্গের আইন পরিষদের সভা : আর সামনে '৪৮-এর ভাষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্দোলনের ছাত্র মিছিল গিয়ে হাজির হয়েছে ভাষার দাবী নিয়ে, হল থেকে বেরিয়ে এসেছেন বর্ষীয়ান নেতা এ, কে, ফজলুল হক; ৫২ সনে এই পরিষদে আগমনের পথে শহীদ হয়েছেন বরকত-সালাম, জব্বাররা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' আওয়াজ মুখে নিয়ে; '৫৬ সনে এই মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত জাতীয় পার্লামেন্টের অধিবেশনে জনাব শহীদ সরওয়ারদী যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতা প্রদান করেছেন, আবার ১৯৫৮ সনে এই মিলনায়তনে পরিষদের সদস্যদের মধ্যে আত্মঘাতী সংঘর্ষ ঘটেছে। ...এবং এই জগন্নাথ হলের প্রায় অর্ধশত তরুণ এই মিলনায়তনে অকালে তাদের প্রাণের মর্মান্তিক ডালি দিয়ে স্মৃতির আর এক সৌধ তৈরি করে গেল ১৯৮৫ সনের ১৫ অক্টোবর তারিখে!

তবু আমি বলব : সব সত্ত্বেও আমরা দশকোটি মানুষের দেশ। জীবনের চরম চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমাদের জন্ম। একটা সঙ্গতিপূর্ণ সুখ দুঃখ ভাগ করে খাবার যৌথ সমাজ তৈরির চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জের ফয়সালা একটা চুরাশী কিংবা পঁচাশীতে হতে পারে না। হয় না। তেমন হ্রস্ব দৃষ্টির সালতামামীতে মূর্খরাই উচ্ছ্বসিত হয়। আবার দূরদৃষ্টিশূন্য বুদ্ধিহীন আমরাই হতাশ হই। বাংলাদেশের 'অবুঝ' কৃষকও যখন তার জমির আলে একটি তালগাছের চারাকে বপন করে, তখন সে তার ফসলকে বছরের হিসাবে পাওয়ার কথা চিন্তা করে না। চেতন, অচেতন, তথা স্বভাবগতভাবেই সে বিশ্বাস করে যত্ন করলে এ চারাটি, যুগের পর যুগ যখন অতিক্রান্ত হবে, তখন সে ফল দিবে, ফসল দিবে এবং তখন সে ফসলকে তার সন্তানেরা, মানুষের সন্তানেরা ভোগ করবে। সেই বিশ্বাসেই তালগাছের চারাটিকে আজ সে বপন করছে।

তাই '৮৫-র সালতামামীর তেমন কোন অর্থ নাই। কাল নিরবধি, অনন্ত। সেই অনন্তকালের জীবনের স্রষ্টা মানুষ। অনন্তকাল ধরে বহমান সেই অপরাজেয় মানুষের স্রোতের অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ। অনন্তকালের ইতিহাস তার পক্ষে।

আমাদের সন্তানদের উপর আমাদের অসন্তোষ আর নিন্দার শেষ নাই। তবু ওদেরই একটি যখন দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়ালে আবার '৮৫-তে সন্তর্পণে হাতের তুলি দিয়ে খোদাই করে :

সময়ের সাহসী সন্তানেরা
বারে বারে আসে
বারে বারে
যুদ্ধে যায়।

তখন তার প্রতি আমার মন কৃতজ্ঞতায় ভয়ে ওঠে, প্রৌঢ় বয়সের চোখের কোণও তখন বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসে।

১৬-১২-৮৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবিকৃত আয়নার অপরিহার্যতা

মুখ দেখার আয়না কবে আবিস্কৃত হয়েছিল, তা আমার জানা নেই। কিন্তু আবিষ্কারটি গুরুত্বপূর্ণ। আয়না বাদে মানুষ চেহারা, বিশেষ করে মুখ দেখতে পারে না। আমি আমার হাত-পা দেখতে পারি। কিন্তু মুখ নয়। আর মুখেই নাকি মানুষের আসল চেহারা। ইংরেজিতে একটা কথাও আছে : 'ফেস ইজ দি ইনডেকস্ অব দি মাইন্ড'; মুখেই মন। আর মনই তো আসল। কিন্তু আজকাল আর কথাটা তত সত্য নয়। মুখের এত মুখোশ যে সে মুখোশ ভেদ করে মন আর বেরুতে পারে না। তাই আজকাল আমরা বুঝি, আমি বা অপরে মুখে যা বলি বা বলে, মনে তার উল্টোটা। তবু এ কৌশলও নির্ভর করে নিজের চেহারা দেখার উপর। চেহারা দেখেই উপযুক্ত কৌশলের কথা আমরা চিন্তা করি।

মানুষের সভ্যতায় সব সময়েই যে পারামোড়া আয়না ছিল চেহারা দেখার জন্য, তা নিশ্চয়ই নয়। গ্রীক পুরাণে নারসিসাসের কাহিনী আছে। নারসিসাস নিজের চেহারা আকস্মিকভাবে দেখতে পেয়েছিল নিস্তরঙ্গ ঝরনা কিংবা একটি কুয়োর পানিতে। তখনো আয়না আবিস্কৃত হয় নি। নারসিসাস নিজের মুখের সৌন্দর্যের কথা এর আগে কখনো জানত না। যেই আকস্মিকভাবে নিস্তরঙ্গ জলে নিজের মুখের আদলটি ফুটে উঠল অমনি সেই অনিন্দ্যসুন্দর তার মুখের সঙ্গে প্রেমে পড়ে গেল। সে প্রতিফলন থেকে চোখ আর সে সরাতে পারল না। সে এক আত্মবিনাশী প্রেম। উপাখ্যানে বলে, নারসিসাস নাকি আত্মপ্রেমের বন্ধন থেকে নিজেকে আদৌ মুক্ত করতে পারে নি। নিজের চেহারার প্রতি চোখ রেখে অনড় হয়ে সে মৃত্যুবরণ করেছিল। কাহিনীটির নানা আন্তরিক তাৎপর্য আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু আজ আমি এই আয়নাতেই আবদ্ধ। নারসিসাস থেকেই ইংরেজি শব্দ 'নারসিসিজ্‌ম্' বা আত্মপ্রেম কথাটির উদ্ভব।

আয়না যখন একবার আবিষ্কার হল, তখন শুরু হল তার প্রকারভেদ। সে এক পুরো বিজ্ঞান বিশেষ। আমি অবিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের সে জগৎ আমার কাছে রহস্য বিশেষ। কিন্তু একথা জানি, আমার যে কোন আয়নায় চলে না। ঘরের মধ্যে একাধিক আয়না আছে। হাত-আয়নার যখন যেটি কিনেছি তাতে যে ততো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্তুষ্ট হতে পেরেছি, তাও নয়। আয়নায় মুখ দেখব, তাতে নিজের মুখখানা যদি গোলগাল, ফুল্লাফালা না দেখায় তবে আর আয়না দেখে লাভ কি? অবশ্য একেবারে যারা খাটুয়ে মানুষ, শ্রমে শ্রমে শেষ, দম ফেলবারও যারা সময় পায় না, তাদের আয়না দেখার উপায় থাকে না। এই বিংশ শতাব্দীতে, আমাদের এই বাংলাদেশে। কিন্তু তাদের কথা নিয়েও বাগবিস্তারে লাভ নেই। আমার সমস্যাও কম নয়। আয়না সামনে ধরলেই যদি মুখের ভাঁজ ভোজ সব ভেসে ওঠে। তবে তাতে মন খারাপ হয়ে যায়। তাই আয়নার দোকানে গিয়ে নানা আয়না দেখি। দোকানীকে বলি : একখান ভাল আয়না দিন। ব্যাপারটা কারুর অপরিচিত নয়। ফটোর দোকানে গিয়ে ফটো তোলাই। তারপর ক্যামেরাম্যানকে বলি, একটু টাচ করে দিবেন। একটু সুন্দর করে দিবেন। আয়নার ক্ষেত্রেও তাই। নানা আয়না। কনভেক্স্, কনকেভ : উত্তল, অবতল। মোটকথা আয়না সভ্যতার অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ নিজের চেহারা না দেখে চলতে পারে না। নিজের চেহারা দেখেই বুঝতে পারে, কোথায় কোন্ মেরামতির প্রয়োজন। কোথায় কোন প্লাস্টারিং-এর আবশ্যক।

কেবল কি ব্যক্তির প্রয়োজন? তা অবশ্যই নয়। মানুষ সমাজবদ্ধ প্রাণী। মানুষ সমাজ তৈরি করে। রাষ্ট্র বানায়। রাষ্ট্র চালাবার জন্য সরকার সৃষ্টি করে। সমাজ, সরকার— এগুলি আধুনিক কালের বিশেষ পরিচিত আর আলোচ্য শব্দ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালগুলি যখন আবার খুলবে, তখন আবার আমাদের শুরু করতে হবে : সমাজ হচ্ছে মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনের মৌলিক প্রকাশ। রাষ্ট্র হচ্ছে সমাজ বিকাশেরই আর একটি পর্যায়। এ্যারিস্টটল বলেছেন : মানুষ হচ্ছে স্বভাবগত ভাবে একটি রাষ্ট্রনৈতিক প্রাণী। এ্যারিস্টটল গোড়ার পণ্ডিত। তিনি সমাজ আর রাষ্ট্রের তত চুলচেরা পার্থক্য করেন নি। তার দরকার হয় নি তখন। এ সব কথা হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বর্ণমালা : অ, আ, ক, খ। বিশ্ববিদ্যালয় খুললে এই বর্ণমালা দিয়েই আবার শুরু করতে হবে। কারণ, এতদিনে অ, আ, ক, খ আমরা ছাত্র-শিক্ষক সবাই ভুলে যে গেছি, একথা না বললেও চলে।

সেই অ, আ, ক, খ-রই আর দুএকটি কথা রাষ্ট্রই বলি কিংবা তার পরিচালন ব্যবস্থা সরকারই বলি, তার প্রধান তিনটি অঙ্গের কথা সেই আদি পণ্ডিতই বলেছিলেন। বলেছিলেন : আইন, শাসন আর বিচার— এই তিনটি হচ্ছে তার অঙ্গ বা বিভাগ। আমরা এখনো তাই বলি। কিন্তু বলাটার কিছুটা সংশোধনী আধুনিক বাস্তব জীবনই অনিবার্য করে তুলেছে। প্রাচীন গ্রীসে প্লেটো-এ্যারিস্টটলের চিন্তার পাণ্ডুলিপি বা পুঁথি নাকি ছিল। পুঁথি না থাকলে তাঁদের রচনা আবিষ্কৃত হতে পারত না। কিন্তু প্রাচীন গ্রীসে সংবাদপত্র নিশ্চয়ই ছিল না। ছিল না যে, এই সত্য থেকে আমার প্রশ্ন জাগে, তাহলে মানুষ, মানে রাষ্ট্রবদ্ধ মানুষ তাদের মুখ দেখতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি প্রকারে? প্রশ্নটা খুব হাল্কা নয়। যথেষ্ট গুরুতর প্রশ্ন। জবাব অবশ্য একটা দেওয়া যায় : একে ছোট ছোট নগর রাষ্ট্র, তায় তার মধ্যে দাসরা আবার মানুষ বলেই গণ্য হত না। তাই প্রভু নাগরিকরা নিজেদের চেহারা দেখত হাটে-বাজারে পারস্পরিক প্রশ্নে, জিজ্ঞাসায়, উত্তরে, আলোচনায়। ওদের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রকাশিত হত মাঠের মজলিসে। সেখানে জোরে জোরে নেতারা বক্তৃতা দিত। সাংঘাতিক উত্তেজক বক্তৃতা। সেই বক্তৃতায় জমায়েত জনতা সমস্যার পক্ষে বিপক্ষে চীৎকার করে সমর্থন, অসমর্থন জানাত। সক্রেটিসকে প্রায় এভাবেই তারা হত্যা করেছিল।

নিরবধি কালের একটা সত্য হিসাবে বলা যায়; এরও একটা গুণের দিক আছে; এই হৈ চৈ, ময়দানে, স্টেডিয়ামে, পল্টনে জমায়েত হওয়া, তাতে বক্তৃতা করা। হাজার জনতাকে ডেকে বলা : 'ভাই সব আপনারা হাত তোলেন। এক হাত নয়। দুই হাত তোলেন।' এরও প্রয়োজন আছে। এও একটা আয়নার কাজ করে। এও সমাজ-জীবনে নানা চিন্তায়, প্রশ্নে জমে ওঠা গ্যাস নিষ্ক্রমণের সেফটিভালভ্। এটা না থাকলে গ্যাসভরতি মানুষ যে কোন পাত্রের মতোই এক সময়ে বিস্ফোরিত হতে বাধ্য।

আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবনে সংবাদপত্র : দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক সাময়িক, সাহিত্য, রম্য– সব মিলিয়ে যা কিছু বলা যায় : তা হচ্ছে রাষ্ট্রের আয়না। সরকারের আয়না। ব্যক্তি এবং সমাজের আয়না। এই আয়নাতে আমরা নিজেদের মুখ দেখি। এই মুখ দেখেই আমরা বুঝার চেষ্টা করি : কোন্খানে কি ভাঁজ, কি গর্ত রয়েছে। কি দুর্বলতা এবং শক্তি রয়েছে। কোনটার মেরামত কত জরুরী। এই বোধ থেকেই সম্ভবতঃ ফরাসী বিপ্লবের পূর্বের চাইতে পরবর্তী কালে অধিকতর জোরের সঙ্গে চিন্তাবিদগণ রাষ্ট্র বা সরকারের সনাতন তিনটা অঙ্গের সংখ্যাকে সংশোধন করে চারটার কথা বলতে শুরু করেছেন। এবং এই চতুর্থ অঙ্গটি হচ্ছে, সংবাদপত্র। ইংরেজিতে বলে 'ফোর্থ এসটেট্'। এবং সে হিসাবে আমাদের বলতে হয় রাষ্ট্রের অপরিহার্য অংশ হচ্ছে চারটি : যথা আইনবিভাগ, শাসন বিভাগ, বিচারবিভাগ এবং সংবাদপত্র।

আমরা ছেলেপিলেদের প্রশ্ন করি : রাষ্ট্রের বিচার বিভাগের স্বাধীনতার আবশ্যকতা কি ব্যাখ্যা করে বুঝাও। তাদের ব্যাখ্যার দুর্বলতা যাই থাক একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না, বিচার বিভাগের বিচারক যদি প্রশাসন বা শাসক দ্বারাই নিযুক্ত এবং নিযুক্ত তথা অবদমিত এবং অপসারিত হন, যদি তার কার্যক্রমের কোন বিধিবদ্ধ বিয়মকানুন না থাকে তবে বিচার বিভাগের উপর আর দেশবাসীর আস্থা থাকে না। যেটাকে আমরা বুর্জোয়া গণতন্ত্র বলতে অভ্যস্ত হয়েছি তারও মূল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শর্ত হচ্ছে : রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ– তথা আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ আর বিচার বিভাগের উপর নাগরিকদের আস্থা বজায় থাকা। আইন মানা, না মানা, ঘটনা দুর্ঘটনা, আঘাত, হত্যা– সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনে এতো প্রাত্যহিক ব্যাপার। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের মনে যদি এই বোধটা থাকে যে, 'আমি ন্যায্য বিচার পাব', তাহলে তার স্বাভাবিক জীবন যাপনে আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে একটা নিশ্চয়তার ভাব আসে।

সেই আগের আমলে, আমাদের কিশোরকালে মুরুব্বীদের মুখে একটা কথা শুনতাম : 'হাকিম নড়ে তো, হুকুম নড়ে না।' কথাটা শুনে হুকুমের উপর বেশ একটা সমীহের ভাব মনে জাগত। এখন বাস্তব জীবনে সার্বজনীন অভিজ্ঞতা হচ্ছে : 'হুকুম নড়ে তো হাকিম নড়ে না।' এতে হাকিম সম্পর্কে মনে আতঙ্ক যদিবা জাগে, হুকুম সম্পর্কে আর শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হতে পারে না।

এখন কেবল বিচার বিভাগ নয়। কেবল তারই স্বাধীনতার প্রশ্ন নয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ব্যাপারটিও আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবনের এক অপরিহার্য শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিক দিয়ে দেখলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা না থাকলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা থাকতে পারে না। কারণ বিচার বিভাগ যদি আহত হয় প্রশাসন দ্বারা আর সে কথা যদি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে না পারে এবং তার সেই প্রকাশের দ্বারা জনগণ যদি অবহিত হয়ে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার একটা বাতাবরণ তৈরি করতে না পারে তবে বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে তার দায়িত্ব পালন করতে পারে না। আবার কেবল যে বিচারবিভাগের জন্যই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আবশ্যক, তাও নয়। আইন বিভাগের জন্যও এ অপরিহার্য। গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠিত রীতি হচ্ছে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংসদ সরকার তৈরি করবে। (এমন কি প্রেসিডেন্ট পদ্ধতিতেও জনগণই প্রেসিডেন্টকে নির্বাচিত করবে।) এবং এই সরকার প্রতিনিধি-সংসদের আস্থার ভিত্তিতে দেশ শাসন করবে। এদিক থেকে সরকার কোন স্বাধীন বা সার্বভৌম শক্তি নয়। সরকার হচ্ছে প্রতিনিধি-সংসদের অধস্তন– তথা তার আজ্ঞাবহ। স্বাধীন সংবাদপত্রই মাত্র পারে এই সত্যটি প্রচার করে জনসাধারণকে সচেতন করতে এবং জনসাধারণের চেতনাই মাত্র নির্বাচিত সংসদের স্বাধীন এবং সার্বভৌম অস্তিত্বকে যেমন সম্ভব করে তুলতে পারে, তেমনি পারে তার স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করতে।

সংবাদপত্র দেশের আয়না বিশেষ। কিন্তু এই আয়নাতে দেশের অবস্থা যথাযথ পাওয়ার জন্য প্রয়োজন তার অবিকৃত রূপের। আর এখানেই ব্যক্তির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবিকৃত আয়নার অপরিহার্যতা

প্রবণতার মত সরকার আর অপর শক্তিসমূহের প্রবণতা হচ্ছে মনের মত আয়না পাওয়ার। যথার্থ চেহারা নয়, আমার মনের খুশী বা ইচ্ছামত চেহারা যাতে দেখা যায়, তেমন আয়না আমার প্রয়োজন। মনের মত আয়না। আর তাই শক্তির কেন্দ্রসমূহ চায় মনের মত সংবাদপত্র। এ জন্যই ব্যক্ত-অব্যক্ত ভাবে, বিজ্ঞাপন দেওয়া, না-দেওয়ার মাধ্যমে, রাত বিরাতে 'হ্যালো' ধ্বনির মাধ্যমে এবং আমার অজানা শত প্রকারে চেষ্টা চলে মনের মত আয়না তথা সংবাদপত্র তৈরি করার। কিন্তু মনের মত আয়না কি বাস্তবকে পরিবর্তিত করতে পারে? মনের মত আয়না আত্মপ্রতারণার উৎস হতে পারে, বাস্তব জ্ঞানের নয়। অবিকৃত আয়নায় নিজের যথার্থ প্রতিচ্ছবি দেখার সাহসের কোন গত্যন্তর নাই!

৯-৫-৮৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সোভিয়েট সাম্যবাদ : এক নতুন সভ্যতা'

১৯১৭ সালে আমার জন্ম ঘটে নি। ১৯১৭ সালে একটি নতুন সমাজব্যবস্থা, একটি নতুন সভ্যতার জন্ম ঘটেছিল। সোভিয়েট সমাজব্যবস্থা। ১৯৪০-এর দশকে ১৯১৭-তে জাত সেই সমাজব্যবস্থা আমাকে নতুন এক জীবন দান করেছিল। শুধু আমাকে নয়। সেকালের প্রজন্মকে। কিন্তু সোভিয়েট বিপ্লবের কাছে আমার নিজের ব্যক্তিগত ঋণের কথা বলছি। ১৭ কি ১৮ বছরের এক তরুণ। চল্লিশের দশকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। দূর ইউরোপে মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সে যুদ্ধের বীরপুরুষ এ্যাডলফ্ হিটলার। তার স্বস্তিকা, তার অদ্ভুত মুখাবয়ব আর তার অনুচর এবং সদম্ভ সশস্ত্র বাহিনীর 'হেইল হিটলার' বলে উত্তোলিত হস্তের ছবিতে দৈনিক কাগজের পৃষ্ঠা পূর্ণ থাকে। ৪০ থেকে ৪২ সালের কথা। দিগ্বিজয়ী হিটলার। উত্তরে, দক্ষিণে, পশ্চিমে তার অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব অপরাজেয়। ১৭৮৯-তে আধুনিককালের উন্মোচনকারী বিপ্লবের ধাত্রী ফরাসীদেশ এই হিটলারের পদানত। রাজধানী প্যারিসে গঠিত হয়েছে হিটলারের পদলেহনকারী পেঁতা সরকার। ফরাসীদের আকাশে বাতাসে স্বস্তিকার আন্দোলন। জার্মান ফ্যাসিস্টবাহিনীর মার্চপাস্ট। পরাধীন ভারতের তখন মূল প্রশ্ন স্বাধীনতা অর্জন। কিন্তু সে সংগ্রাম নানা মত ও পথে বিভক্ত। সাম্প্রদায়িকতার অন্তর্ঘাত প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে। এমন পরিবেশে আমার প্রজন্মের তরুণ মন বিভ্রান্ত। মানুষের সমাজের বিবর্তন কোন্ লক্ষ্যে? কে তার চালক? সে কি হিটলার? হিটলারকে মনে হচ্ছে অজেয়। হিটলার কার প্রতিনিধি? কোন্ সমাজব্যবস্থার? সমাজব্যবস্থা কাকে বলে? এই সব জিজ্ঞাসায় আকীর্ণ মন। '৪১-এর ২২ জুন হিটলার আক্রমণ করেছিল সোভিয়েট ইউনিয়নকে। সে আক্রমণের খবর নিশ্চয়ই কাগজের পৃষ্ঠা জুড়ে বার হয়েছিল। কিন্তু তার তাৎপর্য সেই মুহূর্তে, মুসলিম সমাজভুক্ত একটি মধ্যবিত্ত তরুণ ছাত্রের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় নি। তখনো তার মনে হিটলারের বিক্রম। কিন্তু ৪২ শেষ হয়ে ৪৩-এ না পড়তেই এক নতুন বিস্ময় সেদিনের তরুণের মনকে আবিষ্ট করতে লাগল। কোন এক বীরের বিক্রম নয়। একটা সমগ্র দেশের বিক্রম। কিন্তু শুধু দেশ বললেই কি জবাব মিলে? দেশ তো ফ্রান্সও ছিল। শৌর্যে, বীর্যে, ঐতিহ্যে তো ক্ষুদ্র নয়। কিন্তু সে আত্মসমর্পণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করল কত সহজে। কিন্তু রাশিয়া কেমন করে ঠেকিয়ে দিচ্ছে সমগ্র পরাজিত ইউরোপের শক্তির মাথায় চড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে যে ফ্যাসিস্ট বাহিনী, তাকে? পিছু যে হটছে না সোভিয়েট বাহিনী, তা নয়। ছেড়ে দিতে হচ্ছে এলাকার পর এলাকা। লেনিনগ্রাড অবরুদ্ধ। নেপোলিয়নের মত হিটলারের বাহিনী মস্কোর অদূরে উপস্থিত হয়েছে। পিছু হটছে লাল ফৌজ। তবু আত্মসমর্পণ করে নি সোভিয়েট বাহিনী। আত্মদান করছে। হাজারে হাজারে, লক্ষে লক্ষে। হিটলার-বাহিনীর অগ্রসরের কাহিনী যেমন পৌঁছেছিল সেদিন আমাদের কাছে, তেমনি পৌঁছেছিল সোভিয়েট মানুষের আত্মদানের কাহিনী। এই আত্মদানের কাহিনীই সোভিয়েট সমাজব্যবস্থাকে আমাদের মনের সামনে সেদিন উপস্থিত করে দিয়েছিল। নতুন বিস্ময়ভরা মন আর চোখ নিয়ে আমরা সেদিন তাকিয়েছিলাম মরণপণ সংগ্রামরত এই সোভিয়েটের দিকে। বীর হিটলারের অপচ্ছায়া ক্রমান্বয়ে আমাদের মন থেকে ইতিহাসের নারকীয় কীট হিসাবে অপসৃত হচ্ছিল।

একটি নতুন জীবনবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গি সেদিন আমাদের মধ্যে জন্মলাভ করছিল। সেই ৪০-এর দশকে। ৪২ থেকে ৪৫ সালে। এ একটি প্রক্রিয়ার ব্যাপার। একদিনের ব্যাপার নয়। কোন একটি ঘটনার ভিত্তিতে তাকে আজ ৪০ বছর পরে স্মৃতির পটে তুলে আনা যায় না। তবু নিজের ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাসেও সেই সময়টি যে নতুন চেতনা লাভে, অনুপ্রেরণায় পূর্ণ হয়ে উঠছিল, তাকে স্মরণ করতে কোন অসুবিধা হয় না।

এই চেতনা সৃষ্টিতে নানা সুহৃদ, সুজন সেদিন সাহায্য করেছিলেন। তাঁদের কারুর নাম হঠাৎ আলোর ঝলকানীর মত, চোখ বুজে মনের দিকে তাকালেই, ঝলসে ওঠে।

এমন কয়েকজন সুজনের মধ্যে বৈদেশিক একটি নাম ছিল : সিডনী এবং বিয়েট্রিস ওয়েব। এ একটি নাম যেমন। তেমনি একটি নয়। দুটি নাম। আজকের যুগের তরুণদের কাছে এ নাম দুটি হয়ত নিতান্ত গবেষণার বিষয়। কিন্তু সেকালের ইংল্যান্ডের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এবং চিন্তার ক্ষেত্রে এ দুটি নাম ছিল যেমন সুপরিচিত, তেমনি বামপন্থী মহলের প্রিয় নাম। না, এঁদের কাউকে আমি দেখি নি। তাঁদের রচনার কোন একটি যে পাঠ করেছি, তাও হয়ত নয়। কিন্তু তাঁদের বিপুল সংখ্যক রচনার মধ্যে 'সোভিয়েট কমুউনিজম্ : এ নিউ সিভিলিজেশন : সোভিয়েট সাম্যবাদ, এক নতুন সভ্যতা' শিরোনামের গ্রন্থখানি সেকালে পঠিত, অ-পঠিতভাবে আমাদের মত তরুণদের কাছে পরিচিত এবং প্রিয় ছিল। সিডনী এবং বিয়েট্রিস ওয়েব তথা ওয়েব দম্পতির এই গ্রন্থের নামের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা সেদিনই শুনেছিলাম। সোভিয়েট সমাজব্যবস্থা মাত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তার নতুন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা সারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীর উৎসুক দৃষ্টির সামনে পরীক্ষিত হচ্ছে। পৃথিবীব্যাপী তার শত্রু। তার বিরুদ্ধ প্রচারক। বলশেভিকদের রাজত্ব। বলশেভিক মানে তো বুনো দৈত্য। এবং সেই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সোভিয়েটের মর্মকথা, সোভিয়েট বিপ্লবের নতুন মানবতাবাদী তাৎপর্যের কথা যে সব লেখক ও চিন্তাবিদ সেদিন বিবৃত এবং ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সিডনী এবং বিয়েট্রিস ওয়েব। তাঁরা নাকি তাঁদের গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে শিরোনামের সামনে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন রেখেছিলেন। অর্থাৎ বিশের দশকে প্রকাশিত সে গ্রন্থে তারা যেন তখনো নিঃসন্দেহ নন, সোভিয়েট সাম্যবাদ একটি নতুন সভ্যতা কিনা। কিন্তু ত্রিশের দশকে তাঁদের গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে ওয়েব দম্পতি তাঁদের গ্রন্থের শিরোনামের সামনের সেই প্রশ্নবোধক চিহ্নটিকে মুছে দিয়েছিলেন। এবার গ্রন্থখানির শিরোনাম দাঁড়িয়েছিল, নিঃশর্তভাবে : 'সোভিয়েট কমুউনিজম : এ নিউ সিভিলিজেশন : সোভিয়েট সাম্যবাদ : এক নতুন সভ্যতা।' ওয়েব দম্পতির এই গ্রন্থ পাঠ করার ক্ষমতা আমার তখন হয়ত ছিল না। হয়ত এ গ্রন্থ আমি পাঠ করতে পারি নি। কিন্তু এ গ্রন্থ যে সেকালে আমাদের মধ্যে বিপুলভাবে আলোচিত গ্রন্থ ছিল, তা স্মৃতির পটে এই অমলিন রেখাটি থেকেই বুঝতে পারা যায়।

কিন্তু আর একজন সোভিয়েট সুহৃদ এবং শিক্ষাবিদ, প্যাট স্লোনের 'রাশিয়া উইথ আউট ইলিউশন' বা 'মোহমুক্ত দৃষ্টিতে রাশিয়া' আমি যে পাঠ করেছিলাম, সেটি নিশ্চিত। আর একখানি বই ছিল জসুয়া কুনিজের 'ডন ওভার সমরকন্দ'। মধ্য এশিয়ার মুসলিম জনগোষ্ঠীর সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা থেকে সোভিয়েট বিপ্লবের সাহায্য এবং সহযোগিতায় নতুন জীবনে প্রবেশের কাহিনী। এ বইএর রচনারীতিটি যেমন নাটকীয় ও রোমাঞ্চকর ছিল, তার আবেদনও তেমনি আমাদের মনের উপর ছিল গভীর। পরবর্তীকালে আমাদের প্রখ্যাত লেখক বিনয় ঘোষ এ বইএর বাংলা রূপান্তরও করেছিলেন।

কেমন করে আমরা সোভিয়েটের কথা, ১৯১৭ সালের বিপ্লবের কথা, সোভিয়েট সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের কথা সেদিন জেনেছিলাম তা স্মরণ করতেই এইসব বইএর কথা মনে ভেসে ওঠে।

একটা আফসোসের ব্যাপার, আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতির যা বর্তমান পরিবেশ তাতে পুরোন এমন গ্রন্থের সঙ্গে আমাদের আর সাক্ষাৎ ঘটে না। এমন কোন নিশ্চিত ভাণ্ডার নেই যেখানে গেলে এ সব গ্রন্থের সঙ্গে আবার আমরা পরিচিত হতে পারি। কেবল সেকালের আমাদের কথা নয়। একালের তরুণদেরও প্রয়োজন রয়েছে এইসব পুরোন গ্রন্থ পাঠ করার। কেননা এসব গ্রন্থেই নতুন চিন্তা ও সভ্যতার ভিত রচিত হয়েছিল। সেদিনকার প্রগতিশীল মানবসভ্যতার শুভার্থী এই চিন্তাবিদদের দূরদৃষ্টিকে ইতিহাসের পরবর্তী বিকাশ কিভাবে বাস্তব সত্য বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রমাণিত করেছে তার উপলব্ধি তাঁদের গ্রন্থ এবং চিন্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বাদে তৈরি হতে পারে না।

আমি এমন একটি চিন্তা থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে প্রথমে খোঁজ করেছিলাম তার বইএর তালিকায় এসব বইএর নাম আছে কিনা। এসব বইএর কিছু নাম তালিকায় অবশ্য আমি পেলাম। কিন্তু সিডনী এবং বিয়েট্রিস ওয়েবের সেই 'সোভিয়েট সভ্যতা' নামক গ্রন্থ কিংবা জসুয়া কুনিজের 'ডন ওভার সমরকন্দ'কে খুঁজে পেলাম না। অথচ এ সমস্ত বইএর পুনর্মুদ্রণও আমাদের চিন্তার শক্তি এবং সমৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক।

প্যাট শ্লোনের 'রাশিয়া উইথ আউট ইলিউশন'ও পেলাম না। তবে দুঃখ একটু কমল যখন পুরোন বই তল্লাশ করতে করতে প্যাট শ্লোনের ১৯৩৭ সালে ভিক্টর গলান্‌জ কর্তৃক প্রকাশিত 'সোভিয়েট ডিমোক্রাসি' বা সোভিয়েট গণতন্ত্র শিরোনামের গ্রন্থখানিকে হাতে নিতে পারলাম।

প্যাট শ্লোন নিজে ছিলেন অধ্যাপক। বিংশ শতকে উদ্ভূত মানব ইতিহাসের মহত্তম বিস্ময় সোভিয়েট সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর ছিল প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। তিনি সোভিয়েট রাশিয়াতে শিক্ষকতা করেছেন ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকে। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁর বক্তব্য যেমন প্রাঞ্জল এবং জোরাল, তেমনি পাঠকের মনে প্রত্যয় সৃষ্টিকারী। ২৮৮ পৃষ্ঠার এ গ্রন্থের কলেবর হয়ত তেমন বৃহৎ নয়। কিন্তু অধ্যাপক শ্লোন তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার উদাহরণ সমৃদ্ধ প্রাঞ্জল সংক্ষিপ্ত প্রকাশে সোভিয়েট সভ্যতার তিনটি মূল বৈশিষ্ট্যকে উপস্থিত করেছেন। সোভিয়েট সমাজব্যবস্থা যে মানুষের ইতিহাসে একটি 'নতুন জীবনের' উদ্বোধন, এ কথা তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর গ্রন্থের প্রথম ভাগে : 'নতুন জীবন' শিরোনাম দিয়ে। দ্বিতীয় ভাগ, 'নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা' শিরোনামে লেখক সোভিয়েট রাষ্ট্রকাঠামোর মূল চরিত্রগুলি উপস্থিত করেছেন। 'সোভিয়েট কাকে বলে', 'শ্রমিকের রাষ্ট্র কি', 'গণতান্ত্রিক প্রতিরক্ষা তথা লালফৌজের বৈশিষ্ট্য', 'জাতিসমূহের রাষ্ট্র', 'সমাজতান্ত্রিক সংবিধান', 'পার্টি বা দলের কথা', 'গণতান্ত্রিক শৃঙ্খলা এবং বিরোধিতার স্বাধীনতা' : এই সব শিরোনামের অধ্যায়ে তিনি সোভিয়েট ব্যবস্থার চরিত্রকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর গ্রন্থের শেষ ভাগটির তিনি নাম দিয়েছেন : 'এ এক নতুন গণতন্ত্র : এ নিউ ডিমোক্রাসি'।

প্যাট শ্লোনের এই গ্রন্থখানির ভূমিকার দু একটি অংশ এখানে আমি অনুবাদ করে দিলাম। লেখকের ভূমিকার এই কথা কয়টি আজকের দিনেও এমন বইএর প্রয়োজনের বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে তুলবে।

"...গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্র : ডিমোক্রাসি এ্যান্ড ডিক্টেটরশিপ : এ বিষয়টি কি? গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্র বা ডিক্টেটরশিপ সম্পর্কে আজকাল বিস্তর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেমন লেখা হচ্ছে, তেমনি বিস্তর আলোচনা আমরা শুনতেও পাচ্ছি। গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে। এ আওয়াজ অহরহই উচ্চারিত হচ্ছে। আর যে-একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে তার দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখানো হচ্ছে সোভিয়েট ইউনিয়নকে। কিন্তু একদিকে সোভিয়েট ইউনিয়নকে যখন একনায়কতন্ত্র হিসাবে দেখানো হচ্ছে, তখন বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের এমন প্রখ্যাত চিন্তাবিদও আছেন যাঁরা তাঁদের বক্তব্যতে বলছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের যে শাসনব্যবস্থা তার মধ্যেই রয়েছে গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি।

"গণতন্ত্রের সবচাইতে জনপ্রিয় সংজ্ঞা হচ্ছে আব্রাহাম লিংকনের দেওয়া সংজ্ঞা তাতে তিনি গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন ঃ গণতন্ত্র হচ্ছে "জনগণের সরকার, জনগণ দ্বারা পরিচালিত সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার : গভর্নমেন্ট অব দি পিপল, বাই দি পিপল, ফর দি পিপল।"

"আমরা এখানে সরকার ব্যবস্থার সুপরিচিত গবেষক, লেখক সিডনী এবং বিয়েট্রিস ওয়েবের বক্তব্যের কিছুটা উদ্ধৃত করছি :

"সোভিয়েট রিপাবলিক সমূহের রাষ্ট্র সংস্থা এমন রাষ্ট্রব্যবস্থা নয় যেখানে সরকার এবং জনগণ পরস্পরের বিরোধী পক্ষ হিসাবে পরিগণিত হয়।... অথচ সমস্ত পরিচিত রাষ্ট্রব্যবস্থাতেই ব্যাপারটা এরকম : যেন দুটো পক্ষ : সরকার এবং জনগণ। সোভিয়েট ইউনিয়নের সরকার হচ্ছে সকল প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের দ্বারা পরিচালিত সরকার। এই পরিচালকেরা সংগঠিত হয় নানা প্রকারে : নানা ধরনের কালেকটিভ বা যৌথ সংস্থায়। তাঁদের নানা দায়িত্ব। এবং সে দায়িত্বের অন্যতম হচ্ছে একটি একেবারে নতুন প্রকারের অর্থনীতির দ্বারা সমগ্র দেশের সম্পদের ব্যবস্থাপনা সম্পাদন করা।" (সোভিয়েট কমিউনিজম : পৃষ্ঠা ৪৫০)

"ওয়েব দম্পতির এই বিবরণ সঠিক হলে বলতে হয়, সোভিয়েটই হচ্ছে গণতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের সবচাইতে জনপ্রিয় সংজ্ঞার সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত। অবশ্য এমন কথা কেউ বলতে পারেন যে, সিডনী ও বিয়েট্রিস ওয়েব সুপরিচিত সমাজতন্ত্রী লেখক। কাজেই তাঁদের দেওয়া বিবরণের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব থাকা সম্ভব। এবং সে জন্যই আর একজন লেখক, যিনি জারের রাশিয়াকে দেখেছেন এবং সমাজতন্ত্রের প্রতি যাঁর কোন দিন কোন সহানুভূতি ছিল না, তিনি যখন ওয়েব দম্পত্তির বর্ণনাকে সত্য বলে অভিহিত করেন, তখন কথাটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

"আমি স্যার বারনার্ড প্যারেস-এর কথা বলছি। স্যার বারনার্ড প্যারেস জারের রাশিয়াতে বাস করেছেন। ১৯১৭ সালের নভেম্বরে সোভিয়েট সরকার স্থাপিত হলে তিনি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হয়ে রাশিয়াতে কাজ করেন। ব্রিটিশ সরকার তখন সশস্ত্র হস্তক্ষেপে সোভিয়েট ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার আশা নিয়ে একশ মিলিয়ন পাউন্ড নিয়োগ করেছিল। ১৯১৯ সালে স্যার বারনার্ড ইংল্যান্ডে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরে আসেন এবং ইংল্যান্ডে বলশেভিকবাদ প্রবর্তনের প্রচারের বিরুদ্ধে জবাবদানের জন্য ইংল্যান্ডের প্রত্যেকটি কাউন্টিতে প্রকাশ্য বক্তৃতা দানে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

"১৯৩৫-এর শেষের দিকে আমরা দেখি স্যার বারনার্ড আবার সোভিয়েট গেছেন। এবার তিনি যান রাশিয়াতে। এবং রাশিয়া হচ্ছে সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রিপাবলিক সমূহের ইউনিয়নের সবচাইতে বড় অঙ্গরাষ্ট্র। দেশে ফিরে এসে এবার তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার উপর ক্ষুদ্রাকার একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং সেখানে এই প্রশ্নটিকেই উত্থাপন করেন : সোভিয়েট সরকার জনসাধারণের কাছ থেকে কতখানি ব্যবধানে অবস্থিত?

"প্রশ্নটির জবাব দিয়ে স্যার বারনার্ড এবার বলেন : "জারের আমলে আমি দেখেছি, সরকার জনসাধারণের কাছ থেকে কি চরমভাবে বিচ্ছিন্ন। সেকালের সরকারি মন্ত্রীদের এবং বিশেষ করে জারতন্ত্রের শেষ দিনগুলোর মন্ত্রীদের নিযুক্ত করা হত সমাজের একটি একেবারে সংকীর্ণ গোষ্ঠী থেকে। কোন নীতি বা নিয়মশূন্য ভাবে। আমার মনের কামনা ছিল, রাশিয়ার জনসাধারণ যেন তাদের সরকারের দোরে এসে দাঁড়াতে পারে। ১৯১৭-তে কিছুকালের জন্য আমি দেখেছিলাম, জনসাধারণ যেন সরকারের নিকটবর্তীতে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তখনো আমার মনে হয়েছে যেন, স্পষ্টভাবে না হলেও রুশ জনতা আর রুশ বুদ্ধিজীবীর মধ্যে একটা ব্যবধান থেকে গেছে।... কিন্তু আজ সোভিয়েটে আমি যা দেখেছি তাতে বলতে পারি : সেই ব্যবধানের আজ আর কোন অস্তিত্ব নেই। আমি সরকারি অফিস বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, যেখানেই গিয়েছি, সেখানেই দেখেছি সরকার এবং জনসাধারণ, এদের উভয়ের উৎস অভিন্ন" (স্যার বারনার্ড প্যারেস-এর বই : 'মস্কো এ্যাডমিটস এ ক্রিটিক : মস্কো সমালোচককেও স্বাগত জানায়, পৃষ্ঠা ৩৫)

"কাজেই ওয়েব দম্পতির বক্তব্য যে, 'সোভিয়েট রাষ্ট্রের সরকার পরিচালিত হয় তার সকল বয়ঃপ্রাপ্ত নাগরিকদের দ্বারা', সে বক্তব্য সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে স্যার ব্যারনার্ড প্যারেস-এর অভিজ্ঞতা দ্বারা। এঁরা উভয়ই বলছেন, সোভিয়েট সরকার হচ্ছে, জনসাধারণের সরকার। তাঁরা উভয়ই বলছেন, সোভিয়েট সরকারের রয়েছে এমন সব বৈশিষ্ট্য যাকে আমরা এক নায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচনা করি নে। যাকে আমরা বিবেচনা করি গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য বলে।"... (প্যাট শ্লোন : সোভিয়েট ডিমোক্রাসি : পৃ. ৮-১১)

১৯৯২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘটনাবলী এবং সমাজতন্ত্র

[আমার একটি পুরনো দিনলিপি]

৩০-১-৯২ তারিখে ইনজিনিয়ার্স ইনসটিট্যুশনে 'সমাজতন্ত্র ফোরাম আহূত সেমিনার : 'সোভিয়েট ইউনিয়নের ঘটনাবলী এবং সমাজতন্ত্র শিরোনামের' আলোচনাতে সভাপতি হিসাবে একটি বক্তব্য রাখতে হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গটির কথা।

সমাজতন্ত্র ফোরামের কর্মীরা সমাজতন্ত্র ফোরাম গঠনের উদ্যোগকে বাংলাদেশের সমাজতন্ত্রের আন্দোলনের বর্তমান পরিস্থিতিতে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বলে মনে করেন। তাঁদের এ অনুভূতি তাৎপর্যপূর্ণ।

আমার সভাপতিত্ব করার ঘটনাও ঐতিহাসিক। ১৯৪৮ সালে সদরঘাটের করোনেশন পার্কে পূর্ববঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টির ঢাকা কমিটি জাতীয় পরিস্থিতির উপর একটি সভা আহ্বান করেছিল। তাতে আমার সভাপতিত্ব করার কথা ছিল। সে মিটিং শাহ্ আজিজুর রহমান এবং তাঁর সঙ্গীরা সেদিন ভেঙ্গে দিয়েছিল। কোর্ট হাউজ স্ট্রীটের কমিউনিস্ট পার্টির অফিসেও তারা আক্রমণ করেছিল।

আজ ৪৪ বছর পরে পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের সকল চিন্তাভাবনার দল এবং কর্মীদের চিন্তার বিনিময়-কেন্দ্র হিসাবে গঠিত সমাজতন্ত্র ফোরামের প্রথম আলোচনা সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালনের জন্য স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে আমি সম্মত হয়েছি। ৪৪ বছর আগেও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী একটি সংগঠনের জনসভায় সভাপতিত্ব করার দায়িত্ব পালনে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে আমি সম্মত হয়েছিলাম। আমাকে বলতে পারেন 'ভলান্টিয়ার প্রেসিডেন্ট'। আমার জীবনে এই দুবারই মাত্র সভাপতিত্ব করার ঘটনা ঘটল। অতি সাধারণ, পূর্ববঙ্গের কৃষক সমাজ থেকে উদ্ভূত একটি মধ্যবিত্তের জীবনের এই দু'টি ঘটনার কোন তাৎপর্য থাকলে তা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্য গবেষক কর্মীরা আলোচনা করতে পারেন। কিন্তু নিজের জীবনের ও মাথা, এ মাথার দুটি ঘটনা। নিজের বলে সঙ্কোচ থেকে এ ঘটনা উল্লেখ না করলে হয়ত ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে কিছুটা ঘাটতি থেকে যাবে। সে কারণেই এ দুটি ঘটনার উল্লেখ। নৈর্ব্যক্তিকভাবে দেখলে অবশ্যই আমাদের দেশ ও সমাজের পটভূমিতে কিছুটা ঐতিহাসিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'৯২-এর ২৩ জানুয়ারি ৭টি উন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশের, ১৭ সালের সময় থেকে অনুসৃত নীলনকশার সাফল্যে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ সোভিয়েট রাশিয়ার ভেঙ্গে পড়াকে আধুনিক কালের অন্যতম বিপ্লব বলে অভিহিত করেছেন।

'বিপ্লব' শব্দ বড় অসহায়! তাকে রক্ষাকারী তার কোন জনক-জননী নাই। 'বিপ্লব' নিজে না সশস্ত্র শক্তি, না মারাত্মক বিপ্লবী।

তবু একথা সত্য, সাম্প্রতিক বিশ্বে সংঘটিত নানা ঘটনার মধ্যে পূর্ব ইউরোপ এবং সোভিয়েট রাষ্ট্র সংঘ বা ইউনিয়ন অব সোভিয়েট সোসালিস্ট রিপাবলিকস'-এর ঘটনাবলী নানা দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। একটা ঘটনা বস্তুগত সত্য। নানা কারণে তার সংঘটিত হওয়া। এবং সংঘটিত ঘটনার নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। নানা চিন্তা, আদর্শের মানুষের একই ঘটনার নানা ব্যাখ্যা। হাঁ এবং না মূলক ব্যাখ্যা। ঘটনা নিজেই নিজের ব্যাখ্যা দেয় না। ঘটনা ব্যাখ্যাত হয়। ইতিহাস নিজেই কোন পাঠ নয়। ইতিহাসকে পাঠ করা হয়। যে-পাঠক পাঠ করে, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা-কামনা-বাসনা দ্বারা সেই পাঠ নিয়ন্ত্রিত হয়। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর কেবল সমাহার বা বিবরণ নয়। তাকে কোন্ পাঠক কিভাবে পাঠ করছে, সেটিই গুরুত্বপূর্ণ।

মোটকথা, শুধু 'ইতিহাস' 'ইতিহাসের সত্য', 'ইতিহাসের বাস্তবতা' ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণই নয়। 'ইতিহাস পাঠের' বিষয়টিও বর্তমান ক্রান্তিকালে আমাদের মধ্যে, আমাদের দ্বারা আলোচনার দাবী রাখে।

আমার শুভার্থিনী এক ইতিহাসের অধ্যাপিকা সম্প্রতি আমার ইতিহাসের অজ্ঞতা দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর ইতিহাসের পাঠ শুনিয়ে আমাকে অভিভূত করেছেন।

তাঁর সে পাঠের মর্মকথা : মার্কস-এঙ্গেলস, এঁরা উনবিংশ শতকের জনবিচ্ছিন্ন শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ দুজন মূর্খ ব্যক্তি। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় ইতিহাসে এঁরা বিসমার্কের সমরবাদের সহযোগী। লেনিন প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মান-এজেন্টবিশেষ। ১৯১৭ সালের বিপ্লব একটা প্রতিক্রিয়াশীল গণতন্ত্রবিরোধী ক্যুঃ ফেব্রুয়ারির গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে নস্যাৎকারী। হিটলার-মুসোলিনী তথা ফ্যাসীবাদের উত্থানের জন্য স্ট্যালিন দায়ী। স্ট্যালিন একজন নরখাদক। ২ কোটি লোকের হত্যাকারী। ২য় মহাযুদ্ধের মূল কারণ স্ট্যালিন...

আমি কিন্তু স্বীকার করি, এমনভাবে ইতিহাসকে পাঠ করার তাঁর গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। তেমনি ঘটনার দ্বিতীয় পাঠেরও অন্যপক্ষের অধিকার আছে। ইতিহাস পাঠের এই ডায়ালেকটিকসই বর্তমান মুহূর্তের প্রধান ডায়ালেকটিকস তথা দ্বন্দ্ব বলে আমার মনে হয়। এতে কারু বিরুদ্ধে রাগ-বিরাগের কোন ব্যাপার থাকার কোন কারণ নেই। এতে আপনার-আমার হতাশ হওয়ারও কোন কারণ নেই।

সেই '৪৮ সালের পরে পূর্ব বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনার এমন বিকাশে, সেই বিকাশে সংখ্যাহীন স্বাপ্নিকের আত্মদানের ঘটনা এবং বর্তমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহূর্তে সমাজতন্ত্রী স্বপ্ন ও চিন্তার এই বিস্তার ও বৈশিষ্ট্যকেই আমার একটা আস্ত বিপ্লব বলে মনে হচ্ছে। '৪৮ থেকে '৯২-এর ইতিহাসের এই পাঠ অবশ্যই আমার পাঠ। আর এ পাঠে আমি আনন্দিত, উৎসাহিত।

হ্যাঁ, আমাদের ইতিহাস পাঠও নিশ্চয়ই এক বছর থেকে আর এক বছরে বিকশিত হয়। সেও অনড় থাকে না। দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে তার সমৃদ্ধি।

আমার বাংলাদেশের একটি নাটকের নাম : 'চারিদিকে যুদ্ধ'। এই নামটিকে আমি মুখস্থ করেছি। নামটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমি মনে করি যথার্থই চারিদিকে যুদ্ধ। সর্বদা যুদ্ধ। চারিদিকে বিপ্লব। সর্বদা বিপ্লব।

'স্ট্যালিন' তো একটি প্রতীকী নাম। তাকে কবর থেকে যারা তুলেছে, তারাও বলে। সেই নামের এই এক অবদান যে, সেদিনের থিওরী অব পারমানেন্ট রিভোল্যুশন' বনাম সোস্যালিজম ইন ওয়ান কান্ট্রি'-র বিতর্কে একদেশে জবরদস্তী সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে আজ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেবার জবরদস্ত কাজ সে সমাধা করেছে। তারপর হয়েছে ইতিহাস! (সুকান্ত-র 'তারপর হবো ইতিহাস' স্মরণ করে বলছি।)

সাফল্যের যে মিটিং-এ মার্কিন বুশ আজ সভাপতিত্ব করছেন, এই মিটিংটা ১৯১৭-এর পর ১৮ থেকে ২১শের মধ্যেই অনুষ্ঠিত করতে সেদিনকার মার্কিন বুশ-রিগানরা এবং ব্রিটিশ চার্চিলরা চেয়েছিল। মিটিংটা আহ্বান করতে তাদের খানিকটা দেরি হয়েছে। ৭০ বছরের অধিক। বুশ সাহেবরা আনন্দে বলছেন : এ আর এমন দীর্ঘ সময় কি।

আমরাও বলি : এ আর এমন দীর্ঘ সময় কি?

কাল নিরবধি। এই কালপ্রবাহে কত বুশ-রিগান, রিগান-বুশ আসবেন যাবেন!

তা আমাদেরও শিক্ষার ব্যাপার আছে। ইতিহাস পাঠ থেকে শিক্ষা। অতীত থেকে বর্তমানে ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা।

এটাও স্বীকার্য : আমার নিজের ও আমার প্রতিপক্ষীয় আদর্শের বাহকের পাঠ দিয়ে যেমন, এই পাঠ-নিরপেক্ষভাবেও তেমনি,– নানা কার্য-কারণে যে ইতিহাস তৈরি হয় তার একটা নিজস্ব অস্তিত্ব আছে।

ইতিহাসের রসায়ন বলে কি কিছু হতে পারে? আমি জানি নে।

একেবারে একটা চাষাড়ে দৃষ্টান্ত দিই। চাষার পোলা এর অধিক কেমন করে যাবে? পান-চুন-সুপুরি : কার অনুপাত কি, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু এটা তো সত্য, না পান, না চুন, না সুপারি : কেউ একা সেই রংটি তৈরি করে না যেটি তাম্বুল সেবক বা সেবিকার ওষ্ঠপ্রান্তে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

এ কথা শুধু এটুকু বলার জন্য যে, ইতিহাসে বুদ্ধিমান ব্যক্তির যেমন ভূমিকা আছে, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা : মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুং এবং এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংগ্রামী কুশীলবদের প্রতিপক্ষীয় বিশিষ্ট চরিত্রের যেমন ভূমিকা আছে, তেমনি এদের নিরপেক্ষভাবেই ইতিহাসের অস্তিত্ব আছে : এদের কারণে যেমনি, এদের বাদেও তেমনি। কেবল এদের কারণে নয়। আবার এদের বাদেও নয়। না কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে আমাদের ইতিহাসের একমাত্র নিয়ামক ভাবা উচিত, না কোন দেশ বা রাষ্ট্রসমূহকেও ইতিহাসের একমাত্র নিয়ামক ভাবা সঙ্গত।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙ্গে গেছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন ভাঙ্গার সাফল্যে বুশদের আনন্দকে আমার 'পাগলের গো বধে আনন্দ' বলে মনে হয়। 'পাগলের গো বধে আনন্দ' কথাটার অর্থ কি? অর্থ কি এই যে, 'গো'টা বেঁচে থাকাতেই তার স্বার্থ, গো বধে তার ক্ষতি। তাতে তার আনন্দ পাওয়া তার অসুস্থতার লক্ষণ। তা, অসুস্থ বুশরা মানুষের চেতনার স্বাভাবিক বিকাশের ব্যাপারকে কেমন করে হৃদয়ঙ্গম করবে?

সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ায় আমিও খুশী। আমি জানি কথাটা বলা উচিত নয়। বলাটা মারাত্মক। এবং এর ব্যাখ্যা সহজে বুঝানো মুশকিল।

আমার চিন্তাটাকে মূর্ত করে বললে আমি বলব : সোভিয়েট ইউনিয়নের সংবিধানের ধারার মধ্যেই ছিল : সোভিয়েট হচ্ছে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারসহ স্বেচ্ছাসম্মতির ভিত্তিতে গঠিত রিপাবলিকসমূহের ইউনিয়ন : a voluntary union of republics with right to secede. [Article 72 : Each union Republic shall retain the right freely to secede from the U.S.S.R]

আমি রাজনৈতিক দিকটির কথা বলছি। অর্থনৈতিকভাবে কতটা সমাজতান্ত্রিক ছিল বা ছিল না, সেটা ভিন্ন আলোচনা।

সোভিয়েট সংবিধানের আওতায় তার রিপাবলিকগুলি ৭০ বছরে সাবালক হয়েছে। সাবালক হয়ে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে স্বাধীন হয়েছে। এই বিকাশে অস্বাভাবিকতা কোথায়? মানবিকভাবে ব্যাখ্যার ব্যাপার এইটুকু থাকতে পারে যে, নাবালক পোলা সাবালক হয়ে ঘর ভাঙ্গার সময়ে বাপকে 'শালা' বলে গাল দিয়ে ঘরের জিনিসপত্তর তছনছ করে পৃথক হয়েছে। পাড়া-প্রতিবেশীরা দুঃখ করেছে : আহা! এতদিনে বড় বাড়িটা ভেঙ্গে গেল! যে-বাপ এতদিন খাইয়ে পরিয়ে বড় করল, মানুষ করল, তাকেই পোলাটা এমনভাবে অস্বীকার করল! কিন্তু পাড়া-প্রতিবেশীর এমন মানবিক দুঃখে পৃথিবীর কোন্ পরিবারের নাবালক পোলা সাবালক হয়ে ঘর ভাঙ্গার সময়ে বাপকে 'শালা' কিংবা 'শালার বাপ' বলে গালি না দিয়েছে? বাপকে অস্বীকার করাতেই পোলার সাবালকত্বের আলামত।

রাশিয়াকে শিল্পে বিকশিত করেছে কে? সোভিয়েট ইউনিয়ন : তার রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা। মধ্য এশিয়ার সামন্ততান্ত্রিক যুগের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর পায়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেকল খুলে দিয়েছে কে? তার বোবা মুখে ভাষা যুগিয়েছে কে? সোভিয়েটের আদর্শগত রাষ্ট্রব্যবস্থা।

বিকাশের একটা পর্যায়ে ১৫টি রিপাবলিক যদি ১৫টি বিচ্ছিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে গঠিত হয় তাতে মানুষের জীবনের বিকাশের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা কোথায়? দুঃখের কথা আলাদা। কোন বিকাশ ও বিবর্তনই দুঃখশূন্য নয়।

বুশের ব্যাপারে 'পাগলের গো বধে আনন্দ' কথাটা এদিক থেকে যে, বুশরা 'ঘুঘু দেখেছে, ঘুঘুর ফাঁদ দেখে নি।' বুশ-বেকার এক মস্কোতে দৌড়েই কূল পায় নি। এখন তাকে তের মস্কোর কাছে দৌড়াতে হবে।

সবে তো সেই নাটকের যবনিকার উন্মোচন। অবশ্যই এই নাটকের ক্রমপ্রকাশমান রহস্য বিগত নাটকের নাটকীয়তাকে অতিক্রম করে যাবে। তাই যায়। পরবর্তী পূর্ববর্তীকে সব সময়েই অতিক্রম করে যায়। পরবর্তী পূর্ববর্তীর তুলনাতে সব সময়ই জটিলতর হয়।

* * *

'সমাজতন্ত্র' শব্দটা না আধুনিক, না বাসি। মানুষের সমাজের আদি থেকেই এ শব্দের অস্তিত্ব। সমাজের সঙ্গেই সমাজতন্ত্রের জন্ম। সমাজের তন্ত্রই সমাজতন্ত্র। আজ যে-মূর্খরা সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ভীত এবং তাকে অস্বীকার করতে উদ্যস্ত, তারা অ-সামাজিক, এ্যান্টি-সোসাইটি। মানুষের সমাজ অনিবার্যভাবেই সামাজিক। মানুষ নিজে সামাজিক জীব। যৌথ জীব। দ্বন্দ্বমূলক বিকাশের এ এক বৈশিষ্ট্য যে, অচেতন সামাজিক মানুষ যত সচেতন হতে থাকে তত সে তার মূল বৈশিষ্ট্য সামাজিকতাকে অস্বীকার করার প্রবণতা দেখায়।

কিন্তু অসামাজিক হয়ে তো মানুষের সমাজ অস্তিত্বমান থাকতে পারে না। যৌক্তিকভাবেই এটা যে অচিন্ত্যনীয় : এ সত্যকে হাজার লক্ষ বছরের ঘটনা, দুঘটনা, বিকাশ-বিবর্তনের মাধ্যমেই মাত্র মানুষ ক্রমান্বয়ে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

এবং যেদিন তা হবে, সেদিন সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সামাজিক মানুষের বিরুদ্ধতারও অবসান ঘটবে।

এই অবশ্যই কল্পনা। ভবিষ্যতের কল্পনা। কিন্তু প্রক্রিয়াটা কল্পনা নয়। বাস্তব প্রক্রিয়ার যৌক্তিক পরিণতির কল্পনা।

মার্কস বলেছেন, অর্থনৈতিকভাবে বিষমরূপে বিভক্ত সমাজ যখন আর এরূপে বিভক্ত থাকবে না, শ্রেণী শব্দেরও তখন বিলোপ ঘটবে। শ্রেণীহীন সমাজে শ্রেণীর কোন অস্তিত্ব থাকবে না। সে কথার অনুরূপেই এ কথা যে, মানুষের অ-সামাজিক সমাজ যখন যথার্থ সামাজিক সমাজ হবে, তখন সমাজ শব্দ এবং সমাজতান্ত্রিক শব্দের জন্যও আর মানুষকে লড়াই করতে হবে না। অ-সমাজতন্ত্রের মধ্যেই সমাজতন্ত্রের লড়াই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ মাত্রই কর্মী এবং কর্মপ্রার্থী। যে-সমাজ ব্যবস্থায় একটি কর্মপ্রার্থী মানুষও অনিচ্ছায় কর্মহীন, জীবীকাহীন ও বেকার থাকে এবং থাকবে, সে সমাজব্যবস্থা অ-সামাজিক সমাজব্যবস্থা। অ-মানবিক সমাজব্যবস্থা। এ্যান্টি-সোসাইটি সোসাইটি। এ্যান্টি হিউম্যান, হিউম্যান। সেই এ্যান্টি-সোসাইটিকে স্বাভাবিক, সুস্থ সোসাইটিতে পরিণত করাই স্বাভাবিক মানুষের ক্রম-সচেতন লড়াই। এ্যান্টি-হিউম্যানকে ক্রমান্বয়ে হিউম্যান করে তোলা। মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার লড়াই। এ প্রক্রিয়ায় অস্বাভাবিকতার কিছু নেই।

কিন্তু কবে এ প্রক্রিয়ার শেষ? এর একমাত্র জবাব : এর কোন শেষ নেই। অশেষ শেষের এ প্রক্রিয়া।

এমনভাবে ভাবতে কিছুটা নারভাসনেস আসে আমাদের। তাই এ নিয়ে বেশি ভাবা ভাল নয়। কিছুটা ভাবব, কিছুটা ভাবব না। তাই ভাল। জীবনের বহমান প্রক্রিয়া ভাবা, না-ভাবার মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হচ্ছে। সেদিক থেকে ভাবনার কোন কারণ নেই।

এখন আমরা কি শ্লোগান দেব : সমাজতন্ত্র— জিন্দাবাদ! না, শ্লোগান দেবার দরকার হবে না। সমাজ থেকেই সমাজতন্ত্র। জিন্দাবাদ, মুরদাবাদের অপেক্ষা করে না সমাজতন্ত্রের সত্য।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত'

শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত'খানা পড়ে শেষ করলাম। শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্ম ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে। মৃত্যু ১৯১৯। 'আত্মচরিত' রচনা করেন ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে। তখন তাঁর বয়স এই হিসাবমত ৬১ বৎসর।

শিবনাথ শাস্ত্রী উনবিংশ শতকের বাংলার, বিশেষ করে বাংলার হিন্দু সমাজের অন্যতম চিন্তাবিদ। রাজা রাম মোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশব চন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক বাংলায়, বিশেষ করে তার হিন্দু সমাজে নতুন চিন্তার স্রোত সৃষ্টি করেন। পুরাতন সমাজের নানা সংস্কার এবং আচরণের উপরে এঁরা আঘাত হানেন এবং বিদ্রোহ করেন। এই নূতন শক্তির আঘাতে যে আলোড়ন বাংলার সমাজ মানসে সেদিন সৃষ্টি হয়েছিল তাকে উনবিংশ শতকের রেনেসা বা নব জাগরণ বলা হয়। উনবিংশ শতকের এই নবচেতনা সম্পর্কে অনেক অস্পূর্ণ পুস্তক রচিত হয়েছে। তার সঙ্গে আমাদের অর্থাৎ মুসলমান সমাজের তরুণদের ব্যাপক পরিচয় কম। এমন কি বর্তমান শতকের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দশক থেকে যখন আধুনিক শিক্ষা মুসলিম সমাজের মধ্যে অধিকতর ব্যাপকভাবে প্রবেশ করতে শুরু করেছে এবং একটি শিক্ষিত মধ্য শ্রেণী তৈরি হতে আরম্ভ করেছে তখন মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশের মধ্যে যে নতুন ভাবনা চিন্তা ও বিশিষ্টতার প্রকাশ ঘটছিল, তার সঙ্গেও আমরা আন্তরিকভাবে পরিচিত নই। তার ফলে চিন্তার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কালের তরুণ সমাজে সাধারণভাবে একটি ঐতিহ্যহীন শূন্যতার ভাব ধরা পড়ে। কালের ইতিহাস কালান্তরের হাতে না থাকলে কালান্তরকে নূতন ইতিহাস তৈরির ক্ষেত্রে শূন্যতা, উদ্দেশ্যহীনতা এবং বিভ্রমের শিকার হতে হয়। এ কারণে যে কোন যুগের সমাজের মানসধারার ইতিহাস এবং সে ইতিহাসের সকল উপাদানকে আমার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বোধ হয়।

সমাজ বিকাশের একটি বিশেষ মূল্যবান উপাদান হচ্ছে কালের মধ্যে যারা বেঁচেছিল তাদের আত্মচরিত। ব্যক্তির আত্মচরিত কেবল আত্মকথন নয়। যে-সমাজ ও পরিবেশে ব্যক্তি বেঁচেছিল সে সমাজ ও পরিবেশ তাকে কিভাবে আঘাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিল এবং প্রভাবিত করেছিল তার যেমন পরিচয় পাওয়া যায় ব্যক্তির আত্মচরিতে, তেমনি ব্যক্তি কিভাবে সেই সমাজ ও পরিবেশকে আঘাত করেছিল, তাকে প্রভাবিত করেছিল কিংবা প্রভাবিত করার প্রয়াস পেয়েছিল তারও আভাস পাওয়া যায় ব্যক্তির আত্মচরিতে। ব্যক্তি এবং সমাজ বা পরিবেশ : এদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতেই কালের সৃষ্টি। এটিই কালের ইতিহাস। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতেই ঘটনার সৃষ্টি। সাধারণ ইতিহাসে অবশ্য বড় বড় ঘটনাকে পাওয়া যায়। পাওয়া যায় ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ, ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ, একদিনকার সতীদাহ প্রথার কথা, অপর কালে সতীদাহ নিষিদ্ধ করণের কোন রাষ্ট্রগত আইনের উল্লেখ ইত্যাদি। কিন্তু ঘটনার শুধুমাত্র উল্লেখে তার পটভূমিটি আসে না। বিন্দু বিন্দু করে কিভাবে এই ঘটনার সৃষ্টি হল, তা আমাদের অগোচরে থেকে যায়। তাই ইতিহাসের বৃহৎ ঘটনাগুলি সাধারণ পাঠকের কাছে কেবল যে বিস্ময়কর বলে বোধ হয়, তাই নয়। তাদেরকে মনে হয় অলৌকিক। তাই ইতিহাসের ঘটনার স্বাভাবিকতার বোধের জন্য পরিচয় আবশ্যক ঘটনার পটভূমির। আর এই পটভূমি তৈরি হয় ব্যক্তি ও সমাজের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়। এ কারণে ব্যক্তির আত্মচরিত ইতিহাসের অমূল্য উপাদান। ছোটবড় সকল ব্যক্তিই ইতিহাসের চরিত্র। ইতিহাসের কুশীলব। সকল ব্যক্তিই যদি আত্মচরিত লিখে রেখে যেত বা লিখে রেখে যেতে পারত, তাহলে ইতিহাসের কোন ঘটনাই আমাদের কাছে অলৌকিক বলে বোধ হত না। কিন্তু ব্যক্তিমাত্রই তা পারে না। সে কারণে ব্যক্তি এবং চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা তাঁদের আত্মচরিত তৈরি করেন, তাঁরা অবশ্যই বিশিষ্ট। তাঁদের আত্মকথনের মধ্যে আমরা তাঁদের কালের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আভাস পাই।

অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক সাহেব আত্মজীবনীকে বিশেষ মূল্যবান মনে করেন। তিনিই আমাকে একবার বলেছিলেন : 'আত্মচরিতমূলক রচনার উপর একটু লিখুন না।' চিন্তার ক্ষেত্রে রাজ্জাক সাহেব আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। তিনি শহীদ মুনীর চৌধুরীকেও উৎসাহিত করেছিলেন বাংলা আত্মজীবনীর উপর কাজ করতে। মুনীর বোধ হয় তার ফলেই সাহিত্যপত্রে মীর মোশাররফ হোসেনের আত্মচরিতের উপর কয়েকটি প্রবন্ধ তৈরি করেছিলেন।

আত্মচরিতের ক্ষেত্রে দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনী এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত বিশেষভাবে খ্যাত। মুসলমান চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিকদের মধ্যে মীর মোশাররফ হোসেনের 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'-র পরে এই শতকে কয়েকখানি আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে শিক্ষাবিদ আবদুর রহমান খানের 'আমার জীবন' রয়েছে। কবি জসীম উদ্‌দীনও আত্মচরিতমূলক রচনা লিখেছেন। কবি সুফিয়া কামালও 'আমার কালের কথা' বলে কিছু লিখেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনীতিক জনাব কামরুদ্দিন আহমদ 'মধ্যবিত্তের বিকাশ' নাম দিয়ে তাঁর আত্মজীবনী তৈরি করেছেন। তিনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে, বিশেষ করে পাকিস্তান আন্দোলনে, ঢাকায় কিছুটা প্রগতিবাদী মুসলিম লীগ তৈরিতে এক সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাছাড়া, আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন 'আমার দেখা পঞ্চাশ বছরের রাজনীতি।' জনাব আতাউর রহমান খান লিখেছেন 'ওজারতীর দুবছর'। এ সব অবশ্য সাম্প্রতিক সৃষ্টি। তবু মুসলিম চিন্তাবিদ, রাজনীতিক ও সাহিত্যিকদের রচিত আত্মচরিতমূলক রচনাগুলির একটি তালিকা তৈরি করে তাদের উপর একটি আলোচনা করতে পারলে বিশেষ ভাল হয়। তাতে মুসলিম সমাজের বিকাশের একটি অন্তরঙ্গ আভাস পাওয়া যাবে।

শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতখানা কেবল যে তৎকালীন বাংলার হিন্দু সমাজের চিত্র হিসাবে মূল্যবান, তাই নয়। সাহিত্য হিসাবেও গ্রন্থখানি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এমন স্বচ্ছন্দ, সহজ এবং ঘনিষ্ঠ রীতির রচনার সাক্ষাৎ খুব কমই মেলে।

"... আমাদের বাড়িতে প্রায়ই ২/৩টা বিড়াল থাকে। সে সময় একটা কদাকার বিড়াল ছিল। সে কদাকার বলিয়া মা তাহাকে হনুমান বলিয়া ডাকিতেন, আমরাও হনুমান বলিতাম। হনু বড় চোর ছিল। পোর (শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রপিতামহ) পাতের মাছ চুরি করিয়া খাইত, তিনি দেখিতে পাইতেন না। এই জন্য মা প্রথম প্রথম পোকে আহারে বসাইয়া বাম হস্তে এক গাছি ছড়ি দিয়া আসিতেন; বলিয়া আসিতেন "মধ্যে মধ্যে বাড়িগাছটা আপসো, বেড়াল আসে।" পো মধ্যে মধ্যে ছড়িগাছটা লইয়া বিড়ালের উদ্দেশে মারিতেন। একদিন দেখা গেল, হনুমান লম্বা হইয়া পোর পাত হইতে চুরি করিয়া মাছ খাইতেছে, পো তাহার উদ্দেশে ছড়ি মারিতেছেন, সে ছড়ি হনুর পৃষ্ঠে চপ চপ করিয়া পড়িতেছে, হনুর গ্রাহ্যই নাই। তাহার পর হইতে মা আমাকে পো-র পাতের নিকট ছড়ি হস্তে বিড়াল তাড়াইবার জন্য বসাইয়া রাখিতেন। তাহার পর আর বিড়াল আসিতে পারিত না। কিন্তু একদিন যে ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহা বলিতে হাসিও পাইতেছে, লজ্জাও হইতেছে। সেদিন আমি বসিয়া আছি, পো আহার করিতেছেন। শুকত, ডাল, মাছের ঝোল একে একে সব খাইলেন; আমি ঠিক বসিয়া আছি, কিছুই বিভ্রাট ঘটিল না। কিন্তু শেষে যখন দৈ, কলা ও সন্দেশ দিয়া ভাত মাখিলেন, তখন এই পেটুকের পক্ষে স্থির থাকা কঠিন হইল। অলক্ষিতে ক্ষুদ্র হস্তে এক এক থাবা ভাত গালে তুলিতে লাগিলাম। আমার প্রপিতামহের নিয়ম ছিল যে আহারে বসিয়া কথা কহিতেন না; এ নিয়ম তিনি ৮ বৎসর হইতে ১০৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত পালন করিয়াছিলেন। আর একটি নিয়ম এই ছিল যে, আহারের সময় কেহ স্পর্শ করিলে আহার হইতে বিরত হইতেন। আমার ক্ষুদ্র হাতের থাবা উঠিতেছে, উঠিতেছে, একবার হাতে হাত ঠেকিয়া গেল। অমনি পো শিহরিয়া মাকে ইশারাতে ডাকিতে লাগিলেন, "উঁ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঁ!" অর্থাৎ কে আমাকে ছুঁইয়া দিল, দেখ। মা আসিয়া দেখেন পেটুক পুত্রটির হাতে মুখে দইয়ের দাগ, আর লুকাইবার যো নাই। পো-র কানে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আর উঁ কি? ঐ 'বাবা'। বড় যে আদর দেও!" শুনিয়া প্রপিতামহ মহাশয় হাসিয়া উঠিলেন, "হাঃ হাঃ, বেশ করেছে, তবে ও-ই সব খাক" বলিয়া আহার ত্যাগ করিলেন। কিন্তু এ বন্দোবস্ত মার সহ্য হইল না। তিনি আমার গলা টিপিয়া থাবড়া দিয়া তুলিয়া লইয়া গেলেন; বলিতে লাগিলেন, "আচ্ছা তো বেড়াল তাড়াতে বসিয়েছি, নিজেই বেড়াল হয়েছে।"

এইভাবে একান্ত ঘনিষ্ঠতায় লেখক তাঁর জীবন কাহিনী বলে গেছেন। আর সে কাহিনী কেবল পরিবার পরিজন, আত্মীয়-স্বজনের সুখ-দুঃখের কাহিনী নয়। গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। কিন্তু গোঁড়া হলেও পিতার মধ্যে ছিল নিষ্ঠা, এক গুঁয়ে এক রোখামী। যাকে অন্যায় মনে করতেন তার প্রতি আপোষহীন মনোভাব। এই পিতার পুত্র শিক্ষিত হতে হতে পৌত্তলিক সংস্কারাচ্ছন্ন পিতৃধর্মের প্রতি বিশ্বাস হারাতে শুরু করলেন। কেশব চন্দ্র সেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম ধর্মের দর্শন এবং একেশ্বরবাদ তাকে আকর্ষণ করতে আরম্ভ করল। সেই আকর্ষণে তিনিও একদিন পিতার মতই একক নিষ্ঠা নিয়ে পিতৃধর্ম পরিত্যাগ করে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। ব্রাহ্মণের উপবীত পরিত্যাগ করলেন। কেবল নূতন ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ নয়। এই নূতন ধর্ম প্রচারের জন্য পিতৃগৃহ ত্যাগ করলেন। পিতা তাঁকে ত্যাজ্য পুত্র করেছেন। সে অভিশাপকে তিনি বরণ করেছেন। নিজের চাকুরী পরিত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্মের সারাক্ষণের কর্মী হয়েছেন। সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে ধর্ম অভিযাত্রীর অনিশ্চিত জীবনকে গ্রহণ করেছেন।... এরও মর্মস্পর্শী কাহিনী এঁকেছেন লেখক তাঁর অনুপম ভাষায়।

একশত বৎসরেরও পূর্বের কথা। উনিশ শতকের মধ্যভাগে শিক্ষিত হিন্দু সমাজে নূতন ভাবধারা দ্বন্দ্ব সংঘাত, আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, তার চিত্র। কিন্তু লেখকের সাবলীল কথনে শতাব্দীর পূর্বকার সেই সমাজে ফিরে যেতে আমাদের বিন্দুমাত্র অসুবিধা ঘটে না।

শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মকথায় প্রধানতঃ ব্রাহ্ম ধর্মের বিকাশ, তার প্রচার, তার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিভাগের চিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু লেখকের স্মৃতি কেবল আপন ধর্ম প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ একাধিকবার ধর্ম-ভিক্ষুর বেশে ভ্রমণ করেছেন। আর এই ভ্রমণকালে ভারতের বিভিন্ন স্থানের যে সকল সংস্কার ও সামাজিক আচরণ লেখকের অভিজ্ঞতায় এসেছে তার তিনি বর্ণনা দিয়েছেন। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে হিন্দু সমাজের বর্ণ প্রথা যে কিরূপ অনড় এবং অমানবিক রূপ গ্রহণ করেছে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের বর্ণনাতে তা প্রকাশ পেয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু ভারতবর্ষ নয়। ইংল্যান্ডের সমাজ কিরূপ, ইংরেজ জাতি কিভাবে উন্নতি সাধন করেছে কেবল তা দেখার মানসে শিবনাথ শাস্ত্রী ইংল্যান্ড গিয়েছিলেন। তাঁর জীবনকথায় ইংরেজ চরিত্রের দোষ এবং গুণ উভয় দিকের প্রকাশ সূচক নানা কাহিনী তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। এই প্রসঙ্গে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন জ্ঞানীগুণীর পরিচয়ও তিনি প্রদান করেছেন। এসব কারণে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত'খানা উনবিংশ শতকের হিন্দু সমাজে নূতন ভাবধারার প্রবেশ ধর্ম এবং সামাজিক আচার আচরণের ক্ষেত্রে যে সংঘাত ও তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল এবং যে আলোড়নের মধ্য দিয়ে নতুন বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল তার একটি দর্পণ হিসাবে অতীব মূল্যবান গ্রন্থের চরিত্র ধারণ করেছে।

১৪-৭-৭৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্বে আমাদের অস্তিত্ব

জাতীয় রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মেলনের নবম বার্ষিকী অধিবেশনে যোগদানের সুযোগ আমার জীবনে একটি অনন্যসাধারণ ঘটনা। জাতীয় রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মিলন পরিষদের আমন্ত্রণে আমি সঙ্কোচবোধ করেছি। আমার সঙ্কোচকে কাটাবার জন্য তাঁরা বলেছেন : আপনি বরিশালের সন্তান। এমন কথায় আমার কৈশোরের বরিশাল : তার জাহাজ ঘাট, কীর্তনখোলার তীরের ঝাউবনের গুঞ্জরণ, জিলা স্কুল, বেল ইসলামিয়া হস্টেল, জগদীশ আর দীপালী থিয়েটার আমার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে। কিন্তু সে বরিশাল তো আজ পরিবর্তিত। বর্তমানের বরিশালের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। বর্তমান সম্পর্কে নানা আফসোসের কথা উঠতে পারে। প্রত্যেক বর্তমানই বর্তমানকে নিয়ে আফসোস করে। আফসোসের কারণ নিশ্চয়ই থাকে। কিন্তু বর্তমানেই আবার প্রোথিত হয় ভবিষ্যতের বীজ। ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। বরিশালের বর্তমানেও আশাময় ভবিষ্যতের বীজ উপ্ত হচ্ছে। আফসোসকে ভারী করে লাভ নেই। আমি আফসোস বোধ করি নে। কারণ বর্তমানের বরিশালেও রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের আমি দেখতে পাই। তাঁরা আমার মত বয়সের লোকদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁদের উদ্যোগে নবম রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন গভীর তাৎপর্যের বাহক।

মহৎ ঐতিহ্যের পরিচয় এবং বোধ দ্বারা আমাদের বর্তমানকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সর্বজন শ্রদ্ধেয়া বেগম সুফিয়া কামাল বলেছেন : অশ্বিনীকুমার, শেরে বাংলা, কামিনী রায়, জীবনানন্দ দাস, মুকুন্দ দাসের এই বরিশাল। আমি স্মরণ করি প্রয়াত মনোরমা মাসিমাকেও। তিনিও যেমন আমাদের অপর এক সংগ্রামী জাতীয় ঐতিহ্য, তেমনি বেগম সুফিয়া কামাল আমাদের সকল মহৎ ঐতিহ্যের পতাকা বহনকারী সংগ্রামী পথিকদের এক অনন্য অগ্রবর্তিনী। আমাদের সকলের শ্রদ্ধা এবং ভালবাসার পাত্রী।

জাতীয় রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মেলন আমাদের দেশের সকল মহৎ ঐতিহ্যকে বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত করার নীতিকে তাদের পথ চলার নীতি বলে ঘোষণা করেছেন। কুমিল্লার অভয় আশ্রমের নব্বুই অতিক্রান্ত পরিমল দত্ত; পরিমল দাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁরা সম্মান-সমাদরে আহ্বান করে এনেছেন বরিশাল এই সম্মেলনে। সম্মেলনের তিনি উদ্বোধন করেছেন। এই প্রবীণ শিল্পী ও সাধক যখন তাঁর বিনয়-নম্র কণ্ঠে জীবন দেবতাকে উদ্দেশ করে গেয়ে উঠলেন : আমরা সুরের কাঙাল..., তখন সেদিন আমার চোখের পাতা সিক্ত হয়ে উঠেছিল। সঙ্গীত ও শিক্ষার আর এক সাধক শ্রী পঞ্চানন ঘোষকে আপনারা সম্মাননা জানিয়েছেন। সমগ্র ব্যাপারটিতেই আমি উদ্বুদ্ধ বোধ করছি।

তাই বলছিলাম, সমস্ত সংকট আর প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমি হতাশা বোধ করি নে। জীবন তো অনিবার। জীবন তো মশাল থেকে মশালের রিলে রেস। পূর্ব-প্রজন্ম এসে তার হাতের মশাল পরবর্তী উত্তরাধিকারীর হাতে তুলে দিতে চায়। সে মশাল নিয়ে সামনে ছুটে চলার দায়িত্ব পর প্রজন্মের : বর্তমানের।

মহৎ ঐতিহ্যের মশালকে আমাদের ধারণ করতে হবে। তাকে উজ্জ্বলতর এবং বিশালতর করে দিতে হবে। সেই ব্রতকে সাধন করার স্বাক্ষর আমি লাভ করেছি বিগত তিনদিনের অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকদের আন্তরিকতায়, বর্ষীয়দের, শিল্পীদের পরিশ্রমে, বিনয়ে, শৃঙ্খলায়, স্মীত আচরণে এবং দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর অকৃপণ সহানুভূতি এবং সহযোগিতায়।

তাই বলছিলাম আমি আফসোস বোধ করি নে।

আমার এমন বয়সে, এমন স্থানে, এমন সম্মিলনীতে নানা অনুভূতির উদয় হয় মনের মধ্যে। তাকে প্রকাশ করে বলা আমাদের ক্ষমতার বাইরে। আমি না কথক, না লেখক। লিখিতভাবে কিছু বলার অনুরোধ আছে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে। এবং সে লেখাতেও আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি এবং বারংবার সেটুকুই বলব : রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্বেই আমাদের অস্তিত্ব। আমার অস্তিত্বে রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব।

সেটুকু বলার জন্য বলি :

দেহ আর মন নিয়ে মানুষ। দেহের খোরাক খাদ্য দ্রব্য : ভাত, ডাল, মাছ তরকারী।

মনের খোরাক সংস্কৃতি : কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য।

এ দুয়ের ভারসাম্যহীনতাতেই অসুস্থতা। দেহের ক্ষুধায় মনের দৈন্য। অন্নহীন মানুষ, মানুষ নয়। অন্নই প্রাণ। এ্যারিস্টটল, রুশো, গ্রীন, মার্কস : এঁরা বলেছেন : যে-মানুষ বুভুক্ষু সে স্বাধীন মানুষ নয়। সে দাস। সে রাষ্ট্রের 'সিটিজেন' নয়। সে 'জেনিজেন'। নাগরিক নয়। নাগরিকেতর। কিন্তু রুচিহীন ভুক্ত দেহেও বিকারের বাস। সে স্থূলতায় স্ফীত। সেই স্থূলতা থেকেই হত্যা, ধর্ষণ, রাহাজানী, ছিনতাই।

সংস্কৃতির বিকাশ কেবল মনের সুস্থতার জন্যই অপরিহার্য নয়। সংস্কৃতির বিকাশ ব্যতীত গণতান্ত্রিক রাজনীতিক বিকাশও সম্ভব নয়। সংস্কৃতি যেখানে বন্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং বন্ধ্যা সেখানেই স্বৈরতন্ত্র, সাম্প্রদায়িকতা, কুসংস্কার, অজ্ঞতা এবং বর্বরতার অবাধ বিচরণ। ইংরেজিতে 'পলিটিক্যাল কালচার' বলে একটি কথা আছে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি। জনতার রাজনৈতিক সংস্কৃতি উন্নত না হলে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, ইহলৌকিকতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বিকাশ লাভ করতে পারে না।

এই কারণেই রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মেলন এবং প্রগতিশীল অপরাপর সাহিত্য, সংস্কৃতি, চিত্রকলা, ভাস্কর্যের প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনের অপরিহার্যতা।

রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মেলন কেবল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সম্মেলন নয়। তেমন হলে আমার মত অসঙ্গীতজ্ঞের এখানে আগমনের কোন অধিকার থাকত না।

এমন অসঙ্গীতজ্ঞকে কোন দায়িত্ব দানের দুটি তাৎপর্য : ১ অসঙ্গীতজ্ঞ, অসাংস্কৃতিককে সাংস্কৃতিক হওয়ার সুযোগ দান। ২ রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মেলন কেবল সঙ্গীতের ব্যাপার নয়। কেবল সুরের ব্যাপার নয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের বাণী আপামর মানুষের মনের দ্বারে পৌঁছতে সুরের অপেক্ষা করতে হয় না। অবশ্য সুর তাকে অকথিত, অলৌকিকভাবে আমাদের অন্তরে সে বাণীকে পৌঁছে দেয়। কাজেই একজন রবীন্দ্র সঙ্গীতজ্ঞ ও শিল্পীর কাছে আমরা যারা অসঙ্গীতজ্ঞ, অ-শিল্পী তাদের ঋণের শেষ নেই।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের বাণী আমাদের সুখ, দুঃখ, হাসি; কান্না, প্রেম, ভালবাসা, প্রার্থনা, বেদনা, বিরহের বাণী : যে বাণী আমাদের অন্তরের গভীরে হয়ত অনুরণিত হয়। কিন্তু তার ভাষা দিতে আমরা অক্ষম। রবীন্দ্রনাথ আমাদের অন্তরের সেই অনুভূতিকে ভাষা দিয়ে আমাদের জীবনবোধকে সার্থক করে তোলেন। মহা দুঃখ, মহা-বিপর্যয়, মহা শোকের মধ্যে জীবনের, তথা বাঁচার সংগ্রামের সার্থকতাবোধ আমরা তাতে লাভ করি।

আমার মত অ-শিল্পী, অসঙ্গীতজ্ঞ : এমনকি রবীন্দ্র জগতের বিচিত্র ক্ষেত্রের সঙ্গে স্বল্প পরিচিত ব্যক্তির বর্তমান ভূমিকাতে আমি একান্তই বিব্রত।

উদ্যোক্তারা কেন আমাকে আহ্বান করেছেন ? প্রশ্নটি নিয়ে নানাভাবে আমি চিন্তা করেছি।

একদিকে এটি জাতীয় রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মিলনের উদ্যোক্তাদের উদারতা। অসাংস্কৃতিককে কিছুটা সাংস্কৃতিক হওয়ার সুযোগ দান।

অপরদিকে উদ্যোক্তাদের এ একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়কও হতে পারে।

রাজধানী ঢাকা থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মেলনকে জেলা থেকে জেলায় বিস্তারিত করে দেওয়ার চিন্তা, উদ্যোগ এবং আয়োজন যথার্থই তাৎপর্যের বাহক এবং প্রশংসার বিষয়। রবীন্দ্রনাথকে বিস্তারিত করে দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথকে সার্বজননীন করতে হবে। অজ্ঞ, বর্বর, চিন্তাহীন আমাদের সকলকে রবীন্দ্র-সংস্কৃতি তথা চিন্তার সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচিত করিয়ে দিতে হবে। আমাদের টেনে তুলতে হবে। আমাদের সকলকে হাতে ধরে রবীন্দ্র-সংস্কৃতির জলসায় নিয়ে যেতে হবে। রবীন্দ্র-সংস্কৃতিকে বাঙালির সার্বজনীন সংস্কৃতিতে পরিণত করতে হবে। যে-সংস্কৃতি হবে আমাদের জীবনের পায়ের তলার শক্ত মাটি। যে-মাটিতে দাঁড়িয়ে আমাদের জীবন ফুলে-ফলে পূর্ণ হয়ে উঠবে। নানা দিকে নিজেকে সে উদ্ভাসিত করে দিবে। যে-রবীন্দ্র মাটিতে দাঁড়িয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে যাওয়ার সাধনা করতে পারব।

পুনরায় বলা আবশ্যক : রবীন্দ্রনাথের মাটিতে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করার সাধনা। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বেঁচে থাকার, বিকশিত হওয়ার কিংবা রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করার বর্বর অহঙ্কার হচ্ছে পায়ের তলায় জমিশূন্য, শেকড়শূন্য নির্বোধের অহঙ্কার।

নির্বোধের সেই অহঙ্কার আর অন্ধকারেরই আজ আস্ফালন। রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বদিকে : উপর থেকে নিচ অবধি। তাই কেউ বলে, প্রয়োজন হলে আমরা রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেব, নজরুলকে শোধন করব, মাইকেলকে বিতাড়িত করব, বঙ্কিমকে সাম্প্রদায়িক করব। অর্থাৎ আমরা আত্মহত্যা করব।

নির্বোধের আত্মহত্যার সেই নীতি আর কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আপামর সুস্থ মানুষকে দাঁড়াতে হবে। তাতে আমাদের কোন ভয় কিংবা হতাশার কারণ নেই। কারণ আমাদের পায়ের নিচে মাটি আছে। আর ওদের পায়ের নিচে মাটি নেই।

রবীন্দ্রনাথ বাঙালির গর্ব। বাঙালির গৌরব। রবীন্দ্রনাথ আমাদের জীবনের সংস্কৃতির বর্ণমালা। তার অ, আ : ক, খ। তাকে আত্মস্থ না করে সংস্কৃতি আর অনুভূতির কোন বাক্য রচনাই তো আমাদের পক্ষে অকল্পনীয়।

অপর ভাষাভাষীদেরও গর্ব ও গৌরবের পাত্র আছেন। তবু তাদের জন্য আমাদের মমতা। আহা রবীন্দ্রনাথকে তারা আমাদের মতো একান্ত করে পেলেন না। কিন্তু এ ব্যবধানের তো কোন বিকল্প নাই। রবীন্দ্রনাথকে তো অনুবাদ করা যায় না। ভাবকে ভাষান্তরিত করা যায়। কিন্তু যে ভাবই ভাষা এবং ভাষাই ভাব : যার শব্দই ভাব এবং ভাবই শব্দ, তাকে ভাষান্তরিত করার কি উপায়?

'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'... : কেমন করে করা যায় বাঙালির এই অনুভূতির ভাষান্তর। 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু/ পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু/ এই যে হিয়া থর থর/ কাঁপে আজি এমনতরো/ এই বেদনা ক্ষমা করো,/ ক্ষমা করো প্রভু/ এই দীনতা ক্ষমা করো প্রভু/ পিছন পানে তাকাই যদি কভু।' ...কেমন করে এর বেদনা আর প্রার্থনাকে ভাষান্তরিত করা যায়? সঘন গহন রাত্রি, ঝরিছে শ্রাবণ ধারা/ অন্ধ বিভাবরী সঙ্গী পরস হারা : এই মুহূর্ত আর অনুভূতিকে কেমন করে তুলে নেওয়া যায় অবিকৃতভাবে অপর কোন ভাষায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু কেবল বর্তমানের আবহ নয়। যে-কয়টি পদের সামান্য একটু অংশের আমি উল্লেখ করতে পারলাম সেটুকু উল্লেখ করতে স্মৃতিপটে আমার ব্যক্তি জীবনের নান জগতে যেতে হয়। কিন্তু তা আজ সম্ভব নয়। এ কথা শুধু এ জন্য বলা যে, সেই ১৯৪০ আর পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তানের বদ্ধ কারাকক্ষে নিক্ষিপ্ত শত শত দেশপ্রেমিক রাজবন্দীকে সেদিন যাঁরা তাঁদের বাণী ও ভাব এবং জীবনের কাহিনী দিয়ে উজ্জীবীত করে রেখেছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ঘোর অন্ধকারে আবদ্ধ কারাগার। শুধু ঢাকা, রাজশাহী এবং এমনি অপর সব কারাগারই নয়। সমস্ত দেশই যেখানে কারাগারে পর্যবসিত, তখন সেই কারাগারের নিশ্ছিদ্র পাষাণ দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে মধ্য যামিনী-অতিক্রান্ত মুহূর্তে, অসহায়, নির্জন কুঠুরীতে আবদ্ধ রাজবন্দী নিজের মনে অর্ধোচ্চারণে গেয়ে উঠছেন : এই দীনতা ক্ষমা করো প্রভু/ পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু।...

বৈদেশিকরা নোবেল পুরস্কার বা সম্মান প্রদান করতে পারেন রবীন্দ্রনাথকে। কিন্তু 'আমার মাথা নত করে দাও হে প্রভু, তোমার চরণ তলে...; আর কতদূর নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী : এর কোন কিছুকেই তো অপর কোন ভাষা-ভাষীর পক্ষে অনুভব করা সম্ভব নয়। তাই বৈদেশিকরা রবীন্দ্রনাথকে সম্মান করেন : আমরা রবীন্দ্রনাথকে ভালবাসি।

প্রায় শতবর্ষপূর্বে '১৪০০' সাল নামে কবিতায় কবি বলেছিলেন : আজি হতে শত বর্ষ পরে/ কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি কৌতূহল ভরে/ আজি হতে শত বর্ষ পরে... আজি হতে শতবর্ষ পরে/ এখন করিছে গান সে কোন নতুন কবি, তোমদের ঘরে?/আজিকার বসন্তের আনন্দ অভিবাদন/পাঠায়ে দিলাম তার করে।...

সেই ১৪০০ সাল আগত প্রায়। শতবর্ষ আগে পাঠানো তাঁর উষ্ণ অভয় ভালবাসার বাণীতে আমরা শতবর্ষ পরের জীবনের সর্বস্তরের মানুষেরা অভিষিক্ত। চক্ষুর সম্মুখ হতে যিনি কালের নিয়মে অন্তর্হিত, কালকে অতিক্রমকারী সেই অগ্রপথিক আমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত। আমরা তাকে শতবর্ষ পূর্বের চাইতেও গভীরতরভাবে উপলব্ধি করি, গভীরতরভাবে ভালবাসি।

যেমনি আমরা ভালবাসি রবীন্দ্রনাথকে, তেমনি রবীন্দ্রনাথ ভালবেসেছিলেন আমাদের এই বাংলাদেশকে। 'সোনার তরী' কাব্য সংকলনের মুখবন্ধে তাই কবি লিখেছিলেন : "... সোনার তরীর লেখা আর এক পরিপ্রেক্ষিতে। বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব। শুধু তাই নয়, পরিচয়ে অপরিচয়ে মেলামেশা করেছিল মনের মধ্যে। বাংলাদেশকে তো বলতে পারি নে বেগানা দেশ; তার ভাষা চিনি, তার সুর চিনি। ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দরমহলে আপন বিচিত্ররূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে, যে উদবোধন এনেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোট গল্পের নিরন্তর ধারায়। সে ধারা আজও থামত না, যদি সেই উৎসের তীরে থেকে যেতুম। যদি না টেনে আনত বীরভূমের শুষ্ক প্রান্তরের কৃচ্ছ্র সাধনের ক্ষেত্রে।

"আমি শীত, গ্রীষ্ম বর্ষা মানি নি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি, বৈশাখের খর রৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারা বর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এ পারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানা বর্ণের আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জন-সজনের নিত্য সংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌচচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি, সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয় নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা– বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্য ঘটল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা। এই সময়কার প্রথম কাব্যের ফসল ভরা হয়েছিল সোনার তরীতে। তখনি সংশয় প্রকাশ করেছি, এ তরী নিঃশেষে আমার ফসল তুলে নেবে কিন্তু আমাকে নেবে কি। [রবীন্দ্র রচনাবলী : ২য় খণ্ড : বিশ্বভারতী : সুলভ সংস্করণ : ১৩৯৩ : সোনার তরী কাব্য সংকলনের 'সূচনা' হিসাবে কবির কথার রচনাকালে বৈশাখ ১৩৪৭/ইং ১৯৪০]

* * *

রবীন্দ্র ভুবন। কথাটি নিশ্চয়ই বৃহৎ কথা। এর যথার্থই নানা দিক আছে। নানা মাত্রা আছে। যেমন গাছ, মাটি, মাঠ আর নদীর এই বঙ্গদেশের নানা দিক আছে। আমরা যারা তার মধ্যে বাস করি, জন্মগ্রহণ করি, মৃত্যুবরণ করি, এমনকি যারা একে অপরকে হত্যা করি এবং অপরদ্বারা নিহত হই তারা সবাই বঙ্গভুবনের জল হাওয়ার মধ্যেই তা করি। তার বাইরে আমাদের অস্তিত্ব অকল্পনীয়।

তেমন আমাদের রবীন্দ্রভুবন। এই ভুবনের আমরা বাঙালি অধিবাসী। কিন্তু বঙ্গভুবনের ন্যায় রবীন্দ্রভুবনের অধিবাসীদেরও প্রতিনিয়ত এই ভুবনের নাগরিক হওয়ার, সেই নাগরিকের মহৎ মর্যাদা অর্জনের দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনের প্রয়াসে নিবদ্ধ হতে হয়। না হলে, জন্মগতভাবে জন্মভূমি আমাকে কিছুই দিতে পারে না। তেমনি জন্মগতভাবে রবীন্দ্রভুবনের অধিবাসী আমাকে রবীন্দ্রভুবনের দায়দায়িত্ব : মহৎ থেকে মহত্তরভাবে সাংস্কৃতিক মানুষ হওয়ার চেষ্টার মাধ্যমে রবীন্দ্রভুবনের যোগ্য থেকে যোগ্যতর নাগরিক হওয়ার দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্বে আমাদের অস্তিত্ব

*　　　*　　　*

এই বঙ্গদেশের জানা-অজানা ইতিহাসে নাকি বারংবার এই নাম পরিবর্তিত হয়েছে। সব নামের কথা আমি জানি নে। তবু নামের পরিবর্তন স্বাভাবিক। এটা মানবিক। মানুষ মাটিরই সন্তান। তার পাহাড়-পর্বত-শ্যামল প্রান্তর, নদী আর সমুদ্রের সন্তান। মাটির সন্তান মাটিকে, তার মাঠঘাট, নদী প্রান্তরকে ভালবাসে। তাকে নিয়ে সে স্বপ্ন দেখে। তার স্বপ্নের মূর্তিতে তাকে সে গড়ে তুলতে চায়। সেই প্রয়াস আর পরিশ্রমে তার স্বেদ আর রক্ত সেই মাটিকে সিক্ত করে। তার নদীও স্রোতস্বিনীকে রঞ্জিত করে। এই বয়সেও আমাদের বঙ্গদেশকে নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি। স্বপ্ন বয়স মানে না। স্বপ্ন বাদে মানুষ বাঁচে না। আমিও স্বপ্ন দেখি : এই বঙ্গদেশ একদিন রবীন্দ্র-বঙ্গ বলে অভিহিত হবে। সেই স্বপ্ন আর অভিধাকে কাল থেকে কালে বাস্তবায়িত করার সংগ্রাম আর প্রয়াসে রবীন্দ্রবঙ্গের মানুষ যথার্থই রবীন্দ্রভুবনের যথার্থ নাগরিক হয়ে উঠবে। সে ভবিষ্যৎকে কাল, তারিখ দিয়ে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। কাল নিজে কালাতীত। কাল দিয়ে কালের পরিমাপ ঘটে না। কালহীন সেই ভবিষ্যতের প্রত্যয়ে আমি নিজেকে আজ উজ্জীবীত বোধ করছি।

২৩-১-৯০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের অধিকার

প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে একুশের স্মৃতিচারণে আমরা যার উপর আমাদের আলাপ আলোচনা এবং দৃষ্টি নিবন্ধ করি তা হচ্ছে মানুষের অধিকার। 'রাষ্ট্র ভাষা, বাংলা চাই' : এ আওয়াজ ছিল আমাদের অধিকারের আওয়াজ। এই অধিকার অর্জনেই কত শক্তিক্ষয়, রক্তক্ষয়-জীবনক্ষয়। মানুষের শক্তিক্ষয়। মানুষের জীবনক্ষয়। ব্যাপারটাকে কি আর একটু গভীরভাবে, সাধারণভাবে বিচার করা যায় না?

অধিকার শব্দের একাধিক অর্থ : 'স্বামিত্ব, দখল, কর্তৃত্ব, যোগ্যতা, দাবী' : এরূপ নানা অর্থ।

মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে 'অধিকারের' পাল্টা শব্দ 'অনধিকার'। এখান থেকেই আসে উভয়ের দ্বন্দ্বের প্রশ্ন। অধিকার অনধিকারের দ্বন্দ্ব। কেউ যাকে তার অধিকার বলে দাবী করছে, অপর কেউ তাকে অস্বীকার করছে। তাকে অনধিকার বলছে। এ থেকে বলতে পারি : অধিকার একটি সাপেক্ষ শব্দ। ইংরেজিতে বললে 'রিলেটিভ টার্ম'। অনধিকার বাদে অধিকার নেই। আসলে অনধিকারের জন্ম তথা উদ্ভব থেকেই অধিকারের প্রশ্ন। রুশো বলেছেন : যে-মানুষ একখণ্ড জমির চারদিকে বেড়া তুলে বলল : 'এ জমি আমার, সেইই সমাজে-অসাম্যের জন্মদাতা'। তখন থেকেই দ্বন্দ্ব : 'এ জমি আমার'; 'এ জমি তোমার নয়'; এই 'আমার' 'তোমার'-এর দ্বন্দ্ব।

আজকের সমাজ গতকালের চাইতে অধিক জটিল। আজকের সমাজে অধিকার-অনধিকারের দ্বন্দ্ব একটি চরম রূপ ধারণ করেছে বলে আমরা মনে করি। কারুর দেশ দখলের অধিকার। অপর কারুর দখলদারীর বিরুদ্ধে সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসে হামলা করার অধিকার।

এভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে এখন অধিকার বনাম অনধিকারের দ্বন্দ্ব আমরা দেখতে পাই।

কিন্তু অধিকার-অনধিকারের বর্তমানের এমন আপোষহীন দ্বন্দ্ব কি মানুষের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত অনিবার্য? এর কোন রূপান্তর কি আমরা কল্পনা করতে পারি নে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন অনেক চিন্তাবিদ আছেন যাঁরা কল্পনা করেন, মানুষ আদিতে এমন যুথবদ্ধ যৌথ জীবন যাপনে বাধ্য ছিল যে, মানুষের সেই সমাজে গুরুতরভাবে একের বিরুদ্ধে অপরের অধিকার অনধিকারের দ্বন্দ্বের অবকাশ ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্বে (যে দ্বন্দ্ব ছিল মৌলিক তথা প্রধান দ্বন্দ্ব) প্রকৃতিকে জয় করে মানুষের জীবনকে অধিক থেকে অধিকতররূপে ধারণযোগ্য করার প্রয়াসে মানুষের আদি যৌথ জীবন যত বিভক্ত ও বি-সম হতে লাগল, তত একের ওপরে এবং একের বিরুদ্ধে অধিকারের প্রশ্নেরও সৃষ্টি হতে শুরু করল।

সহজভাবে বললে : জীবন ধারণের জন্য জীবিকার উপায়গুলির মালিকানার ক্ষেত্রে উদ্ভূত বৈষম্য থেকে অধিকার-অনধিকারের বৈষম্য এবং দ্বন্দ্বের উদ্ভব ঘটল।

জীবিকার উপায়ের মালিক মনে করতে লাগল, তার অধিকার আছে জীবিকার উপায়ের অ-মালিককে অধীনস্থ করার। এবং অ-মালিক মনে করতে লাগল জীবিকার উপায়ের মালিকানাকে হস্তগত করারও তার অধিকার আছে।

একথাও অনস্বীকার্য যে, মানুষের বর্তমান জীবনে, দেশে দেশে যেমন, তেমনি আমাদের নিজেদের দেশে অধিকার-অনধিকারের দ্বন্দ্বে মানুষের সৃজনশীল ক্ষমতারই অপচয় ঘটছে। বিগত ন'টা বছরের কথাও যদি ধরি তাহলেও আমরা বলতে পারি, রাজনীতির ক্ষেত্রে অধিকার-অনধিকারের যে সংগ্রাম, সংঘর্ষ, সংঘাত চলেছে তার বদলে, মানুষে মানুষে এই আত্মকলহের বদলে, মানুষের সঙ্গতিপূর্ণ, পারস্পরিকতাসম্পন্ন, স্বশাসন তথা গণতান্ত্রিক একটা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যদি আমাদের থাকতো তাহলে জীবনের বিবিধ সমস্যার ক্ষেত্রে আমরা অধিকতর জাতীয় এবং যৌথভাবে সংগ্রাম করতে সক্ষম হতাম। তাহলে আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা বা শক্তির এত অধিক অপচয় ঘটত না।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমি বলব : মানুষের অধিকার-অনধিকারের দ্বন্দ্বটা মানুষের আত্ম-বিভক্ত সমাজের সমস্যা এবং এ কারণে এ সমস্যা অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম সমস্যা। আসলে মানুষের মৌল এবং স্বাভাবিক সমস্যা কর্মের সমস্যা। অধিকারের সমস্যা নয়। প্রকৃতির শক্তিকে যৌথ প্রচেষ্টায় জয় করে মানুষের নিজের জীবনের ক্রম বিকাশে নিয়োগের সমস্যা। মানুষের একের বিরুদ্ধে অপরের অধিকার-অনধিকারের আপোষহীন রক্তাক্ত, আত্মহননকারী, শক্তির ক্ষয়কারী লড়াইএর সমস্যা নয়। [আমি বলব, তুলনায় পশুদের সমাজ উত্তম। তারা এত অধিক আত্মহননমূলক দ্বন্দ্বে রত হয় না।]

পৃথিবীর অপরাপর রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি এবং তাদের চাইতেও অধিক, আমাদের নিজেদের জীবনের রাজনৈতিক ইতিহাসে আমাদের সৃজনশীল শক্তির অপচয়মূলক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত তথা অধিকার-অনধিকারের লড়াইএর দৃষ্টান্তের কোন অভাব নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরা যাক আমাদের ভাষার অধিকারের লড়াইএর কথা।

বাঙালিকে তার মাতৃভাষায় রাষ্ট্রীয়, সামাজিক সর্বপ্রকার কাজের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করার অতি স্বাভাবিক ব্যাপারটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে রক্তাক্ত লড়াই সেই ৪৮ এবং ৫২ সাল থেকে এই রাষ্ট্রেরই কর্ণধারদের বিরুদ্ধে যে লড়তে হয়েছে এবং সে লড়াইতে এ দেশের অসীম সম্ভাবনাময় মানুষকে তার কৈশোরে এবং তারুণ্যে যে আত্মহূতি দিতে হয়েছে : এ ঘটনা যেমন গর্বের এবং গৌরবের, তেমনি মানুষেরই আর একটা অংশের জন্য লজ্জার এবং নিন্দার বিষয়। কোন মানুষকে কেন চীৎকার করে বলতে হবে : আমার মাতৃভাষায় আমি বিকশিত হব। এটাইতো-স্বাভাবিক এটাইতো প্রকৃতির বিধান। একটি মনুষ্যজীবন মাতৃভাষায় বিকশিত না হয়ে কি বিকশিত হবে তার আজন্ম অজানিত অপর কোন ভাষায়? সেটাইতো অস্বাভাবিক। অপ্রাকৃতিক।

অথচ এমন অস্বাভাবিক, অপ্রাকৃতিক হুকুমই উচ্চারণ করেছিলেন আমাদের বিকাশের ইতিহাসের এক পর্যায়ে ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রনেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সাহেব। তাঁর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভিত্তিতে তিনি ধমক দিয়ে বলেছিলেন : বাঙালির জন্যও রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু : urdu and urdu alone shall be the state language; এই অপ্রাকৃতিক ঘোষণা থেকেই শুরু হল আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার অধিকারের প্রশ্ন। আমরা বললাম : আমাদের অধিকার আছে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার। অপর কতিপয় ব্যক্তি কিংবা অংশ বলল : না, তোমাদের অধিকার নাই। হ্যাঁ, আমরা লড়াই করে সে অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করেছি। অনধিকারীকে বিতাড়িত করেছি। এ আমাদের গর্ব এবং গৌরবের ব্যাপার। কিন্তু এমন যদি হত যে, এই লড়াইটা আমাদের করতে হল না, গোড়া থেকে স্বাভাবিক বিষয় স্বাভাবিকভাবেই যদি কার্যকর হত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে, তাহলে যেমন অপচিত হত না রফিক, সালাম, বরকতের জীবন, তেমনি বাধ্যহীনভাবে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় যৌথ প্রয়াসে বাংলা ভাষার গবেষণা, ব্যবহার এবং প্রয়োগ আমাদের জীবনকে ঋদ্ধতর করে তুলতে পারত।

একজন মানুষ হিসাবে ব্যক্তিগতভাবেও আমি কল্পনা করি পৃথিবীব্যাপী এবং আমাদের দেশেই এমনদিন আসবে, (হোকনা সে আমার অজ্ঞাত পরিধির অন্তে), যেদিন মানুষকে আর অপচয় করতে হবে না তার অমূল্য সৃজনশীল শক্তিকে নিজেদের মধ্যকার অপ্রাকৃতিক, অস্বাভাবিক তথা কৃত্রিম অধিকার-অনধিকারের আত্মহননমূলক লড়াইতে।

মানুষের শক্তি অসীম বলে আমরা উক্তি করি। কিন্তু তাই বলে তাকে অসীমভাবে অপচয় করার আমাদের অবকাশ নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকৃতির গ্যাস ও তেলও শক্তি। সে শক্তি অশেষ নয়। তার অপচয় যেমন মনুষ্য মূর্খতা বৈ আর কিছু নয়– (আহা মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগর এখন পানির বদলে তেলের সাগর : এবং সে জ্বলছে বেহুদা, বেফায়দা আর আমাদের রান্নাঘরে এক সের তেলের মূল্য আমাদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে ২০ টাকাকেও অতিক্রম করে গেছে, আমাদের যান-বাহন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।...) তেমনি মূর্খতা মানুষের তৈরি সৌধ, সভ্যতাকে বন্দুক, বোমা, কামান দেগে ধ্বংস করে দেওয়া।

মানুষের বৈজ্ঞানিক ক্ষমতার উন্নতি কি মানুষেরই ঘরবাড়ি আর জীবনকে ধ্বংসের জন্য? তার স্কাড্ আর পট্রিয়টের এই ব্যবহার! এমন মূর্খতার বড় মূর্খতা আর কি হতে পারে?

মানুষের সৃজনশীল শক্তি তথা ক্ষমতার এমন অপচয় কেবল মূর্খতা নয়। মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এমন অপরাধ করার অধিকার কোন অপরাধীর নেই।

অধিকার-অনধিকারের আসল লড়াই এখানে। এমন মূর্খতা-মুক্ত মনুষ্য সমাজ একদিন সৃষ্টি হবে : এ আশা আমাদের অবশ্যই পোষণ করতে হবে।...

৩০-১-৯১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রগতি সাহিত্যের অগ্রপথিক : সোমেন চন্দ

আমি ভুলে গিয়েছিলাম, ৮ মার্চ সোমেন চন্দের মৃত্যুর তারিখ। ১৯৪২ সনের ৮ মার্চ তারিখে ঢাকার লোহার পুলের উত্তরে, একরামপুরের ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলনে রেল শ্রমিকদের মিছিলে নেতৃত্ব দিয়ে সোমেন এগুচ্ছিলেন সম্মেলনের দিকে। পথে আক্রান্ত হল সে মিছিল প্রতিপক্ষীয়দের দ্বারা। অতর্কিত সে আক্রমণে সাথীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন সোমেন। তাঁর হাতে ছিল শ্রমিকদের সংগ্রামের এবং আদর্শের পতাকা। লাল পতাকা। নির্বোধ আর বর্বর প্রতিপক্ষীয় বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হলেন সোমেন।

কে সোমেন?

কেবল একজন শ্রমিক নেতা নন। ত্রিশ এবং চল্লিশের দশকের ঢাকার প্রগতি লেকদের অন্যতম তরুণ লেখক সোমেন চন্দ। তখনো বয়স তাঁর ২২ পার হয় নি।

সোমেনের মৃত্যুর আগে সোমেনকে সেদিনকার ভারতের বামপন্থী এবং প্রগতিশীল রাজনীতিক, লেখক আর বুদ্ধিজীবীরা যতটুকু চিনেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পরে তার চেয়ে অধিক তাঁর জীবন আর রচনার পরিচয়ে তাঁরা সেদিন এক অপরিসীম সম্ভাবনাময় সংগ্রামী সাহিত্যিককে হারাবার মর্মান্তিক দুঃখে অভিভূত হয়েছিলেন।

ভারতের সাম্যবাদী আন্দোলনের অন্যতম নেতা কমরেড মুজাফফর আহমদ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন : সোমেনের মৃত্যুর খবরে আমার মনটা হাহাকার করে উঠল। যে-সোমেন অবিসংবাদীরূপে হতে পারতেন ভবিষ্যতে সমগ্র বঙ্গসাহিত্যের, সংগ্রামী সাহিত্যের এক স্তম্ভ তিনি নিহত হলেন বাইশ বছর না পূর্ণ হতেই। গোপাল হালদার লিখেছেন : "তাঁর মৃত্যুর পরে সোমেনের 'ইঁদুর' পড়ে আমার অন্তরাত্মা কেঁদে উঠল। আহা! কি এক বিস্ময়কর নক্ষত্র উদিত হয়েছিল আমাদের সাহিত্যের আকাশে। অথচ সে ঝরে পড়ল। রয়ে গেল সাহিত্যের ইতিহাসে আর এক 'আনফুল ফিল্ড্ রিনাউন' হয়ে।"

ত্রিশের শেষ এবং চল্লিশের দশকের ঢাকার প্রগতি সাহিত্যের অন্যতম সংগঠক, সোমেন চন্দের বয়োজ্যেষ্ঠ, কবি এবং সাহিত্যিক কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত ৮ মার্চ '৪২-কে স্মরণ করতে গিয়ে বলেছেন : "... স্থির হয়েছিল (ঢাকার) সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির পক্ষ থেকে ঢাকায় একটি ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৪২ সনের ৮ মার্চ এই সভায় যোগদানের পথে সোমেন চন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৃশংসভাবে খুন হন। এই ঘটনা সম্পর্কে রণেশ দাশগুপ্ত লিখেছেন : 'এ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন প্রখ্যাত কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতা শামসুল হুদা, অধ্যাপক সুরেন গোস্বামী, জ্যোতি বসু, বঙ্কিম মুখার্জী, সাধন গুপ্ত, স্নেহাংশু আচার্য প্রমুখ বিশিষ্ট নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা। সম্মেলনের সূচনাতেই ফ্যাসিবাদের একদল উন্মত্ত সমর্থক এবং কিছু সংখ্যক বিভ্রান্ত যুবা সম্মেলন পণ্ড করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তারা তখন সম্মেলনের দিকে আগতদের উপর আক্রমণ চালাতে শুরু করে। এই সময়ে সোমেন চন্দ লাল পতাকা হাতে রেল শ্রমিকদের একটি মিছিল নিয়ে সম্মেলন মণ্ডপের দিকে আসছিলেন। সম্মেলনের উপর আক্রমণের পরিচালকরা এই মিছিলটির উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সোমেন চন্দকে পৈশাচিকভাবে হত্যা করে। সোমেন চন্দ অবশ্য লাল পতাকাটি হাত থেকে ছাড়েন নি। এইখানেই সমাপ্ত হয় সোমেন চন্দের অক্লান্তকর্মী ও শিল্পী জীবনের।"

সেই '৪২ আজ থেকে ৪৮ বছরের পূর্বের সময়। '৯২-তে সোমেনের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পুরো হবে। '৪২-এর পরে কত ঘটনা ঘটেছে। পৃথিবী কত পাল্টে গেছে। ভারত স্বাধীন হয়েছে : ভারত আর পাকিস্তানের মাধ্যমে। সেই পাকিস্তান থেকেও পূর্ববঙ্গ বেরিয়ে এসে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যে-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্তের মধ্যে চল্লিশের গোড়াতে বামপন্থী চিন্তার তত প্রসার ঘটে নি, চল্লিশের শেষে আর পঞ্চাশের দশক থেকে সেই সম্প্রদায়ের তরুণ সাহিত্যিক আর বুদ্ধিজীবীর অনেকে সাম্যবাদী আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। সমাজতন্ত্র আর সাম্যবাদের আদর্শকে তারা গ্রহণ করেছে। শ্রমিক-কৃষক-জনতার আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করার চেষ্টা করেছে। ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে।

কিন্তু সম্প্রদায়গত অপরিচয়ের কারণেই সোমেন ছিলেন এই তরুণ, নতুন প্রগতিশীল কবি-সাহিত্যিকদের কাছে প্রায় অজ্ঞাত। তবু '৬৮-'৬৯-এর গণআন্দোলনের সময়ে টের পেলাম, এই তরুণদের মধ্যে এমন প্রাণও জন্ম নিচ্ছে যারা সোমেনকে অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। এমনি একটি প্রতিষ্ঠান ছিল 'সৃজনী'। তারাই সে সময়ে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে তার প্রাঙ্গণে সভা করার অনুমতি আদায় করে সোমেন চন্দের স্মৃতি দিবস সেদিন পালন করেছিল। তারপরেও কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে হয়ত একবার সোমেনের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবু বর্তমানে জটিল আর সংকটময় জীবনে সোমেনের আলোচনা বিগত বছরগুলোতে আর তেমন হয়েছে বলে আমার স্মরণে পড়ছে না।

ইতোমধ্যে কোলকাতার কিছু উদ্যোগী তরুণ বিভিন্নসূত্র থেকে সোমেনের রচনাবলী সংগ্রহ করে এবং সোমেনের মৃত্যুতে সেদিন সমগ্র ভারতে রাজনীতিক ও সাহিত্যজগতে যে প্রতিক্রিয়া এবং আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল তার সংবাদ, আলোচনা ও স্মৃতিকথা সংগ্রহ করে দুটি খণ্ডে 'সোমেন রচনা সমগ্র' প্রকাশ করেছেন। এ কাজটি খুবই মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ কাজ হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোমেনের মধ্যে অসীম সম্ভাবনার আভাস ছিল। আজকের প্রগতি লেখক ও সাহিত্য-কর্মীদের মধ্যে সোমেনের জীবন ও সাহিত্যের আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন। সোমেন বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছেন বলে আমার মনে বেদনাবোধ থাকলেও একথাও সত্য, বাংলাদেশের প্রগতিসাহিত্যের উদ্যোগী কর্মীদের মধ্যে তাঁকে স্মরণ করার প্রয়াস সাধারণের দৃষ্টির অগোচরে হলেও চলছিল।

সেলিনা হোসেন যথার্থই একজন পরিশ্রমী লেখক। তাঁর 'নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনিতে' তিনি সোমেন এবং সমকালীন সঙ্গী অপর সাথীদের নায়ক করে উপন্যাস তৈরি করেছেন। বাংলা একাডেমীর জীবনীমালাতে হায়াৎ মাহমুদ 'সোমেন চন্দ' নামে একখানি জীবনী রচনা করেছেন। তাতে তিনি সোমেনের আত্মীয়-স্বজন– যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সোমেনের জীবনকে পূর্ণতরভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছেন।

তবু ৮ মার্চ তারিখটি প্রায় বিস্মৃতই রয়ে যাচ্ছিল, এবারও। এমন সময়ে তিনটি তরুণ আমার বাসা খোঁজ করে বার করে আমাকে সম্বোধন করে বলল : 'স্যার, আমরা সোমেনের মৃত্যুদিবস ৮ মার্চ পালন করব।'

তরুণ তিনটি আমার একেবারেই অপরিচিত। প্রথম বিস্ময় জেগেছিল তাদের পরিশ্রমের জন্য। অনেক পরিশ্রম করে আমার ঠিকানা তাদের বার করতে হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি তার পরিচয়ে বলল, সে ইউনিভারসিটিতে ইংরেজিতে অনার্স পড়ছে। একটি বলল, সে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। অপরটিও বোধ হয় ইউনিভারসিটির কোন বিষয়ে এখনো ছাত্র। তাদের প্রস্তাবে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে আমার জিজ্ঞাসা ছিল : কে সোমেন? আর কেমন করেই বা তোমরা তার হদিস পেলে? ছাত্র তিনটি বলল : আমরা সেলিনা হোসেনের 'নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনিতে' তার নাম পেয়েছি। আর তাতে আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি।

সোমেনের মৃত্যুর ৪৮ বছর পরে তাঁরই কল্পনার বরপুত্ররা বাস্তবে আবির্ভূত হয়ে যখন বলল, তারা সোমেনের মৃত্যুদিবস পালন করবে তখন আমি যেমন অনুপ্রাণিত হয়েছি তেমনি এই তিন তরুণকে মনে হয়েছে : যথার্থই, সাহিত্যের প্রত্নতাত্ত্বিক এরা। সোমেনের উপর বৈরী সমাজ ও কালের অবজ্ঞা আর অপরিচয়ের স্তূপীকৃত ধুলি-বালি-ইট-পাথরকে অপসারণ করে এরা সোমেনকে আবার বার করে আনবে। সংগ্রামী মানুষের অন্তহীন পথের অগ্রপথিক সোমেনকে নিজেদের প্রিয় অগ্রজ বলে তারা সম্বোধন করবে। বিষয়টা বিস্ময়েরই বটে।

কিন্তু এখনো কি বিপুল বৈরিতা। কি অলংঘ্য-প্রায় প্রতিকূলতা। ছেলে তিনটি ছুটাছুটি করেছে। আমাকে রাজী করিয়েছে আলোচনাতে থাকতে। অধ্যাপক কবীর চৌধুরী থাকেন অনেক দূরে, বনানীতে। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে সম্মত করিয়েছে ৮ মার্চ বিকেল চারটায় সোমেনের উপর উদীচীর ঘরে যে আলোচনা ডেকেছে তাতে সভাপতিত্ব করতে। তরুণ অধ্যাপক বিশ্বজিত নিজেই ইতোমধ্যে সোমেন চন্দ আর প্রগতি লেখক সংঘের উপর গবেষণামূলক কাজ করেছেন। তিনিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজী হয়েছেন আলোচনা করতে। তরুণ লেখক রহমান মোস্তাফিজ একটি প্রবন্ধ তৈরি করেছেন সোমেনের উপর। 'সৃজনীর' শুভ রহমানও আলোচনাতে ছিলেন। হায়াত মামুদও আলোচনা করেছেন। তরুণ সংগঠকগণ আলোচনা সভাটির জন্য একটি আমন্ত্রণলিপি তৈরি করে যথাসাধ্য বিতরণ করেছে। সংগঠকদের একজন শিল্পীও। সে নিজে সোমেনের একটি প্রতিকৃতি তৈরি করেছে। সেই প্রতিকৃতিটি শ্রোতাদের সামনে টানিয়ে তার উপর লিখেছে : 'প্রগতি সাহিত্যের অন্যতম অগ্রপথিক সোমেন চন্দের স্মরণে।' কিন্তু সব প্রধান দৈনিকে এই আলোচনা সভার বিজ্ঞাপনটি প্রকাশের জন্য পৌঁছে দিলেও কোন পত্রিকাতেই সোমেন চন্দের উপর আলোচনার পূর্ব খবরটি প্রকাশ করা হল না। 'ইত্তেফাকে' যদিবা একটু উঠেছিল তাতে 'সোমেন চন্দকে' 'সোমেন চন্দ্র' হিসাবে মুদ্রণ করা হয়েছে।

আসলে সোমেনকে পরিচিত করিয়ে দেবার কাজটি সহজ নয়। আমাদের প্রগতি সাহিত্যের আন্দোলনে ইতিহাস এবং মহৎ ঐতিহ্যবোধের যে দুর্বলতা এখনো বিরাজ করছে তাতে সোমেন চন্দের জীবন ও সাহিত্যের তাৎপর্যবোধ বিরাট সংখ্যক সাহিত্যকর্মীর মধ্যে আশা করা যায় না।

তবু এ বিবরণে হতাশ হওয়াও আমাদের উচিত নয়। অল্প সংখ্যক তরুণ শ্রোতাদের সমাবেশ ঘটলেও প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে তাৎপর্যময় আলোচনা হল সেদিন সোমেন চন্দের উপর। অধ্যাপক কবীর চৌধুরী সভাপতি হিসাবেও বললেন : সাম্প্রতিককালে ঢাকার কোন সেমিনারে এরূপ তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা আর হয় নি। শুভ রহমান মূল প্রবন্ধের ভিত্তিতে প্রগতি সাহিত্যের কর্মীদের বর্তমান মুহূর্তের দায়িত্বের কথা বললেন। আর দু বছর পরে ১৯৯২ সনে সোমেনের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হবে। সেই বৎসরটি অধিকতর বৃহৎভাবে এবং সংগঠিতভাবে করার চেষ্টা নিতে হবে। সোমেনের জীবন ও সাহিত্যের আলোচনা বর্তমান প্রগতিশীল সমাজ ও সাহিত্য-কর্মীদের অনুপ্রেরণা এবং অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আলোচনা সভা থেকে সোমেন স্মৃতি রক্ষার জন্য একটি আহ্বায়ক কমিটিও গঠন করা হল।

সোমেন চন্দের উপর তিনটি তরুণ সাহিত্য-প্রত্নতাত্ত্বিকের আলোচনার চেষ্টাটি সফল হোক, সে কামনাই আমার ছিল। এবং তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় নি, বরঞ্চ প্রৌঢ় আমাদের জন্যও অনুপ্রেরণাদায়ক হয়েছে তারই উল্লেখ করে আমি তরুণ সাহিত্যিক আর নাট্যকারদের লক্ষ্য করে বললাম : এবার আপনারা একটি নাটক লিখুন যার নাম হবে 'সোমেন চন্দ'।

১১-৩-৯০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সাম্যবাদের ভূমিকা'র লেখক

৮-২-৮২ : সকাল ১০টা। এই মাত্র অজয় (অজয় রায়) ফোন করে বললেন 'অনিল দা গতরাতে মালেকাদের বাসায় যে ঘরে তিনি থাকতেন সেই ঘরে সকলের অজ্ঞাতে রাত তিনটায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।' গতকাল বাংলাদেশ-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির সম্মেলনে উপস্থিত থেকে তার পুনর্গঠনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে অজয় জানালেন। রাতের এই ঘটনার কথা সকালে দরজায় আঘাত করে জোর করে দরজা খুলে দেখার আগে কেউ জানতে পারে নি।

নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামী কর্মময় একজন অতুলনীয় চিন্তাবিদের জীবনাবসান ঘটল। কি বিস্ময়কর যে, জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত নিজের আদর্শের বাস্তবায়নে সাংগঠনিক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে তিনি দ্বিধা করেন নি। নিদারুণ অসুস্থ শরীরে হাসিমুখে স্বেচ্ছায় দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং তা পালন করেছেন। বোধ হয় ৩১, জানুয়ারি তারিখেও এসেছিলেন আমাদের ইউনিভার্সিটির বাসায়। সন্ধ্যা থেকে প্রায় তিনঘণ্টা গল্প করেছেন স্বাতী আর তিতুর সঙ্গে। সেদিন সকালে নিজে ফোন করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার বড় মেয়ে স্বাতী আর ছোট ছেলে তিতু কোথায়? ওদের সঙ্গে গল্প করতেই তিনি আমার বাসায় আসতেন। আমি বলেছিলাম, আপনি অসুস্থ, আপনি কেন আসবেন। আমি আপনার কাছে ওদের নিয়ে আসব। কিন্তু অনিল দা তা শুনতেন না। নিজে সেই দূর ওয়ারী থেকে নীলক্ষেত চলে আসতেন। এও যেন তাঁর রাজনীতিক কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই ছোটদের সঙ্গে আলাপ করা। স্বাতী, তিতুর কাছে অনিল দা ছিলেন 'অনিল কাকু'। স্বাতীকে সেই প্রায় ষোল বছর আগে 'ক, খ' পড়ার বই কিনে দিয়েছিলেন। সে মেয়ে আজ মেডিক্যাল পড়ছে। তাতেই তাঁর আনন্দ। যখনি বিদেশে, মস্কো কিংবা প্রাগ গেছেন, তখনি সেখান থেকে ওদের জন্য চিন্তা করে একটি ব্যাগ কিংবা এক প্যাকেট পেন্সিল নিয়ে এসে ওদের হাতে দিয়েছেন। আমাদের বাসায় এসে স্বাতী তিতুকে কাছে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কথা বলতেন। বুঝাতেন সকল সমস্যার মধ্যেও সবকিছু বুঝে শান্ত মনে কেমন করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়াশুনা করতে হয়। কখনো ওঠার তাড়া করতেন না। যেন ওদের সঙ্গে গল্প করা ছাড়া তাঁর আর কোন কাজ নেই।

৩১ জানুয়ারি ছিল রোববার। রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মেলনের শেষ দিন। আমি কিছুটা সময় ছিলাম বাংলা একাডেমীতে এই সম্মেলনে। উদ্যোক্তারা বিরাট জনসমাগমে উন্মুক্ত মাঠে কেমন করে রবীন্দ্রনাথের 'দুই বোন' নাটক দেখাচ্ছে, তা দেখার জন্য। কিছু পরে বাসায় এসে দেখলাম, অনিল দা এসে গেছেন। স্বাতী এবং তিতুর সঙ্গে গল্প করছেন। এদিন অনেকক্ষণ আলাপ করলেন আমার বড় ছেলেটির মানসিক সমস্যা সম্পর্কে। ছেলেটি মানসিকভাবে বেশ অপরিণত। বাসায় নানা রকম সংকটের সৃষ্টি করে। বাসার শান্তি নষ্ট করে। তাকে শান্ত করা প্রায় সময়ই ভয়ানক রকমে অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়। দেশে এমন কোন জায়গা নেই সেখানে তাকে দিতে পারি। যেখানে দিলে তার একটু উপকার হয়। সে সম্পর্কে অনেক কথা বললেন। তারপরে, রাত দশটারও পরে, স্বাতী, তিতুকে আবার আদর করে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। আমি এগিয়ে দেবার জন্য বাসার গেটে, রাস্তায় এলাম। সহজে রিকশা পাওয়া গেল না। অনিল দার সঙ্গে কথা বলতে বলতে রিকশার খোঁজে বাসা থেকে মেডিক্যাল কলেজের দিকে এগুতে এগুতে জগন্নাথ হলের গেটে এসে একটা রিকশা পেলাম। সেই রিকশাতে তুলে দিয়ে অনিল দা'কে বললাম' 'ফোন করবেন, অনিল দা। আবার আসবেন।'...

তার পরদিনই আবার ফোন করেছিলেন। বাংলাদেশ-সোভিয়েট মৈত্রী সমিতির কমিটিতে আমাকে থাকার কথা বলার জন্য। তাছাড়া আবার বলেছিলেন, আমার বড় ছেলেটির সমস্যার বিষয়ে। বলেছিলেন, 'ওর উপদ্রবে স্বাতী, তিতুর পড়াশুনারও তো অসুবিধা হয়। ওর সম্পর্কে একজন মনস্তত্ত্ববিদের সঙ্গে আলাপ করবেন!...

তারপরে আজকের এই খবর। আমরা কেউই বিশ্বাস করতে পারছি নে, অনিল দা মারা গেছেন। আমি দু'বার গেলাম তাঁর অফিসে যেখানে পার্টির পতাকা দিয়ে তাঁর সেই পাশফেরা চিরনিদ্রায় শায়িত দেহটিকে আবৃত করে রাখা হয়েছে, সেখানে। আমার স্ত্রীও গেলেন বিকেল বেলা, তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যাবার আগে। স্বাতী গিয়েছিল একবার সকালে। তিতু গেল বিকেলে। অনিলদা'কে এমন নীরবে শুয়ে থাকতে দেখে তিতু আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগল। ওর কান্না আমার চোখেও পানি এনে দিল।...

* * *

অনিলদা মানে 'অনিল মুখার্জী' : 'সাম্যবাদের ভূমিকা'র লেখক অনিল মুখার্জী বাংলাদেশের কমুউনিস্ট নেতা অনিল মুখার্জীর এই পরিচয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আজকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের উপর বাংলাতো; এ বাংলায়, ও বাংলায়, নানা বই আছে। কিন্তু চল্লিশের দশকে সমাজতন্ত্রের ভাবধারার সঙ্গে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের যারা পরিচিত হচ্ছিল, তাদের জন্য এ রকম সাবলীল ভাষায় রচিত সহজবোধ্য এবং বিশেষ করে এই দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাখ্যাত সাম্যবাদী আলোচনা একেবারে বিরল ছিল। সেদিন শ্রমিক আন্দোলনের যারা কর্মী ছিলেন তাদের জন্য এমন প্রাথমিক বইএর প্রয়োজন ছিল খুবই জরুরী। অনিল বাবু নিজেও ঢাকা জেলার শ্রমিক আন্দোলন, বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জের সুতাকল শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন।

আজ থেকে চল্লিশ বছরেরও আগের কথা। তখনো পাকিস্তান হয় নি। ১৯৪০-৪২ সালের কথা। 'সাম্যবাদের ভূমিকা' তিনি সে সময় রচনা করেন। কোন সাহিত্যকর্ম হিসাবে নয়। শ্রমিক আন্দোলনের বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠক অনিল বাবু এ বই রচনা করেন। শ্রমিকদের জন্য সহজবোধ্য একখানি প্রাথমিক বইএর চাহিদা পূরণের তিনি চেষ্টা করেন।

এই রচনার প্রয়োজন এবং সে সময়কার বাস্তব অবস্থার উল্লেখ করে অনিল বাবু ১৯৪২ সনে তার এই বইএর প্রথম প্রকাশের ভূমিকাতে লিখেছিলেন : "নারায়ণগঞ্জের কাপড়-কল-অঞ্চলে যে শ্রমিক আন্দোলন চলিতেছিল, ১৯৩৯ সালের প্রথম দিকে আমি সেই আন্দোলনে যোগদান করি। ক্রমে আমরা যখন শ্রমিক বন্ধুদের সাথে মার্কসবাদ (সাম্যবাদ) সম্বন্ধে রীতিমত আলাপ আলোচনা, পড়াশুনা শুরু করি তখন এই সম্বন্ধে কোন সম্পূর্ণ এবং সহজপাঠ্য বাংলা পুস্তকের অভাবে বড়ই অসুবিধা হইত। আমাদের দরকার হইল এমন একটি পুস্তক যাহাতে মোটামুটি মার্কসীয় মতবাদ লিপিবদ্ধ আছে, যাহাকে ভিত্তি করিয়া ক্লাশ করা চলে এবং যে পুস্তক শ্রমিক-বন্ধুগণ তাহাদের সামান্য অবসর সময়ে নিজেরা পড়িয়াও মার্কসবাদ সম্বন্ধে কিছুটা সাধারণ জ্ঞান লাভ করিতে পারে।"...

এই প্রয়োজন অনিলদা যেভাবে পূরণ করেন তাতে মানুষের সমাজ জীবনের বিবর্তনের জটিল প্রক্রিয়াকে অনবদ্য সহজ ভাষা এবং দৃষ্টান্তের মাধ্যমে প্রকাশ করার তাঁর সহজাত ক্ষমতাটি ফুটে ওঠে। এ গ্রন্থ সেদিক থেকে আজ অবধি অতুলনীয় হয়ে রয়েছে। এ বইএর তাই একাধিক সংস্করণ হয়েছে। রাজনৈতিক সংকট-অবস্থায় গুপ্তভাবেও একে প্রকাশ করা হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়াতে সম্প্রতি এর একটি রুশ সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে।

অনিল বাবু রাজনৈতিক সংগঠনের দায়িত্ব পালনেই জীবন ব্যয়িত করেছেন। স্নেহ আর দরদী মনের মানুষ, অথচ সংসারে আবদ্ধ হলেন না। অপর রাজনৈতিক সাথী ও কর্মীদের সংসারকেই নিজের সংসার বলে ভেবেছেন। রাজনৈতিক দায়িত্বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাবীতে আরো দু'খানি নাতিদীর্ঘ গ্রন্থ : 'শ্রমিক আন্দোলনের হাতেখড়ি', 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার পটভূমি, রচনা করলেও এর বাইরে আর কোন বই তিনি রচনা করেন নি। অথচ ছোটদের জন্য গল্প বলার ক্ষমতাটিও ছিল তাঁর মনোমুগ্ধকর, যার পরিচয় রয়েছে তার ছোটদের জন্য একটি রচনা : 'হারানো খোকা'য়।

নিজের লেখার কথা আমরা কেউ বললেই তিনি বিনয়ের সঙ্গে লেখার ক্ষমতাকে অস্বীকার করতেন। অথচ অনিল বাবুর পক্ষে যে বইটি লেখা আজকের দিনের সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন, নতুন সমাজ তৈরির প্রয়াসে নিরত বাংলাদেশের সমাজতন্ত্রী ভাবধারার কর্মীদের উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণার জন্য প্রয়োজন ছিল সে হচ্ছে তার নিজের আত্মজীবনী। কিন্তু এখানেও নিজের বিনয়বোধ এবং বর্তমানে শারীরিক দুর্বলতার কারণে রচিত হল না। এ ক্ষতি আমাদের জন্য অসামান্য।

অনিল বাবুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে সেই চল্লিশের দশকেই। বিশেষ করে '৪৩ কিংবা '৪৪ সনে। বয়সে তিনি জ্যেষ্ঠ তো বটেই। কিন্তু আচার আচরণে এত নম্র এবং স্নেহপরায়ণ যে অনিল বাবুকে 'অনিল দা' বলে সম্বোধনে আমার এবং আমার বয়স্ক অপর সাথীদেরও কোনদিন কোন সঙ্কোচ আসে নি। পাকিস্তানের কারাগারেও তাঁর সঙ্গে সময়ে সময়ে আমার থাকার এবং তাঁর সাহচর্য পাওয়ার সুযোগ ঘটেছে। সে সব দিনের কথাও এখন স্মৃতিতে ভেসে উঠছে।...

AMARBOI.COM

৮-২-৮২

*　　　*　　　*

'সাম্যবাদের ভূমিকা'-র লেখক অনিল মুখার্জীর মৃত্যুতে আহূত শোকসভায় আমি একটু অংশ নিয়েছিলাম। অনিল বাবুর জীবনকাল : ১৯১২-১৯৮২, ৮ ফেব্রুয়ারি।

অনিল দা'র সঙ্গে আমার পরিচয় সেই ১৯৪২-৪৩ সনে। কেবল আমি নই। আমি, মুনীর চৌধুরী, আবদুল মতিন, বাহাদুর (হেসামুদ্দীন আহমদ) : অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রদের একটি বিশেষ অংশের পরিচয় ঘটে অনিলবাবু এবং তাঁর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ঢাকা জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে চল্লিশের সেই দশকে।

অনিলবাবুর লেখার ধরন ছিল অতুলনীয়। অথচ তিনি রীতিমাফিক সাহিত্যিক ছিলেন না। তাঁকে সাহিত্যিক বললে তিনি প্রতিবাদ করতেন। সংকুচিত বোধ করতেন। তিনি ছিলেন শ্রমিক আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ও নেতা। শ্রমিকদের জীবনযাপন, চাল-চলন, তাদের চিন্তাভাবনার সঙ্গে তাঁর ছিল গভীর পরিচয়। শ্রমিকদের সম্পর্কে আলোচনায় তাঁর আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেদিনকার সমাজতন্ত্রী আন্দোলন এবং সংগঠনের অবস্থা এবং আজকের পূর্ববাংলার তথা তার মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বামপন্থী ও সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের বিস্তার এবং সংগঠনের পার্থক্যের দিকটি অনিলবাবুর স্মৃতি নিয়ে কথা বলতে গেলে স্বাভাবিকভাবে মনে ভেসে ওঠে।

বর্তমানে বামপন্থী গণতন্ত্রী এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন নানা সংগঠন ও ব্যাখ্যায় বিভক্ত। এটা যেমন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তার এবং শক্তির প্রকাশ, তেমনি এর একটি অনিবার্য দুর্বলতার দিকেরও পরিচয় বাহক।

সে দুর্বলতার দিক হচ্ছে সংগঠনের এই বৈচিত্র্যকে বিভিন্নতা না ভেবে বৈরিতা হিসাবে বিবেচনা করা। বামপন্থী ও সমাজতন্ত্রী সংগঠনের আধিক্য থাকতে পারে। কিন্তু গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী শিবিরের সকল দলই যেন সকল দলকে সোভ্রাতৃত্বমূলক সংগঠন বলে গণ্য করে।

কিন্তু এমনটি প্রায়ই হয় না। প্রায়ই এদের একটি অপরটিকে শত্রু বলে বিবেচনা করে। ফলে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সামগ্রিক শক্তি ক্ষুণ্ন হয়। অপরের শক্তিকে নিজের শক্তি বলে তখন আর গণ্য করা হয় না।

অনিল মুখার্জী ছিলেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই সংগঠনের সক্রিয় কর্মী ও নেতা ছিলেন। বাংলাদেশে এমন অনেক কর্মী আছেন যাঁরা মূলে এই কমিউনিস্ট পার্টিতেই সমাজতন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। অনিলবাবুর সাহচর্য লাভ করেছেন। কিন্তু হয়ত ঘটনাক্রমে কোন প্রশ্নের মতপার্থক্যে তাঁরা মূল পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন। সাম্যবাদকে লক্ষ্য রেখেই সংগঠন করেছেন। এবং সেদিক থেকে সমাজতন্ত্রী সংগঠন আজ যতো অধিকই হোক না কেন, অনিল বাবু তাঁদের সকলেরই নেতা। অনিল বাবুর আমি ঘনিষ্ঠতা পেয়েছি। কিন্তু তাঁর মুখে আমাদের দেশের কোন বামপন্থী সংগঠন সম্পর্কে অশ্রদ্ধাপূর্ণ কোন মন্তব্য আমি শুনি নি।

এ কারণেই তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন এবং এ কারণেই তাঁর মৃত্যুকে গণতান্ত্রিক সকল মহল এবং সমাজতান্ত্রিক সকল দল নিজেদের প্রিয়জনের মৃত্যু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদে সকলে মর্মাহত হয়েছেন এবং মৃত্যুর দিনে যেমন, তেমনি এই শোকদিবসেও তাঁদের সকলে সমবেত হয়েছেন তাঁদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে।

অনিলবাবুর এই জীবনাচরণটি বাংলাদেশের সকল সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক দলের আচরণীয় আদর্শ বলে বিবেচিত হওয়া আবশ্যক।

অনিল মুখার্জী প্রধানতঃ ছিলেন দার্শনিক চরিত্রের। তিনি মিতভাষী, সহাস্যমুখের এবং দরদী মনের মানুষ ছিলেন। তাঁর সখ্যতা কেবল সমবয়সী বা রাজনৈতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্মীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর স্নেহ ও সখ্যতা বিস্তারিত ছিল কিশোর-কিশোরী পর্যন্ত। সমাজের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা পর্যন্ত। আমার নিজের পারিবারিক অভিজ্ঞতা থেকেই আমি তা জানি। তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে, স্কুলে পড়ছে আমার যে ছোট ছেলেটি, সেও কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে তার 'অনিল কাকু'র স্নেহ-মমতার কথা স্মরণ করে। নিজে অকৃতদার ছিলেন। নিজের আত্মীয়জনদের কাছে থাকেন নি। নিজের রাজনৈতিক কর্মস্থলকে নিজের অপরিবর্তনীয় স্বদেশ বলে গণ্য করেছেন। সেই স্বদেশে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। নিজের সেই স্বদেশের ভাইবোনকে ভাইবোন বলে ভেবেছেন। ছোটদের নিজের সন্তানবৎ স্নেহ করেছেন।

বিচিত্র অভিজ্ঞতার মানুষ ছিলেন অনিলবাবু। ১৯৩০-এর দশক থেকে তাঁর রাজনীতিক কর্মজীবনের শুরু। কাজেই অর্ধ শতাব্দীর এক ইতিহাস ছিলেন তিনি।

তাঁর বিস্তারিত জীবনী এবং তাঁর সম্পর্কে স্মৃতি সংগ্রহ আমাদের সকলের জন্য, সে রাজনীতি করি কিংবা না করি, সকলের জন্য অবশ্য প্রয়োজন। কারণ বর্তমানের অন্ধকার এবং হতাশার মধ্যেও আমরা বাঁচতে চাই। যখন যথার্থ মানুষের অভাবে আমরা দরিদ্র, তখন একজন যথার্থ মানুষের সাহচর্য থেকে আমরা বঞ্চিত থাকতে পারি নে। অনিল দা'র জীবনী এবং তাঁর স্মৃতির সাহচর্য আমাদের অনুপ্রাণিত করবে।

অনিলবাবুর 'সাম্যবাদের ভূমিকা', 'শ্রমিক আন্দোলনের হাতেখড়ি', 'স্বাধীনতার পটভূমি' প্রভৃতি রচনা দলমত নির্বিশেষে কর্মীমাত্রের অবশ্য পাঠ্য। এই সকল গ্রন্থকে আরো সুলভে এবং সার্বজনীনভাবে প্রচার করা আমাদের বামপন্থী সমাজতন্ত্রী সকল মহলের করণীয় বলে বিবেচিত হওয়া আবশ্যক।

অনিল বাবুর মৃত্যুতে শোকের প্রশ্ন আসে না। যদিচ তাঁর কথা স্মরণ করলে; তিনি আর কোন সেমিনার বা জনসমাগমে নির্বিষ্ট শ্রোতার মত সামনের কাতারে এসে বসবেন না, কখনো মঞ্চে এসে তাঁর যুক্তিপূর্ণ মৃদুভাষণে শ্রোতা ও কর্মীদের যুক্তি বোধে অনুপ্রাণিত করে তুলবেন না এবং ব্যক্তিগতভাবে আমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করবেন না, আমি কেমন আছি, আমার ছেলেমেয়েরা কেমন আছে : এ কথা ভাবলে চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসে। তবু অনিলবাবুর মৃত্যুতে শোক নয়। অনিলবাবুর মৃত্যুতে আমাদের সমাজ জীবন, তার সমস্যা, মানুষের সমাজকে রূপান্তরিত করার যুগ যুগান্ত বিস্তারিত আদর্শে সকল ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে অবিচলিত থাকার যে চরিত্র তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন তা নিয়ে গর্ববোধ করার এবং অনুপ্রাণিত হবার আমাদের প্রয়োজন আছে।

অনিল বাবু হচ্ছেন বিপ্লবী চরিত্রের একটি মহৎ দৃষ্টান্ত। সমরক্ষেত্রে সংগ্রামরত সৈনিক, যিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজ দায়িত্ব পালন করার প্রশান্তিবোধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে ছেদহীন নিদ্রায় মগ্ন হয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে বড় পাওয়ার জিনিস হচ্ছে, জীবনকে, সংগ্রামকে, সমাজরূপান্তরের স্বপ্নকে একটি দূরগামী দৃষ্টি দিয়ে দেখার দর্শন। সমাজ রূপান্তরের সংগ্রামে আমরা যতো সংকীর্ণ দৃষ্টির হব, যত আশু ফলাকাঙ্ক্ষী হব, যত অস্থির, অধৈর্য হব এবং যত নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন না হব, তত আমরা হতাশা বোধ করব। এবং সে হতাশা আমাদের নিজেদের জীবনকেই অর্থহীন করে তুলবে। অনিলবাবুর নিজের জীবন ব্যক্তিগত এবং সমাজগত সকল হতাশার বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রামের জীবন। তিনি আমাদের মাঝে দীর্ঘজীবী হোন, সেই কামনাই আমাদের আজকের কামনা।

১৩-২-৮২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নির্বাসিতের আত্মকথা'

আমার মত সংকটাপন্ন রুগীর জন্য বিশ্বাসের এই আলোহাওয়াটুকুর প্রয়োজন ছিল।

১২ সেপ্টেম্বর '৯২ তারিখের 'ভোরের কাগজ' সংখ্যায় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের আত্মকথা'-র উপর আমার ব্যক্তিগত রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল। ভারত ভূখণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামে অকুতোভয় জীবনদানের পর্যায় ছিল ১৯০৫ থেকে শুরু করে ত্রিশের দশক পর্যন্ত। এই পর্যায়ের সূচনা পর্বের বিপ্লবী এক নেতা ছিলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯০৭ সালে আলীপুর বোমার মামলায় শ্রী অরবিন্দ, বারীন্দ্রকুমার প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গে অভিযুক্ত হন উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। ১৯০৯ সালে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে নির্বাসিত হন আন্দামান সেলুলার বন্দীশালায়। কালাপানির আন্দামান। যেখান থেকে কোন বন্দী কোনদিন ফিরে আসতো না বলেই প্রবাদ তৈরি হয়েছিল। আন্দামান সেলুলার জেলে ১২ বছর বন্দী ছিলেন শত শত রাজবন্দীর সঙ্গে উপেন্দ্রনাথ। কোনদিন দেশে জীবিত ফিরে আসতে পারবেন, তিনিও ভাবেন নি। তবু স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্তার, প্রথম মহাযুদ্ধের ফলাফল, ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় নতুন ধরনের বিপ্লবের সংঘটন : সব মিলিয়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে আন্দামানের রাজবন্দীদেরও ১৯২১ সালে দেশে ফেরৎ নিয়ে আসতে এবং মুক্তি দিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভারত সরকার বাধ্য হয়েছিল।

মুক্তি পাওয়ার পরেই উপেন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন তাঁর আন্দামান বন্দীজীবনের কাহিনী : 'নির্বাসিতের আত্মকথা'। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিকথার এক অনন্যগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ পাঠ করে বলেছিলেন : এমন বই বাংলা সাহিত্যে আর রচিত হয় নি।

এই বইএর নাম হয়ত শুনেছিলাম। কিন্তু পড়ি নি আগে। এই প্রৌঢ় বয়সে সে বইকে পড়তে পেলাম। এ সুযোগটি করে দিয়েছিল আমার স্নেহভাজন তরুণ অধ্যাপক, এম, এম, আকাশ। বইটি কোথা থেকে যেন সংগ্রহ করে সে আমাকে পড়তে দিয়েছিল। আমি এ বই পাঠ করে আমার কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে একটি রচনা তৈরি করেছিলাম এ জন্য, যেন আমাদের আর পাঁচজন সুহৃদ পাঠক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বইখানির কথা জানতে পারেন। 'ভোরের কাগজ'কে ধন্যবাদ তাঁরা রচনাটি প্রকাশ করেছিলেন।

বইখানি ঢাকাতে পাওয়া যায় না বলে আমার রচনাটির শিরোনাম দিয়েছিলাম :

'যে-বই পাঠক কিনতে পারেন না।' 'ভোরের কাগজে' লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পরে বিভিন্ন বন্ধু ও পাঠকের কাছ থেকে আমার কাছে তাগিদ এসেছে : বইখানি কোথায়? বইখানি পাঠ করি কেমন করে? এ প্রশ্ন পাঠকরা অধ্যাপক আকাশকেও করেছেন। কেননা লেখাটিতে তাঁর নামের উল্লেখ ছিল। আমাদের যদি ক্ষমতা থাকত তবে নাতিদীর্ঘ এই গ্রন্থ 'নির্বাসিতের আত্মকথার একটি সুলভ পুনর্মুদ্রণের আমরা উদ্যোগ নিতাম। আসলে এমন মূল্যবান দুস্প্রাপ্য গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের উদ্যোগ নেওয়ার প্রতিষ্ঠান কিংবা প্রকাশক যে আমাদের নেই, তা নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমী : এই দুটি প্রতিষ্ঠান অবশ্যই এরূপ মূল্যবান গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের উদ্যোগ নিতে পারে। কিন্তু কেউ নিচ্ছে না, এটাই যা দুঃখের ব্যাপার।

আমার অপরাধের একটি দিক এই যে, যে-বই আগ্রহী একজন পাঠক বাজারে কিনতে পাবেন না, তেমন গ্রন্থ সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টির চেষ্টা করাটা আমার অন্যায় হয়েছে। এর ফলে আগ্রহী পাঠক নিশ্চয়ই আমার উপরে সন্তুষ্ট হওয়ার চাইতে ক্রুদ্ধ হয়েছেন অধিক যেমন আমি ক্রুদ্ধ হই সেই চিকিৎসকের উপর যিনি আমার কোন রোগের নিরাময়ের জন্য এমন ওষুধের নাম লিখে প্রেসক্রিপশন দেন যে– ওষুধ ঢাকার বাজারে শত চেষ্টা করেও সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

'নির্বাসিতের আত্মকথা' পাঠ করার জন্য তার একটি কপি পাওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। আকাশ যখন তার কপিটি আমাকে পড়তে দিয়েছিল তখন একবার আমার ইচ্ছা হয়েছিল, তার কপিটি আমি একেবারেই রেখে দেব। কথ্য ভাষায় : 'মেরে দেব'। কিন্তু আমার এই বয়সে সেটা মানাবে না এবং আকাশের প্রতি আমার স্নেহ-মমতা থেকে আমার পক্ষে তা করাও সম্ভব নয়।

তবু কিন্তু 'নির্বাসিতের আত্মকথা'র একটি কপি আমি সংগ্রহ করেছিলাম, মাত্র কয়েক ঘণ্টার চেষ্টাতেই এবং আকাশের কপিটি ফেরৎ দিয়ে আমার নিজের কপিটির উপরে নিচে-পাশে নানাভাবে দাগ কেটে, নানারকম চিহ্ন দিয়ে পৃষ্ঠার মার্জিনে 'আহ! উহু!' মন্তব্য লিখে পাঠ করছি।

কেমন করে? এ এক অলৌকিক রহস্যই বটে। এই রহস্যের একটি বর্ণনা আমার প্রথম লেখাটিতে ছিল বটে। কিন্তু স্থানের অভাবে যে বর্ণনা আর পাঠকদের জন্য পেশ করি নি। কিন্তু আজ তার একটু আভাস দেওয়া আবশ্যক।...

'নির্বাসিতের আত্মকথা' নিউমার্কেটের কোন দোকানে কি পাওয়া যাবে না? দেখি না চেষ্টা করে। তাই গিয়েছিলাম কয়েকটি দোকানে। দেখলাম, তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বইএর তাকে কোলকাতা থেকে আমদানী করা গল্প-উপন্যাসের অনেক বই সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বেশ আকর্ষণীয় প্রকাশনা। আমি বললাম : উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের আত্মকথা' আছে? দোকানের বিক্রেতা তরুণ, প্রবীণ : সকলের কাছে এ এক অপরিচিত নাম। অপরিচিত গ্রন্থকার। তাঁরা মাথা নাড়লেন : না, এমন লেখক এবং তার বইএর নাম তাঁরা শোনেন নি।

আমি দেখলাম, বৃথা পরিশ্রম। তার চাইতে 'নির্বাসিতের আত্মকথা'র দ্বিতীয় কপি একটি আমি তৈরি করি নে কেন? বিজ্ঞানের অলৌকিক প্রযুক্তির কল্যাণে এখন আর, কিছু টাকা খরচ করলে বই বা প্রবন্ধ বা কোন লিখিত জিনিসেরই মুহূর্ত-মধ্যে কপি করা আদৌ কোন কষ্টের ব্যাপার নয়। কোন জ্ঞানের ব্যাপারও নয়। আগে বই বা কিছু কপি করতে হলে হাতে প্রতিটি শব্দ দেখে নকল করতে হত। (নিজে রাজবন্দী থাকাকালে জেলখানায় কমিউনিস্ট পার্টির নিষিদ্ধ ইশতেহারকে আগাগোড়া রাতের গভীরে নিষিদ্ধভাবে হাতে লিখে কপি করে সেই কপি নিয়ে সহবন্দীদের মধ্যে পাঠচক্র দাঁড় করেছিলাম। সেও এক স্মৃতি বটে!) কিন্তু এখন মিনিটের মধ্যে ফটোস্ট্যাট।

আমি ভাবলাম, 'নির্বাসিতের আত্মকথা' আমি ফটোস্ট্যাট করে ফেলব। এর ফটোস্ট্যাট কপিকে আমি আমার গ্রন্থ সংগ্রহে রেখে আস্তে ধীরে রসিয়ে রসিয়ে তার প্রতি পৃষ্ঠাকে আমার মন্তব্যের আঁচড়ে অঙ্কিত করে পাঠ করব। এমন সুযোগ থাকতে চিন্তা কি?

আসলে করলামও তাই। বিস্তারিত বিবরণে না গিয়ে বলি, নীলক্ষেতের বাকুশা মার্কেটের ফুটপাত প্রায় ফটোস্ট্যাটের বাজার বসে গেছে। গুনে দেখলাম মাত্র কয়েক হাতের মধ্যে অন্ততঃ ৩২টি ফটোস্ট্যাট মেশিন। আমি সে বাজার থেকে ঘণ্টাখানেকের সময়তে মোট ৫৫ টাকা খরচ করে ১৪০ পৃষ্ঠার 'নির্বাসিতের আত্মকথা' কপি ও বাঁধাই করে দস্তুরমত বই ছাপিয়ে হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। এ এক অলৌকিক ব্যাপার বটে। অবশ্য আমাদের লেখাপড়ার পরিবেশে এর ভালমন্দ : দুইই আছে। কিন্তু সে আলোচনা আজ থাক।...

এই কপিটির উপর ভর করেই আমি আমার লেখাটি তৈরি করেছিলাম। 'ভোরের কাগজে' সেটি পাঠ করে হাসপাতালের বেডে শায়িত অসুস্থ বন্ধু খবর পাঠিয়েছিলেন : সরদার, আমাকে বইখানি একটু পড়তে দেবে? আর এক অধ্যাপক বন্ধু ফোন করে জিজ্ঞেস করেছেন, কোন দোকানে বললে কি বইখানি আনিয়ে দিতে পারবে না?...

আমি আশা করব, আজ হোক, কাল হোক এমন অমূল্য দুষ্প্রাপ্য বইএর পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা আমাদের দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে করা হবে। আমার ব্যক্তিগত ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। আমার কেবল ইচ্ছা হচ্ছে, গোটা বই না হোক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার সেই অসুস্থ হাসপাতালের শয্যায় শায়িত বন্ধুর জন্য 'নির্বাসিতের আত্মকথা'-র কয়েকটি পৃষ্ঠাকে উদ্ধৃত করে দিই।

*   *   *

"যাক্– এদিকে যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। যুদ্ধের পূর্বে যখন ছাড়া পাইবার আশা-ভরসা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া মরণের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলাম, তখন দুঃখের মাঝখানে দিন একরূপ কাটিয়া যাইতেছিল; কিন্তু যুদ্ধের পরে আবার কয়েদী ছাড়িবার কথা উঠিল। তখন আশায় ও আকাঙ্ক্ষায় দিন কাটানো ভার হইয়া উঠিল। একদিন সংবাদ আসিল যে, যে-সমস্ত যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত রাজনৈতিক কয়েদী পিনাল কোডের ৩০২ ধারা অনুসারে অপরাধী নয় তাহারা জেলখানায় যদি সাত বছর কাটাইয়া থাকে ত তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে। আমাদের সাত বছর ছাড়িয়া দশ বৎসর হইয়া গিয়াছে, সুতরাং প্রাণে একটু আশার সঞ্চার হইল। কিছুদিন পরে শুনিলাম যে, যে সমস্ত কয়েদীর মুক্তির জন্য ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের কাছে নাম পাঠান হইয়াছে তাহাদের সঙ্গে আমাদের নামও গিয়াছে; এখন গভর্নমেন্ট তাহা মঞ্জুর করিলেই নাকি আমরা নাচিতে নাচিতে দেশে ফিরিয়া যাইতে পারি।

"এ পর্যন্ত কোনও যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত রাজনৈতিক কয়েদী পোর্ট ব্লেয়ারে হইতে বাঁচিয়া ফিরে নাই। ১৮৫৭ সালে যাহারা সিপাহী বিপ্লবের পর পোর্ট ব্লেয়ার গিয়াছিল তাহাদের সকলকেই সেখানে একে একে দেহরক্ষা করিতে হইয়াছে। থিবর সহিত যুদ্ধের পর যে সমস্ত ব্রহ্মদেশীয় কয়েদী আসিয়াছিল তাহারাও কেহ ছাড়া পায় নাই। আজ আমাদের জন্য যে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে একথা সহসা বিশ্বাস করিতে সাহস হইল না। কিন্তু না বিশ্বাস করিয়াই বা করি কি? প্রাণ যে ফুলিয়া ফুলিয়া হাঁপাইয়া উঠিতেছে।...

এই সময় জেলে কমিটির পোর্ট ব্লেয়ারে আসিবার কথা ছিল। আমি স্থির করিলাম যে আমাদের যা কিছু বক্তব্য সমস্ত জেল কমিটির নিকট গায়ের ঝাল ঝাড়িয়া বলিয়া দিয়া তাহার পর কাজকর্ম ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়িব। কিন্তু রাখে কৃষ্ণ মারে কে? জেল কমিটি চলিয়া যাইবার অল্পদিন পরেই একদিন প্রাতঃকালে সুপারিন্টেন্ডেন্ট আসিয়া আমাদের সংবাদ শুনাইয়া দিলেন যে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট আমাদের আলীপুর জেলে পাঠাইয়া দিবার আদেশ দিয়াছেন; সেখান হইতে আমাদের মুক্তি দেওয়া হইবে।

অল্পদিনের মধ্যে গভর্নমেন্টের মতিগতি কি করিয়া পরিবর্তিত হইল সে রহস্য উদ্ঘাটন করিবার কৌতূহল মনের মধ্যেই চাপা পড়িয়া রহিল। লম্বা হইয়া মেঝের উপর পড়িয়া স্ফূর্তিতে কেহ চীৎকার করিতে লাগিল, কেহ হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল, কেহ গান জুড়িয়া দিল। একজন বিজ্ঞ বন্ধু সকলকে শান্ত করিবার জন্য বলিলেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"একটু স্থির হও দাদারা; এ বাড়িতে ফলার করতে এলে না আঁচানো পর্যন্ত বিশ্বাস নেই। শেষে মাঝ দরিয়ায় না জাহাজ ডুবিয়ে দেয়!"

জাহাজে চড়িবার আর দুই দিন বাকী। রাত্রে চোখে নিদ্রা নাই। আহারে প্রবৃত্তি নাই। কল্পনার শত চিত্র চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে। বহুদিন-বিস্মৃত সুপরিচিত মুখগুলি আবার মনের মধ্যে ফুটিতেছে। যাহাদের সহিত ইহকালের সব বন্ধন কাটিয়া গিয়াছিল তাহারা আবার স্নেহের শতডোরে বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে।

দুইদিন কাটিয়া গেল। দল বাঁধিয়া ছাব্বিশজন জেল হইতে বাহির হইলাম। তখনও কাহারও কাহারও পায়ে বেড়ি বাজিতেছে।...

তাহার পর জাহাজে চড়িয়া একবার পোর্ট ব্লেয়ারের দিকে শেষ দেখা দেখিয়া লইলাম।...

জাহাজ তিনদিন ধরিয়া ছুটিয়াছে; মনটা তাহার আগে ছুটিয়াছে ঐ সাগর দ্বীপে বাতি জ্বলিতেছে, ঐ রূপনারায়ণের মোহনা। আজই খিদিরপুরের ঘাটে জাহাজ গিয়া পৌঁছিবে।

না, জাহাজ ত কই ডুবিল না। এ যে সত্য সত্যই ঘাটে আসিয়া লাগিল। পুলিশ প্রহরী আমাদের সঙ্গে লইয়া আলীপুরের জেলের দিকে চলিল।...

ঘণ্টাখানেক জেলে থাকিবার পর সুপারিন্টেন্ডেন্ট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন শনিবার। আমরা ভাবিয়াছিলাম সেদিন ও তাহার পরদিন বুঝি আমাদের জেলেই থাকিতে হইবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সুপারিন্টেন্ডেন্ট ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন– "তোমরা বোধ হয় আজই বাহিরে যাইতে চাও? কলিকাতায় তোমাদের থাকিবার জায়গা আছে?" বাহিরে যাইবার নাম শুনিয়া আমরা লাফাইয়া উঠিলাম। মুখে বলিল্যাম– "জায়গা যথেষ্ট আছে," আর মনে মনে বলিলাম– "জায়গা না পাই রাস্তায় শুয়ে থাকবো; একবার ছেড়ে দাও।"

সে রাতে হেমচন্দ্র, রবীন্দ্র ও আমি ছাড়া পাইলাম। কিন্তু যাই কোথায়? শ্রীযুক্ত সি, আর, দাশের বাড়ি গিয়া দেখিলাম তিনি বাড়িতে নাই। তখন সেখান হইতে... বাহির হইয়া দেখিলাম যে কলিকাতার রাস্তাঘাট সব ভুলিয়া গিয়াছি।... শ্যামবাজারে শ্বশুরবাড়ি। ভাবিলাম সেখানে গিয়া রাত কাটাইয়া দিব। শ্যামবাজারে যখন পৌঁছিলাম, তখন রাত বারটা বাজিয়া গিয়াছে। বাড়ির দরজা বন্ধ। দুই চারবার কড়া নাড়িয়া যখন কোন সাড়া পাইলাম না, তখন ভাবিলাম, "কুচ পরোয়া নেহি; আজ রাতটা কলিকাতার রাস্তায় না হয় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইব।" প্রাণে একটা নূতন রকম আনন্দ দেখা দিল। আজ বারো বৎসর পরে খোলা রাস্তায় ছাড়া পাইয়াছি। সঙ্গে জেলার নাই, পেটি অফিসার নাই, একটা ওয়ার্ডার পর্যন্ত নাই। অতীতের বন্ধন কাটিয়া গিয়াছে, নূতন বন্ধন এখনো দেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয় নাই। আজ সংসারে বাস্তবিকই আমি একা। কিন্তু এই একাকিত্ববোধের সঙ্গে কোন বিষাদের কালিমা জড়িত নাই; বরং একটা শান্ত আনন্দ উহার তালে তালে ফুটিয়া উঠিতেছে।

শ্যামবাজার হইতে সার্কুলার রোড ধরিয়া শিয়ালদহ স্টেশনের দিকে রওনা হইলাম। বারো বৎসর জুতা পরা অভ্যাস নাই, সুতরাং আজ নূতন জুতায় পা একেবারে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল। জুতা খুলিয়া বগলে পুরিয়া চলিতে লাগিলাম। বগলে পুঁটুলি দেখিয়া রাস্তার এক পাহারাওয়ালা ধরিয়া বলিল, কোথা হইতে আসিতেছি, কোথায় যাইব, ইত্যাদি ইত্যাদি! একবার মনে হইল, সত্য কথা বলিয়াই দিই যে আমি কালাপানির ফেরত আসামী।... তাহার পর ভাবিলাম, আর সত্যনিষ্ঠার বাড়াবাড়ি করিয়া কাজ নাই। একবার সত্যকথা বলিতে গিয়া ত বারো বৎসর কালাপানি ঘুরিয়া আসিলাম।

শেষে বলিলাম, "আমি কালিঘাট হইতে আসিতেছি। শিয়ালদহ স্টেশনে যাইব।"

কনস্টেবল সাহেব আমার বগলের পুঁটুলি পরীক্ষা করিয়া অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন– "তুই কি উড়ে?"

বহু কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া বলিলাম– "হ্যাঁ'...

২০-১০-৯২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একুশে ফেব্রুয়ারি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন

ঢাকাতে একুশে ফেব্রুয়ারির মাসে বাংলা একাডেমীর কর্মসূচিই প্রধান কর্মসূচি। 'একুশে' এখন বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিল্পের বাৎসরিক মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে। বিষয়টির তাৎপর্য আছে। একদিন আবার একুশে ফেব্রুয়ারি মিলন মেলাকেও অতিক্রম করে যাবে। নতুনতর একুশ তৈরি করার জন্য। কিন্তু বর্তমানের এই অবদানটিও মূল্যহীন নয়।

ঢাকার জন জীবনের এই মাসের প্রধান আকর্ষণ বাংলা একাডেমীর অনুষ্ঠানমালা। অন্ততঃ ৭ তারিখ থেকে ২২ তারিখ : এই পনেরদিনের প্রতিদিন যেমন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি ছিল, তেমনি ছিল বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। প্রতিদিন সাড়ে চারটা থেকে শুরু করে সন্ধ্যার পরে আলোচনার শেষে ছিল সঙ্গীত-নাটকের অনুষ্ঠান।

বিরানব্বুই-এর একুশ তারিখ বিকেলের আলোচনাটিও ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আলোচনার শিরোনাম ছিল : একুশে ফেব্রুয়ারি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন। এর উপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক বশীর আল হেলাল। আলোচনায় ছিলেন : ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী। ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমদ, জনাব গাজীউল হক, অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, জনাব ফয়েজ আহমদ, নাট্যকার প্রফেসর মমতাজউদ্দীন আহমদ, ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেন। সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রফেসর আহমদ শরীফ।

আমারও একটু ভূমিকা ছিল। আলোচনার তালিকায় আমিও অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাবো তো আকাশ কালো করে মেঘ নেমে এল। মনে দু রকম অনুভূতি হল : আহা! আলোচনাটা নষ্ট হয়ে গেল! কিন্তু নিজের মনে আবার ভাবলাম : আলোচকের দুরূহ ভূমিকা আমাকে পালন করতে হল না। কিন্তু একাডেমীর ভাগ্য ভাল। আধ ঘণ্টার মধ্যে আবহাওয়া মোটামুটি ভাল হয়ে গেল। বাসা থেকে খোঁজ নিয়েই জানলাম : হাজার হাজার দর্শক শ্রোতা জমে গেছে। আমার আলোচনার দুর্ভাবনা নিয়ে আমিও শেষ পর্যন্ত একাডেমীতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোচনার বিস্তারিত বিবরণে যাবো না। সবটা মিলিয়ে আমার ভাল লেগেছিল। পাঁচটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত চলেছিল। নির্ধারিত আলোচক সকলেই উপস্থিত হয়েছিলেন। জনাব বশীর আল হেলালের উপস্থাপিত প্রবন্ধটির উপর বিভিন্ন আলোচকই বিশ্লেষণমূলক বক্তব্য রেখেছিলেন। প্রবন্ধটিতে প্রবন্ধকারের একটি ইতিহাসবোধ এবং বিবরণশৈলী প্রকাশিত হয়েছিল। তার পক্ষে-বিপক্ষে বলার নিশ্চয়ই সুযোগ ছিল। এবং তাতেই আলোচনাটি জমে উঠেছিল।

একুশের এবারকার এই আলোচনায় স্বাভাবিকভাবে দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক অবস্থার প্রসঙ্গ উঠেছিল। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি সরকারের প্রশ্রয়ে কেমন করে তার প্রতিহিংসার থাবা বিস্তার করে এগুচ্ছে তার আলোচনা ছিল এবং তাতে জবাবদিহীর দিকটিও সোচ্চার ছিল। আমি ভাবলাম, এমন আবহাওয়ায় সরকারের অন্যতম মুখপাত্র ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী হয়ত কিছুটা বিব্রত বোধ করবেন। কিন্তু না, তেমন বোধ হল না। সেদিক থেকে তিনি যে বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্যেই সহজে বিচরণ করতে পারেন তার আর একটি প্রমাণ এদিন পাওয়া গেল। তাঁর সম্পর্কে সভা পরিচালনাকারীর পরিচয়মূলক কথাকে ডা. চৌধুরী সংশোধন করে বক্তৃতার শুরুতে বললেন : 'আমার নিজস্ব পরিচয়েই আমি এখানে এসেছি। সরকারের মুখপাত্র হিসাবে নয়।' আলোচনায়ও তিনি দক্ষ। তাঁর বক্তৃতাশেষে আলোচনার গোড়ার দিকে আমাদের সকলের সঙ্গে তিনি সহাস্যে হাত মিলিয়ে মঞ্চ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। সেটা হয়ত পরবর্তী আলোচকদের জন্য স্বস্তিদায়কই হয়েছিল। আর যাই হোক, পক্ষে-বিপক্ষের সব লোকই তো আমরা বাঙালি– বাংলাদেশী। পরস্পরের ভাই-ভ্রাতা, চাচা-ভাতিজা ও মামা-ভাগ্নে। তাই কারুর সামনের চাইতে পাশে বা পেছনে বলাতেই আমাদের স্বস্তি। উদ্দিষ্ট ব্যক্তি হলে আমরাও বুঝি : এখন থেকে সরে যাওয়াই উত্তম।

আমার নিজের আলোচনাতে আমি বিব্রত হয়েছি এ কারণে যে, আমি গোড়া থেকে আলোচনার শিরোনাম উল্টো করে চিন্তা করছিলাম। সেই উল্টো চিন্তা কিংবা পার্শ্বচিন্তা পেশ করতে যখন উঠলাম তখন আলোচনার বয়স দু ঘণ্টা হয়ে গেছে এবং সম্মুখে উপবিষ্ট জনতার ঘন ঘন করতালির অর্থ হচ্ছে : আলোচনা আর কত? গান কোথায়? 'শেষ করুন। বসে পড়ুন।' আমি দেখলাম : একটু ধমক না দিলে নয়। জনতা মানে আবেগে উদ্বুদ্ধ কিশোর কিংবা তরুণ। তার আবেগ একবার উত্থিত হলে তা ডাইনে-বাঁয়ে কোথায় যাবে তা জনতাও জানে না। জনতার পরিচালকও জানে না। আমি টেবিল চাপড়ে বললাম' 'গান শোনা সহজ। নতুন বাংলাদেশ গড়া কঠিন। একুশের অস্তিত্বের পরিচয় বাদে একুশ পালনের অনুষ্ঠান প্রহসন বৈ আর কিছু নয়।' এতটুকু বলেই বক্তৃতার দণ্ড থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরে এলাম। বাহ্যতঃ একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু কথাটির প্রয়োজন ছিল। আসলে মূল ভুল সংগঠকদের। এমন আলোচনায় সভাপতিসহ দশজন পরিচিত বিশিষ্ট আলোচককে আলোচনায় উপস্থিত করা সময়ের সীমাবদ্ধতার দিক থেকে নিতান্তই অনুচিত। দ্বিতীয়তঃ এমন আলোচনার শেষে সংগীত তথা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আকর্ষণ রাখাও অনুচিত। সাধারণ শ্রোতা-দর্শকের কাছে ক্রমান্বয়ে আলোচনার চাইতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। এবং তখন তার অস্থিরতায় মূল আলোচনাই ভেস্তে যেতে বাধ্য হয়।

কিন্তু সে কথা থাক আমি বরঞ্চ এই আলোচনা প্রসঙ্গে আমার চিন্তার কথাটি বলি।

* * *

'একুশে ফেব্রুয়ারি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন।'

আগে শিরোনামের অর্থটা ধরার চেষ্টা করি। একুশে ফেব্রুয়ারি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন : পূর্ববঙ্গ-পূর্ব পাকিস্তান-বাংলাদেশের আধুনিক ইতিহাসে 'একুশে ফেব্রুয়ারি' একটি প্রতীকী তাৎপর্য আহরণ করেছে। গোড়াতে, সেই ৫২ সালে, ২১ ফেব্রুয়ারিকে আমরা 'একুশের' জন্ম তারিখ বলে চিহ্নিত করেছি। সেদিন থেকে 'একুশকে' আত্মদানের মহৎ আবেগের একটি আধার হিসাবে আমরা বিবেচনা করেছি। এই আবেগ দ্বারা আমরা অনুপ্রাণিত এবং উদ্বুদ্ধ হয়েছি। যাঁরা সেদিন নিহত হয়েছিলেন তাঁদের জীবনকালের বাস্তব সুখ-দুঃখ-কর্মকাণ্ডের অতিরিক্ত তাঁদের জীবনদানের ঘটনাটি সেকালের পরিবেশে বিপুল আলোড়নকারী ঘটনা বলে বিবেচিত হয়েছে। বলা চলে '৫২-সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা সমগ্র পূর্ব বাংলাকে আলোড়িত করেছিল। একুশে ফেব্রুয়ারির প্রতিক্রিয়া ঢাকাকে অতিক্রম করে পূর্ব বাংলার নানা নগর এবং তাকেও অতিক্রম করে পূর্ববাংলার শেকড় তথা তার কৃষক সমাজকে আলোড়িত করেছিল। '৬৯ এবং '৭১-এর পরবর্তীতে এরূপ জাতীয় আলোড়নকারী ঘটনার সাক্ষাৎ আর আমরা পাই নে।

'৭১-এ অবশ্যই বাঙালির জীবনে একটা পর্যায়ন্তর সংঘটিত হয়েছে। '৭১-এর পরবর্তী পর্যায়ে একুশের আলোচনাকারীদের মধ্যে একটা প্রশ্ন সাধারণত : জিজ্ঞাসিত হয়ে আসছে : একুশ কি তার মূল আবেগ ক্রমান্বয়ে হারিয়ে ফেলছে? এখন কি একুশ বাৎসরিক একটি তারিখ কিংবা মাসব্যাপী বিভিন্ন প্রকার সাহিত্য, সাংস্কৃতিক-শৈল্পিক মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে?

কথাটা বেদনা বা ক্ষোভের নয়। এটাও একুশের কম অবদান নয়। আমাদের জাতীয় জীবনে বাৎসরিক এমন পর্ব পূর্বে ছিল না। এতদিনে এই পর্বটি দেশের প্রধান শহর এবং উপশহরে একটি স্থায়ী অস্তিত্ব ধারণ করেছে। একুশের জন্মবৃত্তান্ত নতুন থেকে নতুনতর প্রজন্মের অজ্ঞাত থাকলেও ২১ ফেব্রুয়ারির মিলন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেলা প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হতে থাকবে বলে আমরা মনে করি। অবশ্য এমন হতে পারে এই মিলন মেলাটির চরিত্র নিয়ে বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের পক্ষাপক্ষীর মধ্যে নানা টানাপড়েন ঘটবে। কিন্তু তাতেও একুশের স্থায়ী অস্তিত্বের স্বীকৃতি ঘটবে।

কিন্তু একথা সত্য যে, '৭১-পর্যন্ত একুশের যে রাজনৈতিক চরিত্র এবং অবদান প্রধান ছিল অর্থাৎ একটা প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক শক্তির প্রতিবাদী চরিত্রের প্রকাশ ঘটেছিল– 'একুশের মধ্যে : '৭১-এর পরবর্তীতে সেই রাজনৈতিক চরিত্র একুশের কাছে আশা করাটা যুক্তিসঙ্গত হবে না এবং তার কাছ থেকে তা না পেলেও আমাদের হতাশ হওয়ারও কোন কারণ থাকা উচিত হবে না।

সেদিন থেকে 'একুশে ফেব্রুয়ারি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন' শিরোনামে আমাদের ক্রমবিকাশমান সংগ্রামী রাজনৈতিক-গণতান্ত্রিক আন্দোলনে একুশের অবদান বুঝাতে চাইলে '৭১ পর্যন্ত যেমন তার অবদানকে '৫২-এর পরবর্তীতে '৫৪, '৬২, '৬৬, '৬৮-'৬৯ এবং '৭১-এর রাজনৈতিক স্মারকগুলির সঙ্গে 'একুশ' এবং তার আবেগকে সংযুক্ত করে থাকি, ৭১-এর পরবর্তীতে তেমন করাটা সহজ নয়। তার প্রধান কারণ : '৫২-এর আগে এবং পরে থেকে '৭১ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার একটি রাজনৈতিক লক্ষ্য যেমন ক্রমান্বয়ে নেতৃস্থানীয় সামাজিক-অর্থনৈতিক শ্রেণীগুলির কাছে অর্জনীয় লক্ষ্য বলে ক্রমাধিকভাবে স্বীকৃত হয়ে আসছিল, '৭১-এর পরবর্তীতে তেমন কোন লক্ষ্য এখনো পর্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি।

'৭১-এর পূর্ববর্তী এই লক্ষ্যকে আমরা স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য বলে চিহ্নিত করেছিলাম। '৭১-এর পরবর্তী পর্যায়ে স্বৈরতন্ত্রের বিরোধী গণতন্ত্রের পক্ষীয় আন্দোলনের কথা আমরা উচ্চারণ করলেও এই কথাগুলির অভিন্ন অর্থ আমাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনে আজো নির্ধারিত হয় নি। এ কেবল রাজনৈতিক চেতনার বিষয় নয়। অর্থনৈতিক রূপান্তরেরও বিষয়। কথাটা এখনো যতোই অস্পষ্ট হোক, ক্রমান্বয়ে সেটি অনস্বীকার্য হয়ে উঠবে যে, বর্তমান পর্যায়ের যে-শ্রেণীগুলি সবচাইতে বঞ্চিত আর নিপীড়িত তাদের জীবনের চাহিদা মেটানোই এই পর্যায়ের প্রধান বিষয়।

এ পর্যায়ের ভবিষ্যৎ মেয়াদের পরিমাপ করা সহজ নয়। কিন্তু একথা সত্য, জনজীবন কখনোই ঘটনাহীন থাকবে না। তার সংকট যত বৃদ্ধি পাবে, ঘটনাও তত সংঘটিত হবে। এই মেয়াদ পর্যায়ক্রমে স্বৈরতন্ত্রী গণতন্ত্রীতে, এবং গণতন্ত্রী স্বৈরতন্ত্রীতে রূপান্তরিত হতে থাকবে। এবং এরই মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিকভাবে শোষিত শ্রেণীর আপন রাজনৈতিক শক্তি, রাজনৈতিক কর্মী এবং রাজনৈতিক নেতারও উদ্ভব ঘটবে। এবং এই নতুন শক্তির অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎস যে তখনো 'একুশে ফেব্রুয়ারি' হবে এবং নতুনভাবে হবে : এটিও আশা নিয়ে বলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়। কারণ '৫২-এর একুশের আগে ও পরে সামাজিক-রাজনৈতিক সংগ্রামে, আন্দোলনে যারা জীবন দিয়েছে, সংখ্যাগতভাবে তার প্রধান অংশের আগমন ঘটেছে নিষ্পেষিত কৃষক-শ্রমিক ও নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকেই।

তাদের সেই অবদানের দিকটি এখনো পর্যন্ত আত্যন্তিক গবেষণার মাধ্যমে উদঘাটিত হয় নি। এখন পর্যন্ত শহীদের সংখ্যা পরিচিত কয়েকটি নামেই সীমাবদ্ধ। এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানকে উদঘাটিত করে বিস্তারিত আলোচনায় তার তাৎপর্য ব্যাখ্যায় আমাদের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক সরকার ও শক্তির সচেতন অনীহা ও প্রতিরোধের বিষয়টি কি আমাদের অজানিত?

বস্তুত ঃ যাঁরা এদিকটির আলোচনাতে গরজ বোধ করেন তাদের বিষয়টির দিকে নজর দেওয়া আবশ্যক।

সেদিক থেকে 'একুশ' নামে যে একটি অস্তিত্বের কথা আমরা বলে থাকি তার যথার্থ পরিচয় এখনো বিবৃত হয় নি। এবং বর্তমানের অনুষ্ঠানাদির পেছনকার রাষ্ট্রশক্তির সুকৌশল চেষ্টা হচ্ছে 'একুশে'র সেই যথার্থ পরিচয়টি যেন উদঘাটিত হতে না পারে।

আমার এই অনুভবটির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আবশ্যক। সে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ যেমন আমার ব্যক্তিগত ক্ষমতার বাইরে তেমনি সেমিনারের এই সময়টিও তার উত্তম সময় নয়। কিন্তু ব্যাখ্যায় অক্ষম হলেও এই অনুভূতিটি মূল্যহীন হয়ত নয়, বলেই আমি তার উল্লেখ করলাম।

একুশের সেই অবয়বটির পরিচয় সংগ্রহে একটি দিকের উল্লেখ করে আমার বক্তব্যটি শেষ করতে চাই।

'একুশে ফেব্রুয়ারি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন' কথাটি বললে একুশে ফেব্রুয়ারির জন্ম থেকে তার পরবর্তী রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জাতীয় আন্দোলনের বিকাশে 'একুশের অবদানের কথাটিই প্রধান হয়ে আসে। শিরোনামের এ বিন্যাসে এটিই স্বাভাবিক। এবং এটি গুরুত্বপূর্ণও বটে।

বশীর আল হেলালের সুলিখিত উপস্থাপনাতে এ দিকটি উপযুক্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সাথে সাথে একুশের ঐতিহাসিক পূর্ব-পটও তিনি অঙ্কিত করেছেন। তাতে প্রবন্ধটি ক্ষুদ্রাকারের হলেও সমগ্র উপমহাদেশের রাজনৈতিক বিবর্তনের একটি বহিঃরেখায় পরিণত হয়েছে। এটির প্রচার ও বহু পঠন আবশ্যক।

কিন্তু আমি যদি শিরোনামটিকে ঘুরিয়ে বলি : 'গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও একুশে ফেব্রুয়ারি' তাহলে কি নতুন কিছু অর্থ তাতে আরোপিত হয়? কিছু যে নতুন অর্থ এ শিরোনামে আসে তা বশীর আল হেলালের উপস্থাপনাও প্রকাশ করেছে। তারও একটি দিক হচ্ছে 'গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও একুশে ফেব্রুয়ারি'। 'একুশে ফেব্রুয়ারিও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এটি পরিপূরক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই পরিপূরকের একটি উপেক্ষিত উপাদান হিসাবে আমি সেই '৪৮ সাল থেকে '৭১ সাল অবধি, অন্ততঃ '৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত (২৫ মার্চের পরে '৭১-এর কথা আলাদা। সেটি সাধারণ আলোচনার আয়ত্তের বাইরে) কারাগারে রাজবন্দীদের জীবনকে বুঝাতে চাই।

'রাজবন্দীদের আন্দোলন ও একুশে ফেব্রুয়ারি' : কথাটি এভাবেও বলা যায়। কিন্তু রাজবন্দী কথাটা পরিচিত হলেও, রাজবন্দীদের আন্দোলন কথাটা পরিচিত বা স্বীকৃত কথা নয়।

'৪৮ সাল থেকে '৭১ পর্যন্ত বিস্তারিত পর্যায়ে সমগ্র পূর্ববঙ্গব্যাপী সকল কারাগারের শত সহস্র রাজবন্দীর কথা আমার জানা নেই। কিন্তু আমার জানা না থাকলেও এটা একটা ঐতিহাসিক অস্তিত্ব : রাজবন্দী। অন্ততঃ '৪৮ সাল থেকে '৫২ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলার কারাগারগুলির মধ্যে যে রাজনৈতিক কর্মীরা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তবাদী মুসলিম লীগ সরকার দ্বারা, তাদের কারাগারের ভেতরের জীবন নিয়ে এখনো পর্যন্ত তথ্য এবং ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ভিত্তিতে কোন আলোচনা হয় নি। এজন্যই এ দিকটি আজো উপেক্ষিত। অথচ '৪৮ সাল থেকে ক্রমান্বয়ে পূর্ববঙ্গে আন্দোলনের যে-আবেগ তৈরি হচ্ছিল তার একটি বড় অবদান এসেছিল কারাগারের রাজবন্দীদের কাছ থেকে।

'রাজবন্দী' বললে কথাটির অর্থ দেশের মধ্যে আন্দোলনরত রাজনৈতিক কর্মীদের সরকার আর পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়া বুঝায়। এই নিক্ষিপ্ত হওয়ার মুহূর্তটিতেই যেন রাজনৈতিক কর্মীর রাজনৈতিক জীবনের সমাপ্তি ঘটে যায়। পরবর্তীকালে গণআন্দোলনের ফলে তাদের মুক্তির দাবী যখন বাস্তবায়িত হয় অর্থাৎ রাজবন্দীরা যখন মুক্তি পায় তখন তার রাজনৈতিক জীবন আবার শুরু হয়। কিন্তু মধ্যবর্তী ২, ৫ কিংবা ৭ বছরের তার যে কারাজীবন, এটা যেন তার অরাজনৈতিক জীবন এবং সে কারণে গণ আন্দোলনের ঐতিহাসিকের সেই 'অরাজনৈতিক' জীবনের দিনাদিনের কড়চা সংগ্রহের কোন গরজ থাকে না।

কিন্তু এমন একটি গণ আন্দোলনের অস্তিত্ব কি চিন্তা করা যায় যে-আন্দোলনের আওয়াজের মধ্যে 'রাজবন্দী' কথাটি নেই? 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই'; দাবী নেই কিন্তু রাজনৈতিক কর্মী রাজবন্দী হয়ে যদি 'অরাজনৈতিকে' পর্যবসিত হয়ে যায়, তবে তার উৎস, বাইরের আন্দোলনও কি রাজনৈতিক আন্দোলনের চরিত্র ধারণ করে অগ্রসর হতে পারে?

আমার মনে হয়, তা পারে না। রাজনৈতিক আন্দোলনকে রাজনৈতিক থাকতে হলে তার রাজবন্দীদেরও রাজনৈতিক থাকতে হয়।

কিন্তু রাজবন্দীর রাজনৈতিক থাকা কি মুখের কথা? সুখের কথা? বিনা ঘানি টানা, ডাণ্ডাবেড়ী পরা, বিনা অনশন ধর্মঘটের এবং কারাগারের ভেতরে অসহায়তম ভাবে গুলি খেয়ে শহীদ না হওয়ায় ব্যাপার?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, কারাগারে একজন রাজবন্দীর রাজনৈতিক থাকার প্রতিমুহূর্তের সচেতন সংগ্রাম কারাগারের বাইরের গণআন্দোলনের একজন কর্মীর রাজনৈতিক থাকার চেতনা ও কষ্ট এবং ত্যাগের চাইতে অচিন্ত্যনীয়ভাবে অধিক চেতনা, কষ্ট এবং ত্যাগের ব্যাপার।

এই ইতিহাস আজো লিখিত হয় নি। শুধু দু একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়। এর অধিক নয়। কিন্তু একুশের জন্মের পটভূমিকে যদি আমাদের বুঝতে হয়, এমন কি জন্মের পরে তার রাজনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির দিকটিও যদি আমাদের বুঝতে হয় তবে রাজবন্দীদের কারাগারের অভ্যন্তরের জীবনের ইতিহাস আমাদের গবেষণার মাধ্যমে জানতে হবে।

পাকিস্তানের গোড়াতে, সেই '৪৮ সালের দিকে, রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেপ্তার করে যখন জেলখানায় পোরা হত, তখন তাদেরকে একেবারে খতম করার নীতি নিয়েই পোরা হত।

বিভিন্ন জেলে নিরাপত্তা আইনে আটক রাজবন্দীদের সরকার একেবারে মানবেতর পর্যায়ে নিক্ষেপ করেছিল। ব্রিটিশ সরকারের আমলেও যেসব সুযোগ রাজবন্দীরা ভোগ করত, মুসলিম লীগ সরকার সেসব সুযোগও, রাজবন্দীদের নির্যাতন করার নীতিতে নাকচ করে দেয়। তেমন অবস্থায় রাজবন্দীরা মানুষের মত আচরণ লাভের দাবীতে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় ব্যর্থ হয়ে পরিশেষে অনশন ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হয়। '৪৮-'৪৯-'৫০ সালে বিভিন্ন জেলের রাজবন্দীরা বিভিন্ন মেয়াদে অনশন ধর্মঘট করেছিল। এসব ধর্মঘটের বিস্তারিত বিবরণ এখনো সংকলিত হয় নি। এজন্য স্বরাষ্ট্র বিভাগ এবং বিভিন্ন জেলের ৪০ ও ৫০ দশকের নথিপত্রের উপর গবেষণা প্রয়োজন।

একাধিক ব্যর্থ অনশন ধর্মঘটের পরে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের শতাধিক রাজবন্দী শেষ মরণপণ সংগ্রাম হিসাবে '৪৯-এর ডিসেম্বরে আবার অনশন ধর্মঘট শুরু করে। '৪৯-এর ডিসেম্বরে কয়েকজন সাথীর সঙ্গে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে আমি যখন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে নিক্ষিপ্ত হই তখন বোধ হয় জেলের রাজবন্দীদের অনশন ধর্মঘটের বিশ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ৫৮ দিনের শেষে এই ধর্মঘটের একটা সুরাহা হয়েছিল। রাজবন্দীদের কিছু দাবী জেল কর্তৃপক্ষ ও সরকার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। রাজবন্দীদের জীবনের বিরাট মাশুলের বিনিময়ে এই সাফল্য এসেছিল। এই অনশন ধর্মঘটের এক পর্যায়ে কুষ্টিয়ার শ্রমিক নেতা শিবেন রায়কে নিঃসঙ্গ খুপরিতে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল। এই অনশন ধর্মঘটের প্রতিক্রিয়াতেই ধর্মঘটের অব্যবহিত পরে ঢাকার খ্যাতনামা কমিউনিস্ট নেতা ফনি গুহ অস্বাভাবিকভাবে মারা যান। চট্টগ্রামের কৃষক নেতা ধীরেন শীল এবং অমর সেন অনশনের প্রতিক্রিয়ায় তাঁদের মানসিক ভারসাম্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারিয়ে ফেলেছিলেন। এবং এই সময়েই '৫০ সালের এপ্রিল মাসে, ২৪ এপ্রিল, রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে একটা ছোট্ট বাংলোঘরে রাজবন্দীদের আটক করে জেলের 'পাগলা ঘণ্টি' বাজিয়ে সশস্ত্র বাহিনীকে জেলখানার ভিতরে ঢুকিয়ে একেবারে নিকট থেকে জানালার গরাদে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে বিরামহীনভাবে গুলিবর্ষণ করে ৭ জন রাজবন্দীকে হত্যা করা হয়। এই সাতজন রাজবন্দী ছিলেন : হানিফ শেখ, বিজন সেন, সুধীন ধর, কম্পরাম সিং, আনোয়ার হোসেন, দেলোয়ার হোসেন এবং সুখেন ভট্টাচার্য। এই গুলিবর্ষণের ফলে অনেক রাজবন্দী জীবনের জন্য পঙ্গু হয়েও যান।

কারাগারের মধ্যে অনশন ধর্মঘটের মতো সচেতন সাহসী আর মারাত্মক সংগ্রামের কথা চিন্তা করা যায় না। শুধু একটি বাক্যে অনশন ধর্মঘটের মেয়াদ কিংবা তার ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ দিয়ে একজন রাজবন্দীর কারাগারের মধ্যে রাজনৈতিক জীবন রক্ষা করার প্রতিমুহূর্তের জীবনপণ সংগ্রামের কথা বুঝানো সম্ভব নয়।

একদিন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজবন্দীরা দূর আন্দামানের সেলুলার জেলে অনশন ধর্মঘটে আত্মদানের যে ঐতিহাসিক অধ্যায় তৈরি করেছিলেন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পূর্ব-পাকিস্তান পর্যায়ে পূর্ববঙ্গের কারাগারে গণ আন্দোলনে নিবেদিত-প্রাণ কর্মী রাজবন্দীদের এই অনশন ধর্মঘট এবং রাজশাহী জেলে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণদান। নাচোলের সাঁওতাল আন্দোলনের বন্দীনি ইলামিত্রের উপর পাকিস্তানী পুলিশের নির্মম পাশবিক অত্যাচার এবং বহু সাঁওতাল কর্মীর হাজতে নির্যাতনে প্রাণত্যাগও এই সঙ্গে স্মরণীয়।

'একুশের' জন্মের এই হচ্ছে রক্তাক্ত প্রেক্ষাপট। এর আন্তরিক অনুভব ব্যতিরেকে 'একুশের' অস্তিত্ব এবং তার জন্মগত আবেগ ও শক্তিকে উপলব্ধি করা বর্তমানের প্রজন্মের পক্ষে সম্ভব হবে না। ইতিহাসের এই প্রেক্ষাপট বাদে 'একুশকে' আকস্মিক এবং অলৌকিক মনে হওয়াই স্বাভাবিক। এ কারণে এই পর্যায়টির উপর বিস্তারিত গবেষণা ও তার বিবরণের প্রয়োজনের কথা আমি উল্লেখ করলাম। এ হচ্ছে একুশের সৃষ্টিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অবদান : তথা 'গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও একুশে ফেব্রুয়ারি।'

২১-২-৯২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথায় '৭১?

বাংলা একাডেমীর মূল ভবনের পশ্চিমের যে ঘরটাতে আমি বসতাম সেখান থেকে ১৯৭১-এর ৭ সেপ্টেম্বর তারিখে, অফিসের সময়ে, পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর শাদা পোশাকে গোপন দল আমাকে গ্রেপ্তার করে অপেক্ষমান একটা জীপে তুলে নিয়ে যায়।...

এখন বাংলা একাডেমীর বাইরের চেহারার বেশ কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। হয়তবা ভিতরের চেহারারও। তাকে অনিবার্য বলেই আমার মত প্রাক্তনকেও মানতে হয়।

মূল ভবনের দোতলার উপরে একটি তলা অবশ্য স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বের পর্যায়েই তৈরি হয়েছিল। সেই তলাটির পূর্ব দিকে ছিল পরিচালক তথা সেদিনের মহা পরিচালকের অফিস। পশ্চিম পাশের হল ঘরটাতে আমরা সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রদর্শনী ও সীমিত আকারের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতাম। সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুষ্ঠানগুলির দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হত। তখন ঐ পদের নাম ছিল 'কালচারাল অফিসার'। সংস্কৃতি-অধ্যক্ষ। সেদিনকার সেই 'পর্যায়ে আমি বাংলা একাডেমীর একজন কর্মচারী এবং কর্মী হিসাবে একাডেমীতে যোগদান করেছিলাম ১৯৬৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে। তখন সৈয়দ আলী আহসান সাহেব একাডেমীর পরিচালক। রাজবন্দী হিসাবে আমার কারাবাসের একটি পর্যায় শেষ হয়েছিল '৬২ সনের শেষের দিকে। ঠিক করেছিলাম, চরিত্রগতভাবে 'অ-রাজনৈতিক' আমার পক্ষে নিরীহ কেসেমের কিছু লেখাপড়া করার চেষ্টা করাই শ্রেয়। অবশ্য জীবনের কোন ধনই ফেলা যায় না। কারা জীবনের অভিজ্ঞতাও জীবনের এক সম্পদ বিশেষ। কিন্তু সে পর্যায়ের কথা থাক।

এ পর্যায়ে বাংলা একাডেমীর সঙ্গে যুক্ত হতে পারাটাকে কেবল কোন চাকুরি হিসাবে নিই নি। বাংলা একাডেমীর সঙ্গে মনের আবেগগত সম্পর্কেরও একটি দিক ছিল। তাতেই বস্তুগত অন্য ক্ষয় ক্ষতি অনেকখানি পুষিয়ে যেত।

প্রথমে যোগ দিয়েছিলাম অনুবাদ বিভাগে। একজন সহকারী অনুবাদক হিসাবে। অনুবাদ বিভাগের তখন প্রধান ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও চিন্তাবিদ আবু জাফর শামসুদ্দীন সাহেব। সৈয়দ আলী আহসান সাহেব, আবু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাফর শামসুদ্দীন সাহেব, লুৎফুল হায়দার চৌধুরী, আহমদ হোসেন : একাডেমীতে তখন কেবল এঁরা নন। পদে প্রধান না হলেও সবার মুরুব্বী ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। সংকলন ও আঞ্চলিক ভাষা-অভিধান প্রকল্পের প্রধান সম্পাদক। তাঁর সহকারী ছিলেন গোলাম সামদানী কোরেশী। সংকলন বিভাগের অফিসার ছিলেন মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ। মুহম্মদ আবদুল কাইউমও সংকলন বিভাগে যোগ দেন। তাছাড়া ছিলেন শান্তিনিকেতনের এককালীন অধ্যাপক মুহম্মদ আদমউদ্দীন। শেখ মুহম্মদ শরফুদ্দীন সাহেবও ছিলেন। সরকারি কলেজের প্রিন্সিপাল হিসাবে তিনি তখন অবসর গ্রহণ করেছেন। কিছু পরে শিক্ষাবিদ এস. এন. কিউ জুলফিকার আলী সাহেবও এসে একাডেমীতে যোগ দেন।

অপর সহকর্মীদের নামও উল্লেখযোগ্য। স্মরণযোগ্য। তাঁরা প্রায় সকলেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সকলের নাম করতে গেলে কেবল স্মৃতির উপর নির্ভর করা ঠিক হবে না। সেজন্য বাংলা একাডেমীর পুরোন নথিপত্র দেখতে হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর বর্তমান পর্যায়েরও বিশিষ্ট কর্মী ও সাহিত্যিক বশীর আল হেলাল সাহেব 'বাংলা একাডেমীর ইতিহাস' রচনা করেছেন। এটি একটি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে সম্পাদিত হয়েছে।

কিন্তু আজ আমি সেকালের বাংলা একাডেমীর কর্মীদের নাম উল্লেখ করতে বসি নি। আমার মনের একটি আফসোসের কথা বলতে চাচ্ছিলাম। এখনো আমি বাংলা একাডেমীতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখতে কিংবা আলোচনাতে যোগ দিতে যাই। একাডেমীতে গেলেই মূল ভবনের নীচের তলাতে আমার সেই পশ্চিমের ঘরটিতে যেতে ইচ্ছা করে। সে ঘরের এখন খুব পরিবর্তন না হলেও, ঘরটি এখন একাডেমীর লাইব্রেরির একটি অংশ। ঘরে ঢোকার মুখে দরজার উপরের খিলানের দিকে চোখ যায়। না, এখন সেটি মজবুত। কিন্তু '৭১-এর ২৬ মার্চের পরে ২৭ মার্চ যখন বুকের দুরুদুরু কাঁপুনি নিয়ে এই ঘরটি দেখতে এসেছিলাম, তখন দেখেছিলাম এটি প্রায় বিধ্বস্ত। ২৫ মার্চ রাত্রে পাক হানাদার বাহিনী শহরের উপর ব্যাপক আক্রমণ শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রধান লক্ষ্য ছিল ছাত্রদের হল, অধ্যাপকদের বাসভবন, শহীদ মিনার আর বাংলা একাডেমী, ২৫ মার্চ রাত্রিতে অধ্যাপকদের বাসভবনে হানা দিয়েছিল। ড. গোবিন্দচন্দ্র দেবকে হত্যা করেছিল। তাঁর বাসভবন ছিল কালীবাড়ী বলে পরিচিত মন্দিরটির লাগ-পশ্চিম পার্শ্বে। সংখ্যাতত্ত্বের অধ্যাপক মনিরুজ্জামানকে গুলি করে হত্যা করেছিল শহীদ মিনারের বিপরীত অধ্যাপকদের ত্রিতল ভবনের নিচে। ড. জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুর তাকেও গুলি করেছিল তাঁর বাসার বাইরে, ধরে নিয়ে গিয়ে, সিঁড়ির নিচে।

শহীদ মিনারের স্তম্ভকে গোলার আঘাতে একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। বাংলা একাডেমী একটা অফিস। লোকজন বাস করে না ভবনে। কিন্তু ২৫ মার্চ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাত্রে না হলেও ২৬ মার্চ সকালে নিশ্চয়ই রাস্তায় ট্যাঙ্ক কিংবা সাঁজোয়া বহর থেকে ভারী গোলা নিক্ষেপ করে বিধ্বস্ত করেছিল তেতলার পরিচালকের ঘর এবং নিচের তলার পশ্চিম পার্শ্বের আমাদের সংস্কৃতি আর সংকলন বিভাগের ঘর।

এই ঘরে ঢুকতে গেলেই বর্তমানের পরিবর্তনকে ভেদ করে আমার মনের চোখ চায় বিধ্বস্ত দরজার খিলানের দিকে। আর অন্বেষণ করে আমার বসার টেবিলের পেছনে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকত সাহিত্য-সংস্কৃতির পাণ্ডুলিপি আর নথি বুকে করে যে-লোহার আলমারিটি, সেই আলমারিটিকে।

আহা! ২৭ মার্চ এসে দেখি, সেই আলমারিটির বুক গুলির আঘাতে আঘাতে একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। এ ফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে। ভিতরের তাক খুলে পড়েছে। পাণ্ডুলিপি দুমড়ে মুচড়ে গেছে। ঘটনার সময়ে তো ছিলাম না। কিন্তু পরে সেই ২৭ মার্চ যখন তাকে দেখি এবং ২২ বছর পরে আজো যখন কল্পনা করি সেই দৃশ্যটির তখনো বুঝতে পারি নে কেমন করে সেই আলমারিটি অমন করে ক্ষত বিক্ষত হয়েছিল। আলমারিটি কেবল মাত্র একটি নিরেট বস্তু ছিল না সেদিন আমাদের কাছে। সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি স্মারক ছিল। তাই তাকে অমনভাবে আহত দেখে আমার মনে একটা মমতা ও আবেগের সৃষ্টি হয়েছিল। আমি আলমারিটির উপর একটি রোজনামচাও লিখেছিলাম, 'গুলির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত' এই নাম দিয়ে।

'৭১-এর পরে '৭২ সনে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর্যায়ে আমি বাংলা একাডেমী থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করি।

কিন্তু তাহলেও যখনি বাংলা একাডেমীতে গিয়েছি, তখনি আমার ঘরের, হানাদারদের গুলিতে ক্ষতবিক্ষত সেই সপ্রাণ আলমারিটির খোঁজ করেছে আমার মনের চোখ। হয়ত আরো কিছুদিন ছিল। এমন ঝাঁঝরা অপদার্থ একটা পদার্থের আর কি প্রয়োজন? তাই বোধ হয় কিছুদিন পরে '৭১-এর পরবর্তী কর্মীরা তাকে আবর্জনার আধারে পরিত্যাগ করে দিয়েছেন। তাই আজ আর তার সাক্ষাৎ পাই নে। অথচ পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর সর্বাত্মক ফ্যাসিবাদী আক্রমণের স্মারক হিসাবে আলমারিটিকে রক্ষা করা অসম্ভব ছিল না। মানসিক আবেগের দিক থেকে তার প্রয়োজনও ছিল। আলমারিটি যেমনভাবে আহত ও ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল, তেমনভাবে তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে তার বুকে একটি পরিচয় লিপি উৎকীর্ণ করা যেতো যাতে লেখা থাকতো : 'পাক হানাদার বাহিনীর গোলার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত সাহিত্য-সংস্কৃতির আধার।'

এমনভাবে যদি '৭১-এর স্মারকটিকে রক্ষা করা হতো তাহলে আজ বাংলা একাডেমীর সর্বক্ষণের অনুষ্ঠানে নব প্রজন্মের যে-তরুণ তরুণীরা একাডেমীর চত্বরে এবং তার ভবনে আগমন করেন, তাদের মনে তরল উচ্ছৃঙ্খলতার বদলে মহৎ ঐতিহ্যের স্মরণে কিছু দেশপ্রেমের আবেগ সঞ্চারিত হতে পারত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই একাডেমীতে গেলে এখনো আমি আমার সহকর্মী ক্ষত-বিক্ষত সেই সাথীটির অনুসন্ধান করি। তার অসাক্ষাতে মন বেদনা বোধ করে।

হানাদাররা আর একটা ভারী গোলা নিক্ষেপ করেছিল বাংলা একাডেমীর তেতলার পূর্বদিকের ঘর লক্ষ্য করে। এই ঘরই ছিল তখনকার পরিচালকের ঘর। পরিচালক, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বসতেন ঐ ঘরে। এই ঘর লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত গোলা ঘরের মধ্যে বিস্ফোরিত হওয়ার পরেও তার একটি বড় খণ্ড, প্রায় গোলার আকারে পড়ে ছিল মেঝেতে। গোলার সেই খণ্ডটিকে এখনো দেখা যায় নতুন ভবনে, আজকের মহা পরিচালক যেটিকে সম্মেলন কক্ষ হিসাবে ব্যবহার করেন, সেই কক্ষের চারপাশের টেবিল ঘেরা মাঝের জায়গাটিতে। একটি ছোট টেবিলের উপর রক্ষিত। তবু ভাল, গোলার এই খণ্ডটিকে আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করা হয় নি। কিন্তু কে একে '৭১-এর সেই পাকিস্তানী ফ্যাসিস্ট বাহিনীর আক্রমণের স্মারক হিসাবে চিনবে? কেমন করেই বা একজন দর্শক তাকে চিনবে? একাডেমীর কার্যনির্বাহী পরিষদের কিংবা অপর কোন আলোচনাতে যারা মিলিত হন তাঁদের কারুর যদি চোখ পড়ে এই অর্ধবিস্ফোরিত গোলার খণ্ডটির উপর, তবু তিনি এর কোন পরিচয় লাভ করতে পারবেন না। কেননা গোলার খণ্ডটির সঙ্গে কোন পরিচয় লিপি যুক্ত করার আবেগ একাডেমীর আজকের পরিচালকরা নিশ্চয়ই বোধ করেন না। তাই নির্বাক হয়ে ক্ষুদ্র টেবিলটির উপর অবস্থিত থাকে ইতিহাসের এই সাক্ষীটি। 'ইতিহাস কথা কও' বলে একটি কথা আছে, ঠিকই। কিন্তু ইতিহাসকে দিয়ে কথা না বলালে, সে কথা বলে না। লোহার এই খণ্ডটির মত সে নির্বাক হয়েই পড়ে থাকে।

একাডেমীর সম্মেলন কক্ষে কোন আলোচনা উপলক্ষে গেলে গোলার এই খণ্ডটির দিকে চোখ পড়তে মনে এই বেদনাটিও জাগে। তবু বেদনার কথাটি আমি পরিচালকদের কাছে ব্যক্ত করি নে। করলে তাঁরা নিশ্চয়ই কাঁধ ঝাঁকুনী দিবেন কিংবা আমার প্রশ্নকে দুর্বোধ্য কোন বাক্য মনে করে অবাক দৃষ্টিতে আমাকেই প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করবেন।

থাক, বাংলা একাডেমীর এই স্মারকের কথা। এখন বাংলা একাডেমী নতুন সংস্কারে সংস্কৃত। তার মূল ভবনের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করার চেষ্টা হচ্ছে। দক্ষিণ পার্শ্বের নতুন ভবন তৈরি হয়েছে। বাংলা একাডেমী যে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর ২৫ মার্চের আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য ছিল, সে কথা বাংলা একাডেমীকে দেখে কোন দর্শক, ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ-তরুণী কিংবা সাহিত্যিকের পক্ষে বুঝার উপায় নেই। অক্ষত বাংলা একাডেমী। সবুজ চত্বরে ঘেরা সাহিত্য- সংস্কৃতির মেলার অঙ্গন বাংলা একাডেমী। এই তার বর্তমান। আনন্দের বর্তমান। অতীতের দুঃখ ঘাঁটবার প্রয়োজন কি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসলে বাংলা একাডেমীর কারুর কোন অপরাধ নেই। বাংলাদেশের কোথায় গেলে আমরা সাক্ষাৎ পাব ১৯৭১-এর? মুক্তিযুদ্ধের কোন যাদুঘর নেই। স্বাধীনতা যুদ্ধে ধ্বংস হওয়া মসজিদ-মন্দির, সেতু, ভবন : কারুর কোন প্রতিমূর্তি নেই। শহীদ মিনারকে নতুনভাবে তৈরি করা হয়েছে। বিরাট তার চত্বর। অগুনতি তাতে আরোহনের ধাপ। একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনারকে দখল, বেদখলের সংগ্রামই এখন প্রধান সংগ্রাম। এবং তা থেকেই শহীদ মিনার প্রায়ই 'মিনারের শহীদে' পরিণত হয়ে যায়। কিন্তু এই শহীদ মিনার যে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর আক্রমণে ২৫ মার্চ, '৭১-এর রাত্রিতে বিধ্বস্ত হয়েছিল, তার আকাশচুম্বী দণ্ডকে ওরা নমিত করেছিল, তার কোন স্মারক অবশিষ্ট নেই। তার কোন প্রতিচিত্র নেই। শহীদ মিনারের বেদীর নিচে শিল্পীর কল্পিত যাদুঘর আছে। আছে তাতে দেয়াল চিত্রও। কিন্তু সে যাদুঘর স্মারকশূন্য।

'৭১-এর শূন্যতার বেদনাবোধ জাগে আমার 'রেসকোর্স ময়দানে' গেলেও। সে রেসকোর্স আজ সহরাওয়ার্দী উদ্যানে পরিণত। ফুল-ফলের নানা গাছ গাছালিতে সে পূর্ণ। তরুণ-তরুণীর অনুরাগ, বিরাগের ছায়াঘেরা উদ্যান। স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীনতার এ এক অবদান বটে। এই রেসকোর্স সেদিন বৃক্ষশূন্য ছিল। এবং বিরাট এই উন্মুক্ত মাঠেই সেদিন ৭ই মার্চ তারিখে লক্ষ মানুষের জমায়েত হয়েছিল। মাঠের উত্তর প্রান্তে সুউচ্চ মঞ্চ তৈরি হয়েছিল। উত্তর থেকে দক্ষিণ, আর পুর্ব থেকে পশ্চিম : সর্বত্র স্থাপিত হয়েছিল মাইক্রোফোন ব্যবস্থা। এই মঞ্চে আরোহণ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সেদিন ঘোষণা করেছিলেন : 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

এই দৃশ্যপটের আর একটি অবিচ্ছেদ্য অলংকার ছিল সেদিন মাঠের দক্ষিণ দিকে এখনো যে পুকুর আছে, সেই পুকুরটির উত্তর পাড়ে সুউচ্চ চূড়া সমৃদ্ধ একটি মন্দির। কতকালের পুরোন ছিল মন্দিরটি, তা আমি জানি নে। কিন্তু আমার সেই কিশোর বয়সে, আমি যখন আজ থেকে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় আগে, ১৯৪০ সনে দূর বরিশাল থেকে এসেছিলাম ঢাকায় কলেজে পড়তে তখনো দেখেছি এই মন্দির এবং তার পার্শ্বের অন্যান্য ভবনকে। এখানে হিন্দু ধর্মের সারা ভারতব্যাপী প্রখ্যাত ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের আগমন ঘটত। সন্ধ্যায় পূজার কাসরঘণ্টা বেজে উঠত। একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশের পরিচয় আমরা লাভ করতাম তখন রেসকোর্সের মাঠে বেড়াতে এসে। নিরীহ একটি মন্দির। কিন্তু বর্বর পাক বাহিনীর অধিনায়কদের কাছে অসহ্য। তাই এপ্রিলের কোন একদিনে ডিনামাইট বসিয়ে ধূলিসাৎ করে দিল রমনার রেসকোর্সের সেই মন্দিরকেও। সে মন্দিরের স্থানটি আজ শূন্য। সে মন্দিরের সংস্কার করা হল না। মন্দিরটির আর পুনর্গঠন ঘটল না।

হ্যাঁ, ইতিহাসকে তো অপরিবর্তিত রাখা যায় না। ইতিহাসের পরিবর্তন অনিবার্য। কিন্তু যে-ইতিহাস পরিবর্তনের সাক্ষ্যবিহীন, সে কি ইতিহাস কিংবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবল পরিবর্তন? আমি আর আজকাল রেসকোর্সে যাই নে। কারণ, রেসকোর্সই নেই। পুকুরের ঘাটটিতেও যাই নে। কারণ, পুকুর পাড়ের সেই মন্দিরটি নেই। মন্দির বাদে এই পুকুর এখন অর্থহীন, সৌন্দর্যহীন।

'৭১-কে খুঁজতে এসে সহরওয়ার্দীর উদ্যানের বাইরে আমাকে থমকে যেতে হয়। ৭ মার্চের সেই রেসকোর্স নেই। রেসকোর্সের সেই মন্দির নেই। আমি নিজেই এখন আর কল্পনা করতে পারি নে, এখানে ৭ মার্চ এসেছিল, লক্ষ মানুষের জমায়েত হয়েছিল এবং বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ উচ্চারিত হয়েছিল : এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।...

* * *

'সংবাদ'-এর, পুরোন শহরের, মানসী সিনেমার বিপরীত দিকের ভবনও পাক বাহিনী জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এককালের বিপ্লবী কিশোর-সাহিত্যিক, যে নিপীড়িতা বন্দীনী ইলা মিত্রের উপর, রাজবন্দী থাকা অবস্থায়, অত্যদ্ভূত পরিণত চিন্তার এক কাব্যগাথা রচনা করেছিল, সম্প্রতি-কালে যে উদভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল একটু স্নেহ এবং প্রেমের অভাবে, সেই শহীদ সাবেরও ভস্মীভূত হয়েছিল জ্বলন্ত 'সংবাদ' ভবনের মধ্যে। মার্চের শেষে কিংবা এপ্রিলের শুরুতে। 'সংবাদ' এখন উঠে এসেছে পুরোন পল্টনের নতুন এক ভবনে। তার পুরোন ভবনের গায়েও সেদিনের পোড়া ঘায়ের কোন দাগ নেই। শহীদ সাবেরের প্রতিকৃতই বা কোথায়?

* * *

এখন যেটা হোটেল শেরাটন। সেটাই ছিল যুদ্ধের সময়ে হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টাল। তারই বিপরীতে, রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে ছিল ইংরেজি দৈনিক 'দি পিপল্'। একদিন দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছিল সেই 'পিপল'। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে তখন ছিলেন যে-সব আন্তর্জাতিক সাংবাদিক, মার্চ এবং এপ্রিল মাসে, তাঁরা স্বচক্ষে সে দৃশ্যকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আজ সে 'পিপ্‌ল্' বিলুপ্ত। তার ধ্বংসাবশেষেরও কোন স্মারক নেই।

পাকবাহিনী জ্বালিয়ে দিয়েছিল 'ইত্তেফাক'কেও। বোধ হয় ২৬ মার্চেই কারফিউর কারণে প্রেসে আটকা পড়েছিল অনেক সাংবাদিক। বিশেষ করে প্রেসকর্মী। দগ্ধভবন আর মেশিনের মধ্য থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল নিহত প্রেসকর্মীদের মাথার খুলি। 'ইত্তেফাক' আজ দোতলার যায়গাতে বহুতল হয়েছে। শহীদ প্রেস কর্মীদের হয়ত নামের তালিকা আছে নতুন ভবনের কোন স্থানে। আমি জানি নে কোথায়? কিংবা আছে কি প্রজ্জ্বলিত ইত্তেফাক ভবনের কোন আলোকচিত্র বা তৈলচিত্র?

* * *

বন্ধুবর শিল্পী হাশেম খানকে জিজ্ঞেস করতে হবে। আর কেউ না হোক, তিনি কি দেখেন নি, জগন্নাথ হলের বধ্যভূমিতে একপাল শকুনের লম্বা গলা উঁচিয়ে পাখা মেলে উপবিষ্ট থাকে সেই দৃশ্যকে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখনো চোখ বুজলে সে দৃশ্য দেখে আমি আতঙ্কে শিউরে উঠি। এই মাঠেরই উত্তর দিকে নিহত ড. দেব আর তার সঙ্গীদের টেনে এনে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে মাটি চাপা দিয়েছিল সে রাতের হন্তারা। জগন্নাথ হলের মূল ভবন থেকেও অগুনতি মৃত আর অর্দ্ধমৃতদের টেনে আনতে বাধ্য করেছিল জীবিত যাদের রেখেছিল তাদের দিয়ে। এবং তারপরে তাদেরও মাঠের মধ্যে লাইন বেঁধে দাঁড় করিয়ে মেশিনগানের গুলিতে শেষ করেছিল। তারই ছবি, অস্পষ্ট হলেও, দূর থেকে তুলে রেখেছিলেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহসী এক অধ্যাপক (অধ্যাপক নুরুল্লাহ) তাঁর দোতলা বাসার গোপন কোন জায়গা থেকে।

হলের মাঠের গর্তে অর্দ্ধ-পুঁতে রাখা শহীদদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো নিশ্চয়ই গর্তের বাইরেও অর্দ্ধাবৃত অবস্থায় পড়েছিল। আর তার উপর নজর পড়েছিল আকাশের শকুনদের। ওরা নির্ভয়ে সেদিন নেমে এসেছিল জগন্নাথ হলের মাঠে। শহীদদের দেহ দিয়েই ওদের ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করে দিনের পর দিন নিশ্চিন্তে পাখা মেলে বসেছিল সেই মাঠের মধ্যে! সে এক দৃশ্য! ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাসের মাঠে পাক হানাদার বাহিনীর হাতে নিহত শহীদ অধ্যাপক, ছাত্র আর কর্মচারীদের অর্দ্ধ-পোঁতা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর একদল ক্ষুধার্ত শকুনের উপবেশনের দৃশ্য! এমন দৃশ্য আমি জীবনে কখনো কোথাও দেখি নি।

২৫ তারিখ রাত থেকেই আমি যেন একটা ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছিলাম। ২৬ পেরিয়ে ২৭ তারিখে গিয়েছিলাম বাংলা একাডেমীকে দেখতে। সে ছিল নির্বোধের দুঃসাহসের ব্যাপার। আমার স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে : পরিবারের কেউ সে কথা জানত না। ২৭ কিংবা ২৮ তারিখে ঔৎসুকের টানে গিয়েছিলাম জগন্নাথ হলের মাঠের কাছে। টিএসসি থেকে শহীদ মিনার আর মেডিক্যাল কলেজের দিকে গেছে যে-রাস্তাটা, জগন্নাথ হলে মাঠটাকে হাতের ডাইনে রেখে, সেই রাস্তাটা দিয়ে এগুচ্ছিলাম আমি দক্ষিণ দিকে। আর তখনি জগন্নাথ হলের মাঠে সেই দৃশ্যকে আমি দেখেছিলাম : একপাল ভুক্ত শকুনের দৃশ্য।

সে দৃশ্য কি আমাদের কোন শিল্পী দেখেন নি? যদি দেখে থাকেন তবে তাঁদের মধ্যে কেউ কি তার কোন চিত্র এঁকেছেন? আছে কি তার প্রতিকৃতি কিংবা প্রতিচ্ছবি কোথাও? থাকলে শিল্পী-বন্ধুরা আমাকে বলবেন। আমি ফিরে যেতে চাই সেই দৃশ্যের কাছে, '৭১-এর জগন্নাথ হলের মাঠের সেই দৃশ্যে।

১৪-৩-৯২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের অস্তিত্বের সংকট

শিরোনামটা ভারী হল। 'আমাদের অস্তিত্বের সংকট।' কিন্তু ভারী হলেও ব্যাপারটা তো নিত্যদিনের। নিত্য মুহূর্তের।

একটি কিশোরকে দিনে দুপুরে রাজধানীতে শত শত মানুষের সামনে রামদা দিয়ে জবাই করা হয়েছে। ফটিকছড়িতে মিছিলের উপর আধুনিক অস্ত্র নিয়ে হামলা করা হয়েছে। বেশ কিছু লোক নিহত হয়েছে। বুড়িগঙ্গায় দুটি যুবকের লাশ ভেসে যেতে দেখা গেছে। চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকায় সাধারণ পাহাড়ী, অপাহাড়ী মানুষের বাড়িঘর আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। বহু লোক : নর নারী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, শিশু নিহত হয়েছে।...

এরূপ ঘটনা প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে বাংলাদেশের সর্বত্র সংঘটিত হচ্ছে। কথা হতে পারে, পৃথিবীর সব দেশেই এমন হচ্ছে। কিন্তু তাতে বাংলাদেশের অবস্থার কোন যুক্তি তৈরি হয় না। অস্তিত্বের সংকট। মানুষের অস্তিত্বের সংকট সর্বত্র। এবং আমাদের এই বাংলাদেশে।

এই সব ঘটনার তাৎপর্য নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে। বুঝতে হবে, এ সব ঘটনার তাৎপর্য কি? প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে যে হত্যাকাণ্ড সর্বত্র সংঘটিত হচ্ছে : এযে কেবল হত্যা নয়, এযে আত্মহত্যা, এই চেতনাকে আমাদের জাগ্রত করতে হবে। যে-কোন ব্যক্তি-মানুষের মৃত্যু কোন বড় ঘটনা নয়। দুর্ঘটনায়, রোগে-বিরোগে মানুষ মরছে। মানুষের জন্ম মানেই মানুষের মৃত্যু। কিন্তু এমন ভাবে কথা শেষ করা যায় না। মৃত্যু থেকে মৃত্যু আলাদা। যে-কোন মৃত্যুর তাৎপর্য আমাদের অনুধাবন করতে হবে।

রোগ-বিরোগ, দুর্ঘটনায় যখন মানুষ মরে তখন তার নিকটজনরা শোক সন্তপ্ত হয়। কিন্তু আমাদের এই বাংলাদেশে এমন মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে এবং হচ্ছে যে-মৃত্যুর তাৎপর্য মানুষ হিসাবে আমাদের মূল অস্তিত্বকেই জিজ্ঞাসার বিষয় করে তুলছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে শেখ মুজিবুর রহমানের নিহত হওয়া, এমনি এক হত্যাকাণ্ড যে-হত্যাকাণ্ড মানুষ হিসাবে আমাদের অস্তিত্বের মূল ধরে সেদিন টান দিয়েছে। ঐ '৭৫-এর নভেম্বর মাসে কারাগারের মধ্যে বন্দী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, কামরুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলী : এই চার নেতার হত্যাকাণ্ড, '৮১ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ড : সংখ্যাহীন হত্যাকাণ্ডের মধ্যে এইসব হত্যাকাণ্ড আমাদের সমাজের অস্তিত্বকেই প্রশ্নের মুখোমুখী এনে দাঁড় করিয়েছে। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের যে সংগ্রাম তাতেও শহীদ হয়েছে সংখ্যাহীন কর্মী। এবং সেই ধারায় ১৯৯০-এর ২৭ নভেম্বর নিহত হয়েছেন ডাক্তার শামসুল আলম মিলন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং কারাগারের বন্দী নেতাদের হত্যাকারীরা অজানিত নয়। হত্যাকারীরা সেদিন নিজেরা ঘোষণা দিয়েছিল : তারাই হত্যাকারী।

মনুষ্য সমাজের অস্তিত্বের একটি অমোঘ শর্ত হচ্ছে : মানুষ মানুষকে হত্যা করবে না। কারণ, মানুষ যদি মানুষকে হত্যা করে তাহলে মনুষ্য সমাজের আর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। পশু মানুষকে হত্যা করতে পারে। কিন্তু মানুষ মানুষকে হত্যা করতে পারে না। মানুষকে মানুষের হত্যা করার অর্থ মানুষের আত্মহত্যা করা। কারণ, যে-হত্যা করছে সে মানুষ এবং যাকে হত্যা করা হয়েছে, সেও মানুষ। আমার নাম করিম। আমি যদি করিমকে হত্যা করি সেটা নিজেকেই হত্যা করা হয়। আর একেই বলি আমরা আত্মহত্যা।

মানুষের হাতে মানুষের হত্যার এই যে মূল অর্থ, নিগূঢ় অর্থ : এটাকে দার্শনিক মনে হতে পারে। এবং দার্শনিক বলে প্রতিমুহূর্তে আমরা পরস্পরকে যে হত্যা করে চলেছি, তাতে কোন পরোয়া করি নে। হত্যা করে যে আত্মহত্যা সংঘটিত করছে তার মর্মার্থ চিন্তা না করলে, এ ঘটনার মর্মার্থ যে মানুষের বাস্তব জীবনকে যথার্থই অসম্ভব করে তোলে, সে কথা বুঝার সময় অপর কোথাও হয়ত এত জরুরী হয়ে দেখা দেয় নি, যত জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে ক্ষুদ্র এই বাংলাদেশে নিত্য মুহূর্তের পারস্পরিক হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে।

একজন মানুষ আর একজন মানুষকে হত্যা করতে পারে : নানা প্রকার অস্ত্র দিয়ে। লাঠি দিয়ে আঘাত করে। শ্বাস রুদ্ধ করে। মানুষের সমাজ জীবনে এমন হত্যাকাণ্ডের চাইতে যেটা মৌলিকভাবে মারাত্মক তা হচ্ছে সমাজ জীবনে হত্যাকারীকে হত্যাকারী না বলা। সমাজ জীবনের মৌলিক বিধানের ভিত্তিতে হত্যাকারীকে বিচার করার চেষ্টা না করা। এবং কোন হত্যাকারী সম্পর্কে রাষ্ট্র ব্যবস্থার তরফ থেকে এমন নিয়ম এবং নির্দেশ জারী করা যে, এই হত্যাকারীকে বিচার করা যাবে না।

যে-মুহূর্তে কোন হত্যাকারীকে বিচার করার চেষ্টা না করে তাকে বিচারের উর্ধ্বে বলে ঘোষণা করা হলো, সেই মুহূর্তেই এমন ঘোষণাকারী কেবল যে সমাজের সব মানুষের জীবনের অস্তিত্বের নিরাপত্তাকেই অনিশ্চিত করে তুলল, তাই নয়। সে ঘোষণাকারী 'নিজের হত্যাকেও সঙ্গত' বলে দাবী করার পথ তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হন্তার জন্য মুক্ত করে দিল। তখন থেকে তার হত্যাকারীর পক্ষেও বলা সম্ভব হলো : ঐ হত্যাকাণ্ড যদি বিচারের উর্ধ্বে হয়ে থাকে, তবে তোমাকে হত্যা করার এই ঘটনাও বিচারের উর্ধ্বে হবে না কেন?

আইনের চোখে সকলে সমান, হত্যা এবং সমাজের অস্তিত্ববিরোধী যে-কোন অপরাধ এবং অপরাধী বিচারের উর্ধ্বে নয় : এগুলি হচ্ছে মনুষ্য সমাজের অস্তিত্বের মূল শর্ত। এই শর্ত একবার ভঙ্গ হলে সমাজব্যবস্থার নৈতিক ভিত্তিই বিনষ্ট হতে শুরু করে এবং কালক্রমে সমাজ বলতে যে মৌলিক পারস্পরিকতা এবং শৃঙ্খলাবোধ সম্পন্ন একটা অস্তিত্বকে বুঝায়, সেই অস্তিত্বকে রক্ষা করাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন সেই সমাজ ও রাষ্ট্রেই ক্ষমতাসীন এ দল, ও দল যতোই আইন ও বিচারের কথা বলুক না কেন, সেই সমাজে বাসকারী কোন মানুষের মনেই আর কোন আত্মবিশ্বাসকে সে সৃষ্টি করতে পারে না। সে সমাজের প্রত্যেক এবং সকল প্রতিষ্ঠানই তখন গভীর হতাশা এবং অনস্তিত্বের সংকটে নিপতিত হতে থাকে।

বাংলাদেশের এখন সেই অবস্থা। সমাজ জীবনের মূল ভিত্তির উপর অনাস্থার অবস্থা।

ডা. শামসুল আলম মিলনের মতো সমাজ সচেতন, সমাজের প্রগতিশীল আন্দোলনে নিবেদিতপ্রাণ এক কর্মীর হত্যাকাণ্ড '৯০-এর গণআন্দোলনের মধ্যে এক গভীর তাৎপর্যবাহী ঘটনা ছিল। ডাঃ মিলনের সেদিনের আত্মহুতি '৯০-এর গণআন্দোলনকে বিজয়ের মুকুট পরিয়ে দিয়েছিল।

AMARBOI.COM

কিন্তু ডা. মিলনের হত্যাকাণ্ডের তাৎপর্যকে যে এই সরকার ও সমাজব্যবস্থা উপলব্ধি করতে চায় নি এবং চায় না, সেই মর্মান্তিক সত্যটি উদ্‌ঘাটিত হল সম্প্রতি ডা. মিলনের হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় প্রকাশের মধ্য দিয়ে। ডা. মিলনের হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় যে-দিন প্রকাশিত হয় সেদিন তার বিবরণ এবং ডা. মিলনের মা এবং স্ত্রীর মর্মবিদারী প্রতিক্রিয়ার কথা পাঠ করে আমি নিজেও বেদনাবিদ্ধ হয়েছিলাম। বিষয়টির উপর নিজের মনের প্রতিক্রিয়ার কথা তখন থেকে চিন্তা করছিলাম। কিন্তু বিষয়টির তাৎপর্য এমন গভীর এবং এত মর্মান্তিক যে তাকে প্রকাশ করার আমার ভাষার দীনতাই আমাকে নিস্ফল করে রেখেছে।

বিচারকের দীর্ঘ রায়ের মূল কথা মাত্র আট মিনিটে পাঠ করে বিচারক তাঁর এজলাশ থেকে নিক্রান্ত হয়ে যান। যে-কোন দৈনিকে তার বিবরণ দিয়ে সেদিন শিরোনাম দেওয়া হয়েছিল : 'ডা. মিলন-হত্যা মামলায় ১৩ জন অভিযুক্ত বেকসুর খালাস'। পত্রিকার প্রতিবেদকরা তাঁদের প্রতিবেদনে সেদিন লিখেছিলেন : রায় শোনার পর শহীদ মিলনের মা সেলিনা আক্তার কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন : ত্রুটিপূর্ণ তদন্তের জন্যই আমার ছেলের হত্যাকারীরা শাস্তি পায় নি। প্রতিবেদকের ভাষায় : "আজিমপুরের ৩৯-এল, বাসাটিতে বিকেল পাঁচটায় এই প্রতিবেদকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে মিলনের মা সেলিনা আক্তার ও স্ত্রী মাহমুদা আলম কবিতা মামলার রায় শোনেন। তাঁরা বলেন, মামলার রায় কি হবে আগে থেকেই জানতাম। তাই আদালতে যাই নি। সেলিনা আক্তার বলেন : মামলার যে-রকম তদন্ত হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি বলেই মিলনের হত্যাকারীদের বিচার হল না। তিনি বলেন, আমরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম না। অথচ আমাদেরকেই যখন মামলার প্রধান সাক্ষী করা হয় তখনই বুঝা যায়, তদন্তের দুর্বলতা কোথায়?... তিনি বলেন, মামলাটির পুনঃ তদন্ত করার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে এ নিয়ে কথা বলার জন্য প্রধানমন্ত্রীর একটি এ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছিলাম। কিন্তু এখনো পাই নি। শোকাভিভূত মা বলেন, "আমি একজন অক্ষম মা। ঘরে বসে কান্নাকাটি করা ছাড়া আমি কিইবা করতে পারি। দেশবাসী এই অক্ষম মাকে সাহায্য করে নি। আমি কার কাছে সাহায্য চাইবো?... ভারাক্রান্ত গলায় মিলনের স্ত্রী কবিতা বলেন : সরকার পক্ষের উকিল আমাদের ভর্ৎসনা করেছিলেন, আমরা কেন সাক্ষ্যে আসামীদের নাম বলি নি? আমরা তো ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম না। যারা নাম জানতেন তাঁরা তো কিছুই বলেন নি।..."

ডা. মিলনের শোকাভিভূত মা এবং স্ত্রীর এই অভিযোগের কোন জবাব আজ পর্যন্ত আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা, তার সরকার, সরকারি এবং বিরোধী রাজনৈতিক দল : কেউ দেয় নি। আমাদের অস্তিত্বের সংকটের গভীরতা এখানেই। অথচ এই সরকার, সরকারি এবং বিরোধী রাজনৈতিক দল : সকলেই ডাঃ মিলনের রক্তের বিনিময়েই সেদিন বিজয় লাভ করেছিল। কেউ সরকারে আসীন হয়েছে। কেউ নির্বাচিত সংসদের বিরোধী দলের আসন গ্রহণ করেছে। ডা. মিলনের হত্যার তদন্ত, কিছু ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের করা, মামলার সাক্ষী প্রমাণ ও নথীপত্রের বিচার করে বিচারকের এই মর্মে রায় প্রদান যে, অভিযুক্ত কারুর অপরাধ প্রমাণিত হয় নি। অতএব তারা বেকসুর খালাস। এ সবই যেন নিহত মিলনের পরিবার পরিজনকে সান্ত্বনা দানের অভিনয়। এর মধ্যে মর্ম বেদনা ও সমাজের অস্তিত্বের সংকটের চেতনার কোন স্বাক্ষর নেই। তেমন চেতনা থাকলে, দলমত নির্বিশেষে গণতান্ত্রিক শক্তি উচ্চারণ করত : ডা. মিলনের হত্যার অসম্পূর্ণ তদন্তকে আমরা পূর্ণতর করব। ডাঃ মিলনের হত্যা রহস্যকে আমরা উদঘাটিত করব। না, তেমন প্রতিক্রিয়া কোন মহল থেকেই প্রকাশিত হয় নি।

ডা. মিলনের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত এবং বিচারের ফলাফল থেকে সাধারণ নাগরিক এই সিদ্ধান্তেই আসতে বাধ্য হবেন যে, ডা. মিলন '৯০-এর গণআন্দোলনের মধ্যে নিহত হলেও তাঁর কোন হত্যাকারী নেই।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আত্মঘোষিত হত্যাকারীদের বিচার না করা এবং বিচার না করার জন্য তথাকথিত ইনডেমনিটি বিল বহাল রাখার তাৎপর্য অধিকতর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারাত্মক। এর অর্থ হত্যাকারীরা বীরপুরুষ এবং অপরকে হত্যা করার তাদের রাষ্ট্রস্বীকৃত অধিকার আছে। এমন একটি 'সমাজের-অস্তিত্ব বিরোধী' আইনকে পাশ করা এবং তাকে বহাল রাখার কথা সুস্থ মানুষের পক্ষে চিন্তা করা কষ্টকর। অথচ বাংলাদেশের সরকার বলছেন, এমন জটিল আইনকে বাতিল করার মত কঠিন কাজ তারা আর চিন্তা করতে পারেন না। এর চাইতে অধিক সমাজবিধ্বংসী চিন্তা আর কি হতে পারে?

আসলে হত্যাকারীকে সনাক্ত করে বিচার করে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা নিহতকে কি দিতে পারে? তারা কি তার জীবনকে ফেরত দিতে পারে? লক্ষ কোটি টাকার খেসারতও কি একটি মনুষ্য জীবনের বিকল্প? আমরা কি এখন বলব : এক লক্ষ টাকা = একটি মনুষ্য জীবন? না, হত্যাকারীর বিচারের কোন রায়ই নিহতের জীবনকে ফিরিয়ে দিতে পারে না। সংখ্যাহীন টাকার খেসারতও নয়। তবু হত্যাকারীকে অনুসন্ধান করে চিহ্নিত করা, সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে তার অপরাধকে নির্ধারিত করে তার দণ্ড ঘোষণা করার সামাজিক তাৎপর্য এই যে, সমাজ ঘোষণা করছে : এই হত্যা এবং হত্যাকারীকে সে স্বীকার করে না। মানুষ মানুষকে হত্যা করতে থাকলে মানুষের সমাজের অস্তিত্বই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

তাই একটা হত্যাকাণ্ডের গুরুতর এবং আন্তরিক বিচারের চেষ্টা হচ্ছে হত্যার তাৎপর্য সম্পর্কে সমাজের আত্মোপলব্ধির চেষ্টা। সেই চেষ্টা থেকে বিরত থাকলে বা সে চেষ্টায় আন্তরিকতার অভাব ঘটলে কেবল যে নিহতের আত্মজনের আহাজারীর শেষ থাকে না, তাই নয়। তার মাধ্যমে সমাজের নিজের অস্তিত্বের বিশ্বাস ও নির্ভরতার স্তম্ভেরই ধ্বংস সাধিত হয়।

৩০-৫-৯২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঞ্চলিক ভাষার অভিধান ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

এই শিরোনাম দিয়ে কোন লেখা লেখবার উপযুক্ত লোক আমি নই। সে কথা আমি জানি। আমি বহু বছর কেবল খোঁজ করেছি, বাংলা একাডেমী থেকে ১৯৬৪ সনে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সম্পাদনায় 'পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' নামে যে বৃহদাকার শব্দ সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল তার বিস্তারিত পরিচয় কোন সাহিত্যিক, ভাষাবিদ রচনা করেছেন কিনা। হয়ত করেছেন। সকল রচনার সঙ্গে আমার পরিচয়ের ন্যূনতার কারণেই হয়ত আমি তা দেখি নি। এবং সে কারণেই নিজের মনে একটা ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ থেকে যাচ্ছে, যতটুকু পারি, আমি কিছু লিখি না কেন 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ' এই নামে?

আসলে আধুনিক কালে পূর্বভারতীয় অঞ্চলের লোকভাষার উপর এরূপ অনন্য কর্মের বিস্তারিত পরিচয় দিতে পারেন এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত সাহিত্যিক ও কর্মীবৃন্দ।

আমি নিজে এ কর্মের সঙ্গে কোন পর্যায়েই জড়িত ছিলাম না। এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন বাংলা একাডেমীর একাধিক পরিচালক বা মহাপরিচালক ড. মুহম্মদ এনামুল হক, সৈয়দ আলী আহসান এবং সম্পাদনার তত্ত্বাবধায়ক ও কর্মী হিসাবে জনাব গোলাম সামদানী কোরায়শী, জনাব লুৎফুল হায়দার চৌধুরী, জনাব আবদুর রাজ্জাক, মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম এবং সংকলন অধ্যক্ষ জনাব হাবিবুল্লাহ খন্দকার– এঁরা। কিন্তু সকল কাজের অন্তর্গত পরিশ্রম ও উদ্দীপনার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে যে অবস্থিত ছিলেন অশীতিবর্ষ-প্রায় মনীষী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, এটি আমি সেদিনও আন্তরিকভাবে অনুভব করেছি এবং সে অনুভূতিতে নিজে অনুপ্রাণিত বোধ করেছি।

কয়েকদফায় প্রায় দশ বছর কারাগারে বন্দীজীবন যাপন করার পরে ১৯৬২ সালে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে আমি পুনরায় শিক্ষা ও সাহিত্যের জগতে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টায় ১৯৬৩ সালে যোগ দিয়েছিলাম বাংলা একাডেমীর অনুবাদ বিভাগে, একজন সহকারী অনুবাদক হিসাবে। সৈয়দ আলী আহসান সাহেব তখন বাংলা একাডেমীর পরিচালক। এখন বাংলা একাডেমীর প্রশাসনিক পরিচালককে মহাপরিচালক বলে অভিহিত করা হয়। তাঁর আগ্রহ এবং আনুকূল্যে আমার পক্ষে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেদিন বাংলা একাডেমীতে যোগদান করা সম্ভব হয়েছিল। সে জন্য আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা বোধ করি। অনুবাদ বিভাগের পরিচালনায় ছিলেন প্রবীণ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক জনাব আবু জাফর শামসুদ্দীন।

আমরা বিভাগ হিসাবে কাজের জন্য বসতাম বাংলা একাডেমীর মূল ভবনের দোতলাতে, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ঘরটিতে। অভিধান প্রকল্প সমূহের প্রধান সম্পাদক হিসাবে তখন বাংলা একাডেমীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তিনি বসতেন মূল ভবনের নিচের তলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ঘরটিতে।

আমি যখন একাডেমীর কাজে যোগ দিতে যাই তখন প্রথমেই ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ঘরে গিয়ে তাঁর কদমবুসী করে সালাম জানিয়েছিলাম। আমি এক কালে তাঁর ফজলুল হক হলের ছাত্রও ছিলাম। কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আমি ছাত্র নই। সে হিসাবে আমাকে তিনি চিনবেন, এমন আশা আমি করতে পারি নি। তবু আমি ভাষার বাইরে চল্লিশের দশকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যকার সামাজিক-সাহিত্যিক-রাজনৈতিক নানা আন্দোলন-আলোড়নের কারণে তাঁর স্নেহ-প্রীতি লাভ করেছিলাম। এই নতুন পর্যায়ে এসে যখন আমি তাঁকে সশ্রদ্ধভাবে জিজ্ঞেস করলাম : স্যার, আপনি আমাকে চিনতে পারেন, আমি ফজলুল করিম, আপনার হলের ছাত্র...? তখন তিনি আমাকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন : তোমাকে চিনব না? তোমার কথা আমি জানি। কত দীর্ঘদিন তুমি কারানির্যাতন ভোগ করেছ। তোমার উচিত, তোমার সে জীবনের কথা লেখা।...

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কোন একটি মাত্র ভুবনের লোক ছিলেন না। দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক, শিক্ষা, ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তনে তিনি বহু ক্ষেত্রের আমৃত্যু কর্মী ছিলেন। ছিলেন একাধিক ভুবনের পথ প্রদর্শক ও চিন্তাবিদ। তাই আমার মত সাধারণ একজন কর্মীর জীবনও তাঁর নিকট অপরিচিত ছিল না। এবং সে কথা স্মরণ করে আমাকে উৎসাহিত করাতে তাঁর অকৃপণ উদারতা প্রকাশে কোন দ্বিধা ছিল না।

বাংলা একাডেমীর অফিসে আমি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর আর একটু সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলাম সংস্কৃতি বিভাগের দায়িত্বটি লাভ করার পর। তখন আমাকেও বসতে হত নিচের তলার পশ্চিম পাশের ঘরটিতে। এই ঘরটিতে একটি টেলিফোনও ছিল। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সেই সকাল সাড়ে ন'টায় অফিসে আসতেন। আর বাসায় ফিরতেন সেই বিকেল সাড়ে চারটা কিংবা পাঁচটায়। দুপুরে অফিসেই তিনি মধ্যাহ্নের খাবার খেতেন। কখনো টেলিফোন করার প্রয়োজন পড়লে তিনি তাঁর নিজের ছোট ঘরটি থেকে আমাদের ঘরে চলে আসতেন। দুপুরের খাবারের পরে হয়ত তাঁর ঘরের ক্যাম্প-চেয়ারটিতে একটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্রাম নিতেন। কিন্তু সে সামান্য সময়ের জন্য। তা না হলে সারাটা সময়ই তিনি লেখা পড়ায় ব্যস্ত থাকতেন।

সেই '৬৩-'৬৪ তে তিনি ব্যস্ত ছিলেন প্রধানতঃ পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের সম্পাদনা ও প্রকাশনায়। বিভিন্ন সংগ্রাহকদের দ্বারা একাডেমী পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলার দেড় লক্ষাধিক শব্দ তার অর্থ, প্রয়োগ ও দৃষ্টান্তসহ সংগ্রহ করেছিল।

'৬২ সাল থেকে '৬৪ সাল পর্যন্ত চলছিল তার মুদ্রণের কাজ। সম্পাদনা বিভাগে গোলাম সামদানী কোরায়শীর মত ইংরেজি, বাংলা, আরবি ও ফার্সি জানা দক্ষ সহ-সম্পাদক ছিলেন। প্রেস থেকে মুদ্রিত ফর্মার প্রথম সংশোধন তাঁর হাতেই হত। কিন্তু মুদ্রণের শেষ আদেশ ড. শহীদুল্লাহর হাত দিয়েই হত। এবং শব্দের উচ্চারণ, তার জেলাগত উৎস, অর্থ এবং ব্যবহারের দৃষ্টান্ত, এবং নির্দিষ্ট শব্দের সঙ্গে অপর কোন ভাষার কোন শব্দের সাদৃশ্য বা এর বিবর্তন প্রক্রিয়া– এর প্রত্যেকটি প্রশ্নের ক্ষেত্রে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সিদ্ধান্তই ছিল শেষ সিদ্ধান্ত।

যে একনিষ্ঠ পরিশ্রমের কথা এই প্রকল্পের বাইরের একজন উৎসাহী হিসাবে আমি অনুমানের ভিত্তিতে এখানে উল্লেখ করলাম তার অভিজ্ঞতার কথা বললেন জনাব আবদুর রাজ্জাক। তিনি আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের সংগৃহীত শব্দের বিন্যাসকরণ ও লিপিবদ্ধকরণের বিস্তারিত কাজের ক্ষেত্রে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অন্যতম সহকারী হিসাবে বেশ কয়েক বছর বাংলা একাডেমীতে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি বাংলা একাডেমীর গ্রন্থাগারিক হিসাবে নিযুক্ত আছেন। আমার ব্যক্তিগত অনুরোধে স্মৃতিচারণ করে তিনি বললেন : যে জিনিসটি স্যারের এই বৃদ্ধ বয়সেও আমাদের সকলকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করত তা তাঁর অনলস পরিশ্রম এবং তীক্ষ্ণ বিচারমূলক একাগ্রতা। বস্তুত ঃ '৫৯ সনের ডিসেম্বরের শেষে বাংলা একাডেমীতে যোগদান থেকেই ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ একাডেমীর আদর্শ অভিধান শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নে নিবদ্ধ ছিলেন। কোনদিন তিনি বিলম্বে অফিসে আসেন নি। যে হাজার হাজার শব্দের কার্ড আমরা তাঁর পরীক্ষা ও সংশোধনের জন্য পেশ করেছি তার প্রতিটি কার্ডকে তিনি গভীরভাবে বিবেচনা করতেন। কোন শব্দের অনুরূপ শব্দ অভিধানের অপর কোথাও থেকে থাকলে সেই শব্দের সঙ্গে এই নির্দিষ্ট শব্দের তুলনামূলক বিচারের জন্য সেই শব্দকে তিনি তুলে আনতেন। মোটকথা এই কঠিন পরিশ্রমের কাজে 'ফাঁকি' বলে যদি কোন শব্দ ব্যবহার করা যায়, তবে আর যার ক্ষেত্রেই সেটি প্রয়োগ করা যাক না কেন, বৃদ্ধ মনীষী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পর্কে নয়।

জনাব রাজ্জাক আরো বললেন : আসলে এই কাজটির গুরুত্ব আমরা কিংবা তাঁর অপর কোন সহকর্মী বা সাহিত্যিক যথার্থভাবে অনুভব করতে পারেন নি। তাই এই কাজটি শেষ করার অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে নানা প্রশ্ন নানা তরফ থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেদিন উঠেছিল। কিন্তু আজ মনে হয়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যে নিজের পরিশ্রমে নিজের জীবদ্দশায় এই কাজটি সম্পন্ন করে গিয়েছেন, এটি আমাদের জাতীয় ভাগ্যের কথা। তাঁর অবর্তমানে এ কাজ আদৌ সম্পন্ন হত না।' জনাব রাজ্জাকের এ কথা যথার্থ।

এই অভিধান প্রথমে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সনে। পরবর্তীতে দ্বিতীয় মুদ্রণ হিসাবে ১৯৭৩ সনে, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে এর পুনঃপ্রকাশ ঘটে। এই প্রকাশ ছিল দুই খণ্ডে। এবং তার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল প্রথম খণ্ডে ভূমিকা ও প্রসঙ্গকথা বাদে ৪৬৮ পৃষ্ঠা এবং দ্বিতীয় খণ্ড ছিল ৫৯০ পৃষ্ঠার। অর্থাৎ মোট এক হাজার পৃষ্ঠার অধিক।

এমন গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হয়েছিল তখন কি এর কোন প্রকাশনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল? আমার স্মৃতিতে এমন ঘটনার সাক্ষাৎ মেলে না। অথচ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তখনো জীবিত। এই মহৎকাজের জন্য তাঁকে কি কোন আনুষ্ঠানিক সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছিল? না, তেমনও আমার স্মরণে আসে না। কেবল মনে পড়ে একটি ঘটনার কথা। '৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে গেছে। সে যুদ্ধের উপলক্ষে আমাদের তরুণ, প্রবীণ সাহিত্যিক অধ্যাপকদের মধ্যে অনেকে নানা সরকারি খেতাব আর পদক উপার্জন করেছেন।

একদিন মধ্যাহ্নে 'স্যার' (ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে আমরা আনন্দ আর গর্বের সঙ্গে কাছ থেকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করতাম।) তাঁর ছোট ঘরটি ছেড়ে হয়ত টেলিফোন করতে আমাদের ঘরে এসেছেন। এমন সরল মানুষ আমি জীবনে কম দেখেছি। কথা প্রসঙ্গে আলাপ উঠেছিল সেদিন আমাদের সাহিত্যিক আর অধ্যাপকদের এইসব খেতাব, পদক আর সম্মান প্রাপ্তি নিয়ে। আকস্মিকভাবে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর বিশিষ্ট আনুনাসিক উচ্চারণে বলে উঠলেন : দেখ তো, তোমাদের কত জনে কত কিছু পেলে। কিন্তু আমি কি পেলাম?

এমন সরল সত্য প্রশ্নের জবাব দানের কোন ক্ষমতা আমার ছিল না। আমি আন্তরিকতা নিয়ে শুধু বললাম : স্যার, আপনি যে কিছু পেলেন না, এটিই ইতিহাসে আপনার বড় পরিচয় হয়ে থাকবে...।' আমি জানি, এমনভাবে প্রবোধ দেওয়া আমার উচিত হয় নি। কিন্তু ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সত্য ভাষণের অমন জবাবদিহীতে আমার নীরব থাকা ছাড়া কি গত্যন্তর ছিল? কিন্তু তাঁর প্রশ্নে নীরব থাকা তাঁকে অশ্রদ্ধা জানাবার সামিল হতো। তাই আমার এমন উক্তি। কিন্তু সে উক্তিতে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। কারণ, আমি সেদিনও বুঝেছিলাম সিতারা-এ পাকিস্তান, ইমতিয়াজ-এ পাকিস্তান বা আদমজী-দাউদের পুরস্কার একদিন পুরস্কার প্রাপ্তদেরই পরিহাস করবে। এবং তার বিপরীতে খেতাবহীন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহই শ্রদ্ধার সঙ্গে উত্তরকাল দ্বারা স্মৃত হবেন। কিন্তু আমার সান্ত্বনাদানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিশুর মতন সরল-প্রাণ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ যে তৃপ্ত হতে পারেন নি, সে কথা আমার স্মৃতিতে এখনো ভাসছে। আমার কথায় আবার তিনি আর একটু ক্ষোভের সঙ্গে তাঁর বিশিষ্ট উচ্চারণে বললেন : "আঁ, এতে আমার কি লাভ? আমার মৃত্যুর পরে তোমরা আমার কবরকে ফুলই দাও কিংবা তুচ্ছই কর, তাতে আমার কি আসবে যাবে?' তাঁর এমন জিজ্ঞাসারও সত্যি কোন জবাব ছিল না। এই ক্ষোভ নিয়েই সেদিন তিনি বলেছিলেন : দেখ, অন্যরা খেতাব পায় আর আমাকে ভারত থেকে একটি ভাষা ও সাহিত্য সম্মেলনে কেন দাওয়াত করা হয়, আমার কাছে পাকিস্তান সরকার থেকে তার কৈফিয়ৎ তলব করা হয়।' এ অভিযোগ অসত্য নয়। কিন্তু এর বিস্তারিত তথ্য বাংলা একাডেমীর নথী এবং ড. শহীদুল্লাহর জীবনীকাররাই দিতে পারবেন।

বাংলা একাডেমী থেকে বিদায়কালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে একটি বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল। তাতে সম্মান ও শ্রদ্ধার সূচক হিসাবে বাংলা একাডেমীর সকল গ্রন্থের একটি সেট তাঁকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। সেসব গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম ছিল 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান'। এই সংবর্ধনাটিতে হয়ত উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনাব আবদুর রাজ্জাক। তিনি আমাকে এই সংবর্ধনার একটি ঘটনার কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে বলেছিলেন : 'স্যার, আপনার আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সংকলনের এই কাজ একটি ঐতিহাসিক অবদান হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।' এমন কথায় সেদিনও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নাকি ক্ষোভের সঙ্গে জনাব রাজ্জাককে বলেছিলেন : 'আঁ, তুমি একথা বলছ? কিন্তু কই, আর কেউ তো এমন কথা বলে না।'

AMARBOI.COM

না, বাংলাদেশের অপর কেউ না বললেও বাংলা ভাষার আর এক কৃতীপুরুষ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রসঙ্গে অকাতর প্রশংসা করে বাংলা একাডেমীকে পত্র লিখেছিলেন।

আর এই তথ্যের জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই বাংলা একাডেমীর অপর এক কর্মী জনাব নূরুল ইসলামকে। তিনি পূর্বে বাংলা একাডেমীর গ্রন্থাগারে ছিলেন। বর্তমানে তার সাহিত্য শাখার একজন অফিসার। কিন্তু তাঁর বিশেষ আগ্রহ এবং উদ্যোগ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর স্মৃতিকে জাগরুক রাখা। নিজের ঐকান্তিক চেষ্টায় তিনি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বেশ কিছু মূল্যবান পত্র সংগ্রহ করে 'পত্র সাহিত্যে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ' নামে একখানি সংকলন প্রকাশের চেষ্টা করছেন। এর পাণ্ডুলিপি বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কাছে প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। তাঁর এই পাণ্ডুলিপিখানা প্রকাশিত হলে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর একটি আন্তরিক পরিচয় আমরা লাভ করতে পারব। জনাব নূরুল ইসলামের কাছেই ১৯৬৪ সনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডিসেম্বর ২৩ তারিখে লেখা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের' উচ্ছ্বসিত প্রশংসামূলক দীর্ঘ চিঠির কপিটি আমি দেখতে পেলাম। বাংলা একাডেমীর সেক্রেটারীর নিকট থেকে পশ্চিম বাংলার বিধান পরিষদের তৎকালীন চেয়ারম্যান ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের একটি উপহার-কপি পেয়ে তার জবাবে একাডেমীর সেক্রেটারীকে এই ধন্যবাদপত্র পাঠান। ইংরেজিতে লিখতে হচ্ছে বলে দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন : '... আমাদের বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত এ ধরনের কাজ আর হয় নি। এবং আপনাদের একাডেমী তাঁদের এই কাজ দ্বারা কেবল যে সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সামনেই একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, তাই নয়। সমগ্র ভারতের কাছেই এ একটি দৃষ্টান্ত বিশেষ।... আমি কেবল আশা করব এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাব যেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং তাঁর সহকর্মী সম্পাদকবৃন্দ তাঁদের আবদ্ধ এই বৃহৎ কর্মকে সমাপ্ত করার আয়ুষ্কাল লাভ করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নিকট পত্র লেখার সুযোগের অপেক্ষায় থেকে আজ আপনার মাধ্যমে তাঁকে এবং তাঁর সহকর্মীদের আমি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।"

'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান'-এর প্রথম সংস্করণের প্রসঙ্গকথা লিখেছেন একাডেমীর পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান। সেখানে তিনি উপযুক্তভাবেই ভাষার পরিবর্তনশীলতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। কি প্রকারে পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার নমুনা বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত হয়েছে, তার পরিচয় দিয়েছেন। আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ড. মুহম্মদ এনামুল হক, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই এবং মুনীর চৌধুরীসহ যে সব সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ তাঁদের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। এবং ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সম্পাদনা প্রসঙ্গে বলেছেন : 'সংগৃহীত শব্দের উচ্চারণ ও বানান নির্ধারণের জন্য "ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের সভাপতিত্বে সতেরটি আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হয়।" "অশীতিবর্ষ যখন অতিক্রান্তপ্রায় তখনও শ্রদ্ধেয় ভাষাবিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রধান সম্পাদক হিসাবে উহার সম্পাদনার গুরু দায়িত্ব গ্রহণে কোন দ্বিধা দেখান নাই।"

কিন্তু আমার দুঃখ সেই অশীতিবর্ষ অতিক্রান্তপ্রায় প্রধান সম্পাদক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নিজের জবানীতে বা একাডেমীর পরিচালকের প্রসঙ্গকথায় এই কাজের অন্তরালের অন্তরঙ্গ কাহিনীটি বিবৃত দেখতে পাই নে আমরা, আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের ভূমিকার কোন অংশে।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর একটি ভূমিকা আছে। সেখানে তিনি তাঁর স্বভাবজাত পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ভাষার বিবর্তনের কথা বলেছেন। আঞ্চলিক ভাষার গুরুত্বের প্রসঙ্গে এই ভূমিকার এক স্থানে তিনি লিখেছেন : "ম্যাকসমুলার বলিয়াছেন "দি রিয়াল এ্যান্ড ন্যাচারাল লাইফ অব ল্যাংগোয়েজ ইজ ইন ইটস ডায়ালেকটস"–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থাৎ ভাষার প্রকৃত এবং স্বাভাবিক জীবন তাহার উপভাষাগুলিতে। এই জন্য ব্যক্তিগতভাবে বহুদিন হইতে অনেকে এই কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রবন্ধগুলি প্রধানতঃ কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ সম্বন্ধে আমি ১৩২৭ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক আহূত ছাত্র সম্মিলনীতে মহা মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে যে ভাষণ প্রদান করি তাহাতে বলিয়াছিলাম, "ভাষা তত্ত্বের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান প্রাদেশিক বিভাষার (উপভাষার) সাহায্যে হইতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটি প্রভৃতি ভাষার সহিত তুলনা করিলে দেখিবে মূলে ছিল 'মুই' এক বচন এবং 'আমি' বহুবচন। এমনকি আসামীতে 'ময়' এক বচন এবং 'আমি' বহুবচন। প্রাচীন বাংলায় যে এইরূপ প্রয়োগ ছিল, তাহা চট্টগ্রামের 'চাকমা' বুলি দ্বারা প্রমাণিত হয়। চাকমায় 'মুই' একবচন এবং 'আমি' বহুবচন। বাঙ্গালায় 'আমি যাই, চাকমায় 'মুই যাং', বাঙ্গালায় 'আমরা যাই' চাকমায় 'আমি যেই'। দি ইংলিশ ডায়ালেকট ডিকশনারী প্রায় তিনশত স্বেচ্ছা সাহিত্যসেবকের যোগে সুসম্পন্ন হইয়াছে। আমাদের প্রাদেশিক বিভাষা সংগ্রহের জন্য আমরা কি বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ একটি করিয়া উদ্যোগী ছাত্র সাহিত্য-সেবক পাইব না?" (পৃ. ঝ. দ্বিতীয় মুদ্রণ, আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, ১৯৭৩)

বস্তুতঃ যে প্রশ্ন তিনি তাঁর যৌবনকালে ১৩২৭ তথা ১৯২০ কালে উত্থাপন করেছিলেন সেই প্রশ্নের জবাব হিসাবেই যেন আশীবছর বয়সে একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সম্পাদনার দায়িত্ব ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নির্বাহ করেছিলেন। তা না হলে এমন কাজের প্রশ্নে ড. শহীদুল্লাহর সেই বৃদ্ধ বয়সে জীবিকা নির্বাহের কোন কথা চিন্তা করা যায় না। ভাষা এবং বিশেষ করে বাংলা ভাষার বিবর্তনের বিষয়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর যে লৌকিক এবং গণতান্ত্রিক বোধ তাঁর যৌবনকাল থেকে সক্রিয় ছিল সেই গণতান্ত্রিক বোধ থেকেই তিনি বাংলা ভাষাকে সেবা করার সুযোগ হিসাবে 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

১৩২৪ অর্থাৎ ১৯১৭-১৮ সনে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বয়স যখন বত্রিশ বছর মাত্র তখন তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতিরূপে ভাষার বিবর্তনের প্রশ্নে যে অভিমত তুলে ধরেছিলেন সেটি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

এই মূল্যবান প্রবন্ধের বিস্তারিত উদ্ধৃতি দিবার স্থান এটি নয়। কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর আযৌবন গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর এ এক উজ্জ্বল সাক্ষ্য। তাই আঞ্চলিক ভাষার অভিধান তৈরি তাঁর কাছে ছিল ভাষার বিকাশে গণতান্ত্রিক প্রবাহের অগ্রগতিতে নিজের বিশ্বাস ও সেবার সংযোগ সাধন। কাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে কালে লৌকিক ভাষাই সাধু ভাষাকে একদিক দিয়ে যেমন তার সাহিত্যের বাহন হওয়ার ভাব ও শব্দ সম্ভার যোগান দিয়ে এসেছে, তেমনি সেই স্রোতে সাধুভাষার জনজীবন বিচ্ছিন্ন ধারাকে ক্রমাধিকভাবে অপসারিত করে ভাষা ও সাহিত্যকে জনগণের নিকটবর্তী করে তুলেছে। এই প্রবাহ আজো সক্রিয়। আধুনিক জীবনে সে বরঞ্চ অধিকতর শক্তিশালীভাবে সক্রিয়। বাংলার জেলা থেকে জেলায়, অঞ্চল থেকে অঞ্চলে শব্দের রূপ এবং উচ্চারণ আমাদের সাধু বা বইএর ভাষা থেকে ভিন্ন বটে। কিন্তু যাকে আমরা সাধু স্ট্যান্ডার্ড ভাষা বলে অভিহিত করি তার উৎস হচ্ছে এই লোক ভাষা। সেখান থেকেই আসে উপমা, দৃষ্টান্ত, প্রয়োগ এবং চিত্রকল্পের বৈচিত্র্য। আঞ্চলিক বা লোকভাষা হচ্ছে আমাদের তথাকথিত সাধু বা বই এবং বক্তৃতার ভাষার জননী স্বরূপ। সে যত সমৃদ্ধ, আমাদের বক্তৃতা এবং সাহিত্যের ভাব ভাষা তত সমৃদ্ধ। লোকভাষার কাছে আমাদের শিক্ষিতজনের সাধু ভাষার এই ঋণকে উপলব্ধি করাবার মহৎ দায়িত্ববোধ থেকেই ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আমাদের লোকভাষার অপূর্ব সম্পদের দৃষ্টান্ত হিসাবে 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' সম্পাদনা করেছেন। একুশে ফেব্রুয়ারি তথা বাঙালির ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্যের আলোচনার দিনে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর এই দানকে আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা কর্তব্য।

AMARBOI.COM

১০-২-৮৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : সেকাল, একাল

এ বছরের এ, কে, নাজমুল করিম স্মারক বক্তৃতার শিরোনাম সমাজতত্ত্বের দর্শন বা দর্শনের সমাজতত্ত্ব নয়। এ আলোচনার ইংরেজি শিরোনাম হতে পারে : 'র‍্যানডম টক'। বাংলায় বললে এলোপাতাড়ি আলাপ।

সেই শিরোনামেই বলছি।

১৯৪২ সালের কথা : ৪৭ বছর তো বটেই। '৪০ থেকে ধরলে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা।

সেদিনকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজকের তুলনাতে, ছাত্র শিক্ষকের সংখ্যায় এবং সংগঠন ও পরিবেশগতভাবে ছিল একটি 'আশ্রম' বিশেষ। এ আশ্রমের বাইরে যুদ্ধ, বিগ্রহ, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ক্রমান্বয় বৃদ্ধি পাচ্ছিল, একথা সত্য। তবু চল্লিশের দশকের শেষ তথা দেশ বিভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ্রমিক পরিবেশ একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। ঝড় উঠছিল। বিপর্যয়ের আলামত আসছিল। কিন্তু আমার এবং জ্যেষ্ঠপ্রতিম নাজমুল করিমের প্রিয় যে স্মৃতি সেই আশ্রমের ছিল, সে স্মৃতি ছাত্র-শিক্ষকদের স্নেহ-শ্রদ্ধা, নৈকট্য এবং সাহচর্যের স্মৃতি।

'৭৫-এর পরবর্তীতে নাজমুল করিম যখন নানা জটিল রোগে অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন তখনো তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসা থেকে অনতিদূরে আমার ফ্লাটে হাঁটতে হাঁটতে এসে জিজ্ঞেস করতেন : সরদার, আপনার মনে আছে রবিগুহ আর মদন বসাকের কথা। সেই '৪২-৪৩-এর কথা? আমাদের শিক্ষক অজিত সেনের কথা?

এমন কথাতে অতীতের জন্য একটি আফসোসের সুর ভেসে উঠতে পারে। কিন্তু আমরা তো জানি প্রতি মুহূর্তে বর্তমান অতীত হয়ে যাচ্ছে। এবং অতীতকে বর্তমানে প্রত্যাবর্তন করানো যায় না। আমাদের এমন স্মৃতিচারণে অতীতকে অপরিবর্তিত রাখার চিন্তা আমরা করতাম না। আমরা জানতাম, অতীতকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনা যায় না। এবং অতীত মানেই সবকিছু মহৎ নয়। এবং বর্তমান মানেই সবকিছু অকাম্য নয়। অবশ্য একটা বয়সের পরে ব্যক্তিমাত্রের দৃষ্টিই সামনের চাইতে পেছনের দিকে নিক্ষিপ্ত হয় অধিক। সে বয়স যাদের হয় নি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই প্রজন্মের দৃষ্টি থাকে ভবিষ্যতের দিকে। কিন্তু অতীত ব্যতীত বর্তমান যেমন অকল্পনীয়, তেমনি কোন বর্তমানই কেবল অতীতের রোমন্থনে বদ্ধ থাকতে পারে না। আমরা বলতাম : অতীতের মহৎ কিছু অনুভূতি এবং মূল্যের কথা। অনুপ্রেরণাদায়ক কিছু অভিজ্ঞতার কথা। সেই মহৎ ঐতিহ্য সম্পর্কে বর্তমানকে অবগত করার যথাসাধ্য চেষ্টার দায়িত্ব আমরা বোধ করতাম।

'৪১-৪২-এ ঢাকা কলেজে : ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গের সময়ে নির্মিত হয়েছিল যে লাট ভবন, কার্জন হলের বিপরীতে, উন্মুক্ত অঙ্গনের সেই ভবনে আমার সহপাঠী, বিজ্ঞানের ছাত্র আবদুল মতিন এখনো জীবিত। স্থায়ীভাবে ইংল্যাণ্ডে বাসকারী হলেও তিনি বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আজো সক্রিয়। এককালের প্রখ্যাত সাংবাদিক। তাঁর ছাত্রজীবনের একটি গল্প-সংকলন ইংল্যাণ্ডে বসে সম্প্রতি প্রকাশ করতে গিয়ে সংকলনটির উৎসর্গ পত্রে তিনি তাঁর সমকালের যে কয়েকজন সাথীর নাম উল্লেখ করেছেন তাঁর অন্যতম হচ্ছেন, নাজমুল করিম।

তিনি লিখেছেন :

> "ছাত্রজীবনে যাঁরা আমাকে নবজীবনের সন্ধান দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রবিগুহ, মুনীর চৌধুরী, সৈয়দ নুরুদ্দীন, সানাউল হক, সরদার ফজলুল করিম, নূরুল ইসলাম চৌধুরী ও এ. কে. নাজমুল করিম। এই গল্প সংগ্রহ তাঁদের উদ্দেশে নিবেদিত।"

AMARBOI.COM

সেদিনের ঢাকার প্রগতিশীল অংশটির আভাস দেবার জন্য বন্ধুবর মতিন তাঁর 'কাস্তে' সংকলনটির ভূমিকায় লিখেছেন : "সম্ভবতঃ ১৯৪৪ সালের শেষের দিকে আমাদের প্রতিষ্ঠানটি 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ' নামে পরিচিত হয়। সংঘের মুখপত্র হিসাবে 'প্রতিরোধ' নামক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। যতদূর মনে পড়ে, সদস্যরা মাসে একবার করে মিলিত হয়ে সাহিত্যে সমস্যা, সাহিত্যিকের দায়িত্ব, শিল্পীর সামাজিক দায়িত্ব, কোন্ বিষয়ে লিখবো, কার জন্য লিখবো ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতেন। গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ পড়া হতো এই সভায়। লেখাগুলো পড়ার পর প্রত্যেক সদস্য তাঁর মতামত প্রকাশ করতেন। এই সাহিত্য সভার মাধ্যমে রণেশ দাসগুপ্ত, সত্যেন সেন, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, অচ্যুত গোস্বামী, অধ্যাপক অজিত গুহ এবং সরলানন্দ সেনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সরদার ফজলুল করিম, মুনীর চৌধুরী, সৈয়দ নূরুদ্দীন এবং সানাউল হক সংঘের উৎসাহী সদস্য ছিলেন।

দেশের সার্বিক পরিস্থিতির উল্লেখ করে মতিন লিখেছেন : প্রাক-স্বাধীনতা যুগের ভারতবর্ষ তখন এক অত্যন্ত অনিশ্চিত ও সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পার হচ্ছিলো। ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়' আন্দোলন, ১৯৪৩-এর সর্বগ্রাসী মন্বন্তর, ১৯৪৫-এ নাৎসী বিরোধী যুদ্ধের অবসান, ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারিতে বোম্বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৌবিদ্রোহ, ২৯ জুলাই ডাক ধর্মঘটের সমর্থনে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট, ১৬ আগস্ট কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাংগা, ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগ আমাদের জীবনে বহু অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনের জন্য দায়ী।"

হ্যাঁ, নাজমুল করিম, রবিগুহ, আবদুল মতিন, আমি, সৈয়দ নূরুদ্দিন, মুনীর চৌধুরী : সেদিনকার তরুণরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা সেদিনের সেই জ্ঞানাশ্রমের শান্তিসুধা সচেতনভাবে আকণ্ঠ পান করে আমরা আনন্দ এবং উজ্জীবিত বোধ করতাম। মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা বাড়ছিল। ধরা যাক '৩৯-৪০ সাল থেকে। হিন্দু ছাত্ররা ঢাকা ইউনিভারসিটিকে বলত : মক্কা ইউনিভারসিটি। তবু '৪৩-৪৪ সালেও ঢাকা ইউনিভারসিটির ছাত্রদের মধ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীই ছিল সংখ্যায় অধিক। শিক্ষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ তো বটেই। ধর্মীয় বিভাগ ব্যতীত প্রায় সকল বিভাগেই অধিক সংখ্যক শিক্ষক ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের। এবং সেদিনকার শিক্ষকদের অনেকেই ছিলেন অবিভক্ত ভারতের প্রখ্যাত গবেষক ও শিক্ষক। এঁদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন বসু, হরিদাস ভট্টাচার্য, এন, এম বসু, কালিকারঞ্জন কাননগু, ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ড. এইচ, এল দে, ডি, এন, বানার্জী, অজিত সেন, অমিয় দাশগুপ্ত, মোহিত লাল মজুমদার। মুসলিম শিক্ষকদের মধ্যেও ছিলেন : স্যার এফ রহমান, ড. এম, হাসান, ড. মাহমুদ হোসেন, ড. শহীদুল্লাহ, কবি জসিম উদ্‌দীন। 'মক্কা ইউনিভারসিটির' অধিকসংখ্যক শিক্ষক হিন্দু। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প চারদিকে প্রবাহিত হচ্ছে। তার তেজ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু '৪৫-৪৬ সাল পর্যন্তও শিক্ষকদের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির মানসিকতা ছিল না। কোন মুসলমান ছাত্রের প্রতি কোন হিন্দু শিক্ষক কোন অপ্রীতিমূলক এবং কোন বৈষম্যমূলক আচরণ, বিশেষ করে তাকে জ্ঞান দানের ক্ষেত্রে, তার জ্ঞানের আনুষ্ঠানিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে, করেছেন এমন অভিযোগ ত্রিশের ছাত্র আবদুর রাজ্জাক কিংবা চল্লিশের দশকের আমাদের পরিচিত কোন মুসলমান ছাত্রের কাছেই আমরা শুনি নি। পরবর্তীতে অধ্যাপক রাজ্জাকের সেই স্মৃতিচারণটি উল্লেখযোগ্য, যেখানে তিনি বলেছেন : আমার প্রতি আমার শিক্ষকদের স্নেহের এই এক পরিচয় যে, আমি আমার এম. এ. পরীক্ষার ভাইভাতে উপস্থিত হচ্ছি নে কেন তার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁরা লোক পাঠিয়েছেন আমার আস্তানায়, আমাকে ধরে নেবার জন্য।

ইতিহাস এবং মহৎ ঐতিহ্য : শব্দ দুটি বেশ ভারী। কিন্তু 'ইতিহাস এবং মহৎ ঐতিহ্য' স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনা থেকে রক্ষিত হয় না। তাকে রক্ষা করতে হয়। গবেষণার মাধ্যমে তাকে উদ্ধার করতে হয়। যত্নে তাকে লালন করতে হয়।

নাজমুল করিম এবং আমার : তথা সেই '৪২ থেকে '৪৬ সালের আমাদের শিক্ষক অজিত কুমার সেনের ছবিটি এখনো আমার চোখের সামনে ভাসছে। শুভ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধুতি-চাদরে আচ্ছাদিত দীর্ঘকায় মৌন-গম্ভীর পুরুষ। কিন্তু কালের হাওয়া থেকে ব্যতিক্রম ছিলেন। তাঁর সে ব্যতিক্রমী চরিত্র সেদিনের কিশোর আমাদের কাছেও ধরা পড়ত। আমরা তাতে অনুপ্রাণিত হতাম। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের শিক্ষক। সেদিন সমাজবিজ্ঞান বা সমাজতত্ত্ব বলে কোন ভিন্নতর বিভাগ ছিল না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু অজিত সেনের অধিকতর আগ্রহ ছিল সমাজ পরিবর্তনের দিকে। সমাজের বিশ্বাস, আচার-আচরণ, প্রবাদ : এদের সামাজিক-ভৌগোলিক-আর্থিক মূলের দিকে। আমাদের কাছে তিনি তা বিশ্লেষণ করে বুঝাতেন। বুঝাতেন বাংলাতে। সেই ইংরেজি প্রাধান্যের যুগে। আমাদের টিউটরিয়াল খাতায় মন্তব্য করতেন বাংলায়। নিজের নাম সহি করতেন বাংলায়। শুনেছিলাম, ইউনিভারসিটি কর্তৃপক্ষ কিংবা বিভাগের অধ্যক্ষ : এঁদের কাছে কোন আবেদন কিংবা পত্র পাঠাতেন তিনি বাংলায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষকবৃন্দ 'এ, কে নাজমুল করিম স্মারক গ্রন্থ' প্রকাশ করে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পন্ন করেছেন। এ, কে নাজমুল করিম ঢাকা ইউনিভারসিটির সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এ, কে নাজমুল করিম যেমন সমাজতত্ত্ব বা সমাজবিজ্ঞানের পথিকৃৎ ছিলেন, তেমনি আজ লোকান্তরিত নাজমুল করিম নিজেও সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছেন। এ, কে নাজমুল করিমের নিজের জীবনের, তাঁর চিন্তা ও চেতনার সমাজতত্ত্ব।

কথাটি আমার মনে হয় 'এ, কে নাজমুল করিম স্মারক গ্রন্থে' মুদ্রিত চল্লিশের দশকের যুবক নাজমুল করিমের কয়েকটি রচনা আবার পাঠ করে। এদের মধ্যে রয়েছে : 'মুসলিম অভিজাত ও মধ্যবিত্ত', 'সংস্কৃতির রূপান্তর', 'বাঙালি মুসলিম সংস্কৃতি', 'পূর্ব সীমান্তের অধিবাসী', 'ভূগোল ও ভগবান', 'ধর্মের বিবর্তন ও মার্কসবাদ', এই শিরোনামের কয়েকটি রচনা। নাজমুল করিম বেঁচে থাকতে তাঁর তরুণ বয়সের এসব রচনার কোন সংকলন প্রকাশ করেন নি। তাঁর জীবনকালে ষাট কিংবা সত্তরের দশকের কেউ তা করতে চাইলেও তিনি তাঁকে উৎসাহিত করেন নি। এ বিষয়টির সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা আবশ্যক। তরুণ নাজমুল করিম একদিন যা বিশ্বাস করেছেন, রাষ্ট্রীয়-সামাজিক জীবনের উত্থান-পতনে বিব্রত, বিত্রস্ত এবং শারীরিকভাবে পীড়িত প্রবীণ নাজমুল করিম তাকে স্বীকার এবং প্রচার করা হয়ত সম্ভব বা উপযুক্ত বিবেচনা করেন নি। এ প্রবণতা মানুষ মাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবণতা। কিন্তু প্রবীণ নাজমুল করিমের স্বীকার-অস্বীকারের উর্ধ্বে এ সকল রচনার একটি সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য রয়েছে। এসব রচনায় সেদিনের নাজমুল করিমের মুক্ত এবং অগ্রগামী চিন্তার আন্তরিক এবং দ্বিধাহীন প্রকাশের চিহ্ন রয়েছে।

তাঁর 'ভূগোল ও ভগবান' '৪৬ সালের রচনা। প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিকীতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভগবান ভূগোল সৃষ্টি করার চাইতে ভুগোলই যে ভগবান তথা ধর্মকে সৃষ্টি করেছে, ধর্মের বিশ্বাস ও বৈচিত্র্য যে তার ভৌগোলিক এবং আর্থিক পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত, ধর্ম ব্যাপারটা যে অলৌকিক কোন ব্যাপার নয়, মানুষের বাঁচার লৌকিক প্রয়োজন থেকেই যে ধর্মের উদ্ভব এবং রূপান্তর : একথা সেদিনকার নাজমুল করিম যেরূপ আদর্শ স্পষ্টতা এবং প্রাঞ্জলতার সঙ্গে প্রকাশ করেছিলেন, তেমন স্পষ্টতা বয়স এবং বৈরী অবস্থায় পোড় খাওয়া প্রবীণ নাজমূল করিমের অপর কোন রচনায় বিরল বলেই আমার মনে হয়। স্পষ্টতার কারণে সাহসেরও বটে। তাঁর সহপাঠী অধ্যাপক সৈয়দ হেসামুদ্দীন আহমদ কয়েকদিন পূর্বেও ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে স্মৃতিচারণ করে বলছিলেন : এই লেখার– গুরু-তাৎপর্য উদ্ধার করে সেদিনের রক্ষণশীল সমাজ নাজমুল করিমের মনে আতঙ্ক সৃষ্টিরও চেষ্টা করেছিল।

কেবল 'ভূগোল ও ভগবান' নয়। নাজমুল করিমের জীবনের এই সূচনাপর্বে এরূপ আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রচনার আমরা সন্ধান পাই। আমাদের ফজলুল হক হলের ১৩৫১ তথা ১৯৪৪ সালের বার্ষিকীটির নামকরণ করেছিলাম আমরা 'কলাপী'। ... এই সংখ্যায় নাজমুল করিমের একটি রচনা প্রকাশিত হয়। লেখাটির নাম 'অবকাশ ও সভ্যতা'। নাজমুল করিম হয়ত তখন এম. এ. ক্লাসের শেষ পর্বের ছাত্র। এই লেখাটিতে তরুণ নাজমুল করিমের সমাজবাদ সমর্থনকারী মনোভাবের একটি সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। লেখাটিকে ৪০ বছর পরে আবার পাঠ করে আমার ভাল লেগেছে। মনে হয়েছে, মানুষের যৌবনের সৃষ্টিই তার আবেগে, আন্তরিকতায় শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। নাজমুল করিমের প্রবীণ বয়সে এই লেখাটির কথা তাঁর নিজের মুখে আর শুনেছি বলে মনে পড়ে না। হয়ত লেখাটিকে জীবনের নানা টানাপোড়েনে এবং ঘটনা দুর্ঘটনায় পোড় খাওয়া অধ্যাপক নাজমুল করিম কিশোর কালের কাঁচা রচনা বলে গণ্য করেছেন। একে নিজের বলে আর গর্ব বা দাবী করেন নি হয়ত এমন আশংকায়, পাছে এই ডান-বামের টানাটানি আর দ্বন্দ্বের যুগে তাঁকে কোন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু আজ যদি নাজমুল করিমের দীর্ঘদিনের শিক্ষাদানের দীক্ষায় দীক্ষিত তরুণরা তাঁর গবেষণামূলক অপর রচনায় মুগ্ধ হন, তবে তাঁদের যুবক নাজমুল করিমের এই রচনার কথাটিও জানতে হয়।

রবি গুহের কথা আমি উল্লেখ করেছি। '৪২-'৪৫ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র রবিগুহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে সেদিন বেশ পরিচিত ও জনপ্রিয় কমিউনিস্ট কর্মী ছিলেন। খুব সামাজিক, প্রাণময় এবং কমিউনিস্ট আদর্শে একনিষ্ঠ। নাজমুল করিমের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহপাঠী ছিলেন রবি গুহ। ঢাকারই সন্তান। বিক্রমপুরের। দেশ ভাগের পরিস্থিতিতে পরবর্তীতে তাঁকে দেশ ত্যাগ করতে হয়। স্মারক গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক ড. রংগলাল সেন নিজের উদ্যোগে রবি গুহের সঙ্গে পত্রের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করে নাজমুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিমের উপর নাতিদীর্ঘ একটি স্মৃতিচারণমূলক লেখা সংগ্রহ করেছেন। নাজমুল করিমের মূল্যায়নে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু রবি গুহের এই লেখাটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫২ সনে নাজমুল করিম যখন বিদেশে অবস্থান করছিলেন তখনো তিনি বিদেশ থেকে বন্ধু রবি গুহের কাছে পত্রের মাধ্যমে দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর নিজের মানসিক বেদনার কথা প্রকাশ করেছেন। রবি গুহ তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন–

... "অনার্স ক্লাসের ৫/৬ জন ছাত্রের মধ্যে আমিই একমাত্র হিন্দু। অন্ততঃ আমাদের ক্লাসে, এই সম্প্রদায়িক মানসিক ব্যবধান দূর হল নাজমুলের উদ্যোগে ও চেষ্টায়। হরগঙ্গা কলেজের বন্ধু হেসামুদ্দীন আহমেদ ঢাকাতেও আমার সহপাঠী হলেন। কিছুদিনের মধ্যেই আরো কিছু বন্ধু জুটে গেল যাঁরা আমাদেরই মতো চিন্ত াভাবনা করতেন। আমি এবং অমূল্য চন্দ, অজিত রায়, মদন বসাক, দেবপ্রসাদ মুখার্জী, নিতীন বসু, সুনীল রায়, অনিল বসাক প্রমুখ। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার আগে থেকেই সক্রিয় রাজনীতি করতাম। নাজমুল করিম অল্প দিনেই তা জানতে পেরেও ক্রমশঃই আমাদের ঘনিষ্ঠ হয়। এক বছর বাদে সরদার ফজলুল করিম যখন ঢাকা বোর্ডে দ্বিতীয় হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে নাজমুল করিমই আমার সাথে তার পরিচয় করিয়ে দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্যদের মধ্যে সানাউল হক, এ, কে, এম আহসান, আহমদুল কবির, সৈয়দ নুরুদ্দীন, আবদুল মতীন, মুনীর চৌধুরী, মোহাম্মদ তোহা, মুজাফফর আহমদ প্রভৃতি অনেকে আমাদের ঘনিষ্ঠ হলেন। তখনো আমরা একটি ছোট গোষ্ঠী অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শের জন্য কাজ করে চলেছি। পরবর্তীকালে তা আরো জোরদার হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক গৌরবময় ভূমিকা পালন করে। এসব কাজে নাজমুল করিমের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। সকলের অগোচরে সে কাজ করেছে। কখনো সামনে আসে নি। সকলের কাছে অজানা থেকে এক বিরাট পরিবর্তনের কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। তার কাজের ধরনই ছিল আলাদা। গায়ে ছাপ না লাগাবার প্রধান যুক্তি ছিল তখনকার পরিবেশে অনগ্রসর মুসলিম সমাজের একজন হয়ে ভেতর থেকে পরিবর্তনের কাজ সহজ করা। তার পরামর্শ মতো চলে ব্যক্তিগতভাবে আমি অনেক কাজ করতে পেরেছি। তার কাছে আমার ব্যক্তিগত ঋণের কথা ছেড়ে দিলেও, চল্লিশ দশকের ঢাকার প্রগতি আন্দোলনে তার অবদান ভোলার নয়। আমাদের ছাত্র জীবনে '৪২-এর আন্দোলন, বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ-মহামারী, নোয়াখালী-বিহারের দাঙ্গা, পাকিস্তানের দাবী নিয়ে আন্দোলন ও তার বিরোধিতা এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এ সমস্ত বিষয়ে তার স্বচ্ছ চিন্তা-ভাবনা ছিল এবং কোন না কোনভাবে তখনকার সব আন্দোলনেই সক্রিয় ভূমিকা ছিল।" ...রবি গুহ তাঁর স্মৃতিচারণের শেষে লিখেছেন : "অনেক সময়েই সে এক কৃত্রিম আচরণে নিজেকে ঢেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। ... তাকে ভুল বুঝেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকে, এমনকি বন্ধুরাও ...আমাদের সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মুক্তচিন্তা ও প্রগতিশীল আন্দোলনের সূচনা হয়, তার ঐতিহাসিক রূপ আমরা দেখেছি। সমস্ত আপাত পরিচয়ের বাইরে এই গতিশীল যুগ পরিবর্তনে এক স্থপতি হিসেবেই তাঁর পরিচয় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।" (স্মারক গ্রন্থ পৃ. ২৫৮-২৫৯-২৬০-২৬১)।

নাজমুল করিম সম্পর্কে আমার স্মৃতিচারণ কেবল আমার ও তাঁর যৌবনের স্মৃতিচারণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাজমুল করিম শিক্ষক হিসাবে যোগদানের পরবর্তীকালে তাঁর অবদান ও কার্যক্রমের পরিচয় তার ছাত্র এবং সহকর্মীবৃন্দ জ্ঞাত আছেন। কিন্তু যৌবনের নাজমুল করিমের সঙ্গে পরিচিত জনের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। ক্রমাধিক পরিমাণে সংখ্যাল্প হয়ে আসা মানুষের মধ্যে আমি এখনো জীবিত এবং পরবর্তীতে জীবিত থাকবো না বলেই একালের তরুণ-তরুণীর কাছে এই স্মৃতিচারণটি উপস্থিত করার কিছুটা দায়িত্ব আমি বোধ করেছি।

নাজমুল করিমের অবশ্যই তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে, বিশেষ করে শেষের পর্যায়ে, বিদ্যমান সমাজ ও পরিবেশের সঙ্গে মনের দ্বন্দ্ব এবং টানাপোড়েন ছিল। কার না থাকে? এবং এমন দ্বন্দ্ব অবশ্যই জীবনের চিহ্ন। আমরা কেউ নিজের চরিত্রের দিকে তাকাই নে। আমরা প্রত্যেকে অপরের চরিত্রের মধ্যে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আদর্শ বা ইচ্ছার দ্বন্দ্বহীন চরম প্রকাশ দেখতে চাই। আমরা বলি : তার চরিত্রে যেমন 'হ্যাঁ' ছিল, তেমনি 'না' ছিল। এ বলা যথার্থ উপলব্ধি থেকে বলা নয়। 'হ্যাঁ, বলতে আমরা খুশী। 'না' বলতে আমাদের আফসোস। আহা! সেই 'ভুগোল ও ভগবানের' নাজমুল করিমকে আমরা কোথায় পাই পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে 'পাকিস্তান এ্যাণ্ড এসলামিক এস্টেটের মধ্যে?' এ রকম উক্তি অবান্তর উক্তি। এমন উক্তি সমাজবিজ্ঞানীর যথার্থ উক্তি হতে পারে না। যেমন সমাজের জীবনে পর্যায় থেকে পর্যায়ন্তর তথা পরিবর্তন অমোঘ সত্য, তেমনি ব্যক্তির জীবনেও পর্যায় থেকে পর্যায়ন্তর : পরিবর্তন। তরুণ, প্রবীণ এবং বৃদ্ধ : এক ব্যক্তি নয়। একই নামধারী হলেও। আমরা চাই তরুণ চিরদিন দেহ এবং মনে তরুণ থাকবে। চির তরুণ। আমরা চাই বিদ্রোহী চিরকাল বিদ্রোহী থাকবে। বিপ্লব বিপ্লবী থাকবে। কিন্তু এমন আশা এবং উক্তি কল্পনা বিলাসীর আশা এবং উক্তি। শুধু যে তরুণ পরিবর্তনের মাধ্যমে যুবক এবং যুবক পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রবীণ এবং প্রবীণ পরিবর্তনের মাধ্যমে বৃদ্ধ হয়, তাই নয়। বিপ্লবও বিপ্লবের পরে আর বিপ্লবী থাকে না। সে রক্ষণশীল হয়ে দাঁড়ায়। আমরা এককালে স্বপ্ন দেখতাম রুশ বিপ্লব সর্বকাল বিপ্লবী থাকবে। যে বিপ্লবী এবং বিদ্রোহী ১৯১৭ সালকে সংঘটিত করেছে তারা ১৯৩০-এও তেমনি বিদ্রোহী আর বিপ্লবী থাকবে। ১৯৪০-এর দশকে মার্কসবাদের পরিচয়ে আমরা যারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম তাদের সকলেই আজ প্রবীণ। যারা জীবিত আছেন তাঁদের অনেকের মুখে সোভিয়েট রাশিয়া এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সাম্প্রতিক ঘটনাতে উদ্বেগের এবং হতাশার কথা শুনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারও কারণ, আমরা যে রোমান্টিকতা সেদিন পোষণ করতাম সেই রোমান্টিকতাকে অপরিবর্তিতভাবে আজো পোষণ করতে চাই।

কিন্তু এ যদি প্রবীণদের সমস্যা হয়, তবে আজকের তরুণদের কি সমস্যা? এর জবাব কেবল তরুণরা দিতে পারেন। আজকের যুবকরা বলতে পারেন। তাদের কাছ থেকে সেই জবাব পাওয়ার জন্য আমরা প্রবীণরা আমাদের পর প্রজন্ম; তথা আমাদের সন্তান-সন্ততির দিকে তাকাই। মানসিক এই চাহিদা থেকেই ১৯৭২ সালে আমি প্রত্যাবর্তন করেছিলাম ঢাকা ইউনিভারসিটিতে। ১৯৪৮ সালে পলায়ন আর ১৯৭২-এ প্রত্যাবর্তন। ইতোমধ্যে ঢাকা ইউনিভারসিটির ঘর-বাড়ীর, ছাত্র-ছাত্রীর, প্রক্টর-প্রভোস্ট, চ্যান্সেলার, ভাইস-চ্যান্সেলরের কি বিপুল পরিবর্তন। সংখ্যার পরিবর্তন তো বটেই। সেদিনের হাজার থেকে আজকের হাজারে হাজারে। সেদিন যদি রমনার একটি আশ্রমে আমরা প্রবেশ করেছিলাম, আজ সে আশ্রম এক বিরাট কারখানায় রূপান্তরিত। এখন যথার্থই পণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়া চলছে এখানে : ডিগ্রীধারী মালের উৎপাদন। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রীক এবং সামাজিক অবস্থা এমন যে, এই কারখানার পাইক-পেয়াদা, বরকন্দাজ : প্রক্টর, প্রভোস্ট, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলার, টিএসসি, ক্যাফেটরিয়া ইত্যাদি যত বাড়ছে, উৎপাদনের ওভারহেড খরচ যত বৃদ্ধি পাচ্ছে উৎপাদিত পণ্যের মান এবং মূল্য বাজারে তত কমে যাচ্ছে। এটা আমার কোন হতাশামূলক উক্তি নয়। উৎপাদনের পরিমাণের বৃদ্ধি পাওয়া অনিবার্য। যথার্থ প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন তো নগণ্য। তবু সেই নগণ্য উৎপাদনও বাজারে অতি উৎপাদনের সমস্যা সৃষ্টি করছে। এই সমস্যার মোকাবেলা এ কালের নতুন রোমান্টিক তরুণ এবং যুবকদের তো করতে হবে। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে তার গুণের বৃদ্ধির কৌশলকে আয়ত্ত করতে হবে। চল্লিশের দশকের আশ্রমে আর আমার প্রত্যাবর্তনের উপায় নেই। প্রত্যাবর্তন প্রগতি নয়। পরিবর্তমান পৃথিবীতে, পরিবর্তমান বিশ্বে এবং পরিবর্তমান সমাজে প্রত্যাবর্তন বলে কোন ঘটনা নেই। কেবল সামনে চলা : এগিয়ে চলা। আজকের সমাজবিজ্ঞানীকে কেবল পরিবর্তনকে স্বীকার করলেই চলবে না।

'ডাইনামিকস অব সোসাইটি' : ইংরেজি কথাটি সমাজবিজ্ঞানের নিশ্চয়ই একটি মৌলিক কথা। ডাইনামিকস : গতি! ডাইনামিকস অব সোসাইটি : সমাজের গতিময়তা। এর বিজ্ঞান। সমাজের গতির বিজ্ঞান। 'চেঞ্জিং সোসাইটি ইন ইন্ডিয়া এ্যান্ড পাকিস্তান, ব্যতীত নাজমুল করিমের অন্যতম গবেষণা গ্রন্থের নামও হচ্ছে 'দি ডাইনামিকস অব বাংলাদেশ সোসাইটি'। বস্তুতঃ তাঁর পারিবারিক বিকাশের পরিচয়মূলক 'ফালগুন করা' থেকে 'ডাইনামিকস অব বাংলাদেশ সোসাইটি' পর্যন্ত সকল গ্রন্থ এবং রচনার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে আমাদের সমাজ জীবনের পরিবর্তনকে অনুধাবনের চেষ্টা। কিন্তু এ অনুধাবন কেবল কি পরিবর্তনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ? নাজমুল করিমের রচনার এই এক বৈশিষ্ট্য যে, তিনি সমাজবিজ্ঞানকে কেবল 'পজিটিভ' তথা বর্ণনামূলক কিংবা 'ভ্যালুফ্রি' গবেষণা বলে মনে করেন নি। বিষয়টি জটিল : 'ভ্যালু ফ্রি' না 'ভ্যালুড' : পজিটিভ না নরমেটিভ : সমাজ বিজ্ঞানের এক মৌলিক বিতর্কের বিষয়। আমি তার মধ্যে যেতে চাই নে। কিন্তু আমার মনে হয়, বর্তমানে সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্র নির্বিশেষে ক্ষুদ্র এই পৃথিবী গ্রহে পরিবর্তনের যে অবিশ্বাস্য প্রবাহ চলছে : তার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে তার মধ্যকার মানুষের পারস্পরিক পরিচয় এবং নৈকট্যে এবং ঘনিষ্ঠতায়, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য : ইত্যাকার শব্দগুলির পুরাতন অর্থের বিলোপ এবং রূপান্তর (এ, কে নাজমুল করিমের একটি কন্যার স্বামী শুনেছি মার্কিন এবং সেই সূত্রে বাংলাদেশের কুমিল্লার এ, কে, নাজমুল করিমের বেয়াই বাড়ি আমেরিকার আরিজোনা) : এই সব নিয়ে আপাতদৃষ্টিতে পরিবর্তনের প্রবাহের চাইতেও অধিক, পরিবর্তনের যে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হচ্ছে তাতে সমাজ বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য তথা মানুষের সমাজকে মানুষের সীমাহীন বিকাশের শক্তিতে সমৃদ্ধ মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিকতার দ্বন্দ্বমূলক ঐক্যে আবদ্ধ এক মানবিক সমাজ তৈরির স্বপ্নকে বাস্তব করার দায়িত্বও সমাজ বিজ্ঞানীর বহন করতে হবে। কেবল বর্ণনা নয়। কেবল সংখ্যার চিত্র বা সারণি নয়। কি অর্থ এই পরিবর্তনের। সে কথাও আজকের সমাজবিজ্ঞানীর ভাবতে হবে। এ এক নতুন স্বপ্নের কথা। নতুন রোমান্টিকতার কথা। আমাদের সেকালের স্বপ্নের চাইতে অনেক বৃহৎ স্বপ্ন। বাংলাদেশ বিমানের বিজ্ঞাপনটি অর্থবহ : পৃথিবীটা ক্ষুদ্র হয়ে আসছে। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হওয়ার অনিবার্য প্রক্রিয়ায় রত এই পৃথিবীর মানব সমাজকে ক্রমাধিক পরিমাণে মানবিক করার স্বপ্ন। কেবল ডাইনামিকস অব বাংলাদেশ সোসাইটি নয় : ডাইনামিকস অব ইন্ডিয়ান, এশিয়ান বা আমেরিকান সোসাইটি নয়। ডাইনামিকস অব হিউম্যান সোসাইটি : পৃথিবী গ্রহের মানুষের সমাজের ডাইনামিকস। তথা গতিময়তা। এর বিভিন্ন শাখা প্রশাখা অবশ্যই আছে। নানা মাইক্রো স্টাডি। অণু অধ্যয়ন। উপাদানের অধ্যয়ন। কিন্তু সেই মাইক্রো যেন 'ম্যাক্রো' মানব সমাজকে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ ও মানবিক করার লক্ষ্য থেকে আমাকে ভ্রষ্ট না করে, সেই চেতনাকেও আমাদের জাগ্রত রাখতে হবে।

এ, কে নাজমুল করিমের রচনাতে কেবল মাইক্রোর বিশ্লেষণ নয়, ম্যাক্রোকে অনুধাবনের প্রয়াসও আমরা লক্ষ্য করি। সেদিক থেকে নাজমুল করিমের জীবন ও কর্মের, রচনার ও চিন্তার সমাজতাত্ত্বিক বিচার আমাদের বর্তমানকে অনুপ্রাণিত এবং উপকৃত করবে বলেই আমার বিশ্বাস।

১৯৮৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাহা ইংলিশ, তাহা গ্রীক

অধ্যাপক রাজ্জাককে সামনে রেখে কথা বলা আমার পক্ষে মুশকিল। আমি অবশ্য পরিহাস করে স্যারকে বলি : 'স্যার, আপনিও বুড়ো হয়েছেন, দেখুন আমিও বুড়ো হয়েছি। এখন তো আমরা সমান!' কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি তাঁর সমান হতে পারি নে। এ প্রায় পিতা-পুত্রের পার্থক্যের ব্যাপার। কিন্তু এ পার্থক্যকে কে আজকাল মানে? পুত্রই ধমক দেয় পিতাকে : 'তুমি কি জান? তুমি কি বুঝ? এ কাল তোমাদের সেকাল নয়।' কথাটা খুবই সত্য। এ কাল সেকাল নয়। এ কথা রাজ্জাক স্যারকে তাঁর পুত্র-কন্যাসম ছাত্র-ছাত্রী, ভাইবোন, ভাইঝিদের কজন বলে তা আমি জানি নে। কিন্তু আমার ছেলেমেয়েরা এবং ছাত্র-ছাত্রীরা রোজ আমাকে বলে। এবং তাদের সামনে কোন কথা সাহসভরে বলতে আমি যথার্থই আতঙ্কিত হই। আতঙ্কটা অহেতুক নয়। আমার যে-ছেলে বা ছাত্রের হাতে ডাণ্ডা আছে তাকে ভয় না পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে আহত এবং নিহত হওয়ার মত নির্বুদ্ধিতা এখনো আমার আসে নি। হয়ত আরো পরে আসবে। কিন্তু কথাটা কেবল এদিক থেকে নয়। কথাটা অন্যদিক থেকেও সত্য। আমার ছেলে বা ছাত্রের হাতে ডাণ্ডা আছে কিংবা নাই। তবু তাদের হাতেই তো বর্তমান এবং অধিকতর ভাবে ভবিষ্যৎ। তারাই তো বানাচ্ছে বর্তমান। তারাই তো বানাবে ভবিষ্যৎ। কাজেই কেবল ভয় নয়। অনিবার্যভাবে তাদের উপর ভরসাও আমাদের রাখতে হবে।

কোন অহঙ্কার নয়। কেবল দায়িত্ববোধ থেকেই প্রায় ছ' বছর আগে এই কাজে আমি হাত দিয়েছিলাম। এ্যারিস্টটলের 'পলিটিকস্'-এর বাংলা অনুবাদের কাজে। দায়িত্ব বোধ করলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারী করতে এসে। অবোধ, নির্বোধ যাই বলি, আমাদেরই ছেলেমেয়েরা তো ক্লাশে আমার সামনে এসে বসে। দু কথা শুনতে চায়। জ্ঞানের কথা। মানুষের ইতিহাসের কথা। সমাজের বিবর্তনের কথা। কিন্তু সে কথা তো ভাষায় লেখা। হয় গ্রীকে, নয় রাশিয়ানে, নয় ইংরেজিতে। বাংলাতে খুবই কম। যাদের সামনে কথা বলি, আমার অল্প জ্ঞানের অহমিকা নিয়ে তাদের যেই ধমক দিতে যাই : পড়েছ এ্যারিস্টট্‌ল, পড়েছ প্লেটো, পড়েছ অগাস্টিন, এ্যাকুইনাস, ম্যাকিয়াভেলী, হবস, লক, রুশো? তখনি তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে আমার দিকে। সে চাহনির জবাব এই যে : কেমন করে আমরা পড়ব? এ সব তো ইংরেজিতে লিখিত। আর আমরা ইংরেজি যে একেবারেই বুঝি নে।' তখন চেতনা আসে : যথার্থই এ ধমক দেওয়ার আমাদের অধিকার নেই। শতের মধ্যে পাঁচটি যে ইংরেজি বুঝে না, তা নয়। কিন্তু শতের পঁচানব্বই জনই বুঝে না। তাদের যদি আমি যথার্থই সাহায্য করতে চাই, যদি তাদের ধমক দিতে চাই, কেন তারা পড়ে না, তবে আগে বাংলাতে তাদের পঠনীয় সব মালমশলাকে আমাদের হাজির করতে হবে। তা না হলে অসহায় ছাত্র-ছাত্রীদের, ইংরেজি কেন পড় না, ইংরেজি কেন বুঝ না বলে ধমকানো, গ্রীক কেন পড় না, গ্রীক কেন বুঝ না বলে ধমকানোরই সামিল। আমাদের বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছেই যাহা ইংলিশ, তা গ্রীক। কিন্তু এ কথাটায় অস্বাভাবিকতা বা লজ্জার কিছু নেই। বেশিরভাগ জাপানি ছেলেমেয়েদের কাছেও যাহা ইংলিশ, জার্মান বা ফ্রেঞ্চ তাহা গ্রীক। মোট কথা সকল দেশের ছেলেমেয়েদেরই জ্ঞানের সঙ্গে যা কিছু স্বাভাবিক পরিচয় ঘটে, তা তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমেই ঘটে। দিন রাত যার চর্চা হয় তা মাতৃভাষারই চর্চা। তার অর্থ এই নয় যে, জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরে অপর ভাষা সমূহের চর্চা হয় না, হবে না। কিন্তু মাতৃভাষাই ভিত্তি। মাতৃভাষার উপর দাঁড়িয়েই অপর সব ভাষার চর্চা।

কথাটা ছোট করি। এই বোধ থেকেই আমরা : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, নূর মোহাম্মদ মিঞা, আমিনুল ইসলাম এবং অন্যান্যরা ইংরেজি ভাষা থেকে কিছু চিরায়ত সৃষ্টি ও সাহিত্যকে বাংলা ভাষায় নিয়ে এসে ছেলেমেয়েদের কাছে হাজির করার চেষ্টা করেছি।

সেই চেষ্টারই অংশ এ্যারিস্টটলের 'পলিটিকস্'-এর বাংলা অনুবাদ। এ্যারিস্টটলের 'পলিটিকস'-এর প্রয়োজনীয়তা, তার প্রাসঙ্গিকতা, বিশেষ করে বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থায় : এ সবের বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

আমার অনুবাদ আদৌ এ্যারিস্টটলের 'পলিটিকস'-এর উপযুক্ত অনুবাদ নয়। আমার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা যে কত, তা ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

আসলে এ রকম কাজে আদৌ আমি হাত দিতাম না যদি না অধ্যাপক রাজ্জাক তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের শুরু থেকেই কেবল ধমক দিয়ে বলতেন : 'বেহুদা ক্যান্ লেখা পড়া করছেন? বাপমায়ের টাকা-পয়সা এভাবে নষ্ট করার কি হকটা আছে? যদি এ টাকার ঋণ কিছু শোধ করতে চান, তবে যা একটু 'জানচেন-টানচেন' তা বাংলায় দেন। বাংলায় পেশ করেন। আপনার বাবা তো আপনার ইংরেজি পইড়া বুঝবো না, পোলা তার কত জিনিস জানছে, আর সে জিনিসে তার কত উপকার হইতেছে আর হইবো!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ ধমকের কোন জবাব নেই। এ ধমকের দাবীতেই বাংলাতে কিছু প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সেই চেষ্টার ইতিবৃত্তও আজ দেওয়ার জন্য এ আলোচনার আয়োজন নয়।

এই বাংলায় প্রকাশের চেষ্টারই একটি নমুনা হিসাবে কয়েকদিন পূর্বে অধ্যাপক রাজ্জাককে 'এ্যারিস্টটলের 'পলিটিকস'-এর মুদ্রিত ফাইল কপি দিয়ে বললাম :

'স্যার, একটু দেখবেন। ভালমন্দ যাই হোক, এটি যে প্রকাশিত হয়েছে, তার জন্য এবং তা জানাবার জন্যই একটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। এবং তাতে এই বেয়ারা সময়, বিকেল চারটাতে, আপনাকে হাজির থাকতে হবে।' আমাদের অপরিসীম কৃতজ্ঞতা যে, তিনি সহাস্যে, বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বলেছেন : 'থাকমু। কেবল মনে কইরা একটু নিয়া যাইবেন।'

কিন্তু যে কথাটা বলার জন্য অধ্যাপক রাজ্জাকের কথা বলছি সে এই যে, দ্বিতীয় দিন যখন দেখা করেছি এই বই প্রসঙ্গে, তখন তিনি সানন্দে বলেছেন : 'সরদার, আপনার অনুবাদের ভূমিকাটা আমি পড়েছি। তবে আমি হলে, ব্যাপারটার মধ্যে আর একটু লজিক্যালিটি আনার চেষ্টা করতাম এবং সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ্যারিস্টটলের মূল যে অবদান, মেথোডলজি তথা কোন বিষয়কে আমি কোন্ উপায়ে বুঝার চেষ্টা করব, কোনটা যথার্থই বৈজ্ঞানিক উপায় হবে, তার উপরই আমি অধিক জোর দিতাম।' অধ্যাপক রাজ্জাকের এ মূল্যায়নটি যথার্থ। এ মূল্যায়নে আমরা সবাই উপকৃত বোধ করব। কিন্তু রাজ্জাক স্যার এর পরে যে ধমকটি দিয়েছেন সেটি অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর পরের বাক্যটি এরূপ : 'আপনারা এগুলো কি লেখেন? কাদের জন্য লেখেন? একি বাংলা হয়? তারা কি এগুলো বুঝে?' তাঁর এ বাক্যের সামনে ডবল জিজ্ঞাসার চিহ্ন। এই প্রসঙ্গেই তিনি মহর্ষী হরপ্রসাদ সেন শাস্ত্রীর রচনার অনবদ্য রীতি এবং ভঙ্গী এবং তাঁর অতুলনীয় সাধনার উল্লেখ করেছেন।

ভাষার প্রশ্নে অধ্যাপক রাজ্জাকের এই সমালোচনা যথার্থ। স্যার এই প্রসঙ্গে আমাকে আরো বলেছিলেন : 'অনুবাদ তো একবার করার জিনিস নয়। একবার খসড়া করেন। আবার তারে দেখেন। আবার তারে পুনর্গঠন করেন। আবার লেখেন। দেখেন, আপনার লেখা কতখানি বাংলা করতে পারলেন।'

খুবই সঠিক কথা। অবশ্য আমরা যে পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে বাস করছি, বর্বরতার যে সর্বগ্রাসী যান্ত্রিক এবং অমিত পরাক্রমশালী চর্চা, বলা চলে আক্রমণ হচ্ছে তাতে আমরা যত অক্ষমভাবেই হোক না কেন, বাংলা ভাষার বা বাংলা লেখার যে চর্চা করছি তাতে তারা বোধ হয় একেবারেই অপঠিত থেকে যাচ্ছে। আমরা লিখি বটে, কিন্তু কেউ তা পাঠ করে না। অন্ততঃ আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠ করে না। তারা পাঠ করে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নোট। বই তারা পড়ে না। তবু কেউ কি পড়ে না? তাও সত্য নয়। কেউ কেউ যে পড়ে, হয়ত হঠাৎ পড়ে, কিংবা ভবিষ্যতে পড়বে : তারও উৎসাহজনক সাক্ষাৎ পথে ঘাটে এবং অন্যত্র আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিতভাবে না পেলে এমন কাজে আদৌ হাত দিতে পারতাম না।

কিন্তু এ কথা সত্য যে, আমাদের দেশে লেখক ও পাঠকের মধ্যে একটা ব্যবধান রয়ে যাচ্ছে। লেখক নিজের রচনাতে নিজে তৃপ্ত। সে জানে না কে তাকে পাঠ করছে। তার পাঠকের কি সমালোচনা। কি বক্তব্য। আরো সঠিকভাবে বললে আমাদের মধ্যে, তথা শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে চলছে বাস্তব জীবন এবং জনসাধারণের জীবন এবং ভাষা থেকে ক্রম বিচ্ছিন্নতার এক প্রক্রিয়া। এবং এ জন্যই জীবনের সর্বদিকে ব্যবধান, বিচ্ছেদ, অবোধ্যতা এবং অবাধ্যতা তথা বিরোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু অধ্যাপক রাজ্জাক যে দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন অর্থাৎ লেখক হিসাবে আমার যদি কেউ উদ্দিষ্ট থাকে, যদি কেউ থাকে যার কাছে আমার প্রকাশকে আমি পৌঁছে দিতে চাই, তাহলে যে কোন প্রকাশেই আমাদের সন্তুষ্ট হলে চলবে না। আমার উদ্দিষ্টের অন্তরকে আমি কেমন করে স্পর্শ করতে পারব, কেমন করে অধিকতর ভাবে তাকে আলোড়িত করতে পারব, তার নিরন্তর সাধনাকে আমার প্রকাশের অংশ হতে হবে। তাঁর এমন ইঙ্গিতের জন্য আমি কৃতজ্ঞতা বোধ করছি।

একদিক থেকে দেখলে আমাদের অবস্থা যথার্থই মর্মান্তিক। আমরাই যে কেবল অসহায়, তাই নয়। আমাদের শব্দকুলও অসহায়। দয়া, মায়া, ন্যায়, কর্তব্য, দায়িত্ব, দেশপ্রেম, আইন, সংবিধান : এরা তো অস্ত্র সজ্জিত কোন বাহিনী নয় যে, যে যার অর্থের যথার্থতা সশস্ত্র ক্ষমতায় রক্ষা করবে। তাই শুধু যে পাঠকরা লেখকদের ভাষা বুঝে না, তাই নয়। আমরা নিজেরাও পরস্পরের ভাষা বুঝি না। আমরা যা বলি তা বুঝাই না। যা বুঝাই তা বলি না। আমাদের দয়ার অর্থ নির্মমতা, মায়ার অর্থ মৃত্যু, কর্তব্যের অর্থ নসিহত, গণতন্ত্রের অর্থ স্বৈরতন্ত্র, আইনের শাসনের অর্থ হুকুমের শাসন... । মোটকথা যেমন রাষ্ট্র-জীবন, তেমনি ভাষা জীবন। উভয় জগতে এক নৈরাজ্যিক অবস্থা। হতাশার অবস্থা।

১২-৬-৮৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবর্তিত একুশে : বন্দী একুশ

'অমর একুশে বক্তৃতা'* : কথাটি অবশ্যই ভারী। এদিনে ভারী কথাই বলতে হয়। পাতলা কথা বলা মানায় না। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত এক অসুবিধা, ভারী কথা আমার মত পাতলা মানুষে মানায় না। এবং সে কারণে এই ভারী শিরোনামের যে আমি একান্ত অনুপযুক্ত এবং অযোগ্য, তা ভেবে সংকুচিত মানুষ আমি, অধিকতর সংকুচিত বোধ করছি। তবু দায়িত্ব এড়াবার উপায় নেই। তাই এই উপস্থিতি। কিন্তু ভারী কথা বলতে আমি আদপেই অক্ষম। তাই পাতলা কথায় কিছু মনের ভাব প্রকাশ করার অতিরিক্ত কিছু সুধী শ্রোতাদের সামনে পেশ করতে সক্ষম হব না। কোন তত্ত্বকথা বা গবেষণা উপস্থিত করা সম্ভব হবে না। জীবনের দিকে তাকালে কেবল এই ভরসাটুকু পাওয়া যায়, জীবনটা পাতলা, ভারীতে ভরা। কেবল ভারী হলে আমাদের মত দুর্বল, কৃশ, পাতলা মানুষদের পক্ষে বেঁচে থাকাই অসম্ভব হত। এ তত্ত্বের একটা প্রমাণ বক্তা নিজেই। '৫২ কিংবা তারও পূর্ব থেকে '৮৭ পর্যন্ত 'বর্তে' না হলেও 'বেঁচে' থাকার যে অবিশ্বাস্য ঘটনার সাক্ষ্য হয়ে আপনাদের সামনে সমুপস্থিত হতে পেরেছি, তার একটা বড় কারণ নিশ্চয়ই এই যে, আমি ভারী নই। পাতলা। কিন্তু এ নিয়ে আর বেশি না বলাই ভাল।

'৫২ কিংবা '৫২-র পূর্ব থেকে '৮৭ : ৩৫ বছর তো বটেই। তারও অধিক। তত্ত্ব দিতে না পারলেও কিছু তথ্য দানের দায়িত্ব থেকে রেহাই পেতে পারি নে। কিছুটা সচেতনভাবে কেবল যে '৪৮ সালের মার্চ মাসে কার্জন হলে সেদিনকার দুর্দমনীয় দীর্ঘ-কৃশ জিন্নাহ সাহেবকে বলতে শুনেছি এবং দেখেছি : 'উর্দু এ্যান্ড উর্দু এ্যালোন শ্যাল বি দি স্টেট ল্যাংগোয়েজ অব পাকিস্তান' এবং সেই বাক্য শেষ না হতেই পেছনের সারির তরুণ ছাত্রদের কণ্ঠ থেকে 'নো, নো, নো' শব্দের প্রতিধ্বনিতে শিহরিত হয়েছি, তাই নয়।

এই ঢাকার বুকে ১৯৪৫-এর রশীদ আলী-নৌবিদ্রোহ দিবসে দাঙ্গা পীড়িত শহরে হিন্দু-মুসলমান-সম্প্রীতির আওয়াজ নিয়ে সংগঠিত মিছিলে শরীক হয়ে উৎফুল্ল বোধ করেছি। '৪৮-এর মার্চেই কার্জন হলের রাস্তা ধরে আবদুল গনি

* বাংলা একাডেমীর '৮৭-এর 'একুশে বক্তৃতা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোডে প্রবেশ করে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের যে মিছিল মুসলিম লীগের এক মন্ত্রী সাহেবকে সেক্রেটারিয়েটের গেটে একটি উঁচু টেবিলে দাঁড় করিয়ে 'বাংলা ভাষা পৃথিবীর সব চাইতে ভাল ভাষা' বলে বক্তৃতা দেওয়াতে বাধ্য করেছিল, সে মিছিলে অনুপ্রবেশকারী হিসাবে সে কৌতুকজনক দৃশ্য দেখে জীবনের উঠতি-পড়তির চমকে চমৎকৃত হয়েছি। '৪৮ কিংবা '৪৯-এ সেই যে ছাত্ররা মিছিল করে বর্তমানের ধ্বংসপ্রাপ্ত জগন্নাথ হলের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনকালে পরিষদের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল বাংলা ভাষার অধিকারের দাবীর আওয়াজ নিয়ে, এবং সেই মিছিলকে শান্ত করতে এবং তার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য বিরাট দেহী প্রায় কৃষ্ণবর্ণ এ কে ফজলুর হক সাহেব যে এসে সেই মিছিলের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন, সে দৃশ্যটিও তো এখনো মনের চোখে অমলিন।

এবং সে কারণেই একটি দায়িত্ববোধ। যা দেখেছি, সমবেত শ্রোতা তথা ৫২-উত্তর প্রজন্মকে তা বলা। সাক্ষাৎ দর্শকের বলা এবং অদর্শকের বিবরণের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা পার্থক্য থাকে। আবেগগত পার্থক্য। সাক্ষাৎ দর্শকের বিবরণের মধ্যে একটা আবেগের দিক থাকে। অদর্শক ইতিহাস রচনাকারের সেই আবেগটি সম্ভব নয়। আজ যাদের বয়স '৩৫ তথা '৫২ তে যারা জাত এবং যারা আজ বর্তমানকে শাসন করছে, পরিচালিত করছে, যারা বাংলাদেশকে ভাঙ্গছে, গড়ছে, তারা '৪৫ দেখে নি, '৪৮ দেখে নি, '৫২ দেখে নি। এমন কি '৭১-এর সাক্ষাৎ দ্রষ্টাদের অনেকেই আজ নিহত এবং মৃত। এমন অবস্থাতে '৪৫, '৪৮, '৫২-র দ্রষ্টা : সে ক্ষুদ্র আমি হই, কিংবা বৃহৎ অপর কেউ হন, তাদের দায়িত্ব রয়েছে তাদের সেই সাক্ষাৎ দর্শনের কথা বলে যাওয়া। বর্তমানের যে যেভাবে সেই কথাকে নিতে চান, তিনি সেইভাবেই তাকে নিতে পারেন। তাতে বক্তার কিছু বলার নেই। আমি কেবল আমার দায়িত্বের কথাটি বললাম।

তবু এই সভাতে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে ব্যক্তিগত জীবনেরও সেই ৪০, ৪৫ তথা প্রায় ৫০ বছরের অভিজ্ঞতার কথা বিস্তারিতভাবে বলা সম্ভব নয়। অবশ্য তেমন বিস্তারিত কোন কাহিনীর ভাণ্ডারীও আমি নই। কাহিনীর বড় ভাণ্ডারী না হলেও, একুশকে নিয়ে নৈর্ব্যক্তিকভাবে কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, একুশের কাছে আমার একটি ব্যক্তিগত ঋণের ব্যাপার আছে।

'একুশে' 'ব্যক্তিগত ঋণ' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারেই বুঝা যায়, 'একুশে' কেবল একটি তারিখ নয়। পূর্ব বাংলার '৪৭-উত্তর মানুষের, বিশেষ করে ধর্মগতভাবে তার প্রধান সমাজ, মুসলমান সমাজের ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ-তরুণী এবং মধ্যবিত্ত কেরানী-কর্মচারী-শিক্ষক-অধ্যাপকের আবেগের মূর্তিমান স্বাক্ষর। যেন একুশে এক মহান ব্যক্তি। তাই 'মহান একুশে'। যেন 'একুশে একজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষাদাতা'। তাই 'একুশে আমাদের শিখিয়েছে, মাথা নত না করতে।' যেন 'একুশে' এক নিহত পথিকৃৎ। তাই 'অমর একুশে'।

এই সব শব্দের ব্যবহার থেকে আমার মনে ইংরেজি 'মিথ' শব্দটির আসল অর্থ কি, সে প্রশ্নটি সম্প্রতি জাগ্রত হয়েছে। 'একুশে' যথার্থই আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে। অনেক শব্দকে সে সৃষ্টি করেছে। অনেক শব্দের অর্থকে সে বদলে দিয়েছে। একটি তারিখকে সে ব্যক্তিতে পরিণত করেছে। একক কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নয়। কেবল বরকতের বা সালামের নাম নয়। বরকত-সালাম-রফিক– জব্বার : সকলের নাম 'একুশে'। এই 'একুশে' কি মিথ তথা বস্তুহীন বিশ্বাস, না বস্তুময় অস্তিত্ব? 'ফিকশন' না 'ফ্যাক্ট'?

অবশ্যই ফ্যাক্ট এবং অবশ্যই ফিকশন। এই 'একুশের' কতখানি ফ্যাক্ট এবং কতখানি ফিকশন বা কল্পনা, তা হয়ত গবেষণার বিষয়। তা আমার জানা নেই। তবু '৫২ থেকে '৮৭ পর্যন্ত একুশের বিবর্তন আমার কাছে এই সত্যটিকে যেন উদঘাটিত করছে যে, মানুষের ইতিহাস বিনির্মাণে ফ্যাক্ট যেমন কালক্রমে ফিকশনে পরিণত হয়, তেমনি সেই ফিকশন নতুনতর ফ্যাক্টেরও সৃষ্টি ঘটায়।

এই বিবর্তনের কথা থেকেই আমার মনে জাগরিত হচ্ছে একুশে পালনের বিবর্তনের বিষয়টি। একুশের অনুষ্ঠানের বিবর্তন। এ বিবর্তন কেবল '৫২-পরবর্তী বছরগুলোতে একুশে অনুষ্ঠানের হ্রস্বত্ব বা স্বল্পতার কিংবা ব্যাপকতার বিবর্তন নয়। আমার ব্যক্তিগত বিস্ময় একুশে বা '৫২-র শহীদদের রক্তদানের মূল মঞ্চটিরও বিবর্তনের কথা চিন্তা করে।

এমন কথায় স্মৃতিতে ভেসে ওঠে '৫৫ সালের মধ্যভাগের কথা। সেই '৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকার একটি এলাকা থেকে কয়েকজন সতীর্থসহ এক আসন্ন সন্ধ্যায় সরকারি পুলিশের আকস্মিক আক্রমণে গ্রেপ্তার হয়ে সেই যে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলাম, পাঁচ বছরের অধিককাল পরে '৫৫ সালের মধ্যভাগে ঘটে সেই কারাগার থেকে মুক্তি। আমি কিংবা আমার সহবন্দীদের কেউই সেই '৪৯-এর ডিসেম্বরে ভরসা করতে পারি নি, এই কারাগার থেকে আমাদের কোনদিন মুক্তি ঘটবে। মুক্তির আশা নিয়ে কারাগারে প্রবেশ করে নি সেদিন কোন রাজনীতিক কর্মী। জীবনকে দান করার জন্যই সেদিন কারাজীবনকে গ্রহণ করেছিল তারা। এবং '৪৮, '৪৯ থেকে '৫৫-র মধ্যে কত জীবনের বিনাশ ঘটেছে সেই কারাগারে। সুস্থ মানুষ অসুস্থ হয়েছে। চিরদিনের জন্য দেহমনে পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। সে কাহিনী আজো অলিখিত। আর তাই '৫২-উত্তরকালের কাহিনী কেবল কারাগারের বাইরের রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। ৫২-র আগের এবং পরের সে কাহিনী রচনার দায়িত্ব '৫২ থেকে জাত উত্তরসূরীদের। '৫২-র উত্তর পুরুষদের। কিন্তু '৪৮-'৪৯-এ : পাকিস্তানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তেজনাকর সেই যুগে নিশ্চিত মৃত্যুর গহবরে নিক্ষিপ্ত সংখ্যাহীন রাজনীতিক কর্মী তথা রাজবন্দীদের অসীম কৃতজ্ঞতা এই বিমূর্ত একুশের কাছে। এই একুশে তাদের সেই দিনের ভরসাহীন জীবনে, মৃত্যুর গহ্বরে জীবনের আলো দিয়েছিল। বাঁচার ভরসা যুগিয়েছিল। নিজেদের জীবনদানে যে একুশে তৈরি হয়েছিল সেই দান করা জীবন থেকে জীবন লাভ করার ঋণ আমাদের। এক মৃত্যু যে আর এক মুমূর্ষুকে জীবনরসে পুনর্জীবীত করে তুলতে পারে, তার এমন দৃষ্টান্ত নিজেদের জীবনেতিহাসে আর কোনদিন ঘটে নি।

বোঝাই যাচ্ছে, কথাগুলি আবেগের। এবং '৮৭-র বর্তমান মুহূর্তে নতুন প্রজন্মের কাছে হয়ত অর্থহীন আবেগ। কিন্তু পুরাতনের কাছ থেকে একুশের আবেগহীন তত্ত্বকথা লাভ করা দুষ্কর।

একুশে কি কেবল বিমূর্ত প্রতীক? না। আবেগ-আবিষ্ট বর্তমান বক্তার পক্ষে তেমন কথাও চরমভাবে বলা সম্ভব নয়। প্রতীক কিভাবে ব্যক্তির মনে প্রত্যয় সৃষ্টি করতে পারে তার দৃষ্টান্ত হিসাবে নাম উল্লেখ না করে একজন লেখকের একটি স্মৃতিচারণের উল্লেখ করছি।

"সতের বছরের একটি তরুণ। গত বছর এই ফাল্গুনে ও ষোল ছিল। এবার ফাল্গুনে ও সতেরতে পা দিল। সতের বছরের একটি তরুণ। কী কান্তিময়, লাল গোলাপের রক্ত ঝরা রঙে রঙীন! কি সুন্দর! কত বীর্যবান! কী সাহসী! ওর সাহসের দিকে চাইতে আমাদের প্রাণ কাঁপে। আমরা সাধারণ। আমরা ভীতু। দৈনন্দিনের বেড়াজালে আবদ্ধ। সূর্য কখন ওঠে, কখন অস্ত যায়, আমরা তা জানি নে। সূর্যের রং কি, আমরা জানি নে। সতের বছরের তরুণ সতের বছর আগে এসে সূর্যের দিকে আমাদের মুখ ফিরিয়ে দিয়েছিল। সূর্যের আশা দিয়ে আমাদের ভরে তুলেছিল। আশাহীনের চরম হতাশা ও গ্লানিকে মুছে দিয়ে ও আমাদের নতুন জীবন দান করেছিল। তা না হলে মরেই যেতাম। তা না হলে আমরা জানতাম না বর্বরতারও জবাব আছে। দম্ভেরও পরাজয় আছে।"

এই প্রসঙ্গে আর একটি উক্তিরও উল্লেখ করা যায়। এ উক্তি উচ্চারণকারীরও নাম উদ্ধারের আবশ্যকতা নেই। কিন্তু তার কথাটি বিবেচনার যোগ্য।

"একুশে ফেব্রুয়ারিকে ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে বোধ হয়েছে একটি রহস্যপুরুষ হিসাবে। তাকে প্রথমে ভেবেছি একটি রহস্য শিশু হিসাবে যার জন্ম হয়েছে ২১ ফেব্রুয়ারি, '৫২ সালে। তার পরে তাকে মনে হয়েছে বর্ধমান একটি তরুণ হিসাবে। এখন তো সে বয়সের দিক থেকে বয়ঃপ্রাপ্ত একটি যুবকই নয়, প্রায় ত্রিশ বছরের পুরো মানুষ। এমন বোধের কারণ হয়ত এই যে, একুশে ফেব্রুয়ারিকে আমি নিজে চোখে দেখি নি। তবু সে যেভাবে পূর্ববাংলার মানুষকে আপাদমস্তক আন্দোলিত করেছিল তাতে তাকে এক রহস্যময় শক্তি বলে আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে হয়েছে যার সঙ্গে ইতোপূর্বে আমার তেমন সাক্ষাৎ ঘটে নি। আমার, মানে সেই পঞ্চাশ দশকের বামপন্থী অগ্রগামী রাজনৈতিক কর্মী, বিশেষ করে পাকিস্তানের নিশ্চিদ্র কারাগারগুলিতে বন্দী মানুষের, ব্যক্তিগত ঋণেরও কিছু ব্যাপার আছে একুশের কাছে।... একুশ থেকে একুশ, বা ফাল্গুন থেকে ফাল্গুনে কেবল একুশের বয়স বৃদ্ধি নয়। আমাদের রাষ্ট্র, সমাজ ও জীবনেরও বিকাশ এবং বিবর্তন। সে কোন্ দিকে? তার আভাস অন্য কোন দিনের উদযাপনে না হোক বছর থেকে বছরে একুশের উদযাপনে তার আভাস নিশ্চয়ই কিছু ভেসে ওঠে।"...

লেখকের আগের স্মৃতিচারণটি যদি ঘটে থাকে ১৯৬৯-এ, তবে পরেরটি ঘটেছে ১৯৮১-তে। অর্থাৎ বিবর্তিত একুশের বিবর্তিত দ্রষ্টা বা দর্শনকারীর কিছুটা পরিচয় এই দুটি উদ্বৃতিতে পাওয়া যায়।

বৎসর থেকে বৎসরান্তে আমরা একুশে পালন করে এসেছি। পালন করে আসছি। একুশের অবশ্যই এই এক অনস্বীকার্য অবদান যে, বাঙালির দিনপঞ্জীতে একটি রক্তাক্ত দিনের স্বাক্ষর এঁকে দিয়েছে একুশে। একুশে ফেব্রুয়ারি তথা ৮ই ফাল্গুন বাঙালির সামাজিক-রাজনীতিক জীবনে একটি স্থায়ী ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন আর একুশে ফেব্রুয়ারি বাদে আমরা বছরের দিনপঞ্জী তৈরি করতে পারি নে। কোন প্রতিষ্ঠান তার বাৎসরিক কার্য পরিচালনেও পারে না একুশকে অস্বীকার করতে। একুশে আজ সরকারি ছুটির দিবস। জাতীয় শহীদ দিবস বলে সে আখ্যায়িত। এই ঘটনাটি অর্থাৎ সরকারি ছুটির দিবস বলে স্বীকৃতি লাভের ঘটনাটির আনুপূর্বিক ইতিহাসও উদঘাটনের এবং বিবৃত হবার অপেক্ষায় আছে। শহীদ মিনার আজ বৃহৎ হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে এবং সরকারিভাবে তার স্বীকৃতি ঘটেছে। শহীদ মিনারে যেতে পারা, না পারা প্রতিষ্ঠিত সরকার মাত্রেরই আজ মান মর্যাদার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং এই কারণে প্রতি বছর এখন একুশে ফেব্রুয়ারির শহীদ মিনার প্যাছে না নতুন শহীদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে ওঠে, সেই আশঙ্কায় আমাদের বুক কম্পিত হয়ে ওঠে। অথচ এই শহীদ মিনার প্রতিকূল সরকারের হাতে কতবারই না ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।হ্রস্বদৃষ্টির প্রতিকূল শক্তি সেদিন শহীদ মিনারকে আঘাত করে করে তাকে নতুন থেকে নতুনতর অর্থে অর্থবান করে তুলেছে। ক্ষুদ্র শহীদ মিনারকে বৃহৎ করে তুলেছে।

শহীদ মিনারের এমন বিবর্তনও তাৎপর্যবাহী।

কিন্তু এর অপর একটি দিকও আছে। বিবর্তনের সে দিকটিও বিশ্লেষণের দাবী রাখে। বিশ্লেষণের দাবী রাখে একুশের মূল তাৎপর্য উদঘাটনকারী নতুন সমাজ বিনির্মাণের কর্মীদের কাছ থেকে।

'৫৫ সালে কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে যে-শহীদ মিনারের পাশে দাঁড়িয়ে আবেগে আলোড়িত হয়েছিলাম সদ্য কারামুক্ত কয়েকজন রাজনীতিক বন্দী, সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহীদ মিনারের কোন কনক্রিটের দণ্ড কিংবা সোপান কিংবা চত্ত্বর ছিল না। কয়েকটি চেরা বাঁশের ফালিতে পরিবেষ্টিত ছিল একটি মাটির মঞ্চ। মুক্ত মানুষেরা বন্দীদের বলেছিলেন : 'এখানে পড়েছিল বরকত-সালামের রক্ত।' তাঁদের এমন পরিচয় দানেই কৃতজ্ঞতার স্মৃতিতে আবিষ্ট হয়েছিল সদ্যমুক্ত কারাবন্দীরা। কালক্রমে সেই মঞ্চ স্থানান্তরিত হয়েছে বর্তমানে শহীদ মিনারে। শহীদ মিনার আজ বৃহৎ হয়েছে। সরকার থেকে সরকারের প্রতিযোগিতা শহীদ মিনারকে কে কার চাইতে অধিকতর বৃহৎ করতে পারে।

একুশের আলাপ আলোচনার প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ বাংলা একাডেমী। সঙ্গতভাবেই দাঁড়িয়েছে। বাংলা একাডেমী একুশের ভাষা আন্দোলনের ফলশ্রুতি। ফসল। বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠার পরবর্তী সময় থেকে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠানগতভাবে প্রতি বছর একুশকে পালন করা তার অন্যতম দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করে এসেছে। বাংলা একাডেমীর একুশ পালনেও বিবর্তন ঘটেছে। পূর্বের চাইতে ব্যাপকতর এবং বৃহত্তর আজকের একুশের পালন। আগে যদি সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল একুশের অনুষ্ঠান, আজ সেখানে দিন থেকে সপ্তাহ, এমন কি মাসাবধি বিস্তারিত তার অনুষ্ঠান। গ্রন্থের প্রদর্শনী ঘটে প্রায় মাসব্যাপী। মেলা বসে। গ্রন্থের মেলা। ফুচকা, চটপটি, ঝাল-মিষ্টি, তরুণ তরুণীর কলকাকলীর মেলা বসে। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি : নানা বিভাগের উপর আলোচনা, সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় পক্ষব্যাপী। ২১-এর রাতে বারটা এক মিনিটে পদযাত্রা শুরু হয় শহীদ মিনারকে লক্ষ করে : শহীদদের কবরগাহ হয়ে শহীদ মিনার। কিন্তু ২১ ফেব্রুয়ারির মূল ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল রাত বারটাতে নয়। হয়ত বা সকাল দশটা কিংবা দুপুর বারটাতে। ছাত্র-ছাত্রী-জনতা পুলিশের নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে যখন পরিষদের দিকে অগ্রসর হতে চেয়েছিল, তখন। কিন্তু আজ আমরা রাত বারটাতে পদযাত্রার সূচনা করি অনুষ্ঠানটিকে একটি প্রতীকীমূল্য প্রদানের জন্য। মূল শহীদ মঞ্চ নয়, বৃহৎ শহীদ মিনার এবং বাংলা একাডেমীর বটমূল এখন সাহিত্য, সংস্কৃতির সেমিনার এবং নির্বাধ কাব্য পাঠের স্থান। একুশের সাহিত্য পুরস্কার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকারের তরফ থেকে একুশের পদকের প্রবর্তন করা হয়েছে। বাংলা একাডেমী একুশের বক্তৃতারও প্রচলন করেছে। ইসলামী একাডেমীও এবার একুশে পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই সব ঘটনাই তাৎপর্যের ঘটনা। একটি সংগ্রামী জনসমাজের শক্তির স্মারক। একুশে আজ বাঙালির জাতীয় ইতিহাসের অনস্বীকার্য এক বাৎসরিক উৎসব, অনুষ্ঠান ও পর্ব। বাঙালির ইতিহাসকে অভাবিতভাবে সমৃদ্ধ করেছে একুশে ফেব্রুয়ারি।

'৫২-র একুশ থেকে অতিক্রান্ত ৩৫ বছরের বিচিত্র রক্তাক্ত ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে একুশে সম্পর্কে একথা বলা যায়, একুশে আজ একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। একটি পার্বনিক চরিত্র সে ধারণ করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং সে কারণেই সমাজ রূপান্তরের বিরতিহীন সংগ্রামের যারা শরীক, যারা নতুনতর একুশের সৃষ্টির মাধ্যমে '৫২-র একুশকে অতিক্রম করে '৭১-এর একুশকে তৈরি করেছেন এবং যারা সেই '৭১-কে অতিক্রম করে শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য আর এক একুশ তৈরি করতে চান, বর্তমানের প্রাতিষ্ঠানিক একুশের সীমাবদ্ধতার দিকটিকে অবশ্যই তাঁদের বিশ্লেষণ করতে হবে।

এই বিশ্লেষণের প্রয়োজন এদিক থেকে যে, একুশে যেমন একদিন বাঙালিকে জীবন দান করেছিল, সংগ্রামের নূতন পথ প্রদর্শন করেছিল সে একুশে তেমনি আজ পর্ব আর অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়ে তার জীবনীশক্তিতে নিঃশেষিত হয়ে গেছে বলে বর্তমানের তরুণদের অনেককে হতাশায় আবিষ্ট হতে দেখি।

এইখানেই তাই প্রসঙ্গ আসে মানুষের শেষহীন অভিযাত্রায় যে কোন একটি সংগ্রাম বা আন্দোলনের শক্তি ও সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গ। এবং সে প্রসঙ্গে একথা অনস্বীকার্য যে প্রতিষ্ঠান বাহীরা যেমন, প্রতিষ্ঠানের বাইরের, সমাজকর্মীরাও তেমনি '৫২-র ভাষা আন্দোলনের সামগ্রিক শক্তি এবং সীমাবদ্ধতার দিকটির আলোচনায় এখনো নিবদ্ধ নয়। এখনো সহজ আবেগ ও উচ্ছ্বাস এবং স্মৃতিচারণই বাৎসরিক একটি দিনের ২১ ফেব্রুয়ারির বৈশিষ্ট্য হয়ে হয়েছে।

প্রসঙ্গটিতে আমার ব্যক্তিগত বোধটুকুর উল্লেখ করে এ আলোচনার আমি ইতি টানতে চাচ্ছি।

৩৫ বছরের বিবর্তিত একুশের দিকে তারিখে আমার বলতে ইচ্ছা হয় : একদিনের বিদ্রোহী একুশে আজ প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও সমাজ তথা 'এসটাবলিশমেন্টের' সালাম, শ্রদ্ধা, দর্শন-প্রদর্শনের সূক্ষ্ম, অ-সূক্ষ্ম শত শৃঙ্খলে আবদ্ধ। কাল থেকে কালে বিদ্রোহীমাত্র সমাজকে বিব্রত করেছে। বিদ্রোহীকে নিয়ে সমাজের বড় বিপদ। গোড়াতে সমাজ বিদ্রোহীকে নির্মম অত্যাচারে দমন করে তাকে নির্বাক করতে চায়। কিন্তু তার অমিত তেজে ব্যর্থ হয়ে কালক্রমে সমাজ তাকে স্বীকার করে আনুষ্ঠানিক সম্মান আর শ্রদ্ধার উত্তুঙ্গতায় স্থাপন করে তাকে নির্বীর্থ করার চেষ্টা করে। সমাজ-ইতিহাসের এ এক বাঙময় সত্য। এককালে বিদ্রোহী যদি প্রতিকূলের নিরস্ত্র, সশস্ত্র, সহস্র আক্রমণকে রক্তাক্ত বুকে মোকাবেলা করে শোষিত, দলিত মানুষের আশা-ভরসার দুঃসাহসী নায়ক হয়ে দাঁড়াতে পেরে থাকে তো পরবর্তীতে সেই প্রতিকূল সমাজের খল, কূট আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি, সম্মান ও শ্রদ্ধার বেড়াজালকে অতিক্রম করা তার পক্ষে আর সহজ হয় না। সম্ভব হয় না। একুশে কেবল একটি আন্দোলন নয়। একুশে এক সত্তাগত অস্তিত্ব। ব্যক্তি তথা ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তি যেমন শৈশব, কৈশোর, যৌবন এবং প্রৌঢ়ত্বে রূপান্তরিত হতে হতে অগ্রসর হয়, একটি আন্দোলনও তেমনি। একটি আন্দোলনকে যদি অনড় অস্তিত্ব হিসাবে কল্পনা করে কেবল আওয়াজ তুলি :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'একুশে জিন্দাবাদ, একুশে অমর' তাহলে আমরাও পরিণামে দেখব, অস্তিত্বের ক্ষেত্রে অনড় বলে কোন সত্তা নেই। একুশও বিবর্তিত হয়েছে। '৫২-র একুশ, এমন কি '৭১-র একুশ আর '৮৭-র একুশ অভিন্ন নয়। বাংলাদেশের সমাজও আজ বিবর্তিত সমাজ। '৭১ থেকে ভিন্নতর এক সমাজ। ২২ কোটিপতি আজ কত শতকে পরিণত হয়েছে, তা আমার জানা নেই। কিন্তু জমিহীন কৃষকের সংখ্যা শতে ৪০ থেকে ৬০ এ যে উন্নীত হয়েছে, সে সত্য বাস্তব জীবনের নিত্য মুহূর্তের উচ্চারিত সত্য। বন্ধ্যা ধনবাদী অর্থনীতির বোঝা শোষিতকে মানবেতর প্রাণীতে পর্যবসিত করছে।

এমন দিনে যে তরুণরা আওয়াজ তোলে : 'কেউ খাবে, কেউ খাবে না, তা হবে না, তা হবে না; এ সমাজ জীর্ণ সমাজ, এ সমাজকে ভাঙতে হবে'– তাদের সে আওয়াজ যদি কেবল শব্দের ছন্দময় ঝঙ্কার না হয়, যদি তাতে আন্তরিকতা থাকে, এবং যদি আজকের সংগ্রামী তরুণ একুশের মধ্যে মানুষের মহৎ সংগ্রামের অনিবার্য বিজয়ের বিশ্বাসের উৎসকে অন্বেষণ করতে চায় তবে তাকে '৮৭-তে বন্দী '৫২-র একুশেকে শেকলমুক্ত করার পণ গ্রহণ করতে হবে। সে পণ যেন প্রকাশিত হয় একুশের মর্মবাণীকে একুশে ফেব্রুয়ারির একটি দিন থেকে বৎসরের প্রতি দিনের সংগ্রামে বিস্তারিত করণে, সে পণ যেন প্রকাশিত হয় শহরের চৌহদ্দী থেকে মুক্ত করে শ্রমজীবী মানুষের কল কারখানা, খেত খামারে একুশকে প্রসারিত করণের মাধ্যমে।

AMARBOI.COM

১৪-২-৮৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জহুর ভাই-এর ভাষায় 'জহুর হোসেন চৌধুরী'

"১৯২২ সালের ২৭ জুন সুবেহ সাদেকের অনেক আগে অন্ধকার থাকতেই হোসেন মামুর দরাজ গলার আজানের আওয়াজে আশে-পাশের বাড়ির অনেকের ঘুম ভেঙে গেল। অসময়ে এই আওয়াজের অর্থ সকলেই বুঝলেন– খানবাহাদুর সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা মোসাম্মৎ মোহসেনা খাতুনের একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। নবজাত বাচ্চাটি দেখতে আহামরি নয় বললে বেশ একটু কম বলা হয়। শকল্-সুরতের কথা ছেড়ে দিলেও, প্রথম যাঁরাই বাচ্চাটিকে দেখলেন, তাঁদের মনেই প্রার্থনাবাণী স্বতোচ্চারিত হল, 'আহা, খোদা যেন একে হায়াৎ দেন।' দোয়াটি মামুলি ছিল না। বাচ্চাটির শরীর এমন প্যাঁকাটির মত ছিল যে, এই দীর্ঘজীবন কামনার খাস প্রয়োজন ছিল। শ্রীমানের শরীর যত দুর্বল হোক না কেন অবিশ্রান্ত চীৎকারে সে প্রমাণ করছিল যে, গলার আওয়াজ ও জিহ্বার ধারে সে শারীরিক দৌর্বল্যটা সুদে-আসলে পুষিয়ে নিয়েছে। সে যুগের মানুষ খোদাকে ভয় করতেন, গোনাহকে সযত্নে এড়িয়ে চলতেন। এ কারণেই বোধ হয় রহমানুর রাহিম আল্লাহ তায়ালা বাচ্চাটির শুভাকাঙ্ক্ষীদের আরজ শুনেছিলেন। অন্ততঃ অর্ধডজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার বেশ কয়েকবার সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, আজরাইলের সমন সমাগত।

"ডাক্তারী শাস্ত্রটি যে এখনও নেহাতই অপরিপক্ক এ তথ্যটি প্রমাণ করে মুরুব্বীদের দোয়ার বরকতে এবং আল্লাহর রহমতে আমার বয়স আজ তিপপান্ন বছর তিনমাস। আব্বা-আম্মা, নানা নানী এঁদের মধ্যে কে আমার নাম জহুর হোসেন রেখেছিলেন জানি না। আমাকে নিয়ে রসিকতা করার কোন ইচ্ছা তাদের ছিল একথা আমি কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু বাংলা অর্থ করলে 'জহুর হোসেন' শব্দ দুটির অর্থ দাঁড়ায়, সৌন্দর্যকে যে জাহির করে। সৌন্দর্যের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক আছে এমন বদনাম আমার জন্ম-দুশমনও দিতে পারে না। কিন্তু আমার নামে যে বেরসিকতা ফুটে উঠেছে আমার চরিত্রে তার ছাপ গভীরভাবে পড়েছে, এ কথা আমাকে জানবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরাই এক বাক্যে স্বীকার করবেন। কেউ যদি মনে করেন আমার আত্মজীবনী তাঁদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছি, ভুল করবেন।...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"...মালেক উকিল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, "বাইসাব বালা আছেন ত? আইচ্ছা বাইসাব কতা নাই বার্তা নাই আঁন্নে কেন্নে আৎকা হোম মিনিস্টারিত্তুন স্পীকার অই গেলেনগই?" এর কিছুদিন পূর্বে জনাব আবদুল মালেক উকিল বিনা নোটিশে হোম মিনিস্টারের পদ ছেড়ে স্পীকার হয়ে যান। মালেক উকিল সাহেব জবাব দিয়েছিলেন, "খোদা যা করেন বালার লাইই করেন। স্পীকার অই বড় আরামে আছি বাই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কামের ঝঞ্চাটে হায়াত কমি যাইতে আছিল। মাইনষেও বদদোয়া দেয় না, বরং অল্পবিস্তর ইজ্জতই করে।"

"মালেক উকিল সাহেব জানতেন না তাঁর সেদিনকার কথার কথাগুলো কিরূপ নিদারুণভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হবে। উকিল সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "আমনের বয়স কত?" বললাম, "ফরায় তিপ্পান্ন বছর।"– "ও আল্লাহ। এই বয়সেই চেহারা সুরত এইক্কা হইছে কা?" জবাব দিলাম, "বাইসাব বয়সের ত কোন দোষ নাই। বিলাতে ত ইয়া জোয়ান বয়স। দ্যান না চার্লি চ্যাপলিন আশি বছর বয়সে আরেক গা বিয়া কইচ্চে যে ক'বছর অইগেল। মাশাল্লাহ আল্লাহর রহমতে অনত চরিবরি খায়। আর গ্রীসের অমুকের বাই ওনাসিস ত ফরায় বায়াত্তুর বছর বয়সে আঙ্গো আমেরিকার মরহুম কেনেডি সাবের বিধবা জ্যাকিরে এইত ক বছর আগে বিয়া কইরলেন। (ওনাসিস হালে মারা গেছেন)। আর জ্যাকিরে চোখ্যে না দেইখলে কি হইব ফটোতে দেইখছেন তো।..." (ছাপার অক্ষরে চলে না)।

একটু বিব্রত বোধ করে উকিল সাহেব বললেন, "তোবা তোবা! আন্নের মুখের কোন আড় নাই। অবশ্য আন্নের জিহ্বার কতা কে না জানে। আই জিজ্ঞাইলাম এতে অলফ বয়সে চেহারা এই রকম খারাব অই গেছে কিল্লাই, আর আন্নে শুরু করলেন কোন আনের চার্লি চ্যাপলিন, ওনাসিস আর জ্যাকি কেনেডির বয়ান।"

আমি বললাম, "বাইসাব, ফাঁচকান কতা গুছাই কইতাম ও লেইখতাম ফাইরলাম না হারা জীবনে। আঁর জিহ্বার কতা কইতেছেন। বিয়ার আগে আঁর বেগমসাব এক গণৎকারের কাছে গেছিলেন। বেডা 'অমুকের' হুত গণকা হেতাইনের হাত দেখি এককরে বিদ্যাসাগরী বাংলায় কইছিল, "স্বামী বর্বরতা দোষে দুষ্ট হইবেন।' রবীন্দ্রনাথের পরশপাথর কবিতার ক্ষ্যাপার মত আঁই গত বিশ বছর ধরি গণৎকারে খুঁজি বেড়াইয়ের। অনত্ত হইত্যেক দিন তার কথা মনে অয়। 'অমুকে'র হুতের দেয়া ফাইলে বেডারে জিজ্ঞাইতাম, 'ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ। এ দেশের ভবিষ্যৎটা কি?' তবে চার্লি চ্যাপলিনের বয়ান আন্নেরে কইলাম, হেইটার লগে আর অকাল বার্ধক্যের সম্পর্ক আছে।"

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ক্যামনে"। আমি বলে চললাম, "চব্বিশ বছর পাকিস্তানে আর তিন বছর বাংলাদেশে থাকি চেহারাটা না এই রকম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অইছে, খোদার মেহেরবাণীতে অনঅ ত কবরে যাই ন। আন্নেরও বয়স আর কত অইব। কিন্তু আয়নার দিকে মাসে দুমাসেও একবার দেখেন তো? আঙ্গো মত এতদিন পাকিস্তানে ও বাংলাদেশে থাইকলে জ্যাকি বিবি সাহেবের চেহারায়ও এই জেল্লাই থাইকত ন"...দরবার-ই-জহুর।

৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫

*　　　　*　　　　*

আসলে এই লেখাটির নাম দেওয়া উচিত 'একতা'র লেখা। 'একতা'য় আমার এক ভক্ত ছিল, মোজাম্মেল হোসেন। তিনি আমায় পরিত্যাগ করেছেন, বুঝতে পারি। বহুদিন, 'আরে মোজাম্মেল কেমন আছেন?' এই সম্বোধন করতে পারি নি এবং তার জবাবে, 'স্যার, আপনার কথা মনে করছিলাম, এই জবাবও প্রায় এক বছর যাবৎ না পেয়ে। এটাই স্বাভাবিক। বর্জ্য পদার্থ যত শীঘ্র পরিত্যক্ত হয়, তত অগ্রগামী সাথীদের মাথার বোঝা আর মনের সংকোচ হাল্কা হয়। আর এক বন্ধু অজয়। অজয় রায়। বামপন্থী রাজনৈতিক মহলের পরিচিত নেতা এবং ব্যক্তিত্ব। আমার জেলখানার বন্ধু। সেই কবে চল্লিশের দশকে সাক্ষাৎ ঘটেছিল মুন্সীগঞ্জে। অজয়েরও গলা শুনি নি আমার বাসার মরচে ধরা ফোনে, এক বছরেরও অধিক। সে হয়ত অজয়ের দোষ নয়। আমার ফোনের বার্ধক্য। কিন্তু হঠাৎ সেই ফোনে সেদিন অজয়ের গলা বেজে উঠল। আমার আর জিজ্ঞেস করতে হল না, কে বলছেন। কারণ, অজয়ের গলা আমি চিনি। অজয় বেশি লম্বা করে কথা বলেন না। কাটা কাটা কথা। সোজাসুজি বলেন। অজয় বলল ('বললেন' শব্দটা বাদ দিলাম। তা না হলে অজয় রাগ করবে।) সরদার ভাই, জহুর ভাই এর উপর 'একতা'র জন্য একটা লেখা দিতে হবে। আগামী দুদিনের মধ্যে।

অজয়ের হুকুমের একটা অধিকার আছে। সে অধিকার যতো বলিরেখায়ই রেখাঙ্কিত হোক না কেন, তবু এখনো সে বেঁচে আছে এবং তার বয়স, মানে অধিকারের বয়স, পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। তার ফোনের জবাবে আমিও আর অধিক কিছু বলতে পারলাম না।

হুকুম মানার চেষ্টা করে আমাকে দেখাতে হবে যে, হুকুম মানার ক্ষেত্রে আমি কত ব্যর্থ। কারণ আমি 'লেখক' এই কথাটা কোনদিন বিশ্বাসের মধ্যে আনতে পারি নি। আনতে পারলে লেখায় একটু আত্মবিশ্বাসের ভাব আসত। তবু অজয়দের হুকুমে কথা বলতে হয়েছে। আর সেই আত্মকথাকে তারা প্রয়োজনবোধে 'লেখা' নাম দিয়ে তাদের কাগজের ফাঁকা কলামকে ভরাট করে দায় সেরেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু লেখার কথাই যদি বলি তাহলে জহুর ভাইএর উপর লেখার মত কঠিন এবং অসম্ভব দায়িত্ব আমি আজ পর্যন্ত পাই নি এবং পালন করি নি। এখন কি করি? দ্বিতীয় দিনে অজয় ফোন করতে বললাম, জহুর ভাইএর 'দরবার-ই-জহুর' বইখানা পাঠিয়ে দিতে। আমার কপি কোথায় আছে, খুঁজে পাচ্ছি নে। দেখি 'দরবার-ই-জহুর' পাঠ করে কিছু দাঁড় করাতে পারি কিনা।

সেই চিন্তা নিয়ে নিজের কাঁধের ব্যাগের মধ্যে 'দরবার-ই-জহুরকে' নিয়ে কেবল রাস্তায় ঘুরছি আর ভাবছি কি করি? কি করি?

আমরা আজকাল খুব যুগের হিসাব করি। দশকের যুগ। অর্ধ শতকের যুগ। শতকের যুগ। ১৯৪০ থেকে '৫০ পেরুলেই বলি এক যুগ পার হল। তখন থেকে বলি চল্লিশের দশকের যুগের এই ছিল বৈশিষ্ট্য। ঐ ছিল ধারা। উপধারা।

আসলে সময় তো যুগকে নির্দিষ্ট করে না। সময় তো একটা কাল্পনিক অঙ্ক। সংখ্যা। তার হাত, পা, মন নাই। বাস্তবিক হচ্ছে মানুষ। বাস্তবিক হচ্ছে ব্যক্তি।

বাস্তবিক ছিলেন জহুর হোসেন চৌধুরী। বাস্তবিক ছিলেন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। বাস্তবিক ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন। মুরব্বী আকরাম খানের কথা তোলার দরকার নাই। তাঁর দরবারে আমি কখনো বসার সাহস ও সুযোগ পাই নি। আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেবেরও নয়। তাঁদের সম্পর্কে নানা লেখকের স্মৃতিচারণ আর মূল্যায়নের অভাব নেই। সেগুলো সুযোগ ও প্রয়োজনমত আমরা পাঠ করতে পারব। এবং আমরা পাঠ করি।

মানিক মিয়ার কথা স্মরণে এলে যেমন তাঁর 'রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ'-এর কথা স্মরণ হয়। তেমনি তার নতুন ভবনের কথা নয়। স্মরণ হয় হাটখোলার সেই সেকালের পুরোন একটি বাড়ির কথা। সেখানে তিনি বসতেন। কেমন করে যে অত অল্প জায়গায় অমন জোরালো 'রঙ্গমঞ্চ' আর তার মুখপত্র 'ইত্তেফাক' বেরুত সে আজো আমার কল্পনার বাইরে। মানিক মিয়ার কথাও থাক।

আমি ভাবছি জহুর ভাই এর কথা। এই ভাবতেই চমকে উঠলাম, আমাদের হৃদয়ের আত্মীয় যারা, মা-বাবা, ভাই-বোন, একান্ত সুহৃদয় যাদের আলো-হাওয়া সর্বক্ষণ গায়ে জড়িয়ে আমরা বেঁচে থাকি, তাদের কথা কম স্মৃতিই না আমাদের মনে থাকে। তাঁরা যখন থাকেন না তখন আলো আর বাতাস না থাকার মতো অবস্থায় প্রাণটা আইতাই করে ওঠে। কিন্তু ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে পারি নে : বাবা আমাকে অমুক দিন বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। মা আমাকে শুকনো মরিচ পুড়িয়ে পান্তা ভাত মেখে খাইয়ে দিয়ে বলেছিলেন, খা, খেয়ে দেখ, ভাল লাগবে। জহুর ভাই বলেছিলেন, আরে আপনি এসেছেন। ওরে কে আছিস, মিষ্টি আর সিঙ্গাড়া নিয়ে আয়। যদি এ বাক্য বলে থাকেন তবে সে তার ছেদহীন পূর্ব শব্দ স্রোতের মধ্যে সেকেন্ডের মাত্র বিরাম এবং সে বিরামের পরে পুনরায় সেই অবারিত শব্দের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচ্চারণের, দৃষ্টান্তের, কণ্ঠের শব্দধারার অনিবার প্রবাহ। বলার শব্দে গলার হাঁপানির টান আছে। হাতে পায়ে একজিমার চিহ্ন আছে। কিন্তু শব্দের স্রোতের বিরাম নেই।

হ্যাঁ, এই স্মৃতি কিছু আমার মাথায় আছে। কোন ঘটনার নয়। স্মৃতির পলি। একনাগাড়ে '৪৯ থেকে '৫৫ সাল পর্যন্ত রাজবন্দী হিসাবে আটক থেকে জেল থেকে বেরিয়ে এসে বংশালের 'সংবাদ'-এর পুরোন সেই দালানের নিচের তলার দক্ষিণ দিকের ঘরে প্রায় চব্বিশঘণ্টা বহমান সেই শব্দের স্রোতে যে সামিল হয়েছিলাম, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই শব্দ আর সস্নেহ আকর্ষণে জেলখানা থেকে বেরিয়ে অপর কোন আত্মীয়ের আবাস খোঁজ করতে হয় নি। সোজা বংশালের 'সংবাদ'-এ এসে 'দরবার-ই জহুর'-এ শরীক হয়েছিলাম। জহুর ভাইকে মনে করতে গেলে 'সংবাদ'-এর ঐ পুরোন বাড়ি ছাড়া অপর কোথাও আমি তাঁকে বসাতে পারি নে।

জহুর ভাইএর আযৌবন বন্ধু ছিলেন অধ্যাপক সালাহ উদ্দীন আহমদ। কিছুদিন আগে তিনি 'জহুর হোসেন চৌধুরী এবং সেই সময়'-এরূপ শিরোনামে সুন্দর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। তাছাড়া জহুর ভাই সম্পর্কে আর কেউ কিছু লিখেছেন কিনা, আমি জানি নে।

যাঁরা লেখেন নি তাদের আমি দোষ দিই নে। সন তারিখ এবং কর্ম বিবরণী দিয়ে জহুর ভাই এর জীবনী লেখা যায়। কিন্তু জহুর ভাইকে লেখা যায় না। জহুর ভাইকে জহুর ভাইও লিখতে পারতেন না। তাই তিনি কেবল বলতেন। 'দরবার-ই-জহুর' : এরূপ নাম দেওয়ার হক বাংলাদেশে কেবল জহুর ভাইএরই ছিল। তাঁর দরবারে জহুর ভাই তাঁর সময়কে, বলতেন ঘটনাকে বলতেন, অপর চরিত্রকে উদঘাটন করতেন, নিজেকে নিয়ে পরিহাস করতেন। আর তাঁর সে বলাকে কেবল অতুলনীয় বললে কিছু বলা হয় না। অনন্য বললেও নয়। জহুর ভাইএর বলা কথা শুনতে হয়। আর কি আফসোস, সে কথা 'ইররিপ্রোডিউসিবল্'। কথাটা ইংরেজি অক্ষরে লিখলে ভাল হত। এর কি বাংলা করা যায়? 'অপুনরুদ্ধারণীয়? যাকে পুনরুদ্ধার করা যায় না? এ শব্দ বাংলা অভিধানে নিশ্চয়ই নেই। ইংরেজিতেও 'ইররিপ্রোডিউসিবল্' আছে কিনা দেখার জন্য ৪ তারিখ শুক্রবার যখন কাঁধের ব্যাগে জহুর ভাইকে নিয়ে বাসা থেকে রাস্তায় বেরুলাম তখন ফুটপাতে নজর পড়ল, 'লংম্যানস ডিকশনারী অব কনটেমপোরারী ইংলিশ।' দোকানীকে জিজ্ঞেস করলাম, ভাই কত নিবেন? আমি আশঙ্কা করেছিলাম, নিশ্চয়ই ৫/৬ শ' চাইবে। দেখতে সত্যি সুন্দর প্রকাশনা। নতুন। বিরাটাকারের। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩০০-র অধিক। ইন্ডিয়া থেকে লংম্যানের সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে মুদ্রিত। দোকানীকে বললাম, ভাই কত? দোকানী বলল, স্যার নিবেন? আমি বললাম, দেখি না, টাকায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুলালে নেবার ইচ্ছা তো আছে। দোকানী বলল : স্যার, ১৫০/- টাকা লাগবে। আমি দরাদরি করে আরো পাঁচ টাকা কমিয়ে ১৪৫/- টাকায় লংম্যানের ডিকশনারী কিনলাম। দেখি 'ইররিপ্রোডিউসিবল্' আছে কিনা। আসলে বেরিয়েছিলাম, রাস্তা থেকে সেকেণ্ডহ্যান্ড একটা সোয়েটার কিনতে। শীত বেশ পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু কি ভাগ্যবান। সেকেন্ডহ্যান্ড সোয়েটারের বদলে নতুন 'লংম্যানস ডিকশনারী অব কনটেমপোরারী ইংলিশ!'

মনটা বেশ ভাল লাগল। ইউনিভারসিটির ঘরে এসে খোঁজ করলাম। না, সে শব্দ নেই। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। জহুর ভাইএর কণ্ঠ যে 'ইররিপ্রোডিউসিব্ল্', অপুনরুদ্ধারণীয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যাঁরা সেই কণ্ঠের শ্লীল, অশ্লীল, নোয়াখালী-চিটাগাং-এর শব্দাবলী এবং তার উচ্চারণ শোনেন নাই, তাঁরা তাকে আর কোনদিন শুনতে পাবেন না। জহুর ভাই-এর সে কণ্ঠকে আর শোনানো যাবে না। সেটাই আমাদের জাতীয় আফসোস। এবং আমার সে সামান্য একটু ভাগ্য ঘটেছিল সেই কণ্ঠ শ্রবণের, তাতেই আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে গণ্য করছি।...

৫-১২-৯২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৯২ : সামনে এবং পেছনে

'৯১ সালের ৩১ ডিসেম্বর, তারিখে রাত বারটায় খুব কি কামান দেগেছিল কেউ? টেলিভিশনে কি 'স্বাগত: '৯২' বলে কোন অনুষ্ঠান ছিল? আমি ঠিক জানি নে। আমি সাংসারিক দিন রাত্রির হাঙ্গামাতে টেলিভিশন খুব কমই দেখতে পারি। আমি আশঙ্কায় আছি, আমার অবুঝ ছেলেটি নতুন বছরের ১লা জানুয়ারির অছিলায় কি দামী আবদার করে বসবে, তার ঠিক নেই। অন্য কিছু বাদ দিলেও নতুন বছরের চমৎকার দামী ক্যালেন্ডারের কথা সে বলবেই। বায়তুল মোকাররমে তাকে নিয়ে যেতে হবে। সে ছবিওয়ালা এ ক্যালেন্ডার ও ক্যালেন্ডার দেখবে। ক্যালেন্ডারের বিক্রেতা ছেলেটিকে দাম জিজ্ঞেস করতে আমার ভয় হবে। সে কোনটার দামই দেড়শ-দুশোর কম হাঁকবে না। কিছুদিন পরে হলে হয়ত একটু দরদাম করা যেত। কিন্তু ১লা জানুয়ারি কিংবা পুরো জানুয়ারি একেবারে 'ফিক্সড প্রাইস'। তার মানে তার জন্য আমাকে দুশো টাকা খরচ করতে হবে।...

দৈনিক 'খবরের' একটি বিজ্ঞাপনে আমার কিছুটা ভরসা হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, '৯২-এর ১লা জানুয়ারি সংখ্যার সঙ্গে 'খবর' ম্যাকগাইভারের ছবিসহ বহুবর্ণের একটি ক্যালেন্ডারও দিবেন। মনে মনে ভাবছি, দেখি এটা দেখিয়ে তাকে কতখানি বাগে আনতে পারি। সাংসারিক দায়-দায়িত্বে অবুঝ হলেও ছেলেটির পছন্দ আছে। সে পছন্দের তারিফ না করে পারি কি করে? সুন্দর জিনিসপত্রে দেশ ছেয়ে গেছে এবং যাচ্ছে। যেমন সুন্দর, তেমনি মূল্যবান। সুন্দর জিনিস মূল্যবান হবে না? আর ছেলেটি সুন্দরকে পছন্দ করতে পারলে, সেটিকেও তো তার একটি গুণ বলতে হবে। আমার টাকা নাই বলে সব সুন্দর কি অসুন্দর হয়ে যাবে?

এ থেকে নতুন '৯২-এর ১লা জানুয়ারি নিয়ে আমার উদ্বেগ ও চিন্তার ব্যাপারটা পাঠকরা কিছুটা আঁচ করতে পারবেন।

কিন্তু ব্যক্তিগত উদ্বেগ বাদ দিই। ইংরেজি ১লা জানুয়ারির কথা আনুষ্ঠানিকভাবে স্মরণ করায় কি খুব তেমন কিছু আদিখ্যেতা আছে?

কেউ বলতে পারেন, ১লা জানুয়ারি তো ইংরেজি সালের তারিখ। সে তো বিদেশী। সে তো আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের তারিখ নয়। আমাদের ইতিহাস-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐতিহ্যের তারিখ হচ্ছে বাংলা সনের তারিখ। কিন্তু আজ বাংলা সনের কত তারিখ? ১৭ই পৌষ, ১৩৯৮। এ তারিখও আমি কাগজ দেখে বার করেছি। আমার মুখস্থ নেই। আমার হাতের জাপানি ঘড়ির টিপ দেওয়া কম্পিউটারেও নেই। রাস্তাঘাটের মানুষ, যেমন আমার রিকশাওয়ালা, জিজ্ঞেস করে : স্যার আজ কত তারিখ? সে বাংলা তারিখ নয়। সে ইংরেজি তারিখ। এ তারিখ মুখস্থ। রোজ মুখস্থ করতে হয়। মাস মাহিনার আগমন গুনতে গেলে ক্যালেন্ডারে বিগত তারিখটির উপর কাটা চিহ্ন দিয়ে তাকে সামনে থেকে পেছনে সরিয়ে দিই। ইংরেজি তারিখ মুখস্থ থাকে : আমাদের মধ্যবিত্তদের। শ্রমজীবী মানুষের হয়ত অত থাকে না। আমাকে জিজ্ঞেস করলে বিনাবিলম্বে উত্তর দিতে পারি : আজ ৩১ ডিসেম্বর : কাল ১লা জানুয়ারি। বাংলা তারিখ স্মরণ রাখতে পারি নে। তারপরে আছে হিজরী সাল। বাংলা নতুন বছর আসবে পৌষ-মাঘ, ফাল্গুন-চৈত্র পেরিয়ে বৈশাখে। সরকার অবশ্য আদেশ জারী করেছেন সব তারিখে প্রথমে বাংলা সন তারিখ, তারপরে ইংরেজি তারিখ দিতে হবে। উদ্দেশ্যটি উত্তম। তবু তো একটা অংশে, আমাদের কষ্ট হলেও বাংলা তারিখের কিছু ব্যবহার হবে।

কিন্তু একথা ঠিক বাংলা তারিখ দিয়ে আমরা, বিশেষ করে শহরের অফিস-আদালতের কেরানী-কর্মচারী, দোকানপাটের ব্যবসায়ী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষকরা, দৈনন্দিন জীবনের হিসাব-নিকেশ করি নে। হিসেব নিকেশ করি ইংরেজি তারিখ দিয়ে। ইংরেজি তারিখ আন্তর্জাতিক। তারিখ। পৃথিবীর সকল দেশে দৈনন্দিন জীবনের হিসেব ইংরেজি তারিখে কিংবা বলা চলে আদিতে যা ছিল রোমান ক্যালেন্ডার, সেই ক্যালেন্ডারেই চলে। সেদিক থেকে আমরা ইংরেজি তারিখ বর্জন করতে পারি নে। ইংরেজি নববর্ষের ১লা তারিখে হয়ত আজকাল আমরা স্কুল-কলেজ-অফিস-আদালতে ছুটিও পাই নে। তেমন কোন অনুষ্ঠানের হয়ত আয়োজন করি নে। তবু ইংরেজি তারিখ আমরা বর্জন করতে পারি নে।

ইংরেজি ১লা জানুয়ারিতে আমরা সালতামামির হিসাব করি। প্রতিটি দৈনিক কাগজ বিগত বছরের স্মরণীয় ঘটনাগুলির তালিকা তৈরি করে দেয়। সাথে নতুন বছরের ক্যালেন্ডারও সংযুক্ত করে। বিগত বছরের সুখ-দুঃখের ঘটনাগুলিকে আমরা স্মরণ করার চেষ্টা করি। অন্যদিকে আবার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করি। '৯১ শেষে '৯২ শুরু হবে। সেই '৯২ আমাদের জীবনে কি ঘটনা বহন করে আনবে? তা নিয়ে আমরা চিন্তা করি। অনেক কাগজে জাতির ভাগ্য গণনাকারী জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণীও মুদ্রিত হয়। কোন্ নেতা নিহত হতে পারেন, কোন্ নেতা অপসারিত হতে পারেন, কোন্ নেতা গদিতে আরোহণ করতে পারেন, আরো কি কি ঘটনা জাতীয়-আন্তর্জাতীয় ক্ষেত্রে ঘটতে পারে তার কথা জ্যোতিষীরা উল্লেখ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরকমভাবে ইংরেজি ১লা জানুয়ারি পালন করা আমাদেরও একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যাপারটার একটা প্রয়োজন আছে, একথা ঠিক।

আসলে সন তারিখ হচ্ছে মানুষের কল্পনার বিষয়। এ গাছ, পাথর, পাহাড়-পর্বত নয়। '৯১-এর শেষে '৯২ নিজে কোন ঘণ্টাধ্বনি দিয়ে আসে নি। আমরা আমাদের হিসাবের আবিস্কৃত তারিখ ডিসেম্বর শেষ করে জানুয়ারিতে পা দেবার সময়ে দিনটিকে চিহ্নিত করে নানা অনুষ্ঠান পালন করি।

এই সালতামামিতে আমি ব্যক্তিগতভাবে কি করব? ৩১ ডিসেম্বর শেষ করে ১লা জানুয়ারিতে পা দিয়ে আমার আশঙ্কা জাগে '৯২-এর ডিসেম্বরকে পাড়ি দিয়ে '৯৩-তে পা দিতে পারব কিনা। সেই ভবিষ্যত আমার কাছে অনিশ্চিত বোধ হয়।

মানুষ বাঁচে নিজের মৃত্যু দেখার জন্য। সাংঘাতিক কোন বড় কথা নয়। কিন্তু কথাটা সত্য। আমি বেঁচে আছি নিজের মৃত্যু দেখার জন্য : হত্যা, আত্মহত্যা, গাড়িচাপা, না 'তথাকথিত' স্বাভাবিক মৃত্যু? গণককে বিশ্বাস করতে পারলে তার নির্ধারিত তারিখটির দিকে নির্দিষ্টভাবে এগুতে পারতাম। কিন্তু তার উপর তত ভরসা করতে পারি নে বলেই, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চাইতে নিশ্চিত অতীতের দিকে চোখ ফেরাতে মন চায়।

AMARBOI.COM

পৃথিবী কিংবা ভারত উপমহাদেশের হিসাব তো আমি দিতে পারব না। তবু ১৯২৫ সাল থেকে ১৯৯১ : বছর হিসাবেও কম কি? জীবনের সূচনাতে কি চিন্তা করতে পেরেছিলাম সকল মৃত্যুকে পাড়ি দিয়ে ৬৬ বছর বেঁচে থাকব। বস্তুতঃ উচিতের অধিক বাঁচা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নোটিশ দিয়েছেন : আর কত? এবার কেটে পড়ুন।

সালতামামির কথাই বলি। সালতামামি না হোক, জীবনতামামি। এই জীবন তামামিতে খাতার বাদিকে আমার যা জমা পড়েছে, সে সম্পদও কি কম। টাকার জমা নয়। টাকার হিসাব নয়। আমার এ লেখা আমার সংসারের বিক্ষুব্ধরা কেউ পাঠ করলে নির্ঘাত বলে উঠবে : 'শুধু কথায় চিড়া ভেজে না।' এ সংলাপ তাই তাদের সঙ্গে নয়। এ সংলাপ নিজের সঙ্গে। এ সংলাপ আত্ম সংলাপ।

'২৫ থেকে '৯১। এ সময়েরও সব ঘটনা তালিকাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। এইচ, জি, ওয়েলস্-এর 'টাইম ম্যাশিন' নামে একটি গল্পের কথা মনে পড়ছে। 'টাইম মেশিনে' চেপে বসলে মুহূর্তে অতীতের যে কোন জীবনে চলে যাওয়া যায়। সেই 'টাইম মেশিনে' চেপে ১৯৩৫ সালের আমার কিশোর জীবনে যখন ফিরে যাই তখন দেখি রাজা পঞ্চম জর্জের সিলভার জুবিলীতে আমি সাইকেল রেস দিচ্ছি। ক্লাস ফাইভের ছাত্র। সিটে বসে চালাবার মত পা তখনো লম্বা হয় নি। সিটের নিচ দিয়ে এদিক ওদিক পা দিয়ে সেই সাইকেল রেস। আমার বড় ভাই তাঁর চাকুরির দায়িত্বে সেই রহমতপুরের ছোট্ট বন্দরটিতে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিলেন। আলোকসজ্জা হয়েছিল। ক্যামেরাম্যান কালো কাপড়ের ঘোমটা দিয়ে মান্য ব্যক্তিদের ফটো তুলেছিল।

১৯৩৯ সনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। ১৯৪০ সাল থেকে একদিকে যেমন রাজনৈতিক আন্দোলন তীব্র হচ্ছিল, তেমনি তীব্র হচ্ছিল বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ পাকিস্তানের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। ১৯৪২ সনে কংগ্রেসের নেতৃত্বে 'কুইট ইন্ডিয়া' আন্দোলন শুরু হয়েছিল। গান্ধীজীসহ কংগ্রেসের সকল প্রধান নেতাদের ব্রিটিশ সরকার গ্রেপ্তার করেছিল। আগস্ট আন্দোলনে হাজার হাজার কর্মী বন্দী হয়েছিল। আন্দোলনে রেললাইন টেলিগ্রাফ লাইন উপড়ে ফেলা হয়েছিল। নানা জায়গায় স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল। পূর্ব দিক থেকে জাপান এগিয়ে আসছিল। কোলকাতার উপরে জাপান বোমা নিক্ষেপ করেছিল। ঢাকা শহরের ব্রিটিশ-মার্কিন সেনাবাহিনী ছাউনী পড়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের দালানকোঠা সৈন্যবাহিনী দখল করে নিয়েছিল।

পাকিস্তান আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠছিল। গান্ধী-জিন্নাহর মিটিং হয়েছিল। তবু ৪৬ সালে কোলকাতায় অভূতপূর্ব সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড হয়েছিল। পরিশেষে ৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান-ভারত তৈরি হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটেছিল।

বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের কথা স্মৃতিতে জাগে। সে ১৯৪১ সন। ১৯৪১-এই হিটলারের জার্মানি সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করেছিল। গোড়াতে হিটলারকে অপরাজেয় মনে হয়েছিল। সোভিয়েটের মানুষ বিশ্বের ইতিহাসের অবিস্মরণীয় শৌর্য-বীর্য ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে পরাজিত করেছিল। আজ সে কথা গরবাচেভও বিস্মৃত হয়েছেন। কিন্তু আমি হতে পারি নে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে আদর্শ-স্বপ্ন-বিশ্বাসে আমার এক নবজন্ম ঘটেছিল।...

দেশ বিভাগের পরে '৪৮ সনে মহাত্মা গান্ধীর নিহত হওয়ার ঘটনা মনে ভেসে ওঠে। আকস্মিক সেই সংবাদে বিমূঢ় মনের ছবি। ১৯৪৬ সনে দর্শনে এম এ পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারী নিয়েছিলাম। সেই অপরাধে শুভাকাঙ্ক্ষী পুলিশ '৪৯ সালে গ্রেপ্তার করে নিরাপত্তা আইনে নিরাপদে রেখে দিয়েছিল। '৪৯-'৫০-এ জেলখানাতে শত শত সহবন্দীর সাথে ৩০ দিনের অধিক অনশন করেছিলাম। অপর সাথীরা ৫০ দিন অনশন করেছিলেন। এই অনশনেই শ্রমিক নেতা শিবেন রায়কে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল। '৫০ সনে রাজশাহী কারাগারে নির্বিচারে গুলি করে ৭জন রাজবন্দীকে হত্যা করা হয়েছিল। এইভাবেই '৫২ সালের সড়ক তৈরি হয়েছিল। তারপর '৫২ সালের বিস্ফোরণ ঘটেছিল। '৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করেছিল। পরবর্তীতে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের বন্ধুরা নিরীহ আমাকে পাকিস্তানের পার্লামেন্টে জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রায় বাঙ্গালের 'হাইকোর্ট দর্শন।' '৫৬ থেকে '৫৮ সাল পর্যন্ত পার্লামেন্টের সদস্যগিরী। তারপরে আইয়ুব খাঁর মার্শাল ল : সামরিক আইন। আবার জেল। আবার রাজবন্দী-গিরী।

'৬৯-এর গণ আন্দোলন চোখে দেখেছি। রাস্তার মিছিলে শরীক হয়েছি। '৭১-এ ৭ মার্চ রেসকোর্সের মাঠে হাজির হয়েছি। 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম : এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। এখনো সে আওয়াজ কানে বাজছে।

'৭১-এর শেষে পাক হানাদার বাহিনী আবার গ্রেপ্তার করে জেলে নিক্ষেপ করেছে। হত্যা করার সুযোগ পায় নি। কিশোর মুক্তিযোদ্ধারা ১৭ ডিসেম্বর জেল থেকে মুক্তি দিয়েছে। আবার সেই স্বাধীন বাংলাদেশে '৭৫ সালে অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হয়েছেন। '৭৫-এর নভেম্বরে চার জাতীয় নেতা : সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, কামরুজ্জামান : তাঁদের কারাগারের মধ্যে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৮০-তে জেনারেল জিয়ার হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। '৮১-তে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করেছে। ৯ বছরের রক্তাক্ত গণআন্দোলনের শেষে '৯০-তে জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা ত্যাগ ঘটেছে। পরবর্তীকালে তার গ্রেপ্তার ও বিচার হয়েছে। প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের সম্মতির ভিত্তিতে নিযুক্ত নিরপেক্ষ অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ-এর পরিচালনায় দেশব্যাপী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম একজন মহিলার প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ ঘটেছে। আমার চোখে এ এক সামাজিক বিপ্লবের ঘটনা। সেই মহিলা প্রধানমন্ত্রীর নাম : নিহত জেনারেল জিয়ার পত্নী বেগম খালেদা জিয়া।...

এ হচ্ছে আমার জীবনের তামামি। '৯১-এর সালতামামি নয়। একটি অখ্যাত, সাধারণ, ক্ষুদ্রাকারের ব্যক্তির জীবন-তামামি। বিচিত্র ঘটনার অনুপুঙ্খ বিস্মৃত হয়েছি। তবু স্মৃতির পলিতে এখনো যা আছে তার জন্য আমার মমতা এবং আবেগ কম নয়। এ জীবন-তামামিতে সে আবেগের কথা বলতে পারি নি।

'৯২ সাল আমার কাছে অনিশ্চিত বটে। কিন্তু অতীত আমার কাছে নিশ্চিত। সেই সম্পদ, অভিজ্ঞতার সম্পদ থেকে আমাকে কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না। এই বোধ নিয়েই আমরা প্রবীণেরা কিছুটা ভরসার সঙ্গে '৯২-তে পা রাখছি। স্বাগত '৯২!

৩১-১২-৯১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম

ক্যাসেটের বাজারে ৭ মার্চের সেই ক্যাসেটটি কিনতে পাওয়া যায় আমি একটি কিনেছি। '৭১-এর ৭ মার্চ দুপুর গড়িয়ে বিকেলে রেসকোর্সের ময়দানে শেখ মুজিব যে ভাষণ দিয়েছিলেন, ক্যাসেটটিতে সেই ভাষণের, মনে হয় পুরোটাই আছে। ছোট বড় যে কোন ক্যাসেট বাজানোর যন্ত্রে দিলেই সেই কণ্ঠ শোনা যায়। সেই কণ্ঠ তাঁর নিজস্ব ভংগীতে বলতে বলতে শেষে বলে ওঠে : 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

বৈজ্ঞানিকদের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় একদিন তৈরি হল গ্রামোফোন নামক একটি যন্ত্র, শক্ত রেকর্ডে শব্দকে আটকে রাখার কায়দা। সেই শক্ত রেকর্ডের গায়ে কাঁটা বসিয়ে ঘুরিয়ে দিলেই যে শব্দ একদিন হাওয়ায় মিলিয়ে যেত, সেই শব্দ হুবহু বেজে ওঠে : কণ্ঠের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ওঠা পড়া। কোনটিই আর নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপায় নেই। অন্ততঃ বেশ কিছুকাল, বছর থেকে বছর যুগ থেকে যুগ।

সেই কৌশল আজ আরো কতদূর এগিয়েছে! এখন শব্দের ফিতা তৈরি হয়েছে। সে ফিতাও ঘুরাতে থাকলে শব্দ ঠিক বেজে ওঠে। কেবল যে বেজে ওঠে তাই নয়। শব্দের উপরে নতুন শব্দ আজ চালাক মূর্খ যে কেউ ইচ্ছামত তুলে রাখতে পারে। আমি নিজে বৈজ্ঞানিক নই। মূর্খ মানুষ। ফিতা খুলেও আমি দেখেছি। ওতে ছাই, কিচ্ছু দেখা যায় না। তবু মেশিনে দিলেই আবার বেজে ওঠে। আমি আগে ভূত বিশ্বাস করতাম না। এখন করি। এ একেবারে ভূতুড়ে কারবার। আমার কাছে অপার রহস্যের ব্যাপার। একেবারে অলৌকিক। কিন্তু আমি কৃতজ্ঞ এই ক্যাসেট ভূতের কাছে। এই ক্যাসেট এসেছে বলেই না ৭ মার্চের সেই লাখ লোকের মাঝে দাঁড়িয়ে একটি রূপান্তরিত মানুষের তাঁর নিজেরও অজানিত তাৎপর্যে উচ্চারিত স্বপ্ন, কামনা আজো আমার কানে সাক্ষাৎভাবে বেজে ওঠে।

ক্যাসেটটি ছাড়লেই আমি যে কেবল তুলনাহীন সেই দরাজ কণ্ঠের আওয়াজ শুনি : 'ভাইএরা আমার, মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো'– তাই নয়। আমার চোখের সামনে সমগ্র দৃশ্যপটটি ভেসে ওঠে। রেসকোর্সের বিরাট মাঠ। লোক আসতে শুরু করেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশটা না বাজতে। শেখ সাহেব বক্তৃতা দিবেন বোধ হয় আড়াইটায়। আমি থাকি তখন মতিঝিল কলোনীতে। চাকরি করি বাংলা একাডেমীতে। সেদিন কি আমার অফিস খোলা ছিল? এ প্রশ্ন অবান্তর। একুশে ফেব্রুয়ারি আর পহেলা মার্চের পর থেকেই বাংলাদেশের মানুষের কোনটা কাজ এবং কোনটা কাজ নয়, কোনদিন অফিস আর কোনদিন অফিস নয়, সব একাকার হয়ে গিয়েছিল। তাই ৭ মার্চ আমাদের সকলেরই অফিস ছিল, করণীয় ছিল। করণীয় ছিল রেসকোর্সের ময়দানে হাজির হওয়া, করণীয় ছিল শেখ মুজিবের ভাষণ শোনা। আমার আগ্রহ ছিল কেবল ভাষণ শোনা নয়, জনতাকে দেখা। শেখ মুজিবকে সেই সুউচ্চ মঞ্চ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে দেখা যাবে না, সে আমি জানতাম। শেখ মুজিব আমার খুব যে অপরিচিত ছিলেন, এমনও নয়। একটি বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যবয়সী মানুষ। আমার প্রায় সমবয়সী। একেবারে সমবয়সী যে, তা নয়। আমার জ্যেষ্ঠ, কিন্তু সাংঘাতিকভাবে নয়। মাত্র নয়-ছয়ের ব্যবধান হয়তো। কিন্তু সে পুরুষ দীর্ঘ ছিলেন আমার চাইতে অনেক। মানুষের শরীরের সঙ্গে মানুষের মনের নিশ্চয়ই একটা যোগাযোগ আছে। দীর্ঘ পুরুষের মনে হয়ত সাহস বেশি হয়, ক্ষুদ্র পুরুষদের চাইতে, আমার মত ক্ষুদ্র পুরুষদের চাইতে তো বটেই। আর এই এক দুর্ভাগ্য যে, বাঙালিদের বেশিরভাগই আমার মত ক্ষুদ্র। আবার দীর্ঘদেহী যে একেবারে নেই, তাও নয়। কিন্তু দীর্ঘ দেহ হলেই কি বুকে অধিক সাহস জন্মায়? সাহস প্রতিকূল অবস্থার মুখে, সাহস জেলের নির্জন সেলের মধ্যে, সাহস ফাঁসীর মঞ্চের সিঁড়িতে? না, দীর্ঘ দেহ হলেই বৃহৎ সাহস তৈরি হয় না।

কিন্তু বাঙালি ক্ষুদ্র হলেও অনেক বাঙালি একত্র হলে, ক্ষুদ্র আর কৃশ আর কাহিল বাঙালি একত্র হলে, তাকে আমার বেশ দীর্ঘদেহী, শক্তিশালী ব্যক্তি বলে বোধ হয়। '৫২ সাল আমি দেখি নি। কিন্তু '৬৯ সাল থেকে এ রকম মানুষের সাক্ষাৎ এই ঢাকা শহরেই পল্টনের মাঠে, রেসকোর্সের ময়দানে, শহীদ মিনারের নিচে আর রাস্তায় একাধিকবার পেয়েছিলাম। আর দেখছিলাম অপ্রত্যাশিতভাবে এমন দীর্ঘদেহী মানুষের সংখ্যা যেন দিনকে দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, আর সকাল, বিকাল, দুপুর– প্রত্যেক রোজই যেন তাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটছে।

আমি জানতাম ৭ মার্চের রেসকোর্সের নানা শংকা-আশংকাকে উপেক্ষা করে যে মানুষটি হাজির হবেন তাঁর দৈর্ঘ্য এবং সাহস অতীতের সকল দীর্ঘদেহীকেই অতিক্রম করে যাবে। এই মানুষটির চেহারা কিরূপ হবে, সেটি জানার আকর্ষণই আমাকে দুপুর থেকে টানছিল। আমি একবার চেষ্টা করেছিলাম সেই মানুষটির কত কাছে যেতে পারি, তা দেখতে। দক্ষিণ মাথা দিয়ে শুরু করে আমি কেবল এগুচ্ছিলাম উত্তরের দিকে। সেই সুউচ্চ মঞ্চটির দিকে। কিন্তু একে তো মানুষের ঘন প্রাচীর আমাকে এগুতে, দিচ্ছিল না সামনে, তাতে যত সামনে এগুচ্ছিলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি, তত আমার মনে হচ্ছিল যেন বিরাটদেহী সেই মানুষটিকে আমি হারিয়ে ফেলছি। আসলে যাকে তুমি বড় করে দেখতে চাও, সমস্ত্র করে, তার একেবারে কাছে যেতে নেই। তাহলে ক্রমান্বয়ে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই তোমার নজরে পড়বে : হয় তার পায়ের পাতা, নয় তার দুটো হাত, কিংবা দুই চোখ কিংবা মুখের হাঁ। যাকে আমি সঠিকভাবে দেখতে চাই, তাকে দেখতে হবে একটু দূর থেকে, যেখান থেকে তার হাত, পা, মাথা মিলিয়ে তার যে পূর্ণ অবয়ব, সেটি আমার দৃষ্টিতে আসবে। আমি তাই হতাশ হয়ে খুঁজছিলাম কোন উচ্চস্থান, কোন দূরত্ব যেখান থেকে ৭ মার্চের রেসকোর্সে আগত সেই অদৃষ্টপূর্ব মানুষটিকে কিছুটা দেখতে পাই। তার জন্য কখনো রেসকোর্সের মন্দিরটির বরাবর হটে আসছিলাম। কখনো আরো হটে এসে আমার নিজের অফিস বাংলা একাডেমীর একেবারে ছাদে আরোহণ করছিলাম।

এমন চেষ্টাতে সেই মানুষটির যা একটু আভাস আমি পাচ্ছিলাম তাতে আমি নিজের অজান্তেই যেন রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছিলাম। আমি নিজেকে যত ক্ষুদ্রাবয়ব মনে করি, তেমন আর তখন যথার্থই ছিলাম না। আমার অবয়বকে আমি যথার্থই ছাড়িয়ে যাচ্ছিলাম। দেহ আমার দীর্ঘ হচ্ছিল। শরীরে আমার রোমাঞ্চ জাগছিল। সাহস বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আর তাই পাকিস্তানী জঙ্গী বিমানগুলো আমার মাথার উপর দিয়ে সগর্জনে যখন আসা-যাওয়া করছিল এবং সে বিমান থেকে যে কোন মুহূর্তে যে মৃত্যুর বান আমার বুকে এসে বিঁধতে পারে, সে কথা জেনেও আমার পা একটুও কাঁপছিল না। আমি ছুটে পালাতে চেষ্টা করি নি। এ স্মৃতি এক আশ্চর্য স্মৃতি। এই ক্যাসেটটা ছাড়তেই সেই স্মৃতি মনে ভেসে ওঠে, আর এখনো আমি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি।

এই আমার এক দুর্লভ ভাগ্য। আজ থেকে তের বছর আগের ভাগ্য। আমার যে ছেলেটির বয়স তখন মাত্র পাঁচ, সেও হয়ত আমার হাত ধরে '৭১-এর ৭ মার্চের সেই মানুষটির দর্শনে গিয়েছিল। কিন্তু তাকে বুঝার মত সচেতন মন তখনো তার তৈরি হয় নি। আজ তার বয়স হয়ত ১৮। ১৮ বছরের তরুণ। ওরই হাজার সঙ্গীসাথী আজ আবার রাস্তায় বেরুচ্ছে মিছিল করছে, পুলিশের ট্রাকের নিচে নিষ্পিষ্ট হচ্ছে, গুলির আঘাতে ঢলে পড়ছে। এই তরুণদের মিছিলও আবার স্মরণ করিয়ে দেয় আমাকে '৭১-এর সেই মার্চের দৃশ্যকে ৭ মার্চের রেসকোর্সের ময়দানকে।

আশপাশের অনেকে প্রশ্ন তোলেন : কিন্তু সেই তেজ কোথায় আজকের মোর্চার মধ্যে, শক্তির সেই দ্যোতনা কোথায়? প্রশ্নটির সঠিক জবাব আমার জানা নেই। তবে সেই শক্তি তথা বোধের যদি অভাব থেকেই থাকে তবে তার একটি কারণ আমার এই মনে হয় যে, আমার ১৭ কি ১৮ বছরের ছেলেটির ভাগ্য হয় নি '৭১-এর ৭ মার্চকে সচেতনভাবে প্রত্যক্ষ করার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু ইতিহাসের প্রত্যেক মুহূর্তকে কি পরবর্তীকালের সন্তানেরা প্রত্যক্ষ করতে পারে? এও এক প্রশ্ন। এখন এই মুহূর্তে যেটা প্রত্যক্ষ, পরমুহূর্তে তা পরোক্ষ, তা অতীত। এই মুহূর্তে যে আওয়াজ উচ্চারিত, যে মোর্চা সংগঠিত, পরমুহূর্তে তা বিগত, বিলুপ্ত। বস্তুজগতের প্রবহমানতার এই এক অমোঘ নিয়ম। আর এই নিয়মকে অতিক্রম করার জন্যই মানুষ তৈরি করতে চেয়েছে নানা কলা-কৌশল, ঘটনাকে, তার আবহকে, তার নায়ক-নায়িকাদের কর্মকাণ্ডকে ধরে রাখার, চিত্রে, লেখনীর অক্ষরে, শব্দে, বিবরণে, বর্ণনায়। যখন থেকে মানুষ চেষ্টা করেছে এসব কলা-কৌশল তৈরি করার, তখন থেকেই মানুষের ইতিহাস রচিত হয়েছে। তখন থেকে নির্দিষ্ট কালকেই মানুষ বলে ঐতিহাসিক কাল। তার পূর্বের কাল প্রাগৈতিহাসিক।

মোটকথা মানুষকে সচেতনভাবে চেষ্টা করতে হয় তার জীবন প্রবাহের যুগান্তকারী তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাকে, তার নায়ক-নায়িকাকে, তাদের বাণী আর কর্মকাণ্ডকে এবং সেই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত আবহকে নানা কৌশলে ধরে রাখার, পুনরুজ্জীবিত করার, যেন পরবর্তী যে কোন কালের মানুষ তার পূর্বকালের ঘটনা, মানুষ ও তাদের ক্রিয়াকর্মকে প্রত্যক্ষের মত বোধ করতে পারে। কারণ, অতীতের মধ্য দিয়েই বর্তমানের সৃষ্টি। আর তাই অতীতের তাৎপর্যের বোধ বর্তমানের মধ্যে না থাকলে বর্তমান নিজেকে শেকড়হীন, উদ্দেশ্যহীন যাযাবর ভাবতে বাধ্য।

কিন্তু আধুনিককালের মানুষের কিংবা মানুষের কোন কোন অংশের এই কৌশলও লক্ষণীয় যে, সে চেষ্টা করে যেন মানুষ তার অতীতকে বিস্মৃত হয়। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই বাংলাদেশের বুকেই বিদ্যমান।

বর্তমানের প্রশাসন প্রধান, সামরিক বেসামরিক বাহিনী এবং সরকারি, বেসরকারি সব দল স্বীকার করে যে, '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের সফল সমাপ্তিতে তৈরি হয়েছে বাংলাদেশ। একথা বাংলাদেশের যে কেউ স্বীকার করতে বাধ্য। এবং সকলেরই প্রতিযোগিতা, এই স্বাধীনতা যুদ্ধে তার অবদানই যে বিরাট, একথা প্রমাণ করতে। এবং একথাও স্বীকৃত যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধ কোন একটি দল বা গ্রুপের ছিল না। '৭১ সালের সংগ্রাম যথার্থই জাতীয় সংগ্রামের রূপ নিয়েছিল এবং সেই সংগ্রামের অনস্বীকার্য নেতা শেখ মুজিব দলীয় নেতার অধিক হয়ে জাতীয় নেতার চরিত্র ধারণ করেছিলেন। বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার মধ্য পরিমাণ বিত্তের কৃষকের সংসারের একটি তরুণ জন্ম থেকে বা রাতারাতি 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হয় নি। '৭১ সালে শেখ মুজিব যথার্থই বঙ্গবন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন বলেই 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিটি তাঁর স্বআরোপিত উপাধি নয়। এ আখ্যা ছিল একটি সংগ্রামী জীবনের প্রতি দেশবাসীর সস্নেহ উপাধি। আর সে কারণেই বাংলাদেশের জীবনে আজকের দিনের বড় প্রশ্ন, সেই অবিসংবাদী জাতীয় নেতার নাম-নিশানা আজ লোক চক্ষুর অন্তরালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন? সরকার প্রধান তথা রাষ্ট্রযন্ত্রের এত যে স্মরণ প্রচেষ্টা, দিবস পালন, বক্তৃতা ও বিবৃতিদান, তাতে বাংলাদেশের অতীত ও বর্তমানের যত নেতাদেরই নাম উচ্চারিত হোক না কেন, শেখ মুজিবের নাম অনুচ্চারিত।

আমার ইচ্ছা জাগে, আমার ছেলের বয়সী সতের কি আঠারো বছরের যারা তরুণ, যারা যুবক তাদের কাছে '৭১-এর ৭ মার্চের এই ভাষণটি বাজিয়ে জিজ্ঞেস করি, এই ভাষণ শুনে তাদের মনে কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে? কিন্তু আঠারোর সঙ্গে আটান্নর ব্যবধান বিস্তর। তাই আমার নিজের ঘরের ছেলেকেও আমি আমার মনের এই কথাটিকে জিজ্ঞেস করতে ভয় পাই। আমার ভয়ের এক কারণ, আমার সন্তান হয়ত বলবে, 'হাঁ, বক্তৃতাটি শুনে মনে হচ্ছে খুব যোশের বক্তৃতা।' কিন্তু কেবলই কি যোশের ব্যাপার ছিল সেদিন এই ভাষণে; যোশের কথা তো যে কোন সময়ে যে কেউ বলতে পারে। কিন্তু সেদিন শেখ মুজিব যা বলেছিলেন, তা তাঁর পক্ষে সেদিনই মাত্র বলা সম্ভব ছিল, আর সে ভাষণের তাৎপর্য আজ কেবলমাত্র তার শব্দের পুনর্বাজনার মাধ্যমে ধরা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন লাখ মানুষের জমায়েত ভরা সেদিনের সেই রেসকোর্স, তার মধ্যে স্থাপিত সেই মঞ্চ, শেখ মুজিব এলেন একটু বিলম্বে, তিনি উঠলেন মঞ্চে, চারদিকে তিনি দৃষ্টি ফেললেন, দেখলেন লোকে লোকারণ্য, শুনলেন আকাশে জঙ্গী বিমানের গর্জন এবং সেই গর্জনকেও অতিক্রম করে গর্জন করে উঠছে উদ্বেল লাখ মানুষের সংগ্রামী আওয়াজ। দেখছেন লোক তখনো আসছে আর আসছে। আর এমনি দৃশ্য দেখতে দেখতে শেখ মুজিব বদলে যেতে লাগলেন নিজের অজান্তে। এমনি হয়। জনতার মধ্যে জন এমনিভাবে বদলায়। জনতার বাইরে জন তথা ব্যক্তির এক রূপ : ক্ষুদ্র, শংকিত, সীমিত। জনতার অংশ হিসেবে জনতার মধ্যে তার অপর এক রূপ : তেজে কম্পমান, শক্তিতে দুর্বার আর সম্ভাবনায় অসীম।
আজকের সতের কি আঠারো বছরের পুত্রদের জন্য মমতায় আমার মন ভরে ওঠে। আহা! এই দৃশ্য তারা দেখে নি। সচেতনভাবে দেখার বয়স তখনো তাদের হয়নি।

এই দৃশ্য দেখলে ৭ মার্চের ভাষণের তাৎপর্য বুঝতে তাদের অসুবিধা হত না। কিন্তু সেই ৭ মার্চ তারিখে সচেতন বয়সের যুবক ছিল না বলেই, কিংবা ৭ মার্চের পরে জন্মগ্রহণ করেছে তারা– কেবল এই কারণেই কি তারা বঞ্চিত হবে, আজকের তরুণরা, এই দৃশ্য থেকে, আধুনিক বিজ্ঞানের অলৌকিক ক্ষমতার কৌশলের যুগে? অন্য দেশে এমন হয় না। অন্য দেশে প্রত্যেক যুগের সন্তানই তাদের অতীত সব মহৎ যুগকেই প্রত্যক্ষ করে এবং করে বলেই যে কোন যুগের মহৎকে সে নিজের বর্তমান বলে বুকে আঁকড়ে ধরে আর জীবন দান করে তাকে রক্ষা করার সংগ্রামে। আর তাই কোন মহৎই তার কাছে অতীত নয়। সব মহৎই তার কাছে বর্তমান। কেবল আমাদের বাংলাদেশেই অতীত মানে বিস্মৃত, বিলুপ্ত কাল এবং বর্তমান মানে অতীতকে অস্বীকারকারী এক যাযাবর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭ মার্চের ক্যাসেট ফিতাটি বাজাতে বাজাতে আমার দুটি প্রশ্ন মনে জাগে। একটি হচ্ছে : জনতা তথা জনতার সংগ্রামে ব্যক্তির বা নেতার ভূমিকা। আমাদের তাত্ত্বিকরা নানাভাবে প্রশ্নটি তোলেন। তারা আলোচনা করেন। তাঁরা বলেন, কাউকে 'বঙ্গবন্ধু' বা 'জাতির পিতা' ইত্যাদি বলা অহেতুক। এটা অতিশেয়োক্তি। এ হচ্ছে ব্যক্তিপূজা তথা 'পারসোনালিটি কাল্টের' সৃষ্টি ও চর্চা। প্রশ্নটির অবশ্যই এদিক, ওদিক– উভয়ই আছে। ব্যক্তি যখন নিজেকে জনতার প্রভু বলে গণ্য করে, যখন সে মনে করে সেইই জনতাকে সৃষ্টি করেছে, জনতা তাকে নয়, তখন অবশ্যই ব্যক্তির অহমবোধের মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি ঘটে। এমন অবস্থাতেই প্রকাশ পায় ব্যক্তিকাল্ট : ব্যক্তিরতি। কিন্তু এ যেমন বিকারের দিক, তেমনি জনসংগঠনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ। একথা ঠিক যে, সংগঠনের সাংগঠনিক কমিটি থাকে। সে কমিটিতে যৌথ আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। এটি হচ্ছে গণতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতি। তাই সংগঠনের কৃতিত্ব– ব্যর্থতা কোন ব্যক্তির একার নয়, যৌথের, কমিটির। কমিটিই হচ্ছে সংগঠনের নেতা। কিন্তু কমিটিতেও ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে তফাৎ থাকে। কেউ অপর কারুর চাইতে অধিক প্রাজ্ঞ, অধিক অভিজ্ঞ, অধিক সাহসী। কমিটির কার্যক্রমে এমন প্রাজ্ঞ, অভিজ্ঞ আর সাহসীর প্রভাব থাকবেই। থাকাটাই স্বাভাবিক। এ কারণেই কমিটি যখন বসে, যখন মিলিত হয়, তখন প্রাজ্ঞের কথায় আমরা অপর সকলে চমৎকৃত হই। তাকে বাহবা দিই। সাহসীর সিদ্ধান্তে আমরা আনন্দিত হই। আমরা তাকে আমাদের সম্মুখ সারিতে স্থাপিত করি। তাই প্রাজ্ঞ, অভিজ্ঞ, সাহসী ব্যক্তি নেতা হয়ে ওঠেন আমাদের তথা অনুসারীদের দ্বারাই। কোন ব্যক্তি শূন্য থেকে এসে বলতে পারে না, আমি তোমাদের নেতা এবং তার বলা মাত্র অপর সকলে যথার্থভাবে অন্তর দিয়ে বলতে পারে না, হ্যাঁ আপনি আমাদের নেতা। এমন জবর নেতৃত্ব দখল কেবল অস্ত্রধারীর পক্ষেই সম্ভব, নিরস্ত্র সংগ্রামীর পক্ষে নয়। অবশ্যই জীবনের কোন সত্যই দ্বন্দ্বহীন নয়। অনুসারীদের দ্বারা সৃষ্ট হয় নেতা। এবং অনুসারীদের চেতনার অভাবেই তৈরি হতে পারে ব্যক্তি নেতার ব্যক্তি-রতির ভাব। তাই প্রয়োজন সদা সতর্কতার, সদা সচেতনতার, যেন সমষ্টি বিস্মৃত না হয় নিজের মূল সৃষ্টিশীল ক্ষমতাকে এবং যেন ব্যক্তিনেতা বিস্মৃত না হয় তার শক্তির মূল তথা জনতাকে। কিন্তু এত আদর্শ অবস্থা। এটার জন্য যেমন উভয় তরফে সার্বক্ষণিক সংগ্রাম আবশ্যক, তেমনি এর কোন ভ্রান্তিতে হতাশ হয়ে জনতার শক্তি এবং ব্যক্তির ভূমিকা, উভয়কে নাকচ করে দেবার মনোভাবও থাকা উচিত নয়। এতে ক্ষতি উভয়েরই।

শেখ মুজিব 'বঙ্গবন্ধু' হয়েছিলেন নিজের ঘোষণায় নয়, সংগ্রামী জনতার সস্নেহ এবং সকৃতজ্ঞ ইচ্ছার প্রকাশে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একথা অবশ্যই ঠিক যে, শেখ মুজিবের 'বঙ্গবন্ধু' আখ্যাটিকে তাঁর সমকালীন সাথী, অ-সাথীদের সকলে যে আনন্দের দৃষ্টিতে দেখেছে, এমন নয়। স্বাভাবিকভাবে এই আখ্যাটিতে অনেকের মনে ঈর্ষার উদ্রেক হয়েছে। তাদের মনের ভাবটি এমন : এই অজ্ঞ লোকটিকে 'বঙ্গবন্ধু' বলার কি প্রয়োজন। এমন মনোভাবের অবচেতন অনুযোগটি হচ্ছে : আমাকে 'বঙ্গবন্ধু' না বলে শেখকে বলা কেন?

তাই শেখ মুজিবকে আমরা ঈর্ষা করেছি। ঈর্ষা করেছি আমাদেরকে অতিক্রম করে বড় হওয়াতে। নানাদিকে বড় : তেজে, সাহসে, স্নেহে, ভালবাসায় এবং দুর্বলতায়। সর্বদিকে। এবং সেই ঈর্ষা থেকে আমরা তাঁকে হত্যা করেছি। কেবল এই কথাটিই বুঝি নি যে, ঈর্ষায় পীড়িত হয়ে ঈর্ষিতকে হত্যা করে ঈর্ষিতের স্থান দখল করা যায় না।

আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটি এরূপ : শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণটি কি কেউ লিখে দিয়েছিলেন, তাঁর সাথী, অনুসারী, কবি, সাহিত্যিক কেউ? না, কেউ লিখে দেয় নি। একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। শেখ মুজিবের এই আর এক বৈশিষ্ট্য, গুণ বলি, আর দোষ বলি। লিখিত বক্তৃতা তিনি কোনদিন পাঠ করেন নি। লিখিত বক্তৃতা পাঠে তাঁর আড়ষ্টতা আসত।

শেখ মুজিব তাঁর সমগ্র জীবনই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বক্তৃতা করেছেন। কখন অপর কারুর লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন নি। তাঁর সকল ভাষণে তাই স্বতঃস্ফূর্ততার প্রকাশ : কথার অগোছালো ভাব, হয়ত পুনরাবৃত্তি, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত তেজস্বিতায় ভাস্কর। এমন তেজ লিখিত ভাষণে কখনো আসতে পারে না। শেখ মুজিবের ভাষণ যেমন লিখিত হত না, তেমনি তাঁর প্রদত্ত ভাষণকেও লেখা যেত না। তাঁর ভাষণ তাঁর মুখ থেকেই মাত্র শোনা যেত আর সেই সাক্ষাৎ শোনাতেই তার যা কিছু তাৎপর্য প্রকাশিত হত। তাই ৭ মার্চের ভাষণ লিখিত আকারে যখন আমরা পাঠ করতে যাই, তখন তাতে তাৎপর্যময় কথা আমরা পাই, কিন্তু শেখ মুজিবকে পাই নে।

যন্ত্রকৌশল যাই হোক, নিহত শেখ মুজিবকে আর সাক্ষাৎভাবে পাওয়া যাবে না। নিহত না হলেও শেখ মুজিব মৃত্যুহীন হতেন না। তা সত্ত্বেও ৭ মার্চের ভাষণে শেষ যে বাক্যটি তিনি উচ্চারণ করেছিলেন : 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'– এ বাক্যটি যেমনি স্বতঃস্ফূর্ত ছিল, তেমনি তাঁর কণ্ঠে তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছিল। এ বাক্যটি বাংলাদেশের আপামর মানুষের একটি মহৎ ইচ্ছা ও স্বপ্নের দ্যোতক হয়ে সেদিন প্রকাশিত হয়েছিল শেখ মুজিবের কণ্ঠে। সেদিনকার উত্তাল সংগ্রামই বাক্যটিকে অনিবার্যভাবে স্থাপিত করেছিল শেখ মুজিবের কণ্ঠে : বাক্যটি যে 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'– এ সীমাবদ্ধ থাকে নি, তার সঙ্গে যে যুক্ত হয়েছিল 'মুক্তি' শব্দটিও, সেটিই আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজো বিস্মিত করে। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।' শেখ মুজিব কতখানি ভাষাতাত্ত্বিক ছিলেন, তা আমি জানি নে। কিন্তু সংগ্রামী মুজিব অচেতনভাবে হলেও অনুভব করেছিলেন, 'স্বাধীনতা'র চাইতে ব্যাপকতর তাৎপর্যের শব্দ হচ্ছে 'মুক্তি'। স্বাধীনতার সীমা অতিক্রম করে যায় মুক্তি। স্বাধীনতার যদি ভৌগোলিক সীমা-চৌহদ্দী থাকে, মুক্তি অতিক্রম করে যায় সকল সীমাকে : মুক্তি বঞ্চনা থেকে, মুক্তি বৈষম্য থেকে, মুক্তি শোষণ থেকে, মুক্তি সংকীর্ণতা থেকে, কূপমণ্ডুকতা থেকে, মুক্তি সকল দীনতা থেকে। মানুষের জীবনে এর চাইতে মহৎ স্বপ্ন আর কি হতে পারে। সেই মহৎ স্বপ্নই উচ্চারিত হয়েছিল সেদিনকার সংগ্রামী মানুষের নিশান বরদার শেখ মুজিবের কণ্ঠে। স্বাধীনতার সংগ্রামের শুরু এবং শেষ আছে। কিন্তু মুক্তি সংগ্রামের শুরু অবশ্যই আছে : বঞ্চিত এবং শোষিত মানুষের ক্রমবর্ধমান চেতনার মধ্য দিয়ে তার শুরু। কিন্তু মুক্তি সংগ্রামের কোন শেষ নেই। ক্রমমুক্তির মধ্য দিয়েই অধিকতর মুক্তির পানে মুক্তি সংগ্রামের অনিবার অগ্রগমন।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণের শেষ বাক্য : 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'– তের বছর অতিক্রম করে আজো তাই নিঃশেষিত নয় তার তাৎপর্যের দিক থেকে। স্বাধীনতার পরে আসে মুক্তির তাগিদ। বাংলাদেশের তরুণ শক্তির নতুন সংগ্রামের আওয়াজও তাই আজ : 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।'

AMARBOI.COM

৭-৩-৮৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অজিতদা'র 'বুলু'

আমি ভাবছি, অজিতদা'র 'বুলু' গল্পটি আমি আর পড়বো না। মাত্র তিন পৃষ্ঠার গল্প। কিন্তু যতোবারই পড়ি, ততবারই আমার চোখের পাতা ভিজে ওঠে। নিঃশব্দে পড়লেও গলা ধরে আসে। শরীর কেঁপে ওঠে। এর একটা কারণ হয়ত এই যে, আমার এখন বয়স হয়েছে। পঁয়ষট্টি পেরিয়ে গেছে।

অজিতদা আমার চাইতে বয়সে অনেক বড় ছিলেন। জন্মেছিলেন ১৯১৪-তে। মারা যান আকস্মিকভাবে ১৯৬৯-এর নভেম্বর মাসে। তাঁর 'বুলু' গল্পটি আমি আগেও পড়েছি। এবার পড়লাম অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সম্পাদনায় সম্প্রতি প্রকাশিত 'অজিত গুহ স্মারক গ্রন্থ'খানিতে। এই গ্রন্থে অজিতদা'র অন্যান্য কয়েকটি নাতিদীর্ঘ রচনার সঙ্গে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে 'বুলু'ও। এখানেও গল্পের শেষে রচনার তারিখটি উল্লেখ করা হয় নি। কিন্তু গল্পের ঘটনার বিবরণে বুঝতে পারা যায়, এ গল্পটি '৬৯-এর গণআন্দোলনের মধ্যেই রচিত। এবং হয়ত অজিতদা'র এটিই শেষ রচনা। ৬৯-এর গণআন্দোলনের জন্য উৎসর্গিত। কি অতুলনীয় এবং অনুপ্রেরণাদায়ক এ উৎসর্গ।

অজিতদা আজ '৯১-তে বেঁচে থাকলে হয়ত ৭৬ কিংবা ৭৭ বছর তাঁর বয়স হত। এখনো তাঁর স্মৃতি থাকতো। তাঁর চেতনা থাকতো। তাই যদি হতো, তিনি যদি আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে আমি তাঁর কাছে তাঁর বুলুর কথা আরো বিস্তারিত জানতে চাইতাম। বুলুল কথা। তার বাবা দিনাজপুর জেলের ডাক্তার শাহেদ সাহেবের কথা।

'বুলু' কি একটি গল্পের নাম? গল্প আমরা কাকে বলি? ঘটনার চাইতে কল্পনার মিশেল থাকে যেখানে বেশি, তাই গল্প। কিন্তু বাঙালির জীবনের ইতিহাসের এই এক বিস্ময়কর সত্য যে, এ জীবনে কল্পনার চাইতে অধিক বিস্ময়কর সব ঘটনা ঘটেছে। কবি বা গল্পকারের কল্পনার অধিক।

বুলুও অজিতদা'র কোন কল্পনার সৃষ্টি নয়। আর বাঙালির জীবনের সুখ-দুঃখের আমরণ সাথী অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ কোন গল্পকার ছিলেন না। তিনি ছিলেন দেশের আপামর জনতার সংগ্রামী জীবনের অবিস্মরণীয় এক পরিব্রাজক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথিক। কিন্তু নিস্পৃহ দর্শক নয়। মানুষের নিত্যদিনের সকল ক্রান্তি মুহূর্তের সচেতন সংগ্রামী, দূর দৃষ্টিক্ষেপণকারী এক মহৎ ব্যক্তিত্ব। এমন মানুষ সহজে হয় না। সহজে আসে না। এবং সেজন্যই যাদের জন্য এমন মানুষ আসে, তাঁর ঋণের কৃতজ্ঞতায় তারা নিজেদের ধন্য মনে না করে পারে না।

বুলুর কথা অজিতদা না বললে আমরা জানতে পেতাম না। এবং সে কারণেই মনে হচ্ছে আমরা কত বুলুকে জানি নে। কত বুলুর বাবা কত শাহেদ সাহেবকে।

অজিতদা'র তিন পৃষ্ঠার কাহিনী 'বুলুকে আমাদের যে কোন আলোচনার মাঝে পুরো উদ্ধার করে দেওয়া চলে। দেওয়া উচিত। একুশের উপর যত মহৎ রচনা রচিত হয়েছে, যত মহৎ গল্প কিংবা নাটক তৈরি হয়েছে, 'বুলু' হচ্ছে তার অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের চিরায়ত সৃষ্টি 'ছুটি' কিংবা 'ডাকঘর', 'পোস্টমাস্টার'-এর সঙ্গে আমরা যেমন আকৈশোর পরিচিত হয়ে আসছি আমাদের কৈশোর কিংবা তারুণ্যের স্কুল বা উচ্চতর শিক্ষায়তনের সাহিত্য পাঠের মধ্য দিয়ে, তেমনি 'বুলু'র সঙ্গে পরিচয় ঘটা উচিত একুশোত্তর সকল কিশোর পাঠক-পাঠিকার তাদের সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে। কিন্তু আমাদের মাধ্যমিক, কি উচ্চ মাধ্যমিক কোন সাহিত্য সংকলনে 'বুলু' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে আমি আজো শুনি নি। বন্ধুজনদের কাছে জিজ্ঞেস করেও তার জবাব পাই নি। আমার দেখতে হবে মাধ্যমিক কিংবা উচ্চ মাধ্যমিকের সাহিত্য সংকলনগুলোর পাতা উল্টিয়ে। 'বুলু' কি ওখানে আছে? আমার ভরসা হয় না, 'বুলুকে ওখানে পাওয়া যাবে।

আসলে একুশ পালনের যত আড়ম্বরেরই আমরা আয়োজন করি নে কেন, একুশের 'বুলুকে আমরা বিস্মৃত হয়েই থাকি।

বুলুর কথা বলতে গিয়ে অজিতদা বলছেন :

> "সেদিনের কথা আমার এখনো খুব মনে পড়ে। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনা। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তিনদিন থাকার পরই আমাদের কয়েকজনকে বদলী করা হলো দিনাজপুরের কারাগারে।"...

এ কোন কল্পনার কথা নয়। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনার পরে ভাষা আন্দোলনের প্রাণপুরুষ হিসাবে যে-সব বুদ্ধিজীবী ও অধ্যাপকদের সেদিনকার পূর্ব পাকিস্তানের ফ্যাসীবাদী সরকার গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন : অধ্যাপক অজিত গুহ, অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী এবং অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী।

দিনাজপুর জেলে গিয়ে অজিতদা দেখা পান তাঁর 'বুলু'র।... "বিকেল বেলা জেলের ডাক্তার সাহেব এলেন। ভদ্রলোককে দেখেই আমার ভাল লাগল। লম্বা, গৌরবর্ণ, প্রশস্ত ললাট, সমস্ত চেহারায় একটা প্রশান্ত নম্রতা। আলাপ করে খুব খুশী হলাম। আমাকে বললেন, আমাকে স্যার, ছাত্রই মনে করবেন। যখন যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরকার নিঃসঙ্কোচে বলবেন। আমি আপনাদের পরিচর্যার জন্যই আছি'। পরদিন সকালে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ডাক্তার বিদায় হলেন।...

বুলু এই ডাক্তার সাহেবেরই পাঁচ বছরের ছেলে। অজিতদা'র আদর পেয়ে বুলু বায়না ধরে বাবার সঙ্গে রোজ জেলের ভেতরে আসার, রাজবন্দীদের থাকার বাংলোটিতে। রোজ বুলু আসে। চিরকুমার অজিতদা বুলুকে পেয়ে নিঃসঙ্গতার সকল দুঃখ ভুলে যান। বুলু তাঁর কোলে ওঠে। বিস্কুট খায়। নিজের ছড়ার বই অজিতদা'কে পড়ে শুনায়। আর জিজ্ঞেস করে অজিতদা'কে : 'তুমি পড়তে পারো?'...

তারপর অজিতদা বলেন দিনাজপুর জেল থেকে বদলী হয়ে ঢাকার জেলে ফিরে আসার দিনটির কথা।

"বদলীর জন্য দরখাস্ত করেছিলাম। হঠাৎ একদিন খবর পেলাম, আমার আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। আবার আমি ঢাকা জেলে ফিরে যেতে পারব।...

আসবার দিন সকাল বেলায়ই ডাক্তারের সাথে বুলুও এলো। আদর করে ওকে কোলে নিলেম। তারপর ধীরে ধীরে ওকে বললেম : বুলু, আজ আমি ঢাকা যাবো। তুমি আমার কাছে কি চাও?"

"ও প্রথমে বললো, 'আমি ঢাকা যাবো'। তারপর কি ভেবে হঠাৎ আমার কানের কাছে এসে ফিস ফিস করে বললো : 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।... কেল্লা চাই।"

"আমি তো অবাক। একি কথা এতটুকু শিশুর মুখে। ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললেম, ডাক্তার সাহেব এবার আপনার সরকারি চাকুরি রাখা কঠিন হবে। ছেলের মুখে এসব কি শুনছি।

"ডাক্তার অসহায়ের মত বললেন, কি করবো স্যার, জেলখানার সামনেই বাসা। রাতদিন মিছিলের মুখে ঐ কথাই শুনে মুখস্থ করে রেখেছে। এ আমি ঠেকাবো কি করে?...

তারপর অজিতদা জানলেন সেই মর্মান্তিক ঘটনার কথা। বুলুর বয়স তখন নিশ্চয়ই ২২। '৬৯-এ আসাদেরও বয়স হয়েছিল ২২। ঊনসত্তরের উত্তাল গণজোয়ার। অজিতদা নিজেও তার সচেতন শরীক। সচেতন সংগ্রামী। তাঁর বিশিষ্ট কথনে, আচারণে, প্রকাশে, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সাগ্রহ শরীকানায়। সেই সময়েই তিনি বললেন :

..."এতদিনের পরিবর্তনে এসব কাহিনী ভুলেই গিয়েছিলাম। আর এ কাহিনী বলবার কথাও মনে হতো না, যদি না সেদিন আর এক কাণ্ড ঘটতো। সেদিনের পরে সতের বছর চলে গেছে। সে এক সাহিত্য সভা থেকে বাসায় ফিরছি। বাসার সামনে রিকশা থেকে নামার পরেই হঠাৎ এক ভদ্রলোক আমার হাত চেপে ধরলেন : 'আমায় চিনতে পারেন, স্যার?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> আমি কিন্তু আপনাকে চিনতে পেরেছি। আমার নাম শাহেদ। আমি ডাক্তার। আপনি যখন দিনাজপুর জেলে, তখন আমি ছিলাম সেখানে ডাক্তার।'
>
> "তাকিয়ে দেখলেম। কিন্তু ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে সেই সতের বছর আগেকার ডাক্তার সাহেবের চেহারার কোন মিলই যেন পাই নে। হঠাৎ ভদ্রলোক আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন। আপনার বুলুকে মনে আছে, স্যার, বুলু? ও এবার ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছিল। চাকুরিও পেয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ সেদিন মশাল হাতে বেরিয়ে গেল। আর ফিরে এল না।"...

আমার এই রচনাটুকু যদি কোন আবেগপ্রবণ গবেষকের চোখে পড়ে তবে তাঁকে আমি অনুরোধ করব, যেন তিনি একটু খোঁজ করেন, বুলুর বাবা ডাক্তার শাহেদ আজো বেঁচে আছেন কিনা। ১৯৫২ সালে তিনি দিনাজপুর জেলের ডাক্তার ছিলেন। তাঁর পাঁচ বছরের ছেলে বুলু অজিতদার কানে কানে বলেছিল : 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই। নূরুল আমিনের কেল্লা চাই।' সেই বুলু, ২২ বছরের যুবক বুলু ১৯৬৯-এ এসে বিপ্লব ও জীবনের মশাল হাতে ঘর থেকে সেই যে বেরিয়ে গেল, আর ফিরে এল না।

এমনি করে ৫২ এসে ৬৯-এ যোগ দিল। এমন সাক্ষাৎযোগের দৃষ্টান্ত আমাদের কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়।

কিন্তু শহীদ বুলুর জীবনকে তো ঊনসত্তরের উত্তরসূরীরা জানে না। আমাদের তরুণ গবেষকরা কি পারেন না ডাক্তার শাহেদকে অন্বেষণ করে আবার আবিষ্কার করে তাঁর নিজের ও তাঁর ছেলে বুলুর জীবনকথাকে আরো বিস্তারিত করে আমাদের হাতে তুলে দিতে? শহীদ বুলু কি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে?

১৫-২-৯১

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বিষাদ-সিন্ধু' এবং একটি কিশোর

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের 'বই'-এর সম্পাদক অনুরোধ করেছেন, বই পাঠের স্মৃতিচারণ করতে। অনুরোধটি স্বাভাবিক। 'বই' পত্রিকার প্রয়াস হচ্ছে বইকে নানাভাবে তার পাঠকদের সামনে তুলে ধরা। দেশ ও বিদেশের নানা বইএর তাঁরা খবর সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। দেশের সমকালীন প্রকাশনাক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের আলোচনা পেশ করেন।

'বই পাঠের স্মৃতিচারণ' শিরোনামে ইতোমধ্যে 'বই' নিশ্চয়ই আমাদের দেশের কবি-সাহিত্যিক-শিক্ষাবিদ-বুদ্ধিজীবী : এঁদের অনেকের বই পাঠের স্মৃতিচারণ প্রকাশ করেছেন। আমি তাঁদের সে স্মৃতিচারণ হয়ত পাঠ করি নি।

কিন্তু নিজের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে দেখছি, বিষয়টি তেমন সহজ নয়। নিজেকেই জিজ্ঞেস করেছি : আমি কি আমার সচেতন কিশোরকাল থেকে নানা রকম বই পড়ি নি? তবে তাদের কারুর আচার আচরণ, আমার জীবনে তাদের দান অবদানকে আমি স্মরণ করতে পারছি নে কেন।

বই পাঠের স্মৃতিপটকে ধূসর এবং প্রায় শূন্য দেখে আমার মনটা বিষাদে ভরে উঠল। নিজেকে যথার্থই কৃতঘ্ন, অকৃতজ্ঞ বলে বোধ হতে লাগল। বন্ধুর দানকে স্মরণ না করার অকৃতজ্ঞতা। তাকে বিস্মৃত হওয়া। তবে কি কৃতজ্ঞতার চাইতে কৃতঘ্নতাই মানুষের অধিকতর স্বাভাবিক প্রবণতা? সচেতনভাবে কথাটা স্বীকার করতে দ্বিধা এলেও, সত্যটা অস্বীকার করা যায় কেমন করে?

মানুষের এই এক চরিত্র যে, সে যার কাছ থেকে সবচেয়ে অধিক পায় এবং সর্ব সময় পায়, তাকে নিয়ে তার আদৌ কোন চিন্তা-ভাবনা এবং সচেতন কৃতজ্ঞতাবোধ প্রকাশিত হয় না।

আমরা আমাদের পিতা-মাতাকে নিয়ে ভাবি নে। আলো-হাওয়াকে নিয়ে ভাবি নে। প্রতিবেশ-পরিবেশকে নিয়ে ভাবি নে। তেমনি আমরা বই নিয়ে ভাবি নে। এসব কিছুকেই আমরা যেন 'পথে পড়ে পাওয়া' বিষয় বলে মনে করি। ইংরেজিতে বললে : 'থিংস টেকন ফর গ্রান্টেড' : আছে তো, এ নিয়ে আর চিন্তা কি? এদেরকে সৌভাগ্য বলে জ্ঞান করি নে। কিন্তু আমাদের অর্বাচীনতা এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অজ্ঞতায় এদের কারুর অবদানই তো মিথ্যে হয়ে যাবে না। সে কথা যেমন সত্য, তেমনি এদের অবদান সম্পর্কে যদি চিন্তা করি তবে সেই চিন্তাই আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি উপাদানের অবদানকে দৃঢ়তর করে মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধতর করে তুলতে পারে। সে কথাও তো অনস্বীকার্য।

এমন দার্শনিক কথাবার্তার ব্যাখ্যা বারান্তরে করা যাবে। আজ সত্যি আমি চক্ষু বন্ধ করে আমার আপাতঃ বিস্মৃত কিছু বন্ধুর নামকে স্মরণ করার চেষ্টা করেছি। বইএর নাম। বই-ই বন্ধু। সেই বন্ধুদের নাম। একথা অপর কেউ না জানুক, আমি তো বুঝি, যাদের নাম ও পরিচয় আমি এখন ভুলে গেছি তারাও আমার জীবনের বোধবুদ্ধি, সত্য-মিথ্যা ভেদের জ্ঞান লাভ, জীবনের উদ্দেশ্য, আদর্শ, ত্যাগ, তিতিক্ষা, প্রেম, ভালবাসার অনুভূতি তৈরিতে তাদের অবদান যুগিয়েছে। যদি সম্ভব হত, যদি আমার জীবনে সেই শৃঙ্খলাপরায়ণতা থাকতো যার দ্বারা কিশোরকাল থেকে যখন যে বইকে আমি পাঠ করেছি তার নাম পরিচয়টি আমি শুধু মনের পৃষ্ঠায় নয়, কাগজে কলমে লিখে রাখতাম, তবে তাতে যে সৌধ তৈরি হত, সে সৌধই আমার জীবনের আর এক রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করত। কিন্তু সে অক্ষমতার ক্ষতিকে পূরণ করার কোন উপায় নেই।

কিন্তু আজ এইক্ষণে যাদের নাম স্মরণ করতে পারছি, তাদের পরিচয়, যত অল্পই হোক না কেন, অপর কোন আগ্রহী পাঠকের কাছে বলার একটা দায়িত্ব আমার আছে। সেই দায়িত্বের চিন্তা থেকেই বর্তমানের এই প্রয়াস।

কিশোরকাল থেকে স্মৃতির পাতা উল্টাতে গেলে প্রথমেই আমার মনে পড়ে মীর মোশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু'র কথা।

কিশোরকাল তো বটেই। স্কুলের ষষ্ঠ থেকে বড়জোর অষ্টম শ্রেণীর বয়স। 'বিষাদ-সিন্ধু' কেমন করে হাতে এসেছিল, তা স্মরণ করতে পারছি নে। আসলে সেকালে : আজ থেকে পঞ্চাশ বছরের অধিককাল পূর্বেও 'বিষাদ সিন্ধু' পাওয়ার কোন সমস্যা ছিল না। অল্পবিত্ত কৃষক পরিবারেও, যে পরিবারের দু একটি ছেলে মেয়ে স্কুলে, মাদ্রাসায় পড়ছে, তেমন পরিবারেও 'বিষাদ সিন্ধু' ছিল প্রায় সার্বজনীনভাবে প্রাপ্য বই। 'বিষাদ সিন্ধুকে আজ এই পড়ন্ত বেলায় পাঠ করলে কতটুকু আনন্দ পাব এবং কাহিনীর আবেগে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠব, তা বলা মুশকিল। বর্তমানের কিশোর কিশোরীরা কি 'বিষাদ-সিন্ধু' পাঠ করে? 'বিষাদ-সিন্ধু'-র জায়গাতে আধুনিক গল্প-রূপকথা স্থান নিয়েছে। কিন্তু সেদিন এই 'বিষাদ-সিন্ধু' পাঠ করে যে রোমাঞ্চ এবং আবেগ বোধ করেছিলাম তার স্মৃতিতে আমার মন আজো আন্দোলিত হয়ে ওঠে।

দেহের বয়স হয়। মনেরও কি বয়স হয়? আমি জানি নে। কেবল আফসোস, কালের গতি একমুখো। অতীতকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনা চলে না। তাকে স্মৃতিপটেই কেবল ভাসিয়ে তোলার চেষ্টা করা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘বিষাদ-সিন্ধু’ এবং একটি কিশোর

ত্রিশের দশকের শেষ। ’৩৬ থেকে, ধরা যাক, ’৪০ সালের কথা। একটি গরীব কৃষক পরিবার। আমি হয়ত তখন নিজের বাড়ি ছেড়ে অভিভাবক বড় ভাইএর সঙ্গে তাঁর চাকুরির স্থানে থেকে সেভেন, এইট কিংবা নাইনে পড়ছি। বাড়িতে এলে খুব আদর পাই। সাংসারিক আমার কোন গুণ ছিল না। বাজার করার নয়। গরুকে ঘাস খাওয়াবার নয়। কিন্তু আত্মীয়জনেরা নাম ধরে বলেন : ও বেশ পড়তে পারে। বাংলা বই পড়তে পারে। তাঁরা আমার প্রশংসা করতেন। সেই প্রশংসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি শুধু ‘বিষাদ-সিন্ধু’ পড়েছি, তাই নয়। আমি মজলিস করে উঠানের চারপাশের ঘর থেকে মা-বাবা, ভাই-বোন, চাচা-চাচীকে ডেকে ‘বিষাদ সিন্ধু’ পাঠ করে শুনিয়েছি।

‘পাষণ্ড সীমার খঞ্জর হাতে ইমাম হোসেনের বুকের উপর চেপে বসেছে। খঞ্জর চালাচ্ছে। কিন্তু হযরতের চুম্বনসিক্ত কণ্ঠকে সে খঞ্জর ভেদ করতে পারছে না।’ আহা সে কি কাহিনী! আমার মুখে পাঠ শুনে মা, চাচী, ভাইএরা তাঁদের চোখের পানি রোধ করতে পারতেন না।

পঁয়ষট্টিতে এসে পেছনের দিকেই তাকাতে হয়। সামনের দিকে তাকালে নিম্নমুখী কাউন্ট ডাউনের টেকঅফের ক্রান্তি বিন্দুটিতে দ্রুত পৌঁছে যাবার আশঙ্কায় মনে বিষাদ জাগে। ভয় নয়। আমার মনে আফসোস জাগে। অপ্রাপ্তির আফসোস নয়। দুঃখ, দারিদ্র্য, ব্যথা, বিচ্ছেদ, বিপর্যয়, রাষ্ট্রনৈতিক উত্থান-পতন, আদর্শের বিশ্বাস, অবিশ্বাস, তার জন্য লড়াই, হত্যাযজ্ঞ : প্রাপ্তির কি অচিন্ত্যনীয় বৈচিত্র্য। আসলে একটা জীবন এমন বিপুল বৈচিত্র্য ধারণের জন্য কত ক্ষুদ্র! আগে পরকালের কথা ভাবতাম না। কিন্তু এখন ভাবতে শুরু করেছি। ইহকাল আর পরকাল। ইহকাল তো অচিরেই শেষ হবে। বস্তুবাদী বলে, আমার ইহলোক ত্যাগের সঙ্গে সব কিছু অর্থহীন হয়ে যাবে, এমন ভাবনা ভাবি কি করে? পরিবার, পরিজন, লোক-লোকালয় থাকবে। শুধু এতটুকু বুঝেই অনিবার্যভাবে প্রস্থানোম্মুখের মনে কোন আনন্দের সঞ্চার হওয়ার কথা নয়। তাই যদি হয়, তবে আমিই বা পরকালকে এত সহজে পরিত্যাগ করি কেন? যৌবনে পরকালের প্রয়োজন পড়ে নি। প্রয়োজন বাদে কে ভাবে? এখন তো প্রস্থানের মুহূর্তটি সন্নিকটে। এখনই তো প্রয়োজন।

মানুষের জীবন নানা ইচ্ছা, বাসনা, কল্প কাহিনীতে ভরা। সেই সব কল্প-কাহিনী নিয়ে মানুষ বাঁচে। এবং তারই সম্ভার নিয়ে মহাকালের পথে একাল থেকে সে যাত্রা শুরু করে।

আমিও তেমনি কল্পকাহিনী রচনা করি। আমি ভাবি, একালে না হলেও আগামীকালে আবার আমি ফিরে যেতে পারব আম, জাম, তাল, তেঁতুল, বাঁশঝাড় ঘেরা সেই গ্রামটিতে, যেখানে আমার মা, বাবা, আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বোনেরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার আগমনের অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন। আমি সন্তর্পণে তাঁদের মাঝখানে গিয়ে আচম্বিতে তাদের চমকিত করে বলে উঠব : এই যে আমি এসেছি! ভাই বোন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে আমার নাম ধরে বলে উঠবে : তুই এসেছিল! তোর জন্যই আমরা অপেক্ষা করে আছি। তোর মত করে তো আমরা পড়তে পারি নে। এই নে, তোর 'বিষাদ-সিন্ধু'। তুই পড়ে শুনা, ইমাম হোসেন ফোরাত নদীর কুলে কেমন করে যুদ্ধ করে ঢলে পড়েছিলেন। কেমন করে সীমার তাঁর বুকের উপর চেপে খঞ্জর চালিয়েছিল।...

তাদের দাবীতে, আদরে আমি অনুপ্রাণিত হয়ে উঠব এবং সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে কণ্ঠের স্বরকে আরো উচ্চ করে আমি পড়তে শুরু করব :

"...সীমার, আমি এখনই মরিব। বিষাক্ত তীরের আঘাতে আমি অস্থির হইয়াছি। বক্ষের উপর হইতে নামিয়া আমায় নিঃশ্বাস ফেলিতে দাও। একটু বিলম্ব কর। একটু বিলম্বের জন্য কেন আমাকে কষ্ট দিবে? আমার প্রাণ বাহির হইয়া গেলে আমার মাথা কাটিয়া লইও। দেহ যত খণ্ডে খণ্ডিত, করিতে ইচ্ছা হয়, খণ্ডিত করিও। একবার নিঃশ্বাস ফেলিতে দাও। আজ নিশ্চয়ই আমার মৃত্যু। এই কারবালা প্রান্তরেই হোসেনের জীবনের শেষ কার্য্য সমাপ্ত। জীবনের এই শেষ কারবালায়। ভাই সীমার! তুমি নিশ্চয়ই আমার মাথা কাটিয়া লইতে পারিবে। আশীর্বাদ করিতেছি, এই কার্য্য করিয়া তুমি জগতে বিখ্যাত হইবে। ক্ষণকাল অপেক্ষা কর।"

"অতি কর্কশ স্বরে সীমার বলিল, "আমি তোমার বুকে চাপিয়া বসিয়াছি, মাথা না কাটিয়া উঠিব না। যদি অন্য কোন কার্য্য থাকে বল। বুকের উপর হইতে একটুও সরিয়া বসিব না।" এই বলিয়া সীমার আরো দৃঢ় রুপে চাপিয়া বসিয়া হোসেনের গলায় খঞ্জর চালাইতে লাগিল।...

"হোসেন বলিলেন, "সীমার! কেন এ সময়ে বারংবার আমাকে কষ্ট দিতেছ? শীঘ্র মাথা কাটিয়া ফেল। আর সহ্য হয় না। অনর্থক আমাকে কষ্ট দিয়া তোমার কি লাভ হইতেছে? বন্ধুর কার্য্য কর। শীঘ্র আমার মস্তক কাটিয়া ফেল।"

"আমি ত কাটিতে বসিয়াছি। সাধ্যানুসারে চেষ্টাও করিতেছি। খঞ্জর না কাটিলে আমি তার কি করিব? এমন সুতীক্ষ্ণ খঞ্জর তোমার গলায় বসিতেছে না, "আমার অপরাধ কি? আমি কি করিব?... "সীমার গাত্রের বসন উন্মোচন করিয়া হোসেনকে দেখাইল। নিজেও দেখিল। হোসেন সীমারের বক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দুই হস্তে দুই চক্ষু আবরণ করিলেন! সীমার সজোরে হোসেনের গলায় খঞ্জর দাবাইয়া ধরিল।

"এবারেও কাটিল না। বারংবার খঞ্জর ঘর্ষণে হোসেন বড়ই কাতর হইলেন। পুনরায় সীমারকে বলিতে লাগিলেন, "সীমার, আর একটা কথা আমার মনে হইয়াছে, বুঝি তাহাতেই খঞ্জরের ধার ফিরিয়া গিয়াছে, তোমারও পরিশ্রম বৃথা হইতেছে, আমিও যারপরনাই কষ্ট ভোগ করিতেছে। সীমার। মাতামহ জীবিত অবস্থায় অনেক সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> স্নেহ করিয়া আমার এই গলদেশ চুম্বন করিতেন। সেই পবিত্র ওষ্ঠের চুম্বন মাহাত্ম্যেই তীক্ষ্ণধার অস্ত্র ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। আমার মস্তক কাটিতে আমি তোমাকে বারণ করিতেছি না; আমার প্রার্থনা এই যে, আমার কণ্ঠের পশ্চাদভাগে, যেখানে তীরের আঘাতে শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, সেইখানে খঞ্জর বসাও, অবশ্যই দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইবে।"

জীবনে এমন আবেগ আর অনুপ্রেরণাবোধ, জীবনকে সার্থক ভাবার বোধ যে-বঙ্কু আমার কিশোর মনে উপ্ত করে দিয়েছিল, সেই 'বিষাদ-সিন্ধু'র কাছে আমার ঋণের কি কোন শেষ আছে? তার কি কোন পরিমাপ হয়?

৬-৫-৯০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনারাই আমাদের ডুবাবেন!'

আগের দিনও খেয়াল ছিল না। মাসের ২১ তারিখ মানে তৃতীয় সপ্তাহ শেষ হচ্ছে। গ্যাসের বিল দিতে হবে। গ্যাসের বিল বইএর ভিতরে লেখা আছে : তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে আগের মাসের বিল পরিশোধ করা না হলে, প্রতিমাসে ২ বার্ণারের জন্য ১০ টাকা এবং ১ বার্ণারের জন্য ৫ টাকা করে সারচার্জ মানে জরিমানা দিতে হবে। এই ১০ টাকা অচিরেই হয়ত ২০ টাকা হয়ে যাবে। কিন্তু এই দশ টাকাও আমার জন্য কম নয়। নির্ধারিত ব্যাংকে দৌড়াতে হবে। গতমাসের গ্যাসের বিলটা ব্যাংকের কাউন্টারে জমা দিতে হবে।

দশটার দিকে রিকশা করে ব্যাংকের জন্য যাত্রা করতে আর একটা কথা খেয়াল হল। হায় আল্লাহ! আজকে তো বৃহস্পতিবার! তার মানে ১১টার মধ্যে ব্যাংকে বিল দিতে হবে। কিন্তু সেখানে কি গ্যাস, বিদ্যুৎ, আর পানির বিলের জন্য আমি একা গিয়েই হাজির হব? না, তা নয়। আজকে নিশ্চয়ই গ্যাসের চাপ পড়বে বেশি। দিতে পারব কিনা, তাই বা কে জানে। তবু দৌড়ালাম ব্যাংকের দিকে। গিয়ে দেখি, আমার আশঙ্কাই ঠিক। এগারটার কিছু বাকি আছে বটে। তবু ব্যাংকের কাউন্টারে শতের অধিক বিলদাতা বিল পরিশোধের জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছে। আমি যে চটকরে বিল হাতে নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে যাব, তারও উপায় নেই এক কাউন্টার থেকে স্ক্রল নম্বর নিতে হবে। লাইনে যাঁরা ইতোমধ্যে দাঁড়িয়ে গেছেন তাঁদের একজন বললেন : ঐ কাউন্টারে যান, ঐ যে চশমা চোখে মহিলা, ওনার কাছ থেকে আগে স্ক্রল নম্বর নেন, তারপরে লাইনে দাঁড়ান।

আমার হাতে দুটো বিল। তা তেমন বেশি নয়। অনেকের হাতে ৪টা, ৫টাও থাকে। আমি গিয়ে দাঁড়ালাম সেই কাউন্টারের লাইনে। এখানেও বেশ কয়েকজন লাইন করে দাঁড়িয়েছেন একটা ভরসা, ১১টার আগে যখন ব্যাংকের গেট দিয়ে ঢুকেছি, তখন বিল দিতে কোন অসুবিধে হবে না। স্ক্রলের লাইনে দাঁড়িয়ে একটু একটু করে এগিয়ে আসার সময় হলে আমার বিল বই দুটো মহিলার সামনে এগিয়ে দিলাম। চোখে চশমা। বয়স মাঝারি। উনি বিল নিয়ে ব্যাংকের রেজিস্টারে বিলের নম্বর আর টাকার অংক তুলে নিয়ে বিলের উপরে একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রমিক নম্বর দিয়ে দিচ্ছেন। প্রথম বইটা শেষ হলে দ্বিতীয়টা এগিয়ে দিতে একটু ধমকের চোখে বললেন, এক সাথে দিতে পারেন না? আমি নরম গলায় বললাম : এক সাথেই তো দিয়েছিলাম, আপনি নিলেন না। যাহোক, দ্বিতীয়টাও নিলেন এবং নম্বর দিলেন। এই নম্বর দেওয়ার কাজ করছেন। আবার বেশি ভীড় পড়েছে বলে পাশের সহকর্মী, যিনি টাকা নেন, তাঁর কাছ থেকে বিল বইগুলো এনে রাজস্ব টিকেটও লাগাচ্ছেন এবং ব্যাংকের সিল মেরেও তাঁকে সাহায্য করছেন। চোখে চশমা। গায়ে একখানি ওড়না আছে। মুখখানি হাসি হাসি, তাই তাঁর আগের ধমকটিতে আমি 'মাইন্ড' করলাম না। ক্রল নম্বর নিয়ে এবার টাকা দেওয়ার লাইনে এসে দাঁড়ালাম। কখন এখান থেকে ছুটি পাব তার ঠিক নেই। টাকা নেওয়া, স্ট্যাম্প লাগানো, সিল দেওয়া, খাতায় তোলা, সেই খাতা পেছনে বসা উর্দ্ধতন অফিসারের টেবিলে দেওয়া, তার আবার স্বাক্ষর দেওয়া, বিলের এক অংশ ছিঁড়ে রেখে বই ফেরৎ দেওয়া : প্রক্রিয়াটি খুব ছোট নয় এবং সময়ও কম লাগছে না। আমার সামনে দেখলাম অন্তত ঃ ১৫-২০ জন তো বটেই। পেছনেও লাইন লম্বা হচ্ছে। একজন ক্রল নম্বর বসিয়ে আমার পেছনে দাঁড়িয়ে বললেন, ভাই, জায়গাটা একটু রাখবেন, আমি একটু ঘুরে আসি। আমি বললাম, আমি কেমন করে রাখব? আপনার পেছনে যিনি দাঁড়িয়েছেন, তাঁকে বলুন। লাইনের চোখ তো সামনে দিকে। আমি লক্ষ্য রাখছি, আমার সামনে যিনি দাঁড়িয়েছেন তাঁর দিকে। আর কেউ যেন তাঁর আর আমার মাঝে এসে দাঁড়াতে না পারেন। তাহলে আমি আরো একজনের পেছনে পড়ে যাবো।

কাউন্টারে কাজটা যদি চটপট হতে পারত, এবং সবাই যদি ধৈর্য ধরে লাইনে দাঁড়াত তাহলে এই নিয়মে বিল পরিশোধে কোন চিন্তা হত না। কিন্তু আমাদের সকলেরই চেষ্টা থাকে সবার আগে নিজের কাজটা করিয়ে নেওয়ার। নিজের বিলটা আগে দেওয়ার। তাই লাইনে না দাঁড়িয়ে কাউন্টারের সামনে গিয়ে ভীড় জমায়। তাতে কাজ আরো পিছিয়ে যায়। সময় লাগে বেশি অনেক সময় ঝগড়া-ঝাটিও বেঁধে যায়। মনটা অনেক সময় আমারও খারাপ হয়ে যায় যখন দেখি ভিতরে কোন বিশেষ ব্যক্তির বিল অফিসার আগে নিয়ে বিদায় করছেন। এমন ব্যক্তি পুরুষ হলে আমরা কাউন্টারের বাইর থেকে চীৎকার করি : 'ভিতরে কারুর বিল আগে নেওয়া চলবে না।' কিন্তু ভিতরের সেই ব্যক্তি কোন কোন সময়ে একটি তরুণী বা গৃহিনী হয়ে পড়েন। বিল দিতে এসে ব্যাংকের লাইনে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশকে যেন কিছুটা টের পাই। কোন কোন সময়ে দেখেছি, কোন তরুণী বা মধ্যবয়সী গিন্নী গ্যাস, পানি বা বিদ্যুতের বিল নিয়ে ভিতরে গিয়ে বিল বই কাউন্টার কর্মচারীর দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন। অনেকে অবশ্য সঙ্কোচের সঙ্গেই দেন। আমরা যারা বাইরে দাঁড়িয়ে আছি লাইনে তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে ব্যাপারটা ভাল না লাগলেও মেয়ে বা মহিলা বলে কোন আপত্তি তেমন করি নে। মনের মধ্যে ক্ষোভ যে একটু না জমে তা নয়। সময়ের সমস্যা তো সকলেরই আছে। মেয়েদের চাইতে পুরুষদের সমস্যা কি কম? সকলেরই সময়ের দাম আছে। তবু এখনো মেয়েদের লক্ষ্য করে রুক্ষ স্বরে আমরা বলি নে : 'আরে ভাই, লাইনে এসে দাঁড়ান।' এই মেয়েদের বাসায় হয়ত বিল দেওয়ার লোক নেই। বাবা বা স্বামী অফিসে গেছেন। মানে, বাইরের কাজে মধ্যবিত্ত মেয়েদেরও বেশ একটা অংশ এসে যাচ্ছে। বাইরের দায়িত্ব পালন করছে।

লাইনে না দাঁড়িয়ে অফিসারের কাছে গিয়ে কোন বিশেষ পরিচয়ে বিল দেওয়ার সুযোগ নিতে আমার খুবই সংকোচ হয়। আমি কেবল লাইনে দাঁড়াতে পারলেই খুশী। লাইনে দাঁড়াতে আমার কোন সংকোচ নেই। সংকোচ থাকার মত বৃহৎ লোক আমি নই। কেউ আমাকে ধাক্কা না দিলে লাইনে দাঁড়িয়ে গুটি গুটি পায়ে সামনে এগুই। যখন আমার সময় আসে তখন আমি আমার বিল বই কাউন্টারে এগিয়ে দিই।

কিন্তু এই মনোভাব সকলের নয়। বয়স্ক যাঁরা তাঁরা সাধারণতঃ লাইনকে মেনেই চলেন। কিন্তু মাঝে মাঝে এই মধ্যবিত্ত ঘরেরই দুএকটি যুবককে পাওয়া যায় যে অবুঝের মত লাইনে না দাঁড়িয়ে ভেতরে গিয়ে কিংবা লাইন ভেংগে সামনে গিয়ে নিজের কাজ আগে উদ্ধার করতে চায়। একবার একটি যুবককে বলেছিলাম : আরে বাবা, আপনি না লাইন রাখতে সাহায্য করবেন? আপনি নিজে লাইন ভাংলে আমরা যাই কোথায়? তবু সহজে সে লাইনে আসে নি। কেবল বলছিল : 'আমার তো মাত্র একটি বিল।' আমি বললাম, 'আমারও তো বেশী নয়। মাত্র দুটো বিল।" লাইনের বাকি সবাইও যুবককে বাধা দিলেন। শেষ পর্যন্ত সেই যুবক লাইনে, আমাদের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

আমি বেলাইনে যে বিল দিই নে, সে কথা আবার একেবারে সত্য নয়। একটা স্বস্তি নিয়ে ব্যাংকে ঢুকি, কেউ আমাকে চিনবে না। বেশির ভাগই তো তরুণ কর্মী। অফিসার। আমার মতো বৃদ্ধকে কে চিনবে। তাই সংকোচের কি আছে? কিন্তু দু'এক সময়ে এমন বিস্ময়ও ঘটে যে, হঠাৎ কোন টেবিল থেকে এক তরুণ অফিসার উঠে এসে বলেন, 'আরে স্যার! আপনি এখানে? আপনি আমার টেবিলে এসে বসুন। আমি বিলটা দিয়ে দিচ্ছি।' এমন অবস্থায় যথার্থই সংকোচ জাগে। বিব্রত বোধ করি। আমি যতোই বলি, না, না, আমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না, এই তো হয়ে যাবে, তিনি ততো বলেন : 'স্যার, আমি আপনার ছাত্র। কিংবা স্যার, আমি আপনাকে চিনি।' এই বলে লাইনের আর সব মানুষের বিস্মিত এবং নিশ্চয়ই কিছুটা ক্ষুব্ধ দৃষ্টির সামনে বিব্রত আমাকে সেই অফিসার ধরে নিয়ে তাঁর টেবিলের সামনে বসান। চা খাবার জন্য অনুরোধ করেন। আমি চিনি নে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাত্রকুলের কাউকে মনে রাখা কঠিন। কত ছাত্র। কিন্তু তিনি আমাকে চিনেন। দুএকটা ঘটনার উল্লেখও করেন। আমার বিল বইটা কাউন্টারে দিয়ে বলেন, 'স্যারের বিলটা একটু নিয়ে নিন।' এমন সুযোগ নিতে আমি যথার্থই বিব্রত বোধ করি। এর আগে একদিন পাড়ার বন্ধু আবুল হুসেন তো লাইন থেকে জোর করে ধরে নিয়ে অফিসারের টেবিলের সামনে চেয়ারে বসিয়ে অফিসারের কানের কাছে মুখ নিয়ে কি কথা যেন বললেন। অফিসার বললেন : 'স্যারকে আমরা চিনি। কিন্তু উনি যে আইনের মানুষ। লাইন ছাড়া বেলাইনে সুযোগ নিতে চান না।' এমন কথাতে আবার একটু আনন্দও বোধ হয়। যাহোক, এই প্রশংসাটুকু খারাপ নয়। সেই বন্ধুবর আবুল হুসেন কিন্তু যথার্থই বুঝদার আর আইনী মানুষ। আমাকে ভিতরে বসিয়ে নিজে তাঁর বিল দেওয়ার জন্য লাইনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমি আবার বললাম, আমি লাইনে যাই, আপনি এখানে দিন, তিনি তা শুনলেন না।

লাইনে একবার দাঁড়াতে পারলে আশেপাশে চোখ বুলাতে আমার বেশ ভাল লাগে।

মুসলিম-প্রধান বাংলাদেশের এককালীন সংকুচিত মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে পরিবর্তনের ঢেউ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ষাটের দশকের দিক থেকেই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মেয়েরা ঘরের বাইরে জীবিকার ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, অধ্যাপনা ছাড়াও ব্যাংক ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে, সরকারি অফিসে আজকাল বেশ সংখ্যক মেয়েদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই সমস্ত জায়গায় দীর্ঘ সময় ধরে পুরুষ সহযোগীদের সঙ্গে এই মেয়েদের দায়িত্ব পালনে যে-স্বাভাবিকতা আমার চোখে পড়েছে, তা আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। এদের দেখলেই আমার মনের চোখ চল্লিশ কি পঞ্চাশ বছরের পূর্বের জীবনে ফিরে যায়। আমার নিজের পরিবার পরিজন, প্রতিবেশী, গ্রামবাসী, তাদের সামাজিক, পারিবারিক জীবন কি ছিল এবং সেই জীবনে আজ যে তুলনামূলকভাবে একটা গতি এবং শ্রমময়তা এসেছে, এটা আমাকে আনন্দিত করে তোলে।

এই ২১ তারিখেও গ্যাসের বিল দেওয়ার লাইনে দাঁড়িয়ে আমি এপাশ ওপাশে দৃষ্টি বুলাতে লাগলাম। ইতোমধ্যে ১১টা বেজে গেছে, ব্যাংকের লোকরা গেট বন্ধ করে দিতে চাচ্ছে। সামনের কাউন্টারের কর্মচারীরা বললেন, আর তাঁরা বিল নিবেন না। আজ ইতোমধ্যেই বেশি গ্রহণ করা হয়ে গেছে। অথচ বেশ কিছু মানুষ ব্যাংকে ঢুকে অপেক্ষা করছেন। তাদের বিল বইতে সামনের স্ক্রল-মহিলা স্ক্রল নম্বর দিতে চাচ্ছেন না। এটা নিয়ে একটু হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। স্বাভাবিকভাবে অপেক্ষমানরা বললেন : ১১টার মধ্যে ব্যাংকে ঢুকেছি, বিল কেন নেওয়া হবে না? আমি নিজেও তাই মনে করলাম। বৃহস্পতিবার ১১টায় লেনদেন বন্ধ। একথা ঠিক। কিন্তু যাঁরা ১১টার মধ্যে ব্যাংকে ঢুকেছেন তাঁদের বিল তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেওয়া উচিত। যে-ব্যাংকে বিল দিচ্ছিলাম তার সেই শাখার উচ্চপদস্থ অফিসার বা ম্যানেজারের প্রথম থেকেই হস্তক্ষেপ করা উচিত ছিল। এক যুবক, দেখলাম, বারবার আমাদের সামনের সেই স্কুল দেওয়ার মহিলাকে বলছেন : 'আপা, বিলটা নিয়ে নিন।' মহিলা মাথা ঘুরিয়ে থাকছেন, তেমন কোন জবাব, প্রতি-জবাবে যেতে চাচ্ছেন না। এটা তাঁর নিশ্চয়ই নতুন অভিজ্ঞতা নয়। বিলের ব্যাপারে প্রতিরোজই হয়ত এমন কিছু কথাবার্তা ঘটে থাকে। একবার শুনলাম, যুবক মহিলাকে বলছেন : আপা, আপনি একেবারে কি কসম কেটেছেন, আমার বিলটা নিবেনই না? এর মধ্যে আমার বিলটা পরিশোধের সুযোগ এসে গেছিল। সামনের লাইন অনেক কমে গেছে। আমার বিলটা পরিশোধ করে বিল বই নিয়ে ব্যাংক থেকে বেরিয়ে এলাম। ঐ যুবকও নিশ্চয়ই সেদিন তাঁর বিল দিতে পেরেছিলেন।

মেয়েদের, এমন হৈ হাঙ্গামার মধ্যে কাজ করার এবং মেজাজ রক্ষা করার ক্ষমতাটি যথার্থই প্রশংসনীয়। ব্যাংকের চাপ অবশ্য বৃহস্পতিবার ১১টা এবং অন্যান্যদিন একটা পর্যন্ত বেশি থাকে।

প্রায় ব্যাংকেই বেশ কিছু মহিলা কর্মীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কেউ দেখছি টাকা গ্রহণ করছেন, কেউ বিল নিচ্ছেন, কেউ চেক বই তৈরি করছেন। কোন কোন শাখায় মহিলা ম্যানেজারও রয়েছেন। ব্যাংকের কোন কোন শাখা আবার 'মহিলা শাখা' বলেও নির্দিষ্ট হচ্ছে। কেবল মহিলা শাখার কি উপকার, তা আমি জানি নে। মহিলা শাখায় নিশ্চয়ই মহিলা গ্রাহকদেরই লেনদেনের সুযোগ। কিন্তু মহিলা শাখায় সকল কর্মচারী মহিলা হবেন, এমন কোন কথা নেই।

আসলে ছেলে-মেয়ে, তথা পুরুষ-মহিলাদের, বাইরের কর্মক্ষেত্রে এরূপ স্বাভাবিকভাবে জীবিকা নির্বাহ করা, দায়িত্ব পালন করা : এটা আমার কাছে যথার্থই একটা সমাজ বিপ্লবের সূচক। আমাদের সমাজ জীবনে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। মেয়েদের অবরোধ থেকে মুক্ত করার জন্য মুসলিম সমাজে সেই বিশের দশকে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এবং সে সংগ্রাম তখন থেকে পরিচালনা করে আসছেন তাঁর ভাবশিষ্যারা : বেগম সুফিয়া কামাল এবং তাঁর সঙ্গীনীরা। বেগম সুফিয়া কামাল আশির উর্ধে এই বয়সে এখনো সেই সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছেন। নিজেদের আরদ্ধ সংগ্রাম সে যুগের তুলনায় অনেক বিকশিত হয়েছে। এই সমাজের নানা সীমাবদ্ধতা ও প্রতিক্রিয়ার প্রতিরোধের মধ্যেও মেয়েদের শিক্ষার কিছুটা বিস্তার ঘটেছে। মেয়েরা কর্মের জগতে ঘরের সঙ্কোচ আর বন্ধন থেকে বেরিয়ে এসেছে। তবু মেয়েদের উপর নির্যাতন আর অবিচারের শেষ এখনো হয় নি। বেগম সুফিয়া কামাল তাই তাঁর যেকোন ভাষণে দুঃখ করে বলেন : এতো যে অগ্রগতির কথা তোমরা বলছ, কই, আমাদের মেয়েদের উপর নির্যাতনের তো এখনো শেষ হল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। এ আফসোস তাঁর স্বাভাবিক। সমাজ-বিপ্লব চলছে। কিন্তু তা সম্পন্ন হতে এখনো অনেক বাকি।

তবু আমার নিজের অতীত জীবনের পরিবেশের দিকে চাইলে বর্তমানের এই বিকাশে আমি আবেগে উদ্বুদ্ধ বোধ না করে পারি নে। বাইরে কর্মজীবনে নারী ও পুরুষের, ছেলে ও মেয়েদের এই পারস্পরিক সহযোগিতা, মিছিল, মিটিং, দৌড়, সহজ হাসি আলাপ, ঠাট্টা, বিদ্রূপ, ভাললাগা, ভালবাসার স্বাভাবিক সম্পর্কটি আমাকে অনুপ্রাণিত করে। আসছে এবং আরো আসবে বাঁধভাঙ্গা এই মধ্যবিত্ত মেয়েদের মধ্য থেকে শ্রমজীবি মহিলা ও পুরুষ : সমগ্র মানুষের সহযোগী যোদ্ধারা।

২১ তারিখে ব্যাংকের লাইনে দাঁড়িয়ে একটু স্বস্তির ভাব নিয়ে, লাইনের সামনের দিকে আস্তে আস্তে এগুতে এগুতে নিজের মনে এসব কথাই ভাবছিলাম। দেখলাম, একটু দূরে টেবিলের এপাশে, ওপাশে এক তরুণ ও আর এক তরুণী ব্যাংক কর্মী সরস কিছু আলাপ করছেন। কোন বিষয়ে যেন হাল্কা সুরে তর্ক হচ্ছে। তরুণটি কি যেন বলছেন। তরুণীটি তা মানছেন না। তখন তরুণটি বললেন : 'এই আপনারাই আমাদের ডুবাবেন!'

পরিহাসভরা বাক্যটি আমার কানে লাগল। শ্যামলকান্তি মেয়েটি স্মিত মুখে তরুণ বন্ধুর কথার পাল্টা কোন জবাব না দিয়ে নিজের টেবিলে বোধ হয় কাজে চলে গেছেন।

AMARBOI.COM

আমি তরুণের বাক্যটি নিয়ে ভাবতে লাগলাম : 'এই আপনারাই আমাদের ডুবাবেন।' কথাটির মধ্যে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে একটি রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে। বুঝতে অসুবিধে হয় না, তরুণীটির তরুণ সহকর্মী বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতিতে মেয়েদের ভূমিকার প্রতি ইঙ্গিত করেই উক্তিটি সরস কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখন চলছে মেয়েদের রাজত্ব। এ কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। বাংলাদেশে আমাদের অভাবে কোন অভাব নেই। কিন্তু সম্পদও যে আছে, তাকে স্বীকার করা আবশ্যক। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী একজন মহিলা। বেগম খালেদা জিয়া। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধী দলের এবং আওয়ামী লীগের সংসদীয় নেতা একজন মহিলা। শেখ হাসিনা। তিনি হচ্ছেন বাংলাদেশের বিকল্প প্রধানমন্ত্রী।

ভাবতে গেলে ব্যাপারটা আমাদের জীবনে অভিনব। সমাজ-বিজ্ঞানীগণ বলেন : মানুষের সমাজে এখন চলছে পিতৃতান্ত্রিক শাসন : প্যাট্রিয়ার্কাল ডমিনেশন। কিন্তু আদিতে সমাজের শাসন ছিল মাতৃতান্ত্রিক। মেয়েরাই সমাজ জীবনের মূল শক্তি। শিশু কিংবা সন্তানের পরিচয়সূত্রই ছিল তার মা। পিতা নয়। তখন বাবা যদি অনিশ্চিত থাকত, তো মা নিশ্চিত ছিল। মাতৃতান্ত্রিক সেই সমাজ কালক্রমে পরিবর্তিত হয়ে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পরিণত হয়েছে। সেই পিতৃতান্ত্রিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজই এখন চলছে। এখানে পুরুষের রাজত্ব, পুরুষের কর্তৃত্ব। নারীর উপর নরের মাতব্বরী। নারীর উপর নরের নির্যাতন।

কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক সেই সমাজ কি দুশো বছর, একশ' বছর, এমন কি পঞ্চাশ বছর পূর্বের, মত এখনো বহাল আছে? বহাল যে নেই তার প্রমাণ তো বাংলাদেশের সমাজ বিবর্তনেও আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর তাই বিশ বছর পূর্বেও যা আমরা কল্পনা করতে পারি নি, তাই আজ বাস্তবে সংঘটিত হয়েছে, হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী একজন মহিলা। বাংলাদেশের বিকল্প প্রধানমন্ত্রীও মহিলা। অন্যান্য স্তরের মহিলা রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী, অফিস কর্মী, শিক্ষিকা, অধ্যাপিকা; এদের কথা নাইবা বললাম। আমার ভাবতে অবাক লাগে, যে মুসলিম-প্রধান পূর্ববাংলা বা বাংলাদেশে আমার কিশোর বয়সে আমার মা-চাচীকে ঘরের বার হতে দেখি নি, জাহাজ স্টীমার মটরে কখনো যাদের উঠানো যায় নি, তাঁদেরই মেয়েরা এবং সেই মেয়েদের এবং ছেলেদের মেয়েরা আজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বত্র বিস্তারিত হয়ে পড়ছে।

এ বিপ্লব কেবল যে বাংলাদেশের বিশেষত্ব, এমন নয়। সমগ্র প্রাচ্যেই কিংবা এতদিনকার পিছিয়ে পড়া এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকাতে এই সামাজিক-রাজনৈতিক নবজাগরণ সংঘটিত হচ্ছে। একদিন ইউরোপের যে শিল্পবিকাশ ও চিন্তার উদারতা ও প্রগতিকে আমরা নবজাগরণ বা 'রি নাইস্যান্স' বলে চিহ্নিত করেছিলাম, সেই নবজাগরণ এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার সর্বত্র আজ সংঘটিত হচ্ছে। সেই নবজাগরণ থেকে বাংলাদেশও যে মুক্ত নয়, সেটি আমাদের গর্বের বিষয় হওয়া উচিত।

একদিক দিয়ে দেখলে রাজনীতির এই বিশেষ ঘটনাতে বাংলাদেশের স্থান পৃথিবীর একেবারে শীর্ষে। হ্যাঁ, একথা ঠিক যে, ভারতেও মহিলা প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। তিনি ইন্দিরা গান্ধী। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর কন্যা। শ্রীলংকাতেও প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন : শ্রীমাভো বন্দর নায়েক। নিহত বন্দর নায়েকের পত্নী। ফিলিপিনিতে সাম্প্রতিক কালে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন কোরাজন আকিনো। নিহত আকিনোর পত্নী। বার্মাদেশেও ভবিষ্যতে প্রধানমন্ত্রী হবেন নিশ্চয়ই রাজবন্দিনী মহিলা নেত্রী অং সুকী। আউংসানের কন্যা। কিন্তু প্রাচ্যের কিংবা পৃথিবীর কোথাও প্রধানমন্ত্রী এবং বিকল্প প্রধানমন্ত্রী : উভয়ই মহিলা, এমনটির দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না। এমনকি গণতন্ত্রের সূতিকাগার যে গ্রেট ব্রিটেন সেখানেও বংশগত রাণী অনেক মিলেছে বটে : রাণী এলিজাবেথ, ১নং ভিক্টোরিয়া, রাণী এলিজাবেথ ২নং। কিন্তু মহিলা প্রধানমন্ত্রী একজনই হয়েছেন এ পর্যন্ত। মার্গারেট থ্যাচার। কিন্তু সেখানেও বিকল্প প্রধানমন্ত্রী মহিলা ছিলেন না। হবেন, এমন আভাসও কেউ দিচ্ছেন না। পৃথিবীর এখন যে 'ইউনি-মোড়ল' : মার্কিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুক্তরাষ্ট্র, সেখানে ডলারের গরম থাকলেও মহিলা নেতৃত্বের গর্ব তাদের নেই। দু একজন উপমহিলা মন্ত্রীকে যদিবা পাওয়া যায় এবং পুরুষ প্রেসিডেন্টের মহিলা পত্নী, কিন্তু মহিলা প্রেসিডেন্ট আসতে : এখনো দিল্লী দূর অস্ত!

কাজেই তলাবিহীন ঝুড়ির দিক থেকে নয়। যথার্থ গর্ব ও গৌরবের দিক থেকে : মহিলা প্রধানমন্ত্রী আর বিকল্প-মহিলা প্রধানমন্ত্রীর দিক থেকে, বাংলাদেশ পৃথিবীর শীর্ষতম।

তাই বলছিলাম, এককালের পিতৃ-প্রধান সমাজে ভাঙ্গন ধরছে, ভাঙ্গন ধরেছে। আর তার অন্যতম দৃষ্টান্ত বাংলাদেশেই।

তাই বলে পৃথিবীর এবং বাংলাদেশের তাবৎ নরকুল কি এই বিপ্লবের তাৎপর্য অনুভব করে? নারী ও পুরুষের মিলিত সমাজে এই বিকাশকে কি তারা সকলে সর্বান্তকরণে স্বাগতঃ জানায়। একথার জবাব ইতিবাচক হলে সমগ্র পৃথিবীতে যথার্থই একটা মনুষ্য-যুগের সূচনা ঘটতে পারত। কিন্তু না, সেকথা বলা চলে না। তাই ভারতের মহিলা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করা হয়। তাঁকে হত্যা করে পুরুষকুলেরই অর্বাচীন পুরুষ। পাকিস্তানের মহিলা প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টোকে অপসারণের ষড়যন্ত্র করে পুরুষকুল আকীর্ণ সামরিক-অসামারিক পুরুষকুল। যদিও একজন মহিলা প্রধানমন্ত্রীকে অযোগ্য বলে অপসারিত করে কোন সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা দেখাবার ক্ষমতা এই পুরুষকুলের নেই। ফিলিপিনের সাম্প্রতিক নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীর বিজয় আসন্ন দেখে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার ষড়যন্ত্র করে পুরুষকুলেরই প্রতিদ্বন্দ্বী।

বাংলাদেশেও সমাজ বিপ্লবের এই দিকটিকে বাংলাদেশের পুরুষকুল যে নির্দ্বিধায় স্বাগতঃ জানাচ্ছে, এমন কথা বলা যায় না। এবং এই বিপ্লবকে অস্বীকার করার উদ্যোগ কেবল যে প্রতিক্রিয়াপন্থী জামায়াত সংগঠনের, এমন কথাও বলা যায় না। তথাকথিত আধুনিক শিক্ষিত পুরুষের চেতন-অবচেতনে এখনো বইছে এই সমাজ বিপ্লবকে অস্বীকারের প্রবর্ণতা। আর সেই অবচেতনেরই প্রকাশ ঘটে বান্ধবীর প্রতি তরুণ সহকর্মীর পরিহাসভরা উক্তিতে : 'এই আপনারই আমাদের ডুবাবেন!'

তরুণের এমন পরিহাসভরা উক্তিটিকে একটু গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে আমি নিজের মনে বললাম : ওরা যদি ডুবায়, তার মূল কারণও হবো আমরা, পুরুষেরাই।

২৩-৫-৯২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমায় ভোট দেন, আমি গণতন্ত্র দেবো'

না, গণতন্ত্র প্রসঙ্গে আমি কোন সিরিয়াস প্রবন্ধ লিখতে পারব না। যদিও আমার ছোট্ট-খাট্ট শরীরটি বয়সের কামড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত, সিরিয়াস। কিন্তু মনের মধ্যে আমি বেশ মজা পাচ্ছি।

বাংলাদেশের জীবন নাট্যের, বিশেষ করে রাজনৈতিক নাটকের আমি কোন অভিনেতা নই। তবে আগ্রহী দর্শক তো বটেই। নাটকের দর্শকের ভীড় ক্রমান্বয়ে বাড়ছিল। নব্বুই এর অগাস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর পেরিয়ে নভেম্বরে। মঞ্চের সামনে ভীড় তো বটেই। মঞ্চ ছাড়িয়ে অলিতে গলিতে, রাস্তায় : সর্বত্র। নাটক দেখতে একেবারে সামনের কাতারে বসতে বা দাঁড়াতে পারি নি। ভয়। পাচ্ছে কখন হৈ-হুল্লোড়, ধর-ধাক্কা বেঁধে যায়। তাই যথাসম্ভব নিরাপদ স্থানে দাঁড়িয়ে দেখার জৈবিক তাগিদ বোধ করি।

সেখান থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ময়দানে লড়াই দেখলাম। স্টেনগান-ব্রেনগান হাতে একদল আর এক দলের দিকে দৌড়াচ্ছে। বোমা ফাটাচ্ছে। গুলি ছুড়ছে। একদলকে দেখলাম সুর্যসেন হলের একদিকে শুয়ে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছে।

এরপরেই টি এস সির দিকে গুলি চলল। পুলিশের নয়। পক্ষ-প্রতিপক্ষের। আকৈশোর সাংগঠনিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ, বি, এম, এর তরুণ ডাক্তার মিলন নিহত হলেন।

এরশাদ সরকারের গোপন নীল নকসার একটা কপি ফটোস্ট্যাট করে বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে বিলোচ্ছিলেন। একটা আমিও সংগ্রহ করেছিলাম। তাতে সব নির্দেশ খোলাসা করে ইংরেজিতে লেখা ছিল। স্বরাষ্ট্র বিভাগের বরাত দিয়ে স্বাক্ষরবিহীন সারকুলার। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য নতুন শক্তি হিসাবে দাঁড়াচ্ছে। এটাকে ভাঙ্গতে হবে। দরকার হলে জেলে যে ছাত্র-নেতারা আটক আছে, তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। তাদের অর্থ দিতে হবে। প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতে হবে। প্রধান দল দুটোর মধ্যে বিরোধের বীজ বপন করতে হবে।...

২৭ নভেম্বর এরশাদ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করল। কারফিউ জারী করল। স্কুল কলেজ বন্ধ করে দিল। ঘরে বন্দী হয়ে ভাবলাম : আবার কি ৭১ সালের ২৫ ডিসেম্বরে ফিরে যেতে হবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্দোলনের দাবী : এরশাদকে পতদ্যাগ করতে হবে। এরশাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট মওদুদের পরিহাস : কোথায় এরশাদ পদত্যাগ করবেন? জিরো পয়েন্টে? তার বিকৃত মুখ এবং শুষ্ক কণ্ঠের পরিহাস শেষ হতে না হতে এরশাদের তরফ থেকে ঘোষণা এল : এরশাদ পদত্যাগ করতে রাজী হয়েছেন।... খবর এল, সামরিক বাহিনী নিরপেক্ষ থাকছে। ঘোষণা এল : আন্দোলনের মনোনীত ব্যক্তিকে ভাইস প্রেসিডেন্ট করে তার কাছে এরশাদ পদত্যাগ করবেন। সে কারণে তিনি তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট মওদুদকে বরখাস্ত করবেন এবং সংসদ ভেঙ্গে দিবেন। এইভাবে সাংবিধানিক ধারায় ক্ষমতা হস্তান্তর হবে। বেচারী বাংলাদেশের ক্ষতবিক্ষত সংবিধান। সে না পারে হাসতে, না পারে কাঁদতে!

মানুষের ঢল নামল ৪ ডিসেম্বর রাতে এবং ৫ ডিসেম্বর। আমিও রাস্তায় নামলাম।

হ্যাঁ, এও আর এক একাত্তর বটে। আর এক ১৬ ডিসেম্বর। ৫ ডিসেম্বর সংঘটিত হল ১৬ ডিসেম্বর। বাংলাদেশে পঞ্জিকার তারিখগুলিও বড় অসহায়। কেউ তারা দিন তারিখ ঠিক রাখতে পারে না। পাঁচ ষোল হয়ে যায়। ষোল পাঁচ হয়ে যায়।

বিজয় উৎসব! প্রেস ক্লাবের সামনে জনতার ঢলে দেখা হল অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সঙ্গে। সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরীর সঙ্গে। সকলেই উৎসাহিত। ঘটনার আকস্মিকতায়। নাটকীয়তায়। রেহমান সোবহান সাহেব বললেন : মনে হচ্ছে দ্বিতীয় জন্ম। কেবল ভয়, তৃতীয় জন্মেরও কি প্রয়োজন হবে? আমি হেসে বললাম : আমি জন্মান্তরে বিশ্বাসী। জন্ম থেকে জন্ম, জন্মান্তরের মধ্য দিয়েই তো জীবনের গতি।...

এ ধারাবিবরণী কার জন্য? বাংলাদেশের কারুর জন্যই এর প্রয়োজন নেই। এ কেবল আমার নিজের জন্য। নিজের সঙ্গে নিজের আলাপ। আত্মসংলাপ।

আমার বেশ মজা লাগছিল। ছবিতে দেখলাম : বিচারপতি শাহাবুদ্দীন সাহেব শপথ নিচ্ছেন এরশাদ সাহেবের হাতে। বাংলাদেশে সবই অদ্ভুত, 'হ্যাঁ' এবং 'না', 'শাদা' এবং 'কালো'র : আশা এবং নিরাশার এমন আন্তরিক মিশ্রণ আর কোন দেশে কল্পনা করা যায় না। একজন অবৈধ ব্যক্তি তথা অবৈধ প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে গণ উচ্ছ্বাসের অশ্বে আরূঢ় একজন নিরীহ বিচারপতি বৈধতার শপথ গ্রহণ! অবৈধতা থেকে বৈধতার জন্ম? অত্যদ্ভুত! জীবনের ডায়ালেকটিকসে সবই সম্ভব।

হ্যাঁ, সম্ভব তো বটেই। তা না হলে ঘটলো কেমন করে? হেগেলের ভাষায় : যা বাস্তব তারই যুক্তি আছে : হোয়াট-এভার ইজ রিয়াল, ইজ র‍্যাশনাল।

আমার বেশ মজা লাগছিল। মজা এখনো লাগছে। এখন বাংলাদেশে কেবল নির্বাচনের আমেজ। ভোট আর ভোট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমায় ভোট দিন, : আমি আপনাদের গণতন্ত্র দেব।'

নানান আওয়াজের মধ্যে এই দাবী আর আওয়াজটি আমার খুব ভাল লাগে। কোন নেতা বা নেত্রীকে ভোট দিলেই গণতন্ত্র পাওয়া যাবে। বাংলাদেশে গত প্রায় দশ বছরের লড়াই এবং আওয়াজ : 'গণতন্ত্রকে 'মুক্ত করতে হবে।' গণতন্ত্রকে আনতে হবে।' গণতন্ত্রকে পেতে হবে।' এই আওয়াজে আওয়াজে কত জীবনক্ষয়। কত শব্দক্ষয়। কত পরিশ্রম ক্ষয়।

অবশ্য কেবল দশ বছরের কথা নয়। '৪৭-এর স্বাধীনতাকে যদি একটা পর্যায়ের সূচক বলা চলে, তবে তখন থেকে পূর্ববঙ্গের মানুষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা বা লাভের আওয়াজ দিয়ে আসছে। আর জিন্নাহ্ সাহেব থেকে আইয়ুব-ইয়াহিয়া খাঁ এবং তৎপরবর্তী সকল শাসন-প্রধানরাই বাংলাদেশের মানুষকে কেবল গণতন্ত্র দেবার কথা বলে আসছেন। এর ফলে আমার মত সরল মানুষের মনে আর যাই হোক না কেন, গণতন্ত্র বেশ পরিমাণে মূর্তিমান হয়ে উঠেছে। আগে ধারণা ছিল, গণতন্ত্র একটা বিমূর্ত শব্দ। এখন মনে হচ্ছে, না, গণতন্ত্র একটা মূর্তি। অবশ্যই সুন্দর মূর্তি। অথবা গণতন্ত্র একটি কামধেনু। তার কাছে যা কিছু চাওয়া যায়, তাই-ই সে সহাস্যমুখে প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

আমি আমেরিকার 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি' দেখি নি। টেলিভিশনের ছবিতে যা একটু আভাস পেয়েছি। আমেরিকা ঢোকার পথে নদীর মুখেই নাকি 'মুক্তির মূর্তি' : স্ট্যাচু অব লিবার্টি দাঁড়িয়ে আছে। এবার বাংলাদেশেও আমরা গণতন্ত্রের একটি মূর্তি গড়ব। অবশ্য আমাদের ধর্ম মূর্তি বিরোধী। তবু মূর্তি বাদে মনের কথাকে মূর্তিমান করি কি করে? তবে মূর্তিবিরোধী বলেই আবার আজ যদি এক মূর্তি গড়ি, কাল সে মূর্তিকে ভেঙ্গে ফেলি। পরশু থেকে আর এক মূর্তি গড়া শুরু করি।

ভোট দিলেই গণতন্ত্র পাব আর গণতন্ত্র পেলেই আমার এবং আমাদের সব দুঃখ, কষ্ট, দুর্ভোগ দূর হয়ে যাবে : চালের দাম কমে যাবে : খাজনা ট্যাকস মাফ হয়ে যাবে : আহা। আরো কত কি। এই শুনে শুনে আমারও লোভ হচ্ছে গণতন্ত্রকে পাওয়ার এবং সেজন্য ভোট দেওয়ার। গত দশ বছরে আমি কাউকে ভোট দিই নি। কেউ আমার ভোট চাইতে আসে নি। আমার নাম আমার পাড়ার ভোটার তালিকায় আছে কিনা, আমি জানি নে। শুনেছি থাকুক বা না থাকুক এবং ভোট আমি নিজে না দিলেও প্রতি নির্বাচনে (এবং কত নির্বাচন হয়েছে, তারও ইয়ত্তা নেই : শহর মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড কমিশনার নির্বাচন, মেয়র নির্বাচন, গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার নির্বাচন, চেয়ারম্যান নির্বাচন, উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, সংসদ নির্বাচন) আমার ভোট দেওয়া হয়েছে।

এবার ভোট দিই বা না দিই, একটু ভরসা হচ্ছে এবার হয়ত আমাকে সেই দৃশ্যটা দেখতে হবে না। কোন্ সনের নির্বাচন মনে নেই। সেই যেবার বিরোধী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোটের একদল সংসদ নির্বাচনে যোগ দিয়েছে, আর একদল দেয় নি। সে বছরের কথা।

সেবার ভোটের দিন যাচ্ছিলাম আমি ইউনিভারসিটির মসজিদের পাশ দিয়ে। হঠাৎ দেখলাম, একদল যুবক মসজিদের ওপাশ থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসে অতর্কিতে ঝাপিয়ে পড়ল আর একটি যুবকের উপর। তাকে শুইয়ে ফেলে চড়, কিল, লাথি বিরামহীনভাবে চালাতে চালাতে তাকে রক্তাক্ত করে প্রায় অজ্ঞান করে ফেলল। আক্রমণকারীরা মারছে আর বলছে : 'শালা, ভোট দিয়ে এসেছে। মার ওকে। শেষ করে ফেল।'

গণতন্ত্রের জন্য এও এক লড়াই। আমি কেবল ভরসা করছি, এবার হয়ত সে রকম দৃশ্য দেখতে হবে না। এবার সকল দলই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। কিন্তু তার প্রচারণার যে পাল্টাপাল্টি হচ্ছে তাতে অন্য আতঙ্কও মনকে ভরে তুলছে। নানান ঘটনার, আক্রমণ, প্রতিআক্রমণের খবর আসছে কাগজে। সকলের মনে প্রশ্ন ক্রমান্বয় বাড়ছে : নির্বাচন কি শেষ পর্যন্ত হবে? প্রশ্ন আমার মনেও। 'হবে', 'হবে না' : এই দ্বিধায়, দ্বন্দ্বে দিন থেকে দিন গুনছি। তবু এই দ্বিধা-শঙ্কার মধ্যেও দেখি ঢাকা শহরে আমার পাড়ার ন্যায় সকল পাড়ায় শেখ হাসিনার সমর্থকদের ছাউনী ঘেঁষেই তৈরি হয়েছে খালেদা জিয়ার প্রচারণী ছাউনী। দুটো ছাউনীতেই দুই নেত্রীর সুন্দর রঙীন ছবি শোভা পাচ্ছে। তাদের একজনের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে বঙ্গবন্ধুর দণ্ডায়মান দীর্ঘ প্রতিকৃতি, অপর জনার পাশে আছে জেনারেল জিয়াউর রহমানের ছবি। এমন একটা সহাবস্থানের চিত্র যখন দেখি তখন মনটা আবার কিছুটা ভয়মুক্ত হয়ে ওঠে। অবশ্য এমন সহাবস্থানের বৈশিষ্ট্য এই যে, উভয় ছাউনীতে মাইক বাজছে, ক্যাসেট চলছে সঙ্গীত ও ভাষণের। সে ভাষণের কোনটিকে অপর কোনটি থেকে পৃথক করে বুঝার কারুর উপায় নেই। একটা শব্দ তরঙ্গ উভয় শিবির থেকে বেরিয়ে মিলিত হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে চারদিকে জলের তরঙ্গের মত। সবটা মিলে একটা শোরগোল। একটা মজা। বাঙালির একটা নতুন 'এনগেজমেন্ট'।

আমার ভাল লাগে এমন এনগেজমেন্টের দিকটা। এই ভোটের খেলা। রক্তারক্তি দাঙ্গা-হাঙ্গামার খেলার চাইতে ভোটের এই খেলাটা যদি তুলনামূলকভাবে কম রক্তপাতের হয় এবং ভবিষ্যতে নির্ধারিত সময়ের ব্যবধানে এই ভোটের খেলাটা যদি বাংলাদেশের জীবনে একটা নিয়মে পরিণত হয় তাহলে আমাদের জীবনের কোন সমস্যার সমাধান হোক বা না হোক, যে-শ্বাসরুদ্ধকর আতঙ্কের মধ্যে আমরা বছরের পর বছর দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছি; তার হয়ত কিছুটা অবসান ঘটবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ভরসাতেই আমি আশাবাদী হয়ে উঠতে চাই। এই ভরসা, এই আশা অলীক না হয়ে যাক। সেই কামনাই আজকের মুহূর্তের বাংলাদেশের সাধারণ অপর সকল মানুষের মত আমারও মনের কামনা।

পরিশিষ্ট : সিরিয়াস প্রবন্ধ নয়। তবু সিরিয়াস মনে হলেও শেষ একটু কথা এই যে : গণতন্ত্র কোন নিরেট বস্তু নয়। মরণ চাঁদের মিষ্টি নয়। টাকার থলে নয়। ধন্বন্তরী কোন মলম নয় : যা কোন দল বা নেতার হাতে আছে। তাকে ভোট দিলেই সেটা পাওয়া যাবে। তিনি আমাদের হাতে তুলে দিবেন। আমাদের আর কিছু করার থাকবে না। না, গণতন্ত্র তেমন কোন মূর্তি নয়। তেমন কোন বস্তু নয়। আবার তাই বলে গণতন্ত্র কোন অস্তিত্বহীন, অলীক ব্যাপারও নয়। আজকের পৃথিবীর ছোটবড় সকল দেশের মানুষের স্বপ্ন হচ্ছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার। সরকার ও জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিনিয়ত অধিকতর গণতান্ত্রিক করার। বলতে পারি : গণতন্ত্র হচ্ছে 'অরডার অব দি ডে': যুগের দাবী গণতন্ত্র। কিন্তু গণতন্ত্রের জন্য গণতন্ত্র নয়। একথা যেমন সত্য, তেমনি গণতন্ত্রের জন্য প্রতিদিনের সজাগ সংগ্রামই যে গণতন্ত্র, তাও আমাদের বুঝতে হবে। আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা নানা বিমূর্ত বিষয়কেই বেশ পরিমাণে মূর্ত এবং অর্থময় করে দিয়েছে। ভাষা-স্বাধীনতা-গণতন্ত্র : এর কোনটি যে কোনটি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, একটি থেকেই আর একটি : জীবন আমাদের এ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছে। তুলছে। ভাষা শুধু ভাষার জন্য নয়। ভাষা জীবনের জন্য। ভাষা স্বাধীনতার জন্য। স্বাধীনতাও শুধু স্বাধীনতার জন্য নয়। স্বাধীনতাও গণতন্ত্রের জন্য। স্ব-অধীনতার জন্য। 'গণের তন্ত্রের' জন্য। এবং গণতন্ত্রও কেবল গণতন্ত্রের জন্য নয়। গণতন্ত্রও একটি শঙ্কামুক্ত, কর্মময়, সঙ্গতিপূর্ণ যৌথ মানবিক সমাজ সৃষ্টির জন্য। এই প্রক্রিয়া অন্তহীন প্রক্রিয়া। বাংলাদেশে শত দারিদ্র্য, অভাব আর অনটনের মধ্যে আমাদের এই এক শক্তি ও সম্পদের গর্ব যে, বাংলাদেশের মানুষ জীবনের অভিজ্ঞতায়, ভাষা-স্বাধীনতা-গণতন্ত্র এবং একটা সঙ্গতিপূর্ণ মনুষ্য সমাজের পরস্পরাঙ্গী সংগ্রামের অভিজ্ঞতাতে সমৃদ্ধ। এই সম্ভারবোধ ছাড়া কোন সঙ্কটের মোকাবেলা করা চলে না। হতাশার ভিত্তিতে কোন সংকটের সমাধান ঘটে না।

আপাত : নৈরাজ্যিক অবস্থা এবং হতাশাজনক ঘটনার মধ্যেও আশার সেই উন্মুখ কিশলয়কে আমাদের অন্বেষণ করে বার করতে হবে। আশার এই স্বপ্ন কোন অলীক স্বপ্ন নয় : এই বিশ্বাস আমাদের পোষণ করতে হবে।

১৭-২-৯১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাবলো নেরুদার স্মৃতিকথা

কবি পাবলো নেরুদাকে নিয়ে আমি কি করব ভেবে পাচ্ছি নে। এখনো আমার বিমুগ্ধ অবস্থা।

না, এ নাম আমার কিংবা আমাদের কাছে নতুন নয়। ল্যাটিন আমেরিকার চিলি। তার সংগ্রামী, সমাজতান্ত্রিক মনোভাবে উদ্বুদ্ধ কবি পাবলো নেরুদা। সে নাম আজ বিশ্ববিশ্রুত। সংগ্রামী মানুষের কাছে এ নাম এক অনুপম অনুপ্রেরণার নাম। কিন্তু তাঁর কোন রচনা বা গ্রন্থের মাধ্যমে তাঁর বিস্তারিত পরিচয় আমার জানা নেই।

কিন্তু বয়োকনিষ্ঠ বন্ধু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের তরুণ অধ্যাপক ড. মুনতাসির মামুনের আছে। মামুনের সঙ্গে আমার পারস্পরিক স্নেহ-শ্রদ্ধার সম্পর্ক। মামুন আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তনের অন্যতম গবেষক। মামুন সাময়িক পত্রে উনবিংশ শতকের পূর্ব-বঙ্গ : এই মর্মে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে। এই কাজের স্বীকৃতিতে তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টরেট' প্রদান করা হয়েছে। তার এই কাজটি আমাদের এখানে অনন্য।

মামুনের সদা আগ্রহী মনের অনেক জিজ্ঞাসা। তার পাঠ ও জ্ঞানের পরিধি আমার চাইতে অনেক ব্যাপক। এ জন্য তার কাছে আমার একটা কৃতজ্ঞতাবোধ আছে। মামুন অকৃপণভাবে সব বিষয়ে কথা বলে। নানা জিজ্ঞাসা উত্থাপন করে।

দু'দিন আগে ও আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল : 'স্যার, আপনি নেরুদার স্মৃতিকথা পড়েছেন?

আমি বললাম : না, পড়ি নি। তুমি তো জান, আমার বইপত্র কম। পাঠের পরিধিও ছোট।

মামুন বলল : স্যার, এ এক অমূল্য জিনিস! আমি বললাম : আমাকে একটু দেখতে দিবে?

মামুন কোন দ্বিধা না করে পাবলো নেরুদার 'মেময়েরস্' বা স্মৃতিকথাখানি আমাকে পড়তে দিয়েছে। বইখানি নাড়াচাড়া করতে করতে আমি শিহরিত হয়েছি। এমন জীবনময় মানুষ পৃথিবীতে খুব কমই আছে। কমই থাকে। কবি এবং কবিতার অর্থ যে জীবন এবং আশা, তা নেরুদার জীবন এবং তাঁর স্মৃতিচারণ থেকে যেন প্রত্যক্ষভাবে আমি অনুভব করলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু পাবলো নেরুদাকে নিয়ে আমি কি করি? আগের কালে আমরা কেউ যদি একখানা ভাল বই পড়তাম, তবে সে সংবাদ অপর বন্ধুকে না দিয়ে থাকতে পারতাম না। অপর কারুর আমার কাছে বই চাওয়ার প্রশ্ন আসতো না। আমি যে-বইখানা পড়েছি তা কেবল আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে এর সার্থকতা কোথায়? এ বই অন্য বন্ধুদের দ্বারা পাঠ করাতে হবে। তাদের কাছে এ বইকে পৌঁছে দিতে হবে। এর নানা কাহিনী স্মৃতিতে ভেসে ওঠে। বন্ধুদের নিয়ে একসঙ্গে বই পড়ার স্মৃতি। কিন্তু এখন তো পরিবর্তিত কাল। এখন সংকট আর হতাশার বন্যায় আমরা এক সুহৃদ অপর সুহৃদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। প্রত্যেকে যেন পরস্পর বিচ্ছিন্ন, যোগাযোগের সূত্রহীন আপন আপন দ্বীপে বিপন্ন অবস্থায় আবদ্ধ।

মনে কেবল একটা আফসোস জাগছে : নেরুদার এই স্মৃতিকথার কিছুটাও যদি বন্ধুজনদের শোনাতে পারতাম, কোন উপায়ে!

কিন্তু নেরুদার এই স্মৃতিকথা নিয়ে কিছু লিখতে গিয়েও দেখছি : ব্যাপারটা সহজ নয়। বেশ বড় আকারের গ্রন্থ। মূল স্পেনিশ ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনূদিত। নেরুদা তাঁর শৈশব থেকে তাঁর সমগ্র জীবনের পরিচয় রেখেছেন এই গ্রন্থে। তাতে সংখ্যাহীন ঘটনা ও চরিত্রের আভাস বেরিয়েছে। এক পৃষ্ঠাতে যদি সাক্ষাৎ পাই গান্ধী আর নেহেরুর, অপর পৃষ্ঠাতেই ত্রিশ এবং চল্লিশের দশকের রহস্য পুরুষ মার্শাল স্ট্যালিনের, বর্ণনা পাই মাও সে-তুং-এর। এক বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে পট পরিবর্তন করে করে কবি পাবলো নেরুদা তাঁর বিশ্বব্যাপী চলন্ত জীবনের আভাসদানের চেষ্টা করেছেন। এর কোন অন্তরঙ্গ পরিচয় বাংলায় দেওয়া প্রায় দুঃসাধ্য।

চিলির একজন রেলশ্রমিকের সন্তান নেরুদা জন্মেছিলেন ১৯০৪ সনে। মারা যান ১৯৭৩ সনে, তাঁর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ চিলির সংগ্রামী প্রেসিডেন্ট সালভাদর আলেন্দের নিহত হওয়ার মাত্র বারদিন পরেই। প্রকাশক গ্রন্থের একটি পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন : এ গ্রন্থ হচ্ছে আমাদের সময়ের ইতিহাসের এক মূল্যবান স্বাক্ষর। এ স্মৃতিকথায় উদ্ভাসিত হয়েছে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক এক বিস্ময়কর জগৎ যার বাসিন্দাদের মধ্যে রয়েছেন লরকা, আরাগ, পিকাসো, রিভেরা, গান্ধী, নেহেরু, মাও-সে-তুং, ক্যাস্ট্রো, গুয়েভারা, আলেন্দের মত চরিত্র। নেরুদার কবিতার ছত্রে যেমন রয়েছে ক্রোধ, ঘৃণা, ক্ষোভ এবং গভীর অনুভূতির প্রকাশ, তাঁর জীবনের কাহিনীতেও আমরা পাই সেই অনিবার অস্থিরতা এবং বিরামহীন চলার সাক্ষাৎ। যে-কবি তাঁর মেধা, জীবন চেতনা-এবং উপলব্ধির গভীরতা দ্বারা দেশনির্বিশেষে সংগ্রামী যৌবনের করি হিসাবে প্রিয় হয়েছেন, তারই একটি জীবন্ত আলেখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর 'স্মৃতিকথা'।

প্রকাশকের এই পরিচিতি যথার্থ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেরুদা তাঁর স্মৃতিকথার কয়েকটি ছত্রের ভূমিকায় বলেছেন : 'আমার স্মৃতিকথায় খুব যে সূত্র আছে, তা নয়। এখানে সেখানে এর নানা শূন্যতা। অনেক কিছু আমি ভুলেও গেছি। আসলে জীবনটাই এমন। মাঝে মাঝে আমাদের স্বপ্ন দেখতে ভাল লাগে। কাজের মধ্যে স্বপ্ন। স্বপ্নের বিরতি। স্মরণ করতে গিয়ে দেখি, অনেক কিছু ধূসর হয়ে গেছে। অনেক স্মৃতির টুকরো শুকিয়ে ধুলো হয়ে গেছে। একে আর উদ্ধার করা যাবে না। আস্ত করা যাবে না। বলা যায়, ভাঙ্গা কাঁচের টুকরো। এর কোন মেরামত চলে না।

স্মৃতিকথকের স্মৃতি আর কবির স্মৃতি কি এক? না, তা নয়। যে কথক সে স্মরণ করে স্মৃতির খুঁটিনাটিকে। কবি দেয় তার দগ্ধ সময়ের প্রতিভাস।

'জীবনকথা' বলার কি তাৎপর্য? এ জীবন কি আমার কোন ব্যক্তিগত জীবন? আমি জীবন ধারণ করেছি অন্যের মধ্যে, সকলের মধ্যে।... আমার জীবন তৈরি হয়েছে অপর সকলের জীবনের সম্মিলনে। বহু জীবন মিলিয়ে এক কবির জীবন।'

আমি শুধু নেরুদার কথা কয়টির মর্ম দেবার চেষ্টা করলাম। ইংরেজির কেবল অনুবাদে তাকে প্রকাশ করা দুরূহ।

* * *

পাবলো নেরুদার 'মেময়েরস্' বা স্মৃতিকথার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ফিদেল ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের স্মৃতিচারণটি নজরে পড়ল। এরূপ মনোহর কাহিনী রয়েছে সংখ্যাহীনভাবে ছড়িয়ে সারা বইতে। ফিদেল ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বর্ণনাটি এখানে আমি তুলে দিচ্ছি।

হাভানায় বিজয়ীর বেশে প্রবেশের দু' সপ্তাহ পরে ফিদেল ক্যাস্ট্রো এলেন কারাকাসে একটি স্বল্পকালীন ভ্রমণে। তিনি এসেছিলেন ভেনিজুয়েলার সরকার এবং জনসাধারণ কিউবার বিপ্লবকে যে সহায়তা দান করেছিল তারই জন্য প্রকাশ্যভাবে তাঁর ধ্যনবাদ জানাতে। ক্যাস্ট্রো এই সাহায্য পেয়েছিলেন অস্ত্রের মাধ্যমে। অবশ্য এখন ভেনিজুয়েলার যিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন সেই বেতানকোর্ট এমন সাহায্যের উদ্যোক্তা ছিলেন না। ছিলেন এঁর পূববর্তী এ্যাডমিরাল ওফগাং লারাজাবাল। লারাজাবাল ভেনিজুয়েলার কমিউনিস্টসহ সকল বামপন্থীরই শুভার্থী ছিলেন। এবং তাই কিউবার সংগ্রামের পাশে তাঁকে দাঁড়াবার জন্য তাঁরা আহ্বান জানালে তিনি সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন।

রাজনৈতিক সংবর্ধনা আমি কম দেখি নি। কিন্তু কিউবার বিপ্লবের এই তরুণ বিজয়ীকে সেদিন ভেনিজুয়েলার মানুষ যে সংবর্ধনা জানিয়েছিল তার তুলনা খুব কমই পাওয়া যায়। সেই দুই লক্ষ লোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমিও সেদিন একটিও শব্দ উচ্চারণ না করে ফিদেলের বক্তৃতা শুনছিলাম। অত্যাদ্ভুত সে এক অভিজ্ঞতা। কারাকাসের কেন্দ্র আল সাইলেনসিওর বিরাট স্কোয়ারে বিরামহীনভাবে ফিদেল চার ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা করলেন। এই দীর্ঘ বক্তৃতা জনতা একেবারে নিঃশব্দে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনেছিল। অপর অনেকের মত ফিদেলের এদিনের এই বক্তৃতা ছিল আমার কাছে এক বিস্ময় বিশেষ। ফিদেলকে শ্রবণ করতে করতে একথা আমি সেদিন উপলব্ধি করলাম, ল্যাতিন আমেরিকাতে এক নূতন যুগের সূচনা ঘটেছে। তাঁর ভাষার সজীবতা আমাকে সেদিন স্পর্শ করেছিল। শ্রমিক নেতা কিংবা রাজনৈতিক বক্তাদের মধ্যেও যারা তুখোড়, তাদের বক্তৃতাতেও আমি দেখেছি, বক্তব্য থাকলেও পুনরাবৃত্তিতে অনেক সময়ে তাদের বক্তব্যের ধার যেন ক্ষয়ে যায়। একই বিষয় বা ফর্মুলার পুনরুক্তিতে শব্দ দুর্বল হয়ে আসে। ফিদেল সেদিন ধরাবাঁধা কোন লাইনের মধ্যে ঢুকলেন না। তাঁর ভাষা নৈর্ব্যক্তিক কিন্তু স্বাভাবিক ছিল। মনে হচ্ছিল যেন কথা বলতে বলতে তিনি কেবল যে শ্রোতাকে জ্ঞান দান করছিলেন, তা নয়। তিনি নিজেও যেন শিখছিলেন আর বলছিলেন।...

এই সমাবেশের পরের দিনের কথা। আমি সেদিন গ্রামের দিকে গিয়েছিলাম রবিবারের এক পিকনিকে। এমন সময়ে কয়েকটি মটরসাইকেল আরোহী এসে আমাকে কিউবার দূতাবাসের আমন্ত্রণপত্র পৌঁছে দিল। সারাদিন তারা আমাকে হন্যে হয়ে খোঁজ করেছে। অবশেষে তারা আমার এই সন্ধান পেয়ে গ্রামে এসে ধরেছে। এদিন বিকেলেই দূতাবাসে ক্যাস্ট্রোর এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হবে।

আমি এবং মাতিলদা সোজা দূতাবাসে চলে এলাম। দূতাবাস তখন লোকে লোকারণ্য। অভ্যাগতের সংখ্যা এত যে ঘরে কুলোচ্ছে না। তারা ঘর ছেড়ে উপচে পড়ছে বাইরে, বাগানে। এমব্যাসীর বাইরেও রাস্তায় লোকের ভীড়। সে ভীড়ের মধ্যদিয়ে দূতাবাসের দালানে ঢোকাই মুশকিল হয়ে পড়েছিল।

ঘরভরতি লোকের মধ্যদিয়ে আমরা এগুলাম। চারদিকে দেখলাম, গ্লাসভরতি পানীয় নিয়ে আপ্যায়নকারীরা ঘুরছে। কে যেন আমাদের করিডোর আর সিঁড়ি দিয়ে নিচের তলায় নিয়ে গেল। ফিদেলের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু এবং সচিব সিলিয়া আমাদের জন্য ঘরের একটা অপ্রত্যাশিত অংশে অপেক্ষা করছিল। মাতিলদা তার সঙ্গে রয়ে গেল। আমাকে পরের ঘরটিতে নিয়ে যাওয়া হল। এ যেন কোন পরিচারক, মালী বা গাড়ি ড্রাইভারের ঘর। ঘরের মধ্যে একটা মাত্র বিছানা। কেউ হয়ত ঘরটা এইমাত্র ছেড়ে গেছে। ঘরের জিনিসপত্তর এলোমেলো। একটা বালিশ মেঝেতে। কোণায় একটা ছোট টেবিল। আর কিছু না। আমি ভাবলাম, এখান থেকে আর একটা ভাল ঘরে আমায় নিয়ে যাওয়া হবে, নেতার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। আসলে তা ঘটল না। আমি দেখলাম, হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। আর সে দরজা জুড়ে দাঁড়ালো ক্যাস্ট্রোর দীর্ঘ দেহ।

ক্যাস্ট্রো আমার চাইতে এক মাথা উঁচু। দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে তিনি এগিয়ে এসে 'হেই পাবলো!' বলে বুকে জড়িয়ে আমাকে প্রায় পিষে ফেলতে লাগলেন।

ক্যাস্ট্রোর বাঁশীর মত, প্রায় শিশুর মত কণ্ঠস্বর আমাকে অবাক করে দিল। তাঁর চেহারার একটা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে গলার এই স্বর যেন মিশে গেল। ক্যাস্ট্রোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখের দিকে চাইলে তাঁকে একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বলেই আপনার মনে হবে না। মনে হবে, যেন হঠাৎ একটি কিশোরের পা দুটো লাফ দিয়ে বড় হয়ে গেছে। কিন্তু তার কিশোর মুখখানি কিংবা বয়ঃসন্ধির বিরল পরিমাণ শশ্রুগুচ্ছ যেমন ছিল, তেমনি আছে।

হঠাৎ দেখি, আমাকে আলিঙ্গন থেকে মুক্তি দিয়ে ক্যাস্ট্রো পিছন ফিরে ঘরের একটা কোণের দিকে সোজা এগিয়ে গেলেন এবং তার পরেই কার যেন গলা ধরে ধাক্কা দিলেন। আসলে আমি আগে খেয়ালই করি নি, একজন ফটোগ্রাফার লুকিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাদের দিকে তার ক্যামেরাটাকে তাক করে রেখেছিল। ক্যাস্ট্রো তার গলা ধরে বেদম ঝাঁকুনি দিতে লাগলেন। বেচারার ক্যামেরাটা মেঝেতে পড়ে গেল। দেখলাম, ভীত ক্ষুদ্রকায় লোকটা কোনরকমে ক্যাস্ট্রোর শক্ত হাত থেকে নিজেকে ছুটাতে চাচ্ছে। আমি গিয়ে ক্যাস্ট্রোর হাত ধরে ফেললাম। ফিদেল লোকটাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ঘরের বার করে দিতে লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল। এবার ফিদেল আমার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন। ক্যামেরাটাকে মেঝে থেকে তুলে বিছানার উপর ছুড়ে দিলেন।

ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের মধ্যে কোন কথা হল না। আমি ফিদেলের সঙ্গে সমগ্র ল্যাতিন আমেরিকার জন্য একটা বার্তা সংস্থা গঠনের সম্ভাবনার বিষয় নিয়ে আলাপ করলাম। আমার মনে হয়, পরবর্তীতে যে 'প্রেনসাল্যাটিনা'– বার্তা প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছিল, তার সূচনা ঘটেছিল সেদিন ওখানেই। এবার আমরা সংবর্ধনার জলসায় ফিরে গেলাম। ফিদেল গেলেন তাঁর দরজা দিয়ে। আমি ভিন্নতর একটি দরজার মধ্য দিয়ে।

ঘণ্টাখানেক পরে মাতিলদাকে নিয়ে যখন এমব্যাসী থেকে ফিরে আসছিলাম তখন আমার চোখে যেমন ভীত সন্ত্রস্ত ফটোগ্রাফারের মুখটি ভেসে উঠছিল, তেমনি গেরিলা যোদ্ধা ফিদেলের ত্বরিত পদক্ষেপটিও। ফিদেল দেখেন নি। কিন্তু তাঁর পেছন দিয়ে এই লোকটি যে বিনা অনুমতিতে ঘরের মধ্যে ঢুকেছে, তা যেন তিনি তাঁর গেরিলা যোদ্ধার সতর্ক অনুভূতি দিয়েই আন্দাজ করতে পেরেছিলেন।

ফিদেলের সঙ্গে সেই ছিল আমার প্রথম সাক্ষাৎ। কিন্তু আমার মনে একটি প্রশ্ন রয়ে গেল। ক্যাস্ট্রো আমাদের ছবি তোলার চেষ্টায় বেচারা ফটোগ্রাফারের উপর অমন হিংস্র হয়ে উঠলেন কেন? আজ পর্যন্ত আমি বুঝতে পারছি নে, আমাদের সেই সাক্ষাৎটির এত গোপনীয়তার কারণ কি হতে পারে?

১৯৮৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চার ঘণ্টার প্যারোলে

২৩-১০-৯২ : শুক্রবার। সাপ্তাহিক ছুটির দিন। সকাল ৬টায় ওঠা, বাসার ওভারহেড ট্যাঙ্কে পানি তোলা, খবরের কাগজে চোখ বুলানো, ভোরের নাশতা খাওয়া, স্ত্রীর বাজারের স্লিপ হাতে বাসার কাছাকাছি মধুবাগ বাজারে যাওয়া, প্রথমেই ধনে পাতা, বড় ছেলের বাতিক ও হুকুম, নতুন উঠতে শুরু করেছে, দাম বেশি, ২ টাকায় হবে না, সে ভর্তা খাবে, ৩ টাকার ধনে পাতা, কাঁচামরিচ, দাম বাড়ছে, এখন আর হাতের আন্দাজে দেয় না, অন্তত ঃ ২ টাকার নিতে হবে, এক টাকার দেয় না, দুদিন আগে ২ টাকার কাঁচা মরিচের চেয়েও বেশি পাওয়া যেত এক টাকায়, দোকানী বলে ৫০ টাকা এক কেজি কাঁচা মরিচের দাম পাইকারী বাজারেই, পান ১ টাকা, সুপারী ৫০ গ্রাম ৫ টাকা, বাসার কাজের মেয়ের দাঁতের মাজন ১৪ টাকা, তেল ১ কেজি ৪০ টাকা, সাবান ২ পিস ১৩ টাকা, ডিমের হালি ১৪ টাকা, হাফ রুটি ৪ টাকা, আটা ১ কেজি ১২ টাকা। বাজার শেষ হল। বেরুব বাসা থেকে? কিন্তু কাজ তো আরো বাকি। গোসলের আগে বড় ছেলের কাপড় ধোয়া, একটা বিছানার চাদর, ১টা প্যান্ট, ১টা গেঞ্জি, ১টা তোয়ালে, এক পিস ছেঁড়া কাপড়। আমাকেই ধুতে হবে। আর কেউ ধুলে হবে না। ধোয়া হল। গোসল হল।

১১টা বেজে গেছে। বেরুব? কোথায় যাব? এখন হয়ত ঘণ্টা চারেকের জন্য পালানো যায় : প্যারোলে 'পরিবার নহে কারাগার' থেকে। কোন্ লেখকের যেন বই, 'পরিবার নহে, কারাগার।' সুন্দর নাম। যুৎসই। কিন্তু 'প্যারোল' কাকে বলে? যে পাঠক সেই ব্রিটিশ রাজ থেকে পাকিস্তান রাজ হয়ে বাংলাদেশী হুকুমতে রাজবন্দী হন নি দীর্ঘদিনের জন্য তিনি 'প্যারোল' শব্দের অর্থ জানবেন না। তা স্বাভাবিক। কারাগারে ফিরে যাবার শর্তে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি। এই হচ্ছে 'প্যারোল'। এমন শব্দেও পাঠক বুঝবেন না। তাঁকে রাজবন্দী হতে হবে। তবু থেকে যাবে একালে, সেকালে তফাৎ। কিন্তু সে আলোচনা থাক।

এদিন যথার্থই আমি পালিয়েছিলাম এই কারাগার থেকে। এখন তারই স্মৃতি ঘাঁটন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুক্রবার, ২৩ অক্টোবর। ইচ্ছা হচ্ছিল যাই কাশেমের কাছে। কলেজের বন্ধু কাশেম, ১৯৪২ সালের। কাশেমের ছোট ছেলেটিকে অনেকদিন দেখি নি। নাম বোধ হয় অনু। কিন্তু এমন দুপুরে কারুর বাসায় যাওয়া ঠিক নয়। তাকে বিব্রত করা হবে। যদিও কাশেমের স্ত্রী অত্যন্ত অতিথিবৎসল। মুখে হাসি লেগে থাকে।...

প্রথমে গেলাম বায়তুল মোকাররমে। সব দোকান, অফিস বন্ধ। রাস্তায় ভীড় কম। একটু হাল্কা লাগে। চলাচল করা যায়। পত্রিকার দোকানে দাঁড়ালাম। অবুঝ বড় ছেলেটির আকর্ষণ রঙীন ছবির পত্রিকার দিকে। প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার এলেই বলবে, 'চিত্রালী' নিয়ে এসো। আজকেও বলেছে। তাই প্রথমে খোঁজ করলাম, ২৩ অক্টোবর, শুক্রবারের তারিখ দেওয়া 'চিত্রালী'। অনেক সময় পাওয়া যায় না। কিন্তু আজ পাওয়া গেল। তাতেও মন একটু ভাল লাগল। এখানে না পেলে আরো অনেক দোকানে খোঁজ করতে হত। 'ভোরের কাগজ'-এর একটা কপি দরকার। 'সৌজন্য সংখ্যা' হিসাবে একটা কপি তাদের পিয়ন দেয় বটে। কিন্তু মাঝে মাঝেই তার ফাঁক পড়ে। আজ ১১টা পর্যন্ত দেখলাম দেয় নি। 'ভোরের কাগজ' কেনার একটা ঔৎসুক্যও ছিল। দেখি, কয়েকদিন আগে দেওয়া আমার লেখাটি ছেপেছে কিনা। মাসুদ আমাকে বলেছিলেন, শুক্রবারেই ছেপে দেবেন। ড. মাসুদুজ্জামান। তরুণ সাংবাদিক, সাহিত্যিক। 'ভোরের কাগজ' যাঁরা চালান, তাঁদেরই একজন। সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার লেখার তদারকী বোধ হয় মাসুদই করেন। আমার কাছ থেকে তাগাদা দিয়ে লেখা আদায় করেন। আমার কোন লেখাই অবশ্য লেখা নয়। ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী। কেউ এ লেখা পড়ে বলে আমার ধারণা হয় না। আসলে এখন এত পত্রিকা : দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, আর তাতে এত লেখা : প্রবন্ধ, রস-রচনা, রাজনীতিক আলোচনা প্রকাশিত হচ্ছে যে, কারুর লেখা কেউ পড়ে বলেই আমার মনে হয় না। আমি তো বন্ধু-বান্ধবদের রসিকতা করে বলি : আমার লেখা কেবল আমিই পড়ি। দুবার। কপি কাগজে দেবার আগে একবার। আর কাগজে প্রকাশ হলে আর একবার। দ্বিতীয়বার পড়ি, ছাপা লেখায় কত ভুল মুদ্রণ রয়েছে, তা দেখার জন্য। যারা ছাপে তাদের কাছে লেখা, লেখা নয়। 'কপি'। কলাম মাপে কপি। দরকার যদি হয় তিন কলামের, আর লেখকের লেখা যদি হয় চার কলামের, তবে তাঁরা কাঁচি দিয়ে লেখার আগা-পাছা-কিংবা পেট থেকে এক কলাম কেটে সাইজ করে নেন। তাছাড়া বাক্যে যদি থাকে 'এ কথা আমি বলি নি', তবে ছাপা হবে, 'এ কথা আমি বলি'। 'নি' বাদ পড়ে যাবে নির্ঘাত। কেবল 'নি' বা 'না' নয়। 'হ্যাঁ'ও বাদ যাবে। 'পথিকৃৎ' হবে 'পাঠক'। এবং 'ভিত্তি' হবে ভিডিও'। নিজের মুদ্রিত লেখা নিজে পাঠ করেই আঁতকে উঠি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপরে প্রবোধ দিই নিজেকে। এতে চিন্তার কি আছে? কোন পাঠক তো কষ্ট করে আমার লেখা পড়তে পড়তে 'পথিকৃৎ' পর্যন্ত আসবেন না। 'ভিত্তি' পর্যন্তও নয়। তাই লেখা প্রকাশের পরে কেউ ঠাট্টা করেও বলেন না : 'এখন কি ভিডিওর দোকান খুলেছেন?'

'ভোরের কাগজ' খুলে দেখলাম, আমার লেখাটি ছাপা হয়েছে : 'পুনরায় 'নির্বাসিতের আত্মকথা'। কিনেই এক নজর দেখে নিলাম। দেখলাম, মোটামুটি পাঠযোগ্য। মারাত্মক কোন ভুল চোখে পড়ল না। তাতে মনটা বেশ একটু হাল্কা হল।

ঘড়িতে দেখলাম, প্রায় ১২টা বাজে। 'পরিবার নহে কারাগার।' সেখান থেকে আজ শুক্রবার যদি ঘণ্টা চারেকের মুক্তি পেয়েই থাকি, তবে এত সকালে আবার সেই কারাগারে ফিরে যাওয়া কেন? দরকার হয়তো বায়তুল মোকাররম থেকে হেঁটেই চলে যাব সরদঘাট। বুড়িগঙ্গার তীরে। অনেকদিন যাওয়া হয় নি।

অনেকদিন যাওয়া হয় নি। বুড়িগঙ্গা আমাকে টানে। এখন কি খুব শীর্ণ হয়ে গেছে? কতটুকু পানি আছে? দেখি না গিয়ে। এই দুর্লভ প্যারোলের মুক্তিটুকু ব্যবহার করে। তার আগে মানিব্যাগ খুলে দেখলাম, খুচরো রিকশা ভাড়া নেই। টাকা ভাঙ্গাতে হবে। টাকা ভাঙ্গাতে স্টেডিয়ামের প্রভিনশিয়াল রেস্টুরেন্টে চা খেতে বসলাম।

চা খেয়ে বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণের রাস্তা থেকে একটি রিকশায় দর করে উঠলাম। একজন বুড়োমত রিকশাওয়ালা। সদরঘাট কত, জিজ্ঞেস করতে বলল : ৬ টাকা। আমি আর বেশি দর করলাম না। দরাদরিতে মেজাজ অনেক সময় কথা, পাল্টাকথায় নষ্ট হয়ে যায়। আজ এখনকার এই হাল্কা আমেজটা আর নষ্ট করতে চাইলাম না। গুলিস্তান-সদর ঘাটে রাস্তাও আজ বেশ চলাচলের উপযুক্ত। দুপাশের দোকানপাট সব বন্ধ। রিকশার উপরে রিকশার ধাক্কা, বাস আর টেম্পোর নিচে প্রায় চাপা পড়ার আশঙ্কা আজ নেই। দুপাশের এই শান্ত আর প্রায় নিঃশব্দ দৃশ্য দেখতে দেখতে রিকশায় চড়ে দক্ষিণমুখে এগুতে লাগলাম। দেখলাম গুলিস্তান সিনেমা হলের বিপরীতে রাস্তা আর পার্কের এ দিকটায় বেশ ভাংচুর চলছে। এখানকার রাস্তা আর বাসগুলো থামার জায়গার বোধ হয় পুনর্বিন্যাসের পরিকল্পনা আছে। 'রেল লাইন' পার হয়ে? না, 'রেল লাইন পার হওয়া' পুরোন স্মৃতির কথা। এখন রেললাইনের সেই ক্রসিং-এ ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়িয়ে উত্তর-দক্ষিণ, আর পূর্ব-পশ্চিমের মানুষ আর গাড়ির স্রোত নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। নওয়াবপুরে ঢুকতে হাতের ডানে চোখ পড়তে মনে জিজ্ঞাসা এল : কোথায় সেই 'ক্যাপিটাল রেস্টুরেন্ট'? না, তার কোন চিহ্ন আজ আর নেই। সেকালে, এমন কি ষাটের দশকেও বোধ হয় ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেস্টুরেন্টটি। তখনকার রাজনৈতিক যুবক, ছাত্র আর সাংবাদিকরা আসতেন চা খেতে আর আড্ডা দিতে। এখানকার চা পরোটার বেশ সুনাম ছিল। চল্লিশের দশকের সেই ফটোর দোকান 'ডস' কোম্পানীকে আর খুঁজে পেলাম না। দক্ষিণ দিকে যেতে হাতের বায়ে ছিল। সেকালে এটিই ছিল নির্ভরযোগ্য বনেদি ফটো তোলার দোকান। বংশালের 'মানসী' সিনেমার নাম বোধ হয় এখনো আছে। বংশালের রাস্তা এসে নওয়াবপুরের সঙ্গে যেখানে মিলেছে, সেখানকার মোড়ে পশ্চিম পাশে ছিল আলবার্ট লাইব্রেরি। প্রবাদকালের 'মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায়' অভিযুক্ত ঢাকার কমিউনিস্ট নেতা গোপাল বসাকের বইএর দোকান। প্রধানতঃ ইংরেজি এবং বিদেশী বইএর দোকান। এখন স্মৃতির কোন্ অতলে সেই প্রবাদপুরুষ, ছোট্ট-কৃশদেহের গোপাল বসাক এবং কোথায় ঢাকার বামপন্থী সাহিত্যিক রনেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন, অচ্যুত গোস্বামী, কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত? এঁদের মিলনের অন্যতম কেন্দ্র ছিল আলবার্ট লাইব্রেরি। 'এরা, আমাদের, মানে আমি, আবদুল মতিন, সানাউল হক, মুনীর চৌধুরী, সৈয়দ নুরুদ্দীন : এঁদের পূর্বপূরী। আমরা এসে মিলেছিলাম বহমান প্রাণের এই স্রোতের সঙ্গে, চল্লিশের দশকের প্রায় মাঝখানে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন চলছে এবং প্রায় শেষ হয়ে আসছে।...

নওয়াবপুরের পুল। সে ছিল ঢাকার হিন্দুস্তান-পাকিস্তানের সীমানা। '৪৭-এরও আগে। সেই পুলের পশ্চিম পাশে ছিল একটি মসজিদ। সে মসজিদ আছে। কিন্তু সে পুল আর নেই। পুলের নিচের দোলাইখাল এখন লোহালক্কড়ের দোকান ভরতি সড়ক হয়ে গেছে। নওয়াবপুর ব্রিজের উত্তরের এলাকা ছিল হিন্দু প্রধান এবং দক্ষিণের এলাকা রায়সাহেবের বাজার মুসলমান প্রধান। আরো দক্ষিণে ছিল ঢাকা জেলা বোর্ডের মনোহর দোতলা বাংলো। সে দালানটি আছে বটে। কিন্তু আজ তাকে হতশ্রী মনে হচ্ছে। তার আঙ্গিনা থেকেই তৈরি হয়েছে রাস্তা পারাপারের ওভারব্রিজ। রাস্তার ঠিক এই জায়গাটিতে, পূর্ব পার্শ্বে ছিল প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের অফিস আর বইএর দোকান। একটি চারতলা দালানের নিচে। দালানটি এখনো আছে। তেমন মেরামত বা পুনর্গঠন চোখে পড়ল না। হয়ত একদিন ধসে পড়ে আর এক ইতিহাস তৈরি করবে। ইতিহাস ধসে পড়ার ইতিহাস।

একে ছাড়িয়ে সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত অব্যাহত সিনেমা হলটিকে পাশ কাটিয়ে এগুতে মনের পাতায় অনেক স্মৃতি ঝলসে উঠল। 'মুকুল' সিনেমা। না, এখন আর 'মুকুল' নয়। এখন সে 'আজাদ'। কিন্তু এই 'মুকুলে' '৪২ সালে আই এ ক্লাশের ছাত্র আমি ঢাকা কলেজের হস্টেল থেকে নিজের সাহিত্য আর আনন্দ-প্রাণ বন্ধুদের নিয়ে শিবরাত্রির ফুল সিরিয়াল দেখেছি। এক সঙ্গে 'মুক্তি', 'দেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাটি' আর 'উদয়ের পথে'। এর দক্ষিণ পাশেই 'ওকে' রেস্টুরেন্ট। তারও নাম বদল হয়েছে, কাঠামো আছে। ভিক্টোরিয়া পার্ক এখন বাহাদুর শা পার্ক।...

সদর ঘাট পৌঁছে দেড় টাকার টিকেট কেটে লঞ্চ টারমিনালে ঢুকে পন্টুনের উপর দাঁড়িয়ে দেখলাম : রাতে ছাড়বে যে লঞ্চগুলো, সেগুলো দাঁড়িয়ে আছে নদীর মাঝে। ঢাকা-চাঁদপুরে যাতায়াতের দুটি বড় লঞ্চ দেখলাম সরবে যাত্রী ডাকছে। একটা দেড়টার দিকে ছেড়ে যাবে। পন্টুনের এ মাথা থেকে ও মাথায় ঘুরে আবার বেরিয়ে এলাম। এখান থেকে পশ্চিমে এগুলে বাদামতলী ঘাট। বরিশাল-খুলনা যাওয়ার রকেট স্টীমার এখনো ওখান থেকে ছাড়ে।

এগুলাম বাদামতলীর দিকে। শুক্রবার। বাদামতলীর ব্যস্ত চালের আড়তগুলো দেখলাম বন্ধ। রাস্তায় তেমন ভীড় নেই। হেঁটে হেঁটে ইসলামপুরের রাস্তায় উঠলাম। ইসলামপুর আর পাটুয়াটুলীর মোড়ে সেই ব্রিজটা আজ কোথায়? এর নিচ দিয়েই দোলাইখাল নয়াবাজার হয়ে বুড়িগঙ্গায় গিয়ে মিলেছিল। এই ব্রিজের গোড়াতেই ছিল সাহিত্যিক কাসেম সাহেবের 'মখদুমী এ্যাণ্ড আহসান উল্লাহ লাইব্রেরি'। এখন আর সে ব্রিজের চিহ্ন নেই। সমান রাস্তা হয়ে গেছে। মিটফোর্ড কলেজ (সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ) আর হাসপাতালের সামনে দিয়ে এই রাস্তাই চলে গেছে চকবাজার। একটা রিকশা নিলাম। ভাবলাম, পুরোন এলাকার রাস্তা দেখতে দেখতে নিউমার্কেট হয়ে মগবাজারের বাসায় যাব। মিটফোর্ডের সামনের রাস্তায় পড়তেই '৪৩ সালের (১৩৫০ সনের) দুর্ভিক্ষের সেই দৃশ্যটি চোখে ভেসে উঠল : মিটফোর্ডের এই রাস্তায় একটা দোকানের সিঁড়িতে অভুক্ত এক গ্রামবাসী এসে মরে পড়েছিল। হয়ত দুদিন যাবৎ পড়ে ছিল। কেউ সরায় নি। এখন আর সে লাশ নেই। তবু সেদিনকার ক্ষুধা আর দারিদ্র্য ব্যাপকতর হওয়া ছাড়া হ্রাস পেয়েছে, এমন তো বলা যায় না।

চক ছাড়িয়ে রিকশায় চড়ে ঢাকা জেলের পশ্চিম পাশ দিয়ে লালবাগের দিকে এগুতে রাস্তার নাম খোঁজ করতে দেখলাম : রাস্তার নাম হরনাথ ঘোষ রোড। কে ছিলেন এই হরনাথ ঘোষ? বিশের কিংবা ত্রিশের দশকের ঢাকার। ঢাকা শহরের। নিশ্চয়ই কোন মান্যবর ব্যক্তি যাঁর নামে একটি রাস্তা হয়েছে। সে রাস্তার নামটি এখনো চালু আছে। কিন্তু তাঁর পরিচয় আমি কিংবা আমাদের ছেলেমেয়েরা, নতুন যুগের মানুষেরা কিছু জানে না। না জানাই স্বাভাবিক। রাস্তার নামের সঙ্গে হরনাথ ঘোষের জীবনী লেখা নেই। কিন্তু হরনাথ গোষের জীবনী তো নতুন যুগের গবেষকদের গবেষণা করে লেখা উচিত, জানা উচিত। বিশেষ করে হরনাথ ঘোষ, মদন মোহন বসাক রোডের মদন মোহন বসাক, এঁদের নাম, যারা সম্প্রদায়গত ভাবেই ক্রমান্বয় ঢাকার শহর-জীবন থেকে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লালবাগ ছাড়িয়ে 'আজাদ' অফিসের পেছনে চওড়া রাস্তায় পড়তে নতুন শহরের আভাস পেলাম। শহরের চওড়া রাস্তায় কিছুটা নিঃশ্বাস নেওয়া যায়। এ কথা ঠিক। বিশেষ করে ছুটির দিনে। যানবাহন আর মানুষের কিছুটা অল্প চলাচলের কারণে। তবু ছুটির দিনেও আমার ভাল লাগে নতুন শহরের চাইতে পুরোন শহর। পুরোন গলি। তার সঙ্গেই নিজের জীবনের একটা আত্মীয়তার আবেগ যেন বোধ করি।

'পরিবার নহে, কারাগারের' দরজায় এসে হাতের ঘড়িতে সময় দেখলাম। ভয়, পাছে না সময় পার হয়ে গিয়ে থাকে। দেখলাম, না, সময় একেবারে পার হয়ে যায় নি। তবু গেট দিয়ে ঢুকতে গিয়ে কোন ধমক-ধামকই যে খাবো না, তার কোন নিশ্চয়তা নেই।...

মন্দ লাগল না, বহুদিন পরে 'প্যারোলের' এই কয়েকটি ঘণ্টা।

২৫-১০-৯২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~